হোসেন শাহী আমলে বাংলা

১৪৯৪-১৫৩৮

একটি সামাজিক রাজনৈতিক পর্যেষণা

মমতাজুর রহমান তরফদার

অনুবাদ

মোকাদ্দেসুর রহমান

বাংলা একাডেমী : ঢাকা

উৎসর্গ

আব্বা ও আম্মাকে

যাঁরা না থেকেও সতত আমার হৃদয়ে

অনুবাদকের ভূমিকা

হোসেন শাহী আমল (১৪৯৪-১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দ) বাংলার সুলতানি শাসনামলের স্বর্ণযুগ হিসেবে পরিচিত। এ বংশের চারজন সুলতান প্রায় অর্ধশতাব্দীকালব্যাপী রাজত্ব করেছিলেন। এ সময়কালে প্রশাসন, অর্থনীতি, ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য ও সংস্কৃতি-বাংলার জনজীবনের প্রায় সবক্ষেত্রেই উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। আরবি, ফার্সি, সংস্কৃত এবং বাংলা ভাষায় রচিত, প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত বহু উৎস ব্যবহার করে অধ্যাপক মমতাজুর রহমান তরফদার তাঁর গ্রন্থে এ সব দিকে সন্ধানী আলোকপাত করেছেন।

বর্তমানে বাংলাদেশের সব সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে বাংলার ইতিহাস পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত—সে পাঠক্রমের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ জুড়ে আছে হোসেন শাহী আমলের বাংলার ইতিহাস। কিন্তু বাংলা ভাষায় যথেষ্ট সংখ্যক প্রামাণ্য বই-এর অভাব এ বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষালাভের অন্যতম অন্তরায়। ছাত্রছাত্রীদের প্রয়োজনের কথা মনে রেখে এ গ্রন্থ অনুবাদের কাজ শুরু করেছিলাম। অনূদিত এ গ্রন্থ তাদের কাজে এলে নিজের শ্রম সার্থক মনে করব।

এ গ্রন্থে বাংলা বলতে ১৯৪৭ সালের আগের অবিভক্ত বাংলা, অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিম বাংলাকে বুঝানো হয়েছে।

স্থাপত্য শিল্পসম্পর্কিত আলোচনার ক্ষেত্রে সাধারণত ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করেছি—প্রধানত এ গুলির যথার্থ সহজবোধ্য বাংলা প্রতিশব্দ নেই বলে। বাংলা প্রতিশব্দের ব্যবহার এসব ক্ষেত্রে ভাষার শ্রীবৃদ্ধি না করে বরং তার লালিত্যহানি ঘটায়। মাঝে মাঝে সেগুলি শ্রুতিকটুও মনে হয়। সেসব ক্ষেত্রে প্রতিশব্দের ব্যবহার বক্তব্যকে দুর্বোধ্যও করে তুলতে পারে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাংলা প্রতিশব্দ ব্যবহার করে বন্ধনীর মধ্যে ইংরেজি শব্দটি রেখেছি–সহজবোধ্য হবে এ আশায়।

বানানের ব্যাপারে প্রচলিত রীতি ব্যবহার করা হয়েছে, যেমন হোসেন, মোহাম্মদ, সৈয়দ ইত্যাদি। নিখুঁত অনুবাদ অত্যন্ত দুঃসাধ্য—পূর্ব অভিজ্ঞতা এবং যথাসাধ্য চেষ্টা সত্ত্বেও অনুবাদ নিখুঁত হয়েছে এমন দাবি করার মতো দুঃসাহস আমার নেই। অন্যান্য ভুলত্রুটি থাকাটাও অস্বাভাবিক বা অসম্ভব নয়–সেগুলি পাঠকের ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিলাভে বঞ্চিত হবে না এমন আশা আমার আছে।

এ গ্রন্থ অনুবাদ করতে গিয়ে আমি বহুজনের আন্তরিক ও সক্রিয় সহযোগিতা পেয়েছি, যা না পেলে এ কাজ শেষ করা হয়তো সম্ভব হতো না। তাঁদের সংখ্যা অনেক, কাজেই আলাদাভাবে তাঁদের সকলের নাম উল্লেখ করা সম্ভব নয়—তাঁদের সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

সহকর্মী বন্ধু অধ্যাপক আব্দুস সাঈদ এ গ্রন্থে উদ্বৃত আরবি ও ফার্সি পাঠ্যাংশের অনুবাদ ও অনুলিখনে আমাকে সাহায্য করেছেন। প্রবাসী সহকর্মী ছন্দা প্যারিস থেকে ও প্রাক্তন প্রিয়ছাত্র ও সহকর্মী ড: শামসুল হুদা চিঠি লিখে প্রায়ই এ কাজের অগ্রগতির খোঁজ-খবর নিয়ে আমাকে উৎসাহিত করেছেন। তাঁদের কাছেও আমি ঋণী। অধ্যাপক আব্দুল মোমিন চৌধুরী সবসময়

বিভিন্নভাবে আমার এ কাজে সাহায্য করেছেন। ধন্যবাদ জানিয়ে বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তাঁর কাছে আমার ঋণের বোঝা হালকা করা সম্ভব নয়।

এ গ্রন্থ অনুবাদের অনুমতিদানের জন্য আমি গ্রন্থকার অধ্যাপক মমতাজুর রহমান তরফদার এবং প্রকাশক এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বাংলাদেশ (তদানীন্তন এশিয়াটিক সোসাইটি অফ পাকিস্তান)-এর কর্তৃপক্ষের কাছে কৃতজ্ঞ। বাংলা একাডেমী এ গ্রন্থের প্রকাশনার দায়িত্ব গ্রহণ করায় একাডেমীর কর্তৃপক্ষকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মুখবন্ধ

এ দেশের ইতিহাসে হোসেন শাহী শাসনামলের (১৪৯৪-১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দ) একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে। সে আমলের বাংলার সামাজিক-রাজনৈতিক জীবনের একটি পূর্ণাঙ্গ বিবরণ উপস্থাপনই এ গ্রন্থের লক্ষ্য। যথেষ্ট উপাদান ইতোমধ্যেই আবিষ্কৃত হওয়ায় এ আমলের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচনা করা সম্ভব, যাকে তার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পটভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। হোসেন শাহী আমলের বাংলার বিভিন্ন দিক, যেমন প্রশাসনিক কাঠামো, অর্থনৈতিক জীবন, ধর্মীয় আন্দোলন, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড এবং দেশের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য বিষয় নিয়ে এ পর্যন্ত গ্রন্থ রচনার কোনো প্রয়াস চালানো হয় নি। আলোচ্য সময়কালে বাংলার সামাজিক অর্থনৈতিক জীবনের সক্রিয় শক্তিগুলোকে বিশ্লেষণ করে এসব বিষয়ে আলোচনার একটি ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা এ গ্রন্থে করা হয়েছে।

বিভিন্ন দিক আলোচনা করার সময় গ্রন্থকার এগুলির তুলনামূলক গুরুত্বের দিকে লক্ষ্য রেখেছেন। সত্যিকারভাবে কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেন অবহেলিত না হয় বা বাদ না পড়ে সেদিকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়েছে। হোসেন শাহী আমলের পূর্ববর্তী মুসলমান শাসনামলের শতাব্দীগুলোতে বাংলার সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের বৈশিষ্ট্যসূচক প্রধান প্রবণতাগুলির সাধারণ প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা দেয়া হচ্ছে এ গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদের উদ্দেশ্য।

প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত উৎসসমূহ থেকে উপাদান ব্যবহার করা হয়েছে। আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে রক্ষিত আরবি হরফে *যোগকালন্দরের* দু'টি পাণ্ডুলিপির (নং ৩৮৬ ও ৩৮৮) সঙ্গে ডঃ এনামুল হক সম্পাদিত বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটির একই গ্রন্থের একটি পাণ্ডুলিপি তুলনা করে গ্রন্থকার দেখেছেন যে বর্তমান উদ্দেশ্যের জন্য গুরুত্বহীন কয়েকটি স্তবকের ক্ষেত্রে ছাড়া তাদের মূলপাঠে বিশেষ পার্থক্য নেই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাণ্ডুলিপিগুলির পরিবর্তে ডঃ হকের মূলপাঠের প্রতি কেন সবসময় নির্দেশ করা হয়েছে এ থেকে তার ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে।

আরবি, ফার্সি, সংস্কৃত ও বাংলা শব্দগুলি বর্ণান্তরিত করার ক্ষেত্রে সামান্য রদবদল করে সাধারণভাবে স্বীকৃত প্রাচ্যের রীতি গ্রহণ করা হয়েছে। স্থান ও আধুনিক লেখকদের নামের ক্ষেত্রে কোনো ধরাবাঁধা নিয়ম অনুসরণ করা হয় নি।

এ গ্রন্থ রচনায় বহু পণ্ডিত ব্যক্তির কাছ থেকে আমি যে মূল্যবান সাহায্য পেয়েছি এ সুযোগে এখানে তা স্বীকার করছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে আমার শিক্ষক অধ্যাপক এ. বি. এম হাবিবুল্লাহ ও জনাব এ. এম. খানের কাছে আমি এত বেশি ঋণী যে তা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা আমার পক্ষে কঠিন। তাঁদের আশা পূরণ করতে সক্ষম হয়ে থাকলে সেটাই হবে আমার জন্য সত্যিকারের গর্বের বিষয়। ১৯৬১ সালের জানুয়ারি মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সফলতার সঙ্গে পেশকৃত পি. এইচ. ডি অভিসন্দর্ভ থেকে বর্তমান গ্রন্থের সৃষ্টি হওয়ায় আমি আমার পরীক্ষকবৃন্দের কাছে আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই। তাঁরা হচ্ছেন ঢাকার ডঃ মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নীহার রঞ্জন রায় এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ সি. সি. ডেভিস। তাঁদের মূল্যবান পরামর্শ এবং

সমালোচনামূলক মন্তব্য পর্যালোচনাধীন আমলের সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্যাবলির পুনর্মূল্যায়নে উৎসাহ যুগিয়েছে এবং তা করে আমি যথেষ্ট উপকৃত হয়েছি। আমি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সুকুমার সেন ও শ্রী এস. কে. সরস্বতীর কাছে কৃতজ্ঞ। তাঁরা প্রফুল্লচিত্তে যথাক্রমে ৭ম ও ৮ম পরিচ্ছেদ আদ্যোপান্ত পাঠ করে এগুলোর উন্নয়নকল্পে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়েছেন। অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে আদ্য পরিচয় ও যোগকালন্দরের বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটির পাণ্ডুলিপিগুলি আমাকে দেবার জন্য আমি ড: এনামুল হকের কাছে অত্যন্ত বাধিত। আমার বন্ধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের জনাব এ. শরীফ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত *জ্ঞান-প্রদীপের* পাণ্ডুলিপি পাঠে আমাকে প্রচুর সাহায্য করেছেন। দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে আমি জনাব এস. এ. সোবহানকে [এম. এ (আলীগড়), বি. লিট (অক্সফোর্ড)] স্মরণ করছি। উপাদান সংগ্রহে তিনি আমাকে অনেক সাহায্য করেছিলেন। আমার বন্ধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের শ্রী এস. সি. ভট্টাচার্য পাণ্ডুলিপি পড়ে এবং ভাষার শ্রীবৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে আমার কাজকে সহজ করেছেন। আমার অন্য এক বন্ধু, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও বিদেশী ভাষা বিভাগের ড: এম. এ. আজিজ এ গ্রন্থ রচনার প্রাথমিক পর্যায়ে এবং প্রচুর শ্রম ও সময় ব্যয় করে এর নির্ঘণ্ট তৈরি করে দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছিলেন। আমার বন্ধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের জনাব এ. কে. এম. আব্দুল আলীম কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। এ গ্রন্থের প্রাথমিক অবস্থায় এর টাইপ করা প্রতিলিপি পরীক্ষা করার কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য আমি আমার ছাত্র জনাব নুরুল্লাহ্‌র (এম. এ. এল এল. বি) কাছে গভীরভাবে ঋণী। বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটি, রাজশাহী, ন্যাশনাল লাইব্রেরী, কলকাতা, এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল এবং কলকাতার সাহিত্য পরিষৎ-এর কর্তৃপক্ষের কাছে আমি আনন্দের সঙ্গে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তাঁরা সবাই প্রয়োজনীয় পুস্তক ও সাময়িকী দেখতে আমাকে অকুণ্ঠচিত্তে সাহায্য করেছেন। এশিয়াটিক প্রেসের জনাব আব্দুল হাই ও জনাব আহমদ ওসমান সিদ্দিকী সর্বান্তকরণে সহযোগিতা না করলে এ গ্রন্থ উপস্থাপন করা কঠিন হতো। প্রকাশনার জন্য আমার এ গ্রন্থ গ্রহণ করতে রাজি হওয়ায় এশিয়াটিক সোসাইটি অফ পাকিস্তানের কাউন্সিলের কাছে আমি ঋণী।

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
১৫ই নভেম্বর, ১৯৬৫

মমতাজুর রহমান তরফদার

সূচিপত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ

পটভূমিকা

হোসেন শাহী আমলের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনধারা বুঝতে হলে পূর্ববর্তী আমলের বেশিষ্ট্যমূলক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রবণতাগুলি পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

গজনভী ও সেলজুক শাসনের অবক্ষয়ের পর মধ্য এশিয়ায় উদ্ভূত রাজনৈতিক উত্তেজনা এবং ভারতে আসার জন্য দুঃসাহসী তুর্কিদের দলে দলে অবিরাম দেশত্যাগ এ উপমহাদেশের পরবর্তীকালের ইতিহাসকে প্রচণ্ডভাবে প্রভাবিত করেছিল। আলোচ্য আমলে ঘোর ও খারিজমের শাসকবৃন্দ গোটা রাজনৈতিক দৃশ্যপটে আধিপত্য বিস্তার করেছিল। খ্রিস্টীয় এয়োদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে মুইজউদ্দীন মোহাম্মদ বিন সামের সাম্রাজ্য আফগানিস্তানের গজনী থেকে বাংলার বরেন্দ্র পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কিন্তু এর আঞ্চলিক অখণ্ডতা বজায় রাখা কদাচিৎ সম্ভব হতো। ঘোরী শাসক যখন জীবদ্দশায় তাঁর অধিকতর শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী খারিজম শাহের কাছে সামরিক ও কূটনৈতিকভাবে পরাস্ত হচ্ছিলেন তখন তাঁর মৃত্যুর কয়েক বছরের মধ্যেই গজনী এলাকা শেষোক্ত ব্যক্তি দখল করে নেন।[১] দাসবংশীয় শাসকরা অধিকৃত ভারতীয় যে এলাকাগুলিতে ঘোরীদের রাজনৈতিক উত্তরাধিকার বজায় রেখেছিলেন সেখানেও রূপান্তরের প্রক্রিয়া চলছিল। তাত্ত্বিকভাবে বলতে গেলে ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বখতিয়ার খলজী ছিলেন ভারতে মুইজউদ্দীন মোহাম্মদ বিন সামের তদানীন্তন রাজপ্রতিনিধি কুতুবউদ্দীন আইবকের অধীনস্থ একজন কর্মচারী মাত্র। কিন্তু মগধ ও বরেন্দ্রে তাঁর কার্যকলাপ থেকে দেখা যায় যে সামরিক পরিকল্পনা ও নববিজিত অঞ্চলে প্রশাসনিক পুনর্গঠনের ব্যাপারে এ খলজী নেতার যথেষ্ট রাজনৈতিক স্বাধীনতা ছিল। দিল্লির শাসকের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করলে বখতিয়ার খলজী রাজকীয় চাঁদোয়া ব্যবহারের এবং নিজের নামে শুক্রবারের খুৎবা পাঠ এবং মুদ্রা জারি করার বিশেষ অধিকার পেয়েছিলেন[২] ঘটনাপঞ্জি লেখকদের এ উক্তি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হয়। বখতিয়ারের উত্তরাধিকারী মোহাম্মদ শিরান বস্তুত স্বাধীন ছিলেন এবং আইবকের মৃত্যুর পর আলী মর্দান দিল্লির নিয়ন্ত্রণমুক্ত হয়েছিলেন। ক্রমাধিকারতান্ত্রিক তুর্কি সামন্ত প্রথায় অত্যন্ত কেন্দ্রীভূত সরকার সম্ভবপর ছিল না এবং কেন্দ্র থেকে বাংলা প্রদেশের রাজনৈতিক বিচ্ছেদ ছিল এরই একটা স্বাভাবিক পরিণতি।

উত্তর ভারত থেকে বাংলার রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতার প্রক্রিয়া গিয়াসউদ্দীন ইওয়াজ খলজীর সময়ে নতুন গতি লাভ করেছিল। তিনি, মনে হয়, ইচ্ছাকৃতভাবেই দৃঢ়ীকরণের নীতি অনুসরণ করেছিলেন। "নিজেকে বিশ্বাসীদের নেতার সাহায্যকারী" আখ্যায়িত

করে ইওয়াজ যে মুসলিম বিশ্বের তাত্ত্বিক অধীশ্বর বাগদাদের খলিফার প্রতি মৌন আনুগত্য প্রকাশ করেছিলেন, তিনি যে তাঁর নিজের শাসনের বৈধতার অনুমোদন পেতে এবং খিলাফতের সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে তাঁর উত্তরাধিকারীদের জন্য এক ধরনের নিরাপদ উত্তরাধিকার রেখে যেতে ব্যগ্র ছিলেন এবং বাংলার মুদ্রার আদর্শ হিসেবে গজনীর মুদ্রায় উৎকীর্ণ শব্দগুচ্ছ গ্রহণ করা সত্ত্বেও তিনি গিয়াসউদ্দীন মোহাম্মদ বিন সামের গৃহীত রাজকীয় আখ্যায় নিজেকে ভূষিত করেছিলেন এবং তাঁর নিজের মুদ্রায় মুইজউদ্দীন মোহাম্মদ বিন সামের রাজকীয় উপাধিসমূহের উল্লেখ করেছিলেন—এ সবই মুদ্রার সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত। [৩] গজনীর ঘোরী শাসক পরিবারের সঙ্গে তার রাজনৈতিক সম্পর্ক দেখিয়ে বাংলার শাসক ভারতে মুইজি রাজনৈতিক উত্তরাধিকারে তাঁর দাবি প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেছিলেন বলে মনে হয়। সমকালীন দিল্লির সুলতান ইলতুৎমিশের বিরুদ্ধে তাঁর রাজনৈতিক অবস্থান সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে বোধহয় তিনি এসব কূটনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। ৬২২ হিজরি/১২২৫ খ্রিস্টাব্দে ইলতুৎমিশ কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে একটি সন্ধি সম্পাদন করে তিনি, তাঁর প্রতিপক্ষের বৈরিতা প্রতিহত করেছিলেন যদিও সে সন্ধির শর্ত তিনি কখনও পালন করেন নি। যে হৃত অঞ্চলগুলি তিনি দখল করে নেন সেগুলির উপর ৬২৪ হিজরি। ১২২৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি অব্যাহত নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। সে বছরই তিনি দিল্লির বাহিনী কর্তৃক শেষবারের মতো আক্রান্ত হয়ে নিহত হন।[৪]

মামলুক রাজপ্রতিনিধিত্ব প্রতিষ্ঠা (১২২৭-৮৭ খ্রিস্টাব্দ) সাময়িকভাবে বাংলার বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতা রোধ করেছিল বলে মনে হলেও মুঘিসউদ্দীন ইউজবক (১২৫২-১২৫৭ খ্রিস্টাব্দ) স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন। বলবনী পরিবারের শাসন (১২৮৬-১৩২৮ খ্রিস্টাব্দ) ছিল এ দেশের স্বাধীনতার স্বাভাবিক এক পূর্বসূচনা। তুগ্রিল (১২৬৪-৮১ খ্রিস্টাব্দ) দিল্লির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন এবং রুকনউদ্দীন কায়কাউস (১২৯১-১৩০১ খ্রিস্টাব্দ) শামসউদ্দীন ফিরুজ (১৩০১-২২ খ্রিস্টাব্দ) এবং শেষোক্ত শাসকের পুত্রগণ স্বাধীন সুলতানের মর্যাদা ভোগ করেছিলেন।[৫]

তুঘলক সুলতানাতের ভাঙ্গনের ফলে গুজরাট, মালওয়া, জৌনপুর, দাক্ষিণাত্য এবং বাংলায় স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। বাংলার স্বাধীনতার প্রথম পর্যায়ের প্রতিনিধিত্ব করেন ইলিয়াস শাহী শাসকগণ যাঁরা এ দেশকে দিল্লির নিয়ন্ত্রণভুক্ত করার জন্য ফিরুজ তুঘলকের বারংবার আক্রমণের মুখেও এর স্বাধীন মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখতে সমর্থ হন। পঞ্চদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে উলেমা শ্রেণি ও স্থানীয় প্রশাসকদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে সৃষ্ট অভ্যন্তরীণ পারস্পরিক বিরোধিতা রাজা গণেশের উত্থান ঘটায়, যিনি শেষ পর্যন্ত একটি নতুন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন।

বিখ্যাত চিশতীয়া দরবেশ শেখ নূর কুতুব-ই আলম ছিলেন উলেমা শ্রেণির প্রতিনিধি এবং জৌনপুর ও দিল্লির চিশতীয়া সুফিদের সঙ্গে তাঁর আধ্যাত্মিক ঘনিষ্ঠতা ছিল। হিন্দু শাসকের ক্রমবর্ধমান শক্তিতে অসন্তোষ প্রকাশ করে এবং ইব্রাহীম শর্কিকে বাংলা আক্রমণের আমন্ত্রণ জানিয়ে তিনি জৌনপুরের দরবেশ আশরাফ জাহাঙ্গীর

সিমনানীর সঙ্গে পত্র বিনিময় করেন।[৬] এ ধরনের একটা পরিকল্পনার ফলপ্রসূ বাস্তবায়ন ঘটলে উত্তর ভারতের সঙ্গে বাংলার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্ভব হতে পারত যা এদেশের শাসকদের পক্ষে প্রশান্তচিত্তে গ্রহণ করা ছিল অসম্ভব। রাজা গণেশ তাঁর পুত্র যদুকে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করে ও সিংহাসনে বসিয়ে এ পরিস্থিতির মোকাবেলা করেন। ফলে নূর কুতুব-ই আলমের আপত্তির আর কোনো কারণই রইল না। পার্থিব স্বার্থই মনে হয় যদুকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে প্রণোদিত করেছিল। রাজা গণেশের ধর্মান্তরিত পুত্র জালালউদ্দীন মাহমুদ চীন ও মিশরের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে নিজের অবস্থান দৃঢ় করার চেষ্টা করেন। বাংলার রাজনীতিতে শর্কিদের প্রভাব বৃদ্ধি রোধের প্রতি তাঁর আগ্রহই সম্ভবত এ সকল বিদেশী শক্তির সঙ্গে তাঁর রাজনৈতিক বন্ধুত্ব স্থাপন করার মূল কারণ ছিল। বাংলার সুন্নীদের সমর্থন ও শ্রদ্ধা লাভের জন্যই শুধু নয়: বরং শর্কি প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে তাঁর নিজের অবস্থানকে বৈধ করার জন্যও বোধহয় তিনি খলিফাতুল্লাহ উপাধি গ্রহণ করেছিলেন।[৭] তাঁর উত্তরাধিকারী আহমদ শাহ হিরাটে দূত পাঠিয়ে এবং তৈমুরের পুত্র শাহ রুখের হস্তক্ষেপ কামনা করে ইব্রাহিম শর্কির আক্রমণাত্মক অভিসন্ধি প্রতিরোধ করেছিলেন বলে মনে করা হয়।[৮] মুদ্রার সাক্ষ্য ইব্রাহীমের দু'জন প্রত্যক্ষ উত্তরাধিকারী মাহমুদ ও হোসেনের রাজত্বকালে বাংলা ও জৌনপুরের মধ্যে শত্রুতার অবিরাম অনুবৃত্তির ইঙ্গিত দান করে।[৯] শর্কি শাসনের আক্রমণের পর আলাউদ্দীন হোসেন স্পষ্টতই বাংলার পশ্চিম সীমান্তে লোদী শক্তিকে নিষ্ফল করার উদ্দেশ্যে কূটনৈতিক ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন।

প্রতিবেশী রাজ্যগুলির সঙ্গে বাংলার সম্পর্ক আলোচনা করতে গিয়ে ভৌগোলিক অবস্থা কিভাবে এ অঞ্চলে মুসলিম রাজনৈতিক শক্তির বিস্তারকে প্রভাবিত করেছে তা লক্ষ্য করা উচিত। উত্তর ভারতীয় রাজনৈতিক প্রভাব থেকে বাংলাকে বিযুক্ত করতে ব্যগ্র স্বাধীন সুলতানরা পশ্চিম থেকে এদেশে প্রবেশ পথ–মিথিলা বা তিরহুত এবং দক্ষিণ বিহারের মধ্যে প্রাকৃতিক বিভাজনরেখারূপী গঙ্গার উভয় তীরের ভূখণ্ডের উপর কার্যকর অধিকার বজায় রাখতে চেষ্টা করেছিলেন। ফলে রাজমহল থেকে দক্ষিণ বিহারের ভাগলপুর, মুঙ্গের এবং বিহার শরীফ সহ পাটনা পর্যন্ত এবং পূর্বে গঙ্গা এবং কোসীর সঙ্গমস্থল থেকে পশ্চিমে ছাপরা ও বালিয়া জেলা পর্যন্ত, যার মধ্যে ঘোগরা ও গঙ্গার মিলনস্থল অন্তর্ভুক্ত, উত্তর বিহারের দক্ষিণ পর্যন্ত প্রসারিত সমগ্র অঞ্চল কৌশলগত ভাবে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হতো বলে মনে হয়। কারণ মধ্য-যুগের বাংলার পরম্পরাগত সীমানা রাজমহল পাহাড়ের নিকটস্থ তেলিয়াঘরি গিরিপথ এবং কোমী নদী হেঁটে পার হওয়া যায় এমন স্থানগুলির প্রতিরক্ষার জন্য গঙ্গার অপর তীরস্থ অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ ছিল আবশ্যকীয় পূর্বশর্ত। পায়ে হেঁটে পার হওয়া যায় এমন জায়গায় পণ্ডক এবং কোসী নদী পার হয়ে গঙ্গা নদীর উত্তর তীর ধরে পশ্চিম থেকে সৈন্যবাহিনী বাংলার দিকে অগ্রসর হতে পারত। দক্ষিণ বিহারের উত্তরাংশ দিয়ে যাওয়া যে সড়ক লক্ষ্ণৌতিকে দিল্লির সঙ্গে যুক্ত করেছিল[১০] সেটা ছিল সংকীর্ণ তেলিয়াঘরির ভেতর দিয়ে বাংলায় আসার পথ। এটা এবং গঙ্গার সংকীর্ণ জলধারা এদেশের প্রতিরক্ষা অবস্থানকে

মোটামুটি সন্তোষজনক করে তুলেছিল। বখতিয়ার খলজী এবং শের খানের মতো আক্রমণকারীরা সম্ভবত পশ্চিমের প্রবেশপথের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যগুলি বুঝতে পেরেছিলেন, যার ফলে তাঁরা ঝাড়খণ্ডের ওধারে বীরভূম ছাড়িয়ে গঙ্গার গতিপথের দিকে যাওয়া অধিকতর দুর্গম পথ অনুসরণ করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেছিলেন।[১১] বিহারে গঙ্গার দক্ষিণ তীরবর্তী ভূখণ্ড বলতে গেলে ছিল বাংলার প্রাথমিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় একটি কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ স্থান এবং সম্ভবত এটা উত্তর গাঙ্গেয় উপত্যকায় বাংলার প্রবেশপথ তিরহুতের বিরুদ্ধে সৈন্য চলাচলের ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহৃত হতো।

কাজেই বাংলার শাসকদের বিহারের উত্তরাংশে আধিপত্য করার আগ্রহ সহজেই বোধগম্য। ভাগলপুরসহ বিহারের পূর্বদিকের অঞ্চলে, মনে হয়, ইওয়াজের কিছুটা নিয়ন্ত্রণ ছিল সেখান থেকে তিনি বিহার জিলায় ইলতুৎমিশকে বাধাদান অথবা তিরহুত আক্রমণ করে কর আদায় করতে অগ্রসর হয়েছিলেন।[১২] মুঙ্গের ও বিহার শরীফে আবিষ্কৃত রুকনউদ্দীন কায়কাউস (৬৯০ হিজরি/১২৯১ খ্রিস্টাব্দ-৭০১হিজরি/১৩০১ খ্রিস্টাব্দ) এবং শামসউদ্দীন ফিরূজের (৭০১হিজরি/১৩০১ খ্রিস্টাব্দ-৭২২ হিজরি/১৩২২ খ্রিস্টাব্দ) আমলের মুদ্রার সাক্ষ্য[১৩] সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে যে, এ দু'জন শাসক স্বাধীনভাবে বিহারের অংশবিশেষ শাসন করেছিলেন। ভাগলপুর শামসউদ্দীন ইলিয়াস (১৩৪২-৫৭ খ্রিস্টাব্দ), নাসির উদ্দীন মাহমুদ (১৪৩৩-৫৯ খ্রিস্টাব্দ) এবং শামসউদ্দীন মোজাফ্‌ফরের (১৪৯১-৯৪ খ্রিস্টাব্দ) মতো ইলিয়াসশাহী এবং হাবসী সুলতানদের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল[১৪] এবং হোসেন শাহী রাজ্যের সেদিকে আঞ্চলিক বিস্তৃতি ছিল পূর্ব-অনুসৃত নীতির অনুবর্তন মাত্র।

বাংলার দিকে আসা দক্ষিণের রাস্তা, যার কৌশলগত গুরুত্ব ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে, তারচেয়ে তিরহুতের ওপর দিয়ে কোসীর পূর্বদিকে উত্তর বাংলার সমতলভূমির দিকে সরাসরি আসা উত্তরের রাস্তা ছিল যে কোনো আক্রমণকারী বাহিনীর জন্য সহজতর পথ। বলবন, গিয়াসউদ্দীন তুঘলক, ফিরূজ তুঘলক, ইব্রাহীম শর্কী এবং বাবরের মতো আক্রমণকারীরা বারবার এ রাস্তাই অনুসরণ করেছিলেন। বাংলার প্রধান প্রবেশপথ নিয়ন্ত্রণকারী তিরহুতে যে কোনো আক্রমণকারী সৈন্যবাহিনীর উপস্থিতি এ দেশের রাজনৈতিক নিরাপত্তার জন্য ছিল স্পষ্ট হুমকিস্বরূপ। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সুলতানগণ উত্তরের সেই গাঙ্গেয় অঞ্চলে এক ধরনের কূটনৈতিক বা প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবহার করে এ নিরাপত্তা রক্ষার চেষ্টা করেছিলেন। মধ্যযুগের তিরহুতের ইতিহাসের বৈশিষ্ট্যসূচক রাজনৈতিক ঘটনাদির পর্যায়গুলি স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে, দিল্লি বা জৌনপুরের শাসকগণ সে দেশে বাংলার প্রভাব প্রতিহত করতে যথেষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ করতে ব্যর্থ হন নি। কথিত আছে যে, কর্ণাটের রাজা দিল্লির বিরুদ্ধে বাংলার শাসকের আক্রমণাত্মক অভিসন্ধিতে সাহায্য করায় গিয়াসউদ্দীন তুঘলক ৭২৪ হিজরি/১৩২৪ খ্রিস্টাব্দে বাংলার বাহাদুর শাহের মোকাবেলা করার পর দিল্লি প্রত্যাবর্তনের পথে তিরহুতের হরি সিংহ দেবকে আক্রমণ ও পরাজিত করেছিলেন। তিরহুতের শাসনভার আহমদ শাহ বিন মালিক তবলিঘের উপর ন্যস্ত করা হয়েছিল।[১৫] মোহাম্মদ তুঘলক

শেষ পর্যন্ত এ অঞ্চলটিকে তুঘলক সাম্রাজ্যের একটি ইকলিম বা প্রদেশে পরিণত করেছিলেন।[১৬] শামসউদ্দীন ইলিয়াস শাহ তুঘলক সুলতানের জীবদ্দশায় তিরহুত জয় করেছিলেন এবং শেষোক্তের মৃত্যুর পর দেশটিকে দু'টি অঞ্চলে ভাগ করে এর প্রশাসনিক কাঠামোতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এনেছিলেন। বুরহিগণ্ডকের উত্তরের ভূখণ্ড ওইনওয়ারা শাসক কামেশ্বরের ভাগে পড়ে এবং উত্তরে নেপালের তরাই থেকে দক্ষিণে বেগুসরাই পর্যন্ত বিস্তীর্ণ সমগ্র ভূখণ্ড ইলিয়াসের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে আসে। মোহাম্মদ তুঘলকের মৃত্যু পর্যন্ত বাংলার সুলতান দ্বারভাঙ্গায় সদর দফতর রাখলেও স্পষ্টতই গঙ্গা ও গণ্ডকের গতিপথ পাহারার জন্য এবং দিল্লির ক্ষতিসাধন করে পশ্চিম সীমান্ত বিস্তৃত করার উদ্দেশ্যে পরবর্তীকালে গঙ্গার উত্তর তীরে হাজীপুর শহরের প্রতিষ্ঠা করেন।[১৭] তিরহুতের উপর তাঁর সামরিক নিয়ন্ত্রণ নেপাল অভিযান এবং বহরাইচ ও বেনারসসহ অযোধ্যায় তাঁর ভূখণ্ড দখলের একটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ হিসেবে কাজ করেছিল বলে মনে হয়।[১৮] এর পূর্ব সূত্রেই ইতিহাসের ছাত্রের পক্ষে ফিরূজ তুঘলকের তিরহুত অভিযান, যার ফলে তিরহুত আবার দিল্লির নিয়ন্ত্রণে আসে, সম্ভবত ব্যাখ্যা করা সম্ভব।[১৯] শর্কী শাসন এবং ওইনওয়ারা বংশের পতন নিশ্চিতভাবে পরবর্তী ইলিয়াস শাহী শাসকদের অসুবিধা দূর করেছিল। এরপর ৮৭৫ হিজরি/১৪৭০ খ্রিস্টাব্দে বারবক শাহ তিরহুতে প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। ইলিয়াস শাহের পুরাতন রাজনৈতিক বিভাগগুলি পুনরুজ্জীবিত করে তিনি সে দেশের নিম্নাংশকে বাংলার প্রশাসনিক আওতায় নিয়ে আসেন এবং এর সদর দফতর হয় হাজীপুর। বুরহিগণ্ডকের উত্তরে অবস্থিত অঞ্চল রাজা ধীর সিংহের অধীনে রাখা হয় এবং রাজার কাছ থেকে কর সংগ্রহের জন্য কেদার রায় নামে একজন নায়েব নিযুক্ত করা হয়।[২০] পরবর্তী পরিচ্ছেদে দেখা যাবে যে সিকান্দর লোদী হোসেন শাহের সঙ্গে একটি অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন এবং তিনি তুঘলকপুর বা তিরহুত এবং বিহারে প্রশাসনিক কর্মকর্তা নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন যা পরবর্তীকালে বাংলার সুলতানগণ এগুলি দখল করে নিয়েছিলেন। তিরহুতের উপর নিয়ন্ত্রণ নসরত শাহকে ঘোগরা পার ছাড়িয়ে আজমগড় এবং খারীদ পর্যন্ত তাঁর রাজ্য বিস্তার করতে সাহায্য করেছিল বলে মনে হয়। ঘোগরা এবং গন্ডকের মোহনার নিয়ন্ত্রণের ফলে নসরত বাবরকে অন্ততপক্ষে প্রাথমিক বাধা দিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

প্রথম পর্যায়ে মুসলিম রাজনৈতিক শক্তি বাংলার উত্তর পশ্চিম জেলাগুলিতে সীমাবদ্ধ ছিল এবং এখানেই দেও কোট, মহীসন্তোষ এবং লক্ষ্ণৌতিসহ অধিকাংশ রাজনৈতিক কেন্দ্র অবস্থিত ছিল।[২১] মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার এক শতাব্দীর মধ্যে লক্ষ্ণৌতি রাজ্য দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে সম্প্রসারিত হয় এবং ভাগীরথীর উভয় তীরের অঞ্চলগুলি এর অন্তর্ভুক্ত হয়। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে ও চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম দিকে সাতগাঁও, পান্ডুয়া এবং ত্রিবেণীতে বসতি স্থাপন শুধু দক্ষিণ-পশ্চিমে শক্তিশালী উড়িষ্যা-শাসকদের অগ্রগতি রোধেরই নয়[২২], বরং গঙ্গাপথে এবং সাতগাঁওয়ের বাণিজ্যকেন্দ্রের মাধ্যমে বাংলা যে সামুদ্রিক বাণিজ্য গড়ে তুলতে চেষ্টা করছিল মুসলিম

শাসকদের সেটাও নিয়ন্ত্রণের স্থির সংকল্পের প্রকাশরূপে বিবেচনা করা যায়। একই ধরনের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক বিবেচনা সোনারগাঁও, সিলেট এবং চট্টগ্রাম অঞ্চলকে মুসলিম রাজ্যসীমার অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি প্রভাবিত করেছিল বলে মনে হয়। অহোম, ত্রিপুরা ও আরাকান রাজাদের ক্রমবর্ধমান শক্তি এবং মেঘনা-পদ্মা ও চট্টগ্রাম হয়ে বঙ্গোপসাগর অভিমুখী বাণিজ্যপথ হয়তো এর তাৎক্ষণিক কারণ ছিল।

২.

এটা মোটামুটিভাবে নিশ্চিত যে, ইলিয়াস শাহী শাসকবৃন্দ এবং রাজা গণেশের বংশ দিল্লির নিয়ন্ত্রণমুক্ত একটি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছিলেন। উত্তর ভারত ও মধ্য এশিয়া থেকে বিচ্ছিন্নতার ফলে বাংলা সাংস্কৃতিকভাবেও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ঐ বিচ্ছিন্নতাই, মনে হয়, বাংলার স্থানীয় সংস্কৃতির বিকাশ-প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করেছিল। গুপ্ত সাম্রাজ্যের ভাঙনের পর দীর্ঘদিনের কলহ ও বিশৃঙ্খল অবস্থার শেষে পাল রাজারা একটি স্বাধীন শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এ সময়েই চর্যা গীতিও রচিত হয়েছিল—যা ছিল ইতোমধ্যে দীর্ঘ বিবর্তনের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বিকশিত দেশী ভাষায় প্রথম সাহিত্য সৃষ্টি। এগুলিতে ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে যে বৈরীভাব প্রকাশ পায় তা থেকে শত শত বছর ধরে বাংলার জনজীবনে কর্তৃত্বকারী ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির বিরুদ্ধে জনগণের প্রতিক্রিয়ার নির্দেশ পাওয়া যায়। সুলতানি আমলে এসে আমরা তাৎপর্যপূর্ণ কিছু ঘটনা লক্ষ্য করি। দরবারের ভাষা হিসেবে যে ফার্সিকে রাখা হয়েছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই; কিন্তু এর পরিপূরক কোনো উত্তর ভারতীয় বা ইরানি স্রোতধারা না থাকায় এর জীবনীশক্তি শেষ হয়ে যায়। যে ফার্সি পংক্তিগুলি রচনা করতে তিনি ব্যর্থ চেষ্টা করেছিলেন সেগুলি পূর্ণাঙ্গ করতে ইরানি কবি হাফিজকে আজমশাহের আমন্ত্রণ[২৩] এ রকম পূর্ব-প্রসঙ্গে তাৎপর্যবহ হয়ে ওঠে। বাংলার জনজীবনে ইরানি সংস্কৃতির প্রভাব সীমিত হওয়ায়, বাংলা ভাষা উন্নয়নের উপযুক্ত পরিবেশ পেয়েছিল। ভারতীয় উপমহাদেশের মধ্যেই জৌনপুর ও গুজরাটের দেশী স্থাপত্যশিল্প এবং দক্ষিণী উর্দুভাষা ও সাহিত্যের বিকাশেও সম্ভবত একইরকম অবস্থা আমরা লক্ষ্য করি।[২৪] উত্তর ভারতীয় রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আধিপত্য থেকে মুক্ত হয়ে বাংলাসহ এ রাজ্যগুলি সাহিত্য, চারুকলা ও স্থাপত্য শিল্পের চর্চার মাধ্যমে স্বস্ব আঞ্চলিক ধীশক্তি প্রকাশের সময় ও সুযোগ লাভ করে। চর্যাগীতি যদি পুরাতন বাংলার প্রতিনিধিত্ব করে, তবে আনুমানিক পঞ্চদশ শতাব্দীতে অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস রচিত শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন মধ্যযুগীয় বাংলার ধারক।[২৫] কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ের মতো সংস্কৃত মহাকাব্য ও পৌরাণিক কাহিনীর বাংলা অনুবাদের দৃষ্টান্ত আলোচ্য সময়কালের সাংস্কৃতিক জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। ছন্দোবদ্ধ কাহিনীগুলি জনগণের সেকেলে আসক্তি ও কল্পনাকে তৃপ্ত করেছিল। কিন্তু পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষদিকে স্থানীয় দেব-দেবী সম্পর্কে যে আদি পাঁচালী কাব্যগুলি রচিত হওয়া শুরু হয় সেগুলি প্রেরণা পেয়েছিল বাংলার সাংস্কৃতিক অবস্থা ও ভৌগোলিক প্রকৃতি থেকেই। দেশী সাহিত্যের

শৈশব-পর্যায় শেষ হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং সুলতানি আমল একটি জাতীয় জীবনের বিবর্তন নির্দেশ করেছিল বলে মনে হয় যেখানে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সাহিত্যিক অভিব্যক্তির মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত শুধু ভাষার সমরূপতাই ছিল এমন নয়, রাজনৈতিক ঐক্য এবং ভৌগোলিক সান্নিধ্যও ছিল এর মৌলিক বৈশিষ্ট্য।

দিল্লি বা জৌনপুরের সাম্রাজ্যবাদী অভিসন্ধি প্রতিহত করতে গিয়ে শাসকদের আঞ্চলিক দেশপ্রেমের উপর নির্ভর করতে হতো বলে তাঁরা প্রশাসনে নিশ্চয়ই একটি ধর্মনিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন করেছিলেন। ফিরুজ শাহ তুঘলকের সঙ্গে যুদ্ধে জিয়াউদ্দীন বারাণী ও ইয়াহিয়া বিন আহমদ কর্তৃক ইলিয়াস শাহকে সাহায্যকারী হিন্দু রায়দের[২৬] উল্লেখ এ প্রসঙ্গে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হয়। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে আমরা বেশ কিছু হিন্দুকে মুসলমান সুলতানদের অধীনে উচ্চ দায়িত্বশীল পদে এবং দেশের অভিজাত ভূ-স্বামী সম্প্রদায় হিসেবে দেখতে পাই। এ সব হিন্দু কর্মকর্তা ছিলেন জনগণের ধীশক্তির ভাণ্ডার এবং তাঁরা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নয়নে সাহায্য করেছিলেন। এভাবে সুলতানরা হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও তাদের সার্বিক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন।

দেশের মাটিতে দৃঢ়মূল এই হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অনুরূপ মুসলমান অংশ তখন সৃষ্টি হয় নি। বহুসংখ্যক লিপির সাক্ষ্য থেকে প্রমাণিত একটি বিস্তৃত অভিজাত শ্রেণীর অস্তিত্ব সম্ভবত এ সিদ্ধান্তকে অস্বীকার করে না। সেনাপতি ও সামরিক রাজ্যপালদের নিয়ে দেশের সামরিক অভিজাত শ্রেণী গঠিত হয়েছিল। প্রশাসনিক ও যুদ্ধবিগ্রহের ক্ষেত্র ছাড়া তাঁদের অবদান এত তুচ্ছ মনে হয় যে, তাঁরা একটি জ্ঞানদীপ্ত মুসলিম বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর আওতায় আসেন না। সমাজে কিছু স্পষ্টত প্রতীয়মান ঐতিহাসিক শক্তির কার্যকারিতাকে এ শ্রেণীর বিলম্বিত বিকাশের কারণরূপে নির্দেশ করা যায়। মুসলিম বিজয়ের পর পর যে সব বিদেশী মুসলমান এসেছিল তারা তখনও এদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করে নি। স্থানীয় ধর্মান্তরিত ব্যক্তিদের হঠাৎ একটি জ্ঞানদীপ্ত সুস্থিত শ্রেণীতে পরিণত হওয়ার কোনো সমাজতাত্ত্বিক কারণই ছিল না। এদের অধিকাংশই মনে হয় আদিতে হিন্দুসমাজের নিম্নতর শ্রেণীভুক্ত ছিল। তবুও এটা বিশ্বাস করা যুক্তিযুক্ত মনে হয় যে, বাংলা ভাষাভাষী একটি মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিবর্তনের প্রথম পর্যায় আমরা প্রাক-মোগল বাংলাতেই দেখতে পাই। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে জীবিত সৈয়দ সুলতান, শেখ ফয়জুল্লাহ, দৌলতকাজী এবং আলাওল প্রধানত এ বিবর্তনেরই ফসল। মোগল শাসন তাঁদেরকে মুসলিম সংস্কৃতির অন্ধকার অজ্ঞাত অবস্থার দিকে ঠেলে দিয়েছিল, যার ফলে তাঁদেরকে আধুনিক গবেষকদের খুঁজে বের করতে হয়েছে।

প্রাক-মোগল বাংলা মিশ্র সমাজ কাঠামোতে স্বভাবতই ইসলামি প্রবণতা ছিল যথেষ্ট দুর্বল। সাহিত্যিক ও লিপিজাত উৎসগুলি থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, সুফিবৃন্দ বা মুসলমান শিক্ষকরা জনগণকে ইসলামি শিক্ষা দান করার চেষ্টা করেছিলেন।[২৭] ইসলামি সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্রগুলি থেকে বাংলা ভৌগোলিক ও রাজনৈতিকভাবে

বিচ্ছিন্ন থাকায় এ সকল শিক্ষক বা তাঁদের ছাত্রবৃন্দ মুসলিম সভ্যতার মূল থেকে খুব বেশি গ্রহণ করতে পারে নি, যার অপরিহার্য ফল এই যে, তাঁরা মুসলিম আইন ও ব্যবহারতত্ত্ব, হাদিস ও কোরানের তফসির-এর মতো জ্ঞানের এসব শাখায় কোনো গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করতে পারেন নি।[২৮] ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে পূর্ব উত্তর ভারতের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হওয়ার পর ইসলামি ধর্মশাস্ত্র ও নীতিবিদ্যা সম্পর্কে বাংলায় বই লেখা শুরু হয়। এ ক্ষেত্রে প্রেরণার প্রধান উৎস ছিল মোগল সাম্রাজ্যবাদীদের স্পষ্টত প্রতীয়মানভাবে এখানে আসা ফার্সি ও আরবিতে লেখা বইগুলি।[২৯] এসব বাংলা অনুবাদ বা অভিযোজন সম্ভবত ছিল এক গোঁড়া প্রতিক্রিয়ার ফসল[৩০] যা শুরু হয়েছিল বহু ধর্মের সমন্বয় সাধনের আন্দোলনের বিরুদ্ধে এবং যার চিহ্ন স্পষ্টভাবে দেখা যায় প্রাক-মোগল-যুগের সাংস্কৃতিক পরিবেশের অন্তর্গত শেখ ফয়জুল্লাহ ও সৈয়দ সুলতানের কাব্যে। কিন্তু প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক চাহিদা তৃপ্ত করার প্রয়োজন ছিল। তাদের মনের ব্যগ্র কামনার সাড়া সম্ভবত তারা পেয়েছিল দেশীয় প্রাচীন ও অফুরন্ত সংস্কৃতির ভাণ্ডার থেকে যার উপর তান্ত্রিক যোগী এবং বৌদ্ধ সহজিয়া বা নাথপন্থীরা বহু শতাব্দী ধরে নির্ভর করেছিল। এভাবে ইসলামি অতীন্দ্রিয়বাদের সঙ্গে স্থানীয় যাজকীয় ধারণা ও কামনার সংশ্লেষণ হয়ে দাঁড়ায় অনিবার্য। অমৃতকুণ্ড নামে নাথ মতাদর্শের অনুসারীদের সেকালে ব্যবহৃত সংস্কৃতে লেখা একটি তান্ত্রিক ধর্মপুস্তক ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম দিকেই অতীন্দ্রিয়বাদীদের মনকে আকর্ষণ করেছিল। সে সময় আলী মর্দান খলজীর রাজত্বকালে লক্ষ্ণৌতির ইমাম ও প্রধান কাজী রুকনউদ্দীন সমরকন্দী এটাকে আদিতে ভোজর ব্রাহ্মণ (বজ্র ব্রহ্ম ?) নামে পরিচিত কামরূপের একজন ধর্মান্তরিত যোগীর সাহায্যে আরবিতে অনুবাদ করেছিলেন। মধ্যযুগে বারবার আরবি ও ফার্সিতে এর অনুবাদ মুসলিম মানসের জন্য এর উপযোগবাদী মূল্যের ইঙ্গিত দান করে। বাংলায় এর আধ্যাত্মিক উত্তরসূরি হচ্ছে শেখ জাহিদের আদ্য পরিচয়, সৈয়দ সুলতানের জ্ঞান-প্রদীপ ও জ্ঞান-চৌতিশা, (সৈয়দ মুর্তুজার?) যোগ কালন্দর এবং আলী রিজার জ্ঞান-সাগর"। তাদের সময়কাল ছিল পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত, যার ফলে আমরা বাংলায় একটানাভাবে যোগীর সুফি ঐতিহ্য পাই। এসব সাহিত্যকর্ম স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে মুসলমান অতীন্দ্রিয়বাদীদের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ স্পষ্টত প্রতীয়মানভাবে স্থানীয় ধর্মীয় পদ্ধতির প্রভাবে মনস্তাত্ত্বিক শারীরিক অনুশীলনের পশ্চাদ্‌গামী পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন এবং তদনুসারে অস্ট্রিক ও পৌরাণিক যে সব উপাদান এসব অস্পষ্ট সৃষ্টিতত্ত্বে প্রবল হয়েছিল সেগুলি ভাগ করে নিয়েছিলেন।[৩১] অতএব আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই যে, মুসলিম জীবনযাত্রা প্রণালীর অন্যান্য দিকেও স্থানীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে একই ধরনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।

হিন্দুসমাজের বহিরঙ্গে পুরাতন ঐতিহ্য ও প্রতিষ্ঠানের অনুবর্তন দেখা গেলেও এর অন্তরালে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ও রূপান্তরের প্রক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। বাংলায় ব্রাহ্মণদের আগমন এবং কুলীন প্রথার উৎপত্তি কুলজী সাহিত্যানুসারে যথাক্রমে

পৌরাণিক রাজা আদিশূর ও বল্লাল সেনের সঙ্গে জড়িত। পরম্পরাগত ধারণা ইতিহাসের ছাত্রকে সন্তুষ্ট করতে পারে না। মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার আগে হিন্দুসমাজে কুলীন প্রথার প্রচলন হয়েছিল বলে মনে হয় না, এটা ছিল মুসলিম শাসনের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণদের মনে অতীত গৌরবের জন্য অহঙ্কারী প্রতিক্রিয়ার প্রতীকায়ন। কুলীন প্রথার অস্তিত্ব সম্পর্কে পাল ও সেন আমলের সাহিত্যিক ও লিপিগত উৎসগুলির নীরবতা, পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে ব্রাহ্মণদের বারবার মেলায় শ্রেণীবিভক্তিকরণ এবং শূলপাণি, রায়মুকুট বৃহস্পতি ও রঘুনন্দনের স্মৃতি রচনায় আমরা যে সামাজিক-ধর্মীয় আইনের সংকলন গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে আত্ম-সচেতন ব্রাহ্মণ্য পুনরুজ্জীবন লক্ষ্য করি— এ সবই আমাদের অনুমানকে সমর্থন যোগায়।

চর্যাপদে ব্রাহ্মণ্য সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও আনুষ্ঠানিকতার যে নির্মম সমালোচনার প্রবণতা[৩৩] আমরা লক্ষ্য করি এবং ধর্মপূজা পদ্ধতির অনুসারীদের সার্বজনীন পূজার অনুষ্ঠানাদি সংক্রান্ত গ্রন্থের কোনো কোনো অংশে ব্যক্ত স্থানীয় ধর্মপূজা পদ্ধতির অনুসারীদের বৈরীমনোভাব এটাই নির্দেশ করে যে স্থানীয় পূজা পদ্ধতির অনুসারীদের কাছে প্রচলিত ব্রাহ্মণ্য গোঁড়ামি অপ্রিয় হয়ে পড়েছিল। ব্রাহ্মণ্য সামাজিক-ধর্মীয় বিধি সাধারণভাবে কঠোর হওয়ায় বাকপটু বিবৃতি স্মৃতি গ্রন্থগুলিতে রয়েছে। এরফলে হিন্দুসমাজের উচু ও নিচুশ্রেণীর মধ্যে যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়, যার পরিণতিস্বরূপ ব্রাহ্মণদের সামাজিক বিচ্ছিন্নতা নিচুশ্রেণীর মানুষকে বিকাশমান বাংলা ভাষায় তাদের ধারণা ও বিশ্বাসগুলি অকপটে প্রকাশের কিছুটা স্বাধীনতা দিয়েছিল বলে মনে হয়। সেনরা ছিলেন ব্রাহ্মণ্যবাদ ঘেঁষা এবং সংস্কৃত সংস্কৃতির সমর্থক। এখন তাঁদের রাজনৈতিক ক্ষমতা বিলুপ্ত হওয়ার ফলে অনার্যদের দেব-দেবী ও ধারণাগুলির উপস্থিতি সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অনুভব করা যাচ্ছিল। এভাবে পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে মনসা, চণ্ডী, গোরখনাথ এবং সত্যপীরকে নিয়ে বেশকিছু কাব্য রচিত হয়েছিল।[৩৪] এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে এসব প্রার্থনা পদ্ধতির সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার কোনো সম্পর্ক নেই; কারণ সংশ্লিষ্ট দেব-দেবীকে প্রসন্ন করে পার্থিব মঙ্গল লাভই ছিল তাদের অনুসারীদের লক্ষ্য। তাদের শারীরিক অস্তিত্বে স্থায়িত্ব আনবে ও আশায় নাথপন্থীরা যোগ অনুশীলন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অমরত্ব লাভ করতে চায়। তাদের দেব-দেবীরা পার্থিব জীবনে যেন তাদের ক্ষতি সাধন না করেন সেজন্য মনসা ধর্ম এবং সত্যপীরের উপাসকরা তাদের দেব-দেবীদের তুষ্ট করতেই প্রত্যাশী। প্রারম্ভে সর্বপ্রাণবাদী এবং বৃক্ষ ও জন্তুর মূর্তি পূজকদের মধ্য থেকে ধর্মান্তরিত এসব মানুষের পক্ষে যে কোনো ধর্মীয় দর্শনের সূক্ষ্ম বা গূঢ় নীতির প্রতি সংবেদনশীল হওয়া সম্ভবপর ছিল না।

উল্লিখিত সামাজিক বিশৃঙ্খল অবস্থা ইসলাম ধর্মের বিস্তারকে কিছুটা সহজতর করেছিল বলে মনে হয়। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে বিখ্যাত ন্যায় ও স্মৃতি লেখকদের জন্মস্থান এবং এর পূর্বের আমলেও ব্রাহ্মণ্য গোঁড়ামির কেন্দ্র রাঢ় অঞ্চলে বহুসংখ্যক লোককে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরণ নিশ্চয় কঠিন কাজ ছিল। প্রায় এক শতাব্দী আগে ছোট পাণ্ডুয়ায় ব্লখম্যানের দেখা[৩৫] মুসলমান অধিবাসীদের অদম্য সংখ্যাগরিষ্ঠতা–সম্ভবত

সাইফউদ্দীন ও জাফর খানের নেতৃত্বে "অবিশ্বাসীদের তলোয়ার ও বর্শার আঘাতে হত্যাকারী" বিজয়ী দলের পেছনে পেছনে আসা এক ধরনের জঙ্গি ইসলামের এ অঞ্চলে আগমনের ফসল।[৩৬] মোটামুটিভাবে ব্রাহ্মণ্য প্রভাবমুক্ত উত্তর ও পূর্ব বাংলা সম্ভবত ইসলামের জন্য এক স্বাগত পথ খুলে দিয়েছিল। তিব্বতীয়-বর্মীশ্রেণীর উপজাতীয়দের ধর্মান্তরিত করতে সম্ভবত মুসলমান ধর্ম প্রচারকদের কোনো বাধার সম্মুখীন হতে হয় নি।[৩৭] যে কোনো ধরনের আচারনিষ্ঠ ধর্মের প্রতি এদের অনুরাগ ছিল নিতান্তই অস্থায়ী এবং অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে ওহাবী-ফরায়েজী আন্দোলনের ফলে গোঁড়ামি প্রভাবশালী হওয়ার পূর্বে এ অঞ্চলের মন-মানসে ইসলাম হালকাভাবে আসন গেঁড়েছিল। বর্ণপ্রথা শাসিত অঞ্চলে সামাজিক দমননীতি নিম্নশ্রেণীর মানুষকে ইসলামের আশ্রয়ের দিকে নিয়ে গিয়ে থাকতে পারে। এ যুক্তির সমর্থনে আমাদের কোনো সুস্পষ্ট সাক্ষ্য না থাকলেও অব্রাহ্মণদের ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতি বৈরী মনোভাবের ও ইসলামের প্রতি সহানুভূতির স্পষ্ট নিদর্শন আছে। যথেষ্ট সমাজতাত্ত্বিক সম্পর্কযুক্ত, শূন্য পুরাণের এমন এক পরিচ্ছেদ নিরঞ্জনের উষ্মায়[৩৮] এটা প্রকাশ পেয়েছে। তুরুস্ক রাজাকে মগধে আমন্ত্রণ জানিয়ে বৌদ্ধ পুরোহিতরা কিভাবে সেনদের নীতির প্রতি প্রতিঘাত করেছিল তারানাথ[৩৯] সেটাও আবার বর্ণনা করেছেন। এরফলে ওদন্তপুরী ও বিক্রমশীলা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।

প্রাথমিক দিকের মুসলিম বাংলায় ভক্তি ধর্মীয় প্রথা একটা নির্দিষ্ট রূপ গ্রহণ করেছিল। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে রাধা সহ গোপীদের সঙ্গে কৃষ্ণের প্রেমলীলার উল্লেখ রয়েছে।[৪০] কিন্তু জয়দেবের গীত-গোবিন্দের রাধা প্রথমবারের মতো শ্রীকৃষ্ণের সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত প্রণয়িনী হিসেবে উপস্থিত হয়েছেন। রহস্যমূলক ধর্মপদ্ধতির অধিকাংশই পরম সত্তার পুরুষ ও স্ত্রী রূপের মূলনীতির উপর অধিষ্ঠিত। হিন্দুতন্ত্রসমূহে শিব ও শক্তি এবং বৌদ্ধতন্ত্রসমূহে প্রজ্ঞা ও উপায় এগুলির প্রতিনিধি। এ নীতি অনুযায়ী তান্ত্রিক ও বৌদ্ধ সহজিয়ারা বিশ্বাস করতেন যে পরম অবস্থা বা সহজ উল্লিখিত পুরুষ ও স্ত্রী মূল উপাদানগুলির মিলনের মাধ্যমে লাভ করা যেতে পারে। সম্ভবত ঈশ্বর সম্পর্কে এ দ্বি-পাট বিশিষ্ট ধারণার প্রভাবেই তন্ত্রগুলিতে পরিলক্ষিত শ্রীশক্তির প্রতিরূপ হিসেবে রাধাকে সৃষ্টি করা বৈষ্ণব মানসে একান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে দেখা দিয়েছিল। গীত-গোবিন্দের বিষয়বস্তু অবলম্বনে রচিত বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের সুমধুর কবিতাগুলি নিশ্চয়ই রাধা-কৃষ্ণ ধর্মপদ্ধতিকে জনপ্রিয় করে তুলেছিল। এর উত্তরকালীন পুনরুত্থানের প্রতীক হয়েছিলেন শ্রীচৈতন্য যিনি তাঁর নিজের মধ্যে প্রকৃত সত্তার রাধা এবং কৃষ্ণ উভয় দিকই উপলব্ধি করেছিলেন বলে বিশ্বাস করা হয়। উল্লিখিত তিনজন কবির কবিতায় আমরা স্থূল আকারে সে ধর্মপদ্ধতি পাই যা বর্ধমানের গোস্বামীদের রচনায় তার সূক্ষ্ম অধিবিদ্যা লাভ করেছিল। ষোড়শ শতাব্দীর শেষদিকের কাব্য ও চম্পুগুলিতে চিত্রিত রাধার সঙ্গে কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়ঘন সম্পর্কের প্রণয়াকুল চিত্রের প্রায় অনুরূপ চিত্র জয়দেব ও চণ্ডীদাসের কবিতায় পাওয়া যায়। এটা লক্ষ্য করা চিত্তাকর্ষক যে বিদ্যাপতিও এ দু'জন কবির কবিতা চৈতন্যকে যথেষ্ট অনুপ্রাণিত করেছিল।

৩.
ধর্ম ও সাহিত্যের মতো চারুকলা, স্থাপত্যশিল্প ও মুদ্রাশিল্পেও বেশ কিছুটা ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করা যায় যেগুলিকে আঞ্চলিক না বললেও প্রতিনিধিস্থানীয় বলা চলে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রায় সব ইমারত বিলীন হয়ে গেছে যার ফলে প্রাথমিক হিন্দু বা বৌদ্ধ শৈল্পিক ঐতিহ্য থেকে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার ফলে সৃষ্ট স্থাপত্যরীতিতে উত্তরণের পর্যায় সম্পর্কে ধারণা করা কঠিন। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং চতুর্দশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে নির্মিত ত্রিবেণীর জাফর খান গাজীর মসজিদ এবং ছোট পাণ্ডুয়ার মসজিদ [৪১] বহু গম্বুজ বিশিষ্ট আয়তাকার শ্রেণীর প্রতীক। এগুলিতে (voussoirs) এর উপর প্রতিষ্ঠিত (True Arch) এবং চতুষ্কোণ থেকে বৃত্তে অবস্থান্তরের পর্যায় লাভের জন্য ব্যবহৃত (Corbelled Pendentive) এর মতো প্রযুক্তিগত প্রণালীর প্রয়োগ দেখা যায়। এ বহু গম্বুজ বিশিষ্ট আয়তাকার ধরনের মসজিদও (Corbelled Pendentive) প্রণালী সম্পূর্ণ প্রাক-মোগল যুগে অব্যাহত ছিল। আমরা যদি মনে রাখি যে স্কুইঞ্চের (Squinch) মতো বৈজ্ঞানিক ও নিখুঁত নির্মাণ পদ্ধতি উত্তর ভারত, ইরান এবং অন্যান্য মুসলিম দেশগুলিতে প্রায় একরূপে গৃহীত হয়েছিল। সেক্ষেত্রে বাংলায় স্কুইঞ্চ এর দুর্লভতা এবং গুজরাটে এর অনুপস্থিতি[৪২] যথেষ্ট বিস্ময়কর। বাংলা ও গুজরাটের কারিগরগণ ভারতীয় (Trabeate) পদ্ধতির সঙ্গে এতবেশি পরিচিত ছিলেন যে স্কুইঞ্চের প্রায়োগিক গুরুত্ব তাঁরা উপলব্ধি করতে পারেন নি। সম্ভবত একই ধরনের মানসিকতার দৃষ্টান্ত হচ্ছে ইলতুৎমিশের সমাধিতে ভারতীয়কৃত স্কুইঞ্চের উপস্থিতি যা নির্মাণ করা হয়েছিল ভারতীয় স্থপতির সুপরিচিত প্রাবরণ ধারায়। বাংলার রাজমিস্ত্রিরা কক্ষের চতুষ্কোণী আকৃতি ও গম্বুজের গোলাকার ভিত্তির মধ্যে সমন্বয়সাধনের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল। একলাখী সমাধিসৌধে (পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ) তারা এ সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছিল। নিপুণ পদ্ধতির আশ্রয় নিয়ে ইট দিয়ে এর মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত অন্তঃস্থল ভরিয়ে এ চতুষ্কোণী ইমারতের অভ্যন্তরকে তারা অষ্টভুজে পরিণত করেছিল। গুজরাটের স্থপতিগণ কোণে কোণে আড়াআড়িভাবে স্থাপিত অতিরিক্ত থামের সাহায্যে চতুষ্কোণ কক্ষকে অষ্টভুজে পরিণত করে অবস্থান্তরের পর্যায়ের সঙ্গে জড়িত জটিলতা দূর করেছিলেন। গুজরাটের সারলেজে শেখ আহমদ খত্তরীর সমাধিসৌধের কেন্দ্রীয় কক্ষে আমরা এটাই দেখতে পাই এবং সন্নিহিত ইমারতগুলির সবগুলি গম্বুজই অনুভূমিক নীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট (Trabeate) পদ্ধতির ভিত্তিতে নির্মিত। মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত নিখুঁত স্কুইঞ্চ পদ্ধতির সঙ্গে এসব পদ্ধতির তুলনা করলে তাদের বেশ সেকেলে মনে হয়। স্কুইঞ্চের একমাত্র ব্যবহার দেখা যায় গৌড়ের গুমতি তোরণে (ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগ) যেখানে প্রাক-মোগল বাংলার নির্মাতাদের কাছে অপরিচিত এক ঐতিহ্যের সঙ্গে জন্মগতভাবে পরিচিত একজন স্থপতিকে আবিষ্কার করা যেতে পারে।

মহিলাদের গ্যালারির উপস্থিতি এবং পূর্ব ও পশ্চিম ভারতের মসজিদ স্থাপত্যে পরিলক্ষিত প্রার্থনাস্থানকে (Sanctuary) মূল অংশ (Nave) ও পার্শ্ববর্তী ট্র্যানসেপ্টে

বন্ধনের ইঙ্গিত দান করে। আদিনা মসজিদের প্রার্থনাস্থানকে আহমেদাবাদের জামে মসজিদ ও পঞ্চদশ শতাব্দীর জৌনপুরের মসজিদগুলির প্রার্থনাস্থানের সঙ্গে তুলনা করলে এর পারস্পরিক সম্পর্ক প্রায় স্পষ্ট হয়ে উঠে। ইমারতগুলির প্রত্যেকটির পশ্চিমদিকের ক্লয়েস্টারে (Cloister) একটি মনোরম মূল অংশ (Nave) রয়েছে যা দু'দিকের ট্র্যানসেপ্টের ফ্যাসাডের (Facade) স্কাইলাইনের উপরে উঠে গিয়ে সমস্ত প্রার্থনা-স্থানের নকশার কেন্দ্রবিন্দু রচনা করেছে। মূল অংশের (Nave) বিশাল উচ্চতা এবং বিশেষত আহমেদাবাদের জুমা মসজিদে পরিলক্ষিত পশ্চিমস্থ ক্লয়েস্টারের (Cloister) পিরাসডের মতো উচ্চতা মনে হয় সিনারের একাদশ শতাব্দীতে নির্মিত গণ্ডেশ্বরের মন্দিরের মতো পশ্চিম ভারতীয় ইমারত থেকে এসেছে যার ফ্যাসেডে উঁচু মণ্ডপ ও সোপান ছিল।[৪৩] পার্সি ব্রাউন দেখিয়েছেন যে, আহমেদাবাঁদ ও চম্পানিরের জুমামসজিগুলির ত্রিতল মূল অংশগুলির (Naves) নির্মাণ পরিকল্পনার যথেষ্ট পরিমাণে মন্দিরের প্রভাব দেখা যায়।[৪৪] বাংলা ও জৌনপুরের স্থপতিগণও আদিনা ও জৌনপুরের মসজিদগুলির মূল অংশের (Naves) উচ্চতার প্রভাব লাভের চেষ্টা করেছিলেন। তাঁরা ছাদ নির্মাণের বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন। আদিনা মসজিদের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি দামাস্কাসের আল-ওয়ালিদের মসজিদ থেকে নেওয়া হয়েছিল বলে মনে করা হলেও [৪৫] এ দু'টি ইমারতের প্রার্থনাস্থানগুলির (Sanctuary) মধ্যে গঠনসংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈসাদৃশ্য দেখা যায়। যেখানে আলওয়ালিদের মসজিদের প্রার্থনা-স্থানের মধ্যাংশের চাঁদওয়ারি (Gable) ছাদ কিঞ্চিৎ উঁচু গম্বুজ দিয়ে ঢাকা,[৪৬] সেখানে আদিনা মসজিদের কেন্দ্রীয় মূলঅংশের (Nave) উপরে রয়েছে খিলান করা ছাদ (Vanlt) যেটা সম্পূর্ণভাবে পড়ে গেলেও মালদহের পুরাতন মসজিদের প্রার্থনাস্থানের ভল্ট থেকে অনুমানের ভিত্তিতে পুনঃস্থাপিত করা যায়।[৪৭] আদিনা মসজিদের পার্শ্ব উইংগুলির (Side wings) ছোট ছোট অনেকগুলি গম্বুজ দিয়ে ঢাকা সমতল ছাদ রয়েছে। চাঁদওয়ারি ছাদ বিশিষ্ট (Gable rooting) আলওয়ালিদের মসজিদের সঙ্গে এর পার্থক্য রয়েছে। আদিনা মসজিদের ভল্টের উৎস নির্দেশ করা খুব দুঃসাধ্য হলেও এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, চারটি ক্লয়েস্টারের প্রত্যেকটির মাঝখানে ভল্টবিশিষ্ট মধ্যযুগীয় ইরানি মসজিদের নমুনা এ পদ্ধতি গ্রহণে বাংলা কারিগরদের অনুপ্রাণিত করেছিল।[৪৮] বিশাল খিলানযুক্ত একটি পাইলন (Arched Pylon) জৌনপুরের মসজিদগুলির মূল কক্ষের (Nave) উচ্চতা ও মর্যাদাকে গুরুত্ব প্রদান করেছে। এ পাইলনের পিছন থেকে উঠেছে একটা গম্বুজ[৪৯] যা অভ্যন্তরীণভাবে দু'পর্যায়ে ওঠা একটা কাঠামো যার নিচের স্তরে দেখা যায় স্কুইঞ্চ এবং উপরের স্তরে দেখা যায় ব্রাকেট (Bracket)। জৌনপুরের জুমামসজিদের (১৪৭০ খ্রিস্টাব্দ) ভল্টবিশিষ্ট ট্র্যানসেপ্টগুলি[৫০] আমাদের আদিনা মসজিদের ভল্টবিশিষ্ট মূল অংশের (Nave) কথা মনে করিয়ে দেয়। উপরতলার পর্দাঘেরা একটি কক্ষের আকারে প্রার্থনাস্থানের (Sanctuary) উত্তর পশ্চিম কোণে অবস্থিত বিচ্ছিন্ন মহিলাদের গ্যালারি পূর্ব ও পশ্চিম ভারতের মসজিদ স্থাপত্যের এক অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী বৈশিষ্ট্য। বাংলা, জৌনপুর ও গুজরাটের মসজিদগুলিতে এর

অবস্থান ও আকৃতি প্রায় একরূপ। একমাত্র পার্থক্য হচ্ছে লাল দরওয়াজা মসজিদে এটা মূল অংশের (Nave) সন্নিহিত একটা কেন্দ্রীয় স্থানে অবস্থিত এবং জৌনপুরের আটালা মসজিদে ও জুমামসজিদে প্রতি ট্র্যানসেপ্টের (Transept) শেষভাগে একটি করে এরকম দু'টি কক্ষ রয়েছে। পূর্ব ও পশ্চিম ভারতীয় দেশগুলির মসজিদে মহিলাদের কক্ষের প্রাধান্য এবং ভারতের বাইরের দেশগুলির মসজিদে এ বৈশিষ্ট্যর সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি সম্ভবত এর ভারতীয় উৎপত্তির ইঙ্গিত দান করে। মন্দিরস্থাপত্যে এর উৎপত্তি সন্ধান করা যেতে পারে। সেখানে প্রায়ই পার্শ্ব-কক্ষ (Ante-room) এবং দ্বিতল বিশিষ্ট কক্ষ রয়েছে যার ভার বহন করছে খাটো ও মোটা থাম, ব্র্যাকেটের শীর্ষদেশ (Bracket Capitals) ও অনুভূমিক প্রধান কড়িকাঠ (Architraves)।

কোনো রকমের উল্লম্ব সম্প্রসারণ দ্বারা অনুভূমিক স্কাইলাইনের প্রভাব লাঘব না হওয়ার কারণে বাংলার ইমারতগুলির একটি সহজাত একঘেয়েমি রয়েছে। আদিনা মসজিদের প্রার্থনা কক্ষের ফ্যাসেড বাদ দিলে অন্যান্য ইমারতগুলির একটানা স্কাইলাইন রয়েছে এবং ছাদ হিসেবে এগুলির উপরের স্কন্ধহীন গম্বুজগুলির চিত্তাকর্ষক প্রভাব সামান্য। এ বিষয়ে প্রাক-মোগল বাংলার মসজিদগুলির সঙ্গে জৌনপুর ও গুজরাটের মসজিদগুলির লক্ষণীয় পার্থক্য দেখা যায়। শেষোক্তগুলির বিশাল পাইলন (Pylon) যা শীর্ণ কিন্তু আনুপাতিকভাবে সম্প্রসারিত ক্ষুদ্র মিনারগুলি স্কাইলাইন ভেদ করে অনুভূমিক প্রভাবকে প্রতিঘাত করে।

কিন্তু বিচ্ছিন্ন যে দু'টি ক্ষুদ্র মিনার আমরা বাংলায় দেখতে পাই সেগুলি কোনো শ্রেণীবিশেষের প্রতীকস্বরূপ এবং এগুলি সম্ভবত উপমহাদেশের বাইরে অবস্থিত প্রেরণার কোনো দূরবর্তী উৎসের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পুরাতন দিল্লিতে কুতুব-মিনারের মতো বিশাল একটি স্মৃতিস্তম্ভের উপস্থিতি এ ধারণার ইঙ্গিত দেয় যে ছোট পান্ডুয়ার মিনারের গঠনকৌশল পূর্বোক্তের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল।[৫১] গড়নের দিক থেকে অবশ্য উভয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। কুলুঙ্গিবিহীন অবিচ্ছিন্নভাবে ক্রমাগত সরু হয়ে যাওয়া (Tapering) ফ্যাসেড এবং প্রতিতলাতে বিভক্তকারী অভিক্ষিপ্ত ব্যালকনিসহ কুতুব মিনার তুর্কিস্তানের জরকুরঘনের একই ধরনের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত মিনারের সদৃশ।[৫২] কিন্তু পাণ্ডুয়ার মিনার যতই উপরে উঠেছে ততই তার পাঁচটি তলার প্রত্যেকটির উচ্চতা ও ব্যাস হ্রাস পেয়েছে এবং এর উপরের অংশে সুস্পষ্ট কুলুঙ্গি রয়েছে যা ব্যালকনির কাজ করে।[৫৩] এ অট্টালিকার পিছন দিকে সরে যাওয়া সমুন্নতি (Receding Elevation) আফগানিস্তানের অন্তর্গত জামের সদ্য আবিষ্কৃত মিনারের প্রতিকৃতি বলে মনে হয় যেখানে প্রতিপর্যায়ের শেষে পিছনে সরে যাওয়া দেখতে পাওয়া যায়।[৫৪] জামের মিনার ও দিল্লির কুতুবের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ পূর্বোক্তের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে গোলাকৃতি নকশা ও অভ্যন্তরণ সিঁড়ি যা ভূমি থেকে শীর্ষ পর্যন্ত ঘুরে ঘুরে উঠেছে। একমাত্র বৈসাদৃশ্য হচ্ছে জামের মিনারের ভিত্তির আকার অষ্টভুজী। এর উচ্চতার সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন প্রস্থের ব্যাখ্যা এই যে প্রতিস্তরের শীর্ষে একটি পিছনে সরে যাওয়া ব্যালকনি রাখার জন্য কারিগর অপেক্ষাকৃত মোটা ভিত্তি দিয়ে শুরু করেছিল। কুতুব

মিনারসহ এ ধরনের অন্যান্য ভারতীয় ইমারত থেকে এভাবে স্বতন্ত্র ছোট পাণ্ডুয়ার মিনার চতুর্দশ শতাব্দীর বাংলার সঙ্গে জাফর খান গাজী ও সাইফউদ্দীনের মতো প্রাথমিক তুর্কি দুঃসাহসীদের মাধ্যমে সমকালীন আফগানিস্তানের যোগাযোগের ইঙ্গিত দান করে। এদের নির্দেশনায় মিনারটি নির্মিত হয়েছিল বলে মনে করা হয়। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে নির্মিত গৌড়ের ফিরোজা মিনারে বহু ভাগ দেখা যায় যার উপরের গুলি অগভীর কুলুঙ্গি দ্বারা একটি অপরটি থেকে বিচ্ছিন্ন।[৫৫] মনে হয় এটা ছোট পাণ্ডুয়াস্থ এর পূর্বসূরি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল।

প্রাক-মোগল যুগের বাংলার ইমারতগুলিকে নির্মাণের জাগতিক বা ধর্মীয় উদ্দেশ্যের দিক থেকে সুবিধাজনকভাবে দু'টি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। জাগতিক শ্রেণীর ইমারত হিসেবে দুর্গ-তোরণ, স্নানাগার ও নগর-প্রাচীরের উদাহরণ দেওয়া যায় যার কিছু কিছু গৌড় ও পাণ্ডুয়ায় পাওয়া যায়। ধর্মীয় ইমারতের মধ্যে রয়েছে মসজিদ ও সমাধিসৌধ যেগুলিকে তাদের আকৃতি ও এক বা একাধিক গম্বুজের সংখ্যানুসারে শ্রেণীভেদ করা যায়। এটাই হচ্ছে গোটা আমলের প্রধান নির্মাণ উপকরণ এবং থাম ও দরজার বাজু হিসেবে ব্যবহৃত হওয়া ছাড়া পাথর, দেয়ালের, বিশেষত, পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে ও ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগের ইমারতগুলির দেয়ালের পৃষ্ঠদেশ আবৃত করার কাজে ব্যবহার করা হয়েছে। পোড়ামাটির ফলকের অলংকরণের প্রাচুর্য হতবুদ্ধি করে দেয় এবং দেয়ালের পৃষ্ঠভাগে সাধারণত মাধুর্য ও রঙের বিভিন্নতা এনে দেয়। এটা পাথরের পৃষ্ঠভাগেও অনুকরণ করা হয়েছে। ডিমাপুর তোরণের ফ্যাসেডে এবং বিষ্ণুপুর ও কান্তনগরীর মতো প্রতিনিধি স্থানীয় মন্দিরের কার্নিশের (Cornice) বক্রতা, থামের আকৃতি ও দরজার বিন্যাসে বাংলা স্থাপত্যের প্রভাব দেখা যায়।

ঢাকা জাদুঘরে রক্ষিত লিপিগুলির মধ্যে কিছুসংখ্যক লিপিতে প্রদর্শিত তুঘরা পদ্ধতির অর্গান পাইপ (Organ Pipe) ও বর্শা (Lance) শ্রেণী নামে পরিচিত কিছু নির্দিষ্ট ধরনের লিপির বাংলায় বিকাশ ঘটেছিল। অর্গান পাইপ রীতি মনে হয় কিছু জৌনপুরী মুদ্রার লিপিকে প্রভাবিত করেছিল।

বাংলার মুদ্রা প্রাচীন ভারতের ১৭৫ গ্রেন মানের অনুরূপ ছিল। এতে বিশুদ্ধ ধাতু ও খাদের অনুপাতে হেরফের ঘটত সামান্য যা এ আমলের রৌপ্য মুদ্রার অমার্জিত সম্পাদনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সম্ভবত বৈদেশিক বাণিজ্য-প্রধান এ উপকূলীয় অঞ্চলে অর্থনীতির স্থিতিশীল অবস্থা ও ধাতব মুদ্রার জন্য অনুভূত একটা নিয়মিত চাহিদার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করায়। গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক ঘটনার স্মরণার্থে যে স্বল্পসংখ্যক স্বর্ণমুদ্রা উৎকীর্ণ করা হয়েছিল বলে মনে করা হয়[৫৬] সেগুলির ১৭২.৮ গ্রেন ওজনের মানসম্মত। মধ্যযুগের মুসলিম ভারতে স্বর্ণ ও রৌপ্যের অনুপাত ছিল ১:১০।[৫৭] এ ছাড়া স্বর্ণ ও রৌপ্যের বিনিময় হারের কোনো তথ্য আমাদের হাতে নেই।

ইওয়াজ খলজীসহ প্রাথমিক সুলতানদের মুদ্রায় শাসনকারী সুলতানদের নাম ও রাজকীয় উপাধি, খলিফার নাম বা খলিফার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের ইঙ্গিতবহ উপাধি কলেমা ও তারিখ রয়েছে। ইওয়াজ খলজীর কিছু মুদ্রায় তারিখ ছাড়াও মাসেরও

নামোল্লেখ একটা অনুপম বৈশিষ্ট্য[৫৮] যা মধ্যযুগের মুসলিম জগতের মুদ্রাতত্ত্বে আর কোথাও পাওয়া যায় না। খলিফার নাম ছাড়া উল্লিখিত মুদ্রাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের প্রায় সবগুলিই স্বাধীন সুলতানরা গ্রহণ করেছিলেন। খলিফার নামের পরিবর্তে তাঁরা খলিফার ডান হাত এবং বিশ্বাসীগণের নেতার সাহায্যকারী ইত্যাদি শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করেছিলেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর কোনো কোনো শাসক 'আল্লাহর খলিফা' উপাধি গ্রহণ করেছিলেন, মাঝে মাঝে সাক্ষ্য ও প্রমাণ দ্বারা। [৫৯] এ শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করে যার অর্থ সীমিত করা হতো। সুলতানা রাজিয়ার সময় থেকে টাকশালের নাম উৎকীর্ণ করার রীতি শুরু হয়। তাঁর ৬৩৪ হিজরি/১২৩৬ খ্রিস্টাব্দের একটি মুদ্রায় লক্ষ্ণৌতির উল্লেখ রয়েছে।[৬০]

বাংলার মুদ্রা প্রচলন করতে গিয়ে গিয়াসউদ্দীন ইওয়াজ খলজী মনে হয় ঘোরী শাসকদের গজনী-মুদ্রা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন যাদের ভাষাগত রচনাশৈলী তিনি সামান্য পরিবর্তন করে গ্রহণ করেছিলেন।[৬১] বাংলার কিছু কিছু 'মুদ্রায় বিশ্বাসীদের নেতার সাহায্যকারী', 'খলিফার ডান হাত', 'যুগের আলেকজান্ডার' এবং 'দ্বিতীয় আলেকজান্ডার-এর মতো উপাধিগুলি দিল্লির প্রতি বাংলার সুলতানদের মনোভাব নির্দেশ করে।[৬২]

দিল্লির প্রাথমিক মুদ্রার মান সুস্থিতকরণে বাংলার অবদান ছিল বলে মনে হয়। কারণ ৬২২ হিজরি/১২২৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৬২৪ হিজরি/১২২৭ খ্রিস্টাব্দ [৬৩] পর্যন্ত বিস্তৃত ইলতুৎমিশের গুরুত্বপূর্ণ এক শ্রেণীর রৌপ্যমুদ্রা ওজন, নকশা এবং রাজকীয় উপাধির দিক থেকে ইওয়াজের মুদ্রার অনুকরণে উৎকীর্ণ। বাংলার কোনো কোনো বিশেষ ধরনের মুদ্রা জৌনপুর, ত্রিপুরা, আসাম, কামরূপ এবং আরাকানের মতো দেশের মুদ্রার আদর্শ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। জৌনপুরের ইব্রাহীম, মাহমুদ এবং হোসেনের কিছু স্বর্ণমুদ্রা[৬৪] লিপির দিক থেকে বাংলার জালালউদ্দীন মোহাম্মদের মুদ্রার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্যপূর্ণ।[৬৫] কিম্ভূতকিমাকার সিংহ অথবা দ্বি-বর্গক্ষেত্র, রশ্মিযুক্ত অথবা খাঁজওয়ালা বৃত্ত, বাংলা অক্ষর, শাসকের ধর্মবিশ্বাস নির্দেশক শব্দগুচ্ছ এবং ১৭.৮ গ্রেনের চেয়ে নিকৃষ্ট মানের মতো মধ্যযুগীয় ত্রিপুরা রাজ্যের মুদ্রার ব্যবহার বৈশিষ্ট্যগুলি সম্ভবত বাংলার মুদ্রা থেকে অভিযোজন। কোচ এবং আহোম মুদ্রা যে বাংলার বিশেষ এক ধরনের মুদ্রার আদর্শে উৎকীর্ণ তা পরবর্তী পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হবে। কিছু কিছু আরাকানী ও জয়ন্তীয়া মুদ্রায়ও বাংলার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এসব মুদ্রাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য আত্মভূত করে প্রতিবেশী দেশগুলি সম্ভবত সুস্থিত সরকার বিশিষ্ট মধ্যযুগীয় বাংলার উন্নততর সংস্কৃতির অনুকরণ করছিল। [৬৬]

৪.

বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থার ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী সেন শাসনামলের সঙ্গে মুসলিম শাসনামলের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। সেন আমলে বহির্বাণিজ্য মনে হয় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং এক ধরনের গ্রামীণ অর্থনীতি জনজীবনের বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল।[৬৭] সামুদ্রিক বাণিজ্যের এ অবনতি সম্ভবত রোমান সভ্যতা ও রোমানদের

সৃষ্ট ভূমধ্যসাগরীয় রাষ্ট্রপুঞ্জের পতনের সঙ্গে জড়িত। দশম ও একাদশ শতাব্দীতে ইতালিয় শহরগুলির ও স্ক্যান্ডিনেভিয়ার বাণিজ্যিক তৎপরতা ইউরোপের অর্থনৈতিক জাগরণের সৃষ্টি করায়[৬৮] সে অন্তর্মুখী হয়ে পড়ে যার অনিবার্য ফল হিসেবে ভারতীয় উপকূলীয় অঞ্চলের সঙ্গে তার পূর্বের সামুদ্রিক যোগাযোগ আর নবায়িত হয় নি। পশ্চিমের এ শহরে পুনরুজ্জীবনের কোনো সুফল বাংলা পায় নি। এটা উল্লেখ করা গুরুত্বপূর্ণ যে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মিনহাজ বাংলায় কড়ির প্রচলন[৬৯] এবং ধাতব মুদ্রার সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি লক্ষ্য করেছিলেন। মুসলিম শাসনের প্রথমদিকে শুধু শাসকের সার্বভৌমত্বের চিহ্নরূপেই নয় সম্ভবত বিনিময় মাধ্যম রূপেও মুদ্রার প্রচলন ছিল। স্বাধীন সুলতানাত প্রতিষ্ঠার সময় থেকে সাতগাঁও, সোনারগাঁও এবং চট্টগ্রামের মতো গুরুত্বপূর্ণ বন্দরও প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। এগুলি এবং যথেষ্ট সংখ্যক টাকশাল নগরীর পত্তন[৭০] বাংলার সামুদ্রিক বাণিজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও তার ফলে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানের সঙ্গে তার যোগাযোগের কথাই নির্দেশ করে। সুতরাং সভ্যতার গ্রামীণ পর্যায় থেকে মুদ্রা অর্থনীতির প্রচলনের উপর প্রতিষ্ঠিত নাগরিক পর্যায়ে বাংলাকে আবার নিয়ে আসার ব্যাপারে মুসলিম শাসনের একটি ভূমিকা ছিল।

৫.

মুসলিম শাসনের প্রাথমিক আমলের বাংলায় জীবনধারার সামাজিক-রাজনৈতিক প্রবণতাগুলি হোসেন শাহী আমলেও অব্যাহত ছিল। দীর্ঘদিন ধরে সক্রিয় ঐতিহাসিক কিছু প্রক্রিয়ার সর্বোচ্চ সীমা অর্জনও এ আমলে লক্ষ্য করা যায়। বৈষ্ণব আন্দোলন, নব্যন্যায়ের ক্রমোন্নতি, রঘুনন্দন কর্তৃক হিন্দু সামাজিক ধর্মীয় আইন সংহিতার চূড়ান্তকরণ, ধর্ম, মনসা ও সত্যপীরের মতো স্থানীয় পূজা-পদ্ধতির সৃজন এবং তাদের কোনো কোনোটি সম্পর্কে পাঁচালীকবিতা রচনা—এসবই আলোচ্য সময়কালে হয়েছিল—যা মনে হয়েছিল রূপান্তরের এক দীর্ঘ প্রক্রিয়ার ফল। হোসেন শাহী শাসনামলে কিছু নতুন শক্তির ইঙ্গিতও লক্ষ্য করা গিয়েছিল যা অল্পকাল পরে শুধু বাংলার জীবনধারাকেই নয় ভারতীয় উপমহাদেশের জীবনধারাকেও প্রভাবিত করেছিল। সক্রিয় এ শক্তিগুলির মধ্যে পর্তুগিজদের আগমন ছিল যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। পোপের অনুমোদন লাভের ফলে পর্তুগালের রাজা "ইথিওপিয়া, আরব, পারস্য ও ভারতের নৌ-চলাচল, বিজয় ও বাণিজ্যের প্রভু"[৭১] উপাধি গ্রহণ করেছিলেন এবং পর্তুগিজরা প্রাচ্যের ব্যবসা-বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার ভোগকে সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত মনে করেছিল। বিজয়নগর রাজ্যের একজন গভর্নর ও সেনাপতির সহায়তায় ১৫১০ খ্রিস্টাব্দে অ্যাফোনেসা দ্য আলবুকার্কের বিজাপুর সুলতানাত থেকে গোয়া দখলের ফলে ভারতের পশ্চিম উপকূলে পর্তুগিজ প্রভাব সুদৃঢ় হয়। স্পেনে বহু শতাব্দীর মুসলিম শাসন, ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে তুর্কি ও আরব প্রতিপত্তি এবং প্রাচ্যের বাণিজ্যের উপর আরব বণিকদের নিয়ন্ত্রণ পর্তুগালের অনুভূতিকে এত তিক্ত করেছিল যে তার সন্তানেরা এখন মুসলমানদের চেয়ে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে চেয়েছিল। রাজনৈতিক ও

বাণিজ্যিক ক্ষমতার প্রসার এবং খ্রিস্টধর্মের বিস্তার ছিল ভারতে পর্তুগিজ নীতির মূল বৈশিষ্ট্য—প্রচণ্ড মুসলিম-বিদ্বেষ এবং জলদস্যুতা মাঝে মাঝে এর ইন্ধন যুগিয়েছিল। বার্বোসা নবীর প্রতি তাঁর অশ্রদ্ধার ভাব গোপন করেননি[৭২] এবং দ্য ব্যারোস "ভারতে মুসলিম সভ্যতার অস্তিত্ব স্বীকার" করেন নি।[৭৩] ক্যাপ্টান হেডা মুসলমানদের বিরুদ্ধে পর্তুগিজদের যুদ্ধের বিবরণ দিতে গিয়ে প্রায়ই "সৈন্যদের উৎসাহদানকারী ক্রুশধারী ধর্মযাজকদের" ভুল চিত্র এঁকেছেন।[৭৪] বাণিজ্য তাদের প্রধান লক্ষ্য হলে বাংলা তাদের নিরাশ করে নি। কালিকটে অবিশ্বাস্য উচ্চমূল্যে বিক্রিত বাংলা কাপড়ের কথা ভাস্‌কো-ডা-গামা তাঁর সংক্ষিপ্ত বিবরণে উল্লেখ করেছেন।[৭৫] বাংলায় বাণিজ্যের সম্ভাবনার কথা আলোচনা করে আল বুকার্ক তাঁর রাজার কাছে একটি চিঠি লিখেছিলেন।[৭৬] সুতরাং ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বঙ্গোপসাগর, চট্টগ্রাম ও গৌড়ে পর্তুগিজ তৎপরতা সহজেই বোধগম্য।

ভারতে মোগলদের আগমন সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়ার সূচনা করে যা আকবরের আমলে চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করে। মোগল সাম্রাজ্যবাদের এবং আধিপত্যের জন্য মোগল-আফগান প্রতিদ্বন্দ্বিতার চাপও হোসেন শাহী বাংলাকে ভোগ করতে হয়েছিল।

এভাবে সযত্ন গবেষণার দাবিদার বাংলার সামাজিক সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক জটিল ছাঁচের বেশকিছু সুস্পষ্ট উপাদান হোসেন শাহী আমলে দেখা গিয়েছিল। সামাজিক, ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা শুধুমাত্র বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। ভাগলপুর ও রাজমহলের পরের অঞ্চলগুলির সঙ্গে এর তেমন কোনো সম্পর্ক নেই যদিও সেসব অঞ্চল মাঝে মাঝে বাংলার রাজনৈতিক সীমানার অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল এবং প্রায়শ বাংলা এবং দিল্লি অথবা জৌনপুর রাজ্যের মধ্যে বিবাদের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এ গবেষণার পরিধির সীমানির্দেশকরণ শুধুমাত্র দেশের পশ্চিম সীমান্তের অনিশ্চিত প্রকৃতিই প্রভাবিত করে নি। ভারতের বাকি অংশ থেকে তাকে স্বতন্ত্রকারী ভাষাগত এবং সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলিও এটাকে প্রভাবিত করেছে।

টীকা

১. এ. বি. এম. হাবিবুল্লাহ : দি ফাউন্ডেশন অফ মুসলিম রুল ইন ইন্ডিয়া, পৃ. ৩০-৩১ ও পৃ. ৮৯-৯০।

২. মিনহাজ-ই-সিরাজ ; তবকাত-ই নাসিরী, পৃ. ৬৪; নিজামউদ্দীন আহমদ : তবকাত-ই আকবরী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৮।

৩. এ বিষয়গুলি সম্পর্কে আমার "বেঙ্গলস রিলেসন্স উইথ হার নেইবারস : এ নিউমিসম্যাটিক স্টাডি) (এন. কে. ভট্টশালী স্মারক গ্রন্থ) শীর্ষক প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

৪. মিনহাজ : পূর্বোল্লিখিত , পৃ. ১৬৩, ১৬৪, ১৭১, নিজামউদ্দীন : পূর্বোল্লিখিত পৃ. ৫৪;

৪. মিনহাজ : পূর্বোল্লিখিত , পৃ. ১৬৩, ১৬৪, ১৭১, নিজামউদ্দীন : পূর্বোল্লিখিত পৃ. ৫৪; সেলিম, : রিয়াজ-উস-সালাতীন, পৃ. ৭০।

৫. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন : হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, ২য় খণ্ড, ২য় ও ৩য় অধ্যায়।

৬. বেঙ্গল পাস্ট অ্যান্ড প্রেজেন্ট, (Lxvii), ১৯৪৮, পৃ. ৩২-৩৯; সেলিম: পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১১১-১৪। রাজা গণেশ সম্ভবত রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে বাংলায় উলেমা শ্রেণীকে দমন করতে শুরু করেছিলেন। কথিত আছে যে তিরহুতের দেব সিংহও রাজার প্ররোচনায় একই ধরনের নির্যাতন-নীতি গ্রহণ করেন যার চাপ পাণ্ডুয়ার আলা-উল-হকের আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারী দ্বারভাঙ্গার সুলতান হোসেন সহ জ্ঞানী দরবেশরাও ভোগ করেছিলেন (মোল্লা তকীয়া : বইয়াজ, মুয়াসির এ উদ্ধৃত, মে-জুন, ১৯৪৯, পৃ. ৯৮-৯৯। পূর্ব-ভারতীয় এ সকল শাসক সম্ভবত উলেমা-প্রাধান্যের মারফত অনুপ্রবেশকারী উত্তর-ভারতীয় রাজনৈতিক প্রভাব থেকে তাঁদের নিজেদের এলাকাকে মুক্ত করতে চেষ্টা করছিলেন। ১৪০২ খ্রিস্টাব্দে ইব্রাহীম শর্কির সে দেশ আক্রমণের পূর্বেই তাঁর পক্ষে জনৈক মখদুম শাহের যুদ্ধ করার যে উল্লেখ বিদ্যাপতি করেছেন, তা থেকে তিরহুতের রাজনীতিতে সুলতান হোসেনের সক্রিয় অংশগ্রহণ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়, প্রাগুক্ত। কীর্তিলতায় উল্লিখিত মখদুম শাহকে (আর. কে. চৌধুরী : "দি ওইনওয়ারাজ অফ মিথিলা" জে. বি. আর. এস. 1XL, ২য় অংশ, ১৯৫৪, পৃ. ১৪। উপরোল্লিখিত মখদুম শাহকে সুলতান হোসেন রূপে শনাক্ত করা যেতে পারে।

৭. আমি এখানে এ. এইচ দানীর "বিব্লিওগ্রাফিক অফ দি মুসলিম ইনস্ক্রিপশন অফ বেঙ্গল" এর আমার পর্যালোচনা থেকে বর্ণনা করছি । জে. এ. এস. পি. ৩য় খণ্ড, পৃ. ২০৭-০৮।

৮. চার্লর্স স্টুয়ার্ট : হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, পৃ. ১১১-১৩; জে. এ. এস. বি. ১৯৫২. পৃ. ১৬৮, টীকা ১। সাম্প্রতিককালে স্টুয়ার্টের প্রদত্ত তথ্য সম্পর্কে সুখময় মুখোপাধ্যায় সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। দেখুন'বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর. পৃ. ৬৪-৬৫।

৯. আমার "বেঙ্গলস রিলেশন্স উইথ হার নেইবরস" প্রবন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে, পূর্বোল্লিখিত।

১০. মিনহাজ, পৃ. ১৫৯।

১১. এ. বি. এম. হাবিবুল্লাহ : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৭১ ; হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫-৬ এবং ১৬২।

১২. মিনহাজ, পৃ. ১৬৩। মোল্লা তকীয়ার বইয়াজ অনুসারে (মুয়াসির মে-জুন, ১৯৪৯, পৃ. ৭৯ ও ৮০ তে উদ্ধৃত) বখতিয়ার খলজী ৫৯৯ হিজরি/১২০২ খ্রিস্টাব্দে দ্বারভাঙ্গা আক্রমণ করেছিলেন এবং তিরহুতের নরসিংহ দেও অন্ততপক্ষে ইওয়াজের সময় পর্যন্ত বাংলার করদরাজা ছিলেন। কথিত আছে যে, তিরহুতের রাজা ইওয়াজকে আলাউদ্দীন জানীর হাত থেকে বিহার দখল করতে সাহায্য করেছিলেন। এস. এইচ. আসকারি: "এ রিভিউ অফ বিহার ডিউরিং দি টার্কো-আফগান পিরিয়ড", কারেন্ট স্টাডিজ, ১৯৫৪, পৃ. ৭।

১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯-১০; জে. এ, এস. বি. ১৮৭৩, পৃ. ২৪৭-৪৮ এবং ৫০; এ. এইচ. দানী :- বিব্লিওগ্রাফি অফ দি মুসলিম ইনস্ক্রিপশন্স অফ বেঙ্গল, পৃ. ৪-৫, ৭-৮ এবং ৯; এস. আহমদ: ইনস্ক্রিপশন্স অফ বেঙ্গল, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১১-১৫, ২৬-২৭ এবং ২৯-৩০।

১৪. সিরাত-ই- ফিরুজশাহীতে ইলিয়াস কর্তৃক চম্পারণ বিজয়ের উল্লেখ আছে। এস. এইচ. আসকারি : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১৫। নাসির উদ্দীন মাহমুদ ও শামসউদ্দীন মোজাফফরের ভাগলপুরে আবিষ্কৃত মুদ্রা সাক্ষ্যের জন্য দেখুন জে. এ. এস. বি. XLI, পৃ. ১০৬; ই. আই, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৮০; এম. এইচ. আসকারি : পূর্বোল্লিখিত পৃ. ১৯; এ. এইচ. দানী; পূর্বোল্লিখিত, পৃ: ১৩৫-৩৬ ও ১৩৭ ; এস. আহমদ ; পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৫১-৫৩ এবং ১৪৪-৪৫।

১৫. মোল্লা তকীয়া : বইয়াজ, মুয়াসিরে উদ্ধৃত, পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৮৮; এস. এইচ, আসকারি : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১১, আর, কে, চৌধুরী : "দি কর্ণাটজ অফ মিথিলা, এ. বি. ও, আর, আই XXXV. ১৯৫৫, পৃ. ১২০-২১।

১৬. মোহাম্মদ তুঘলক দ্বারভাঙ্গার নাম পরিবর্তন করে তুঘলকপুর রেখেছিলেন। বইয়াজ : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৮৯-৯০ এবং ৯১। তুঘলকপুর উরফ তিরহুত থেকে জারিকৃত মুদ্রার জন্য দেখুন রাইট : ক্যাটালগ, ২য় খণ্ড. ১ম অংশ, নং ৩৮৪। আরও দেখুন, টমাস : ক্রনিকল্স, পৃ. ২০৩, টীকা, ১।

১৭. বইয়াজ : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৯৩-৯৪। এও কথিত আছে যে হাজীপুরে একটি দুর্গ নির্মাণ করা হয়েছিল এবং বুরহি গন্ডকের বাম তীরের একটি গ্রামের নামকরণ করা হয় শামসউদ্দীন পুর। স্থানীয় বাসিন্দারা এ গ্রামকে বলে শামষ্টিপুর

১৮. হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০৫। .

১৯. বারাণী ; তারিখ-ই ফিরুজ শাহী পৃ. ৫৮৯ ও ৫৯৪।

২০. বইয়াজ থেকে উদ্ধৃত, পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১০১। ভৈরব সিংহ নামে রাজার ছেলে বা ভাই নায়েবকে পরাস্ত করে এবং বারবককে তিরহুত আক্রমণ করতে বাধ্য করে যার ফলে তিরহুত আবার বশ্যতা স্বীকার করে। প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০-১০১; এস. এইচ আসকারি : পূবোল্লিখিত, পৃ. ১৯ ; এস. মুখোপাধ্যায় ; পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৯৭-৯৯।

২১. এ জায়গাগুলির অবস্থান ও শনাক্তকরণের জন্য দেখুন : হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩, টীকা ১, এবং পৃ. ৩৬ ও ৩৭।

২২. দক্ষিণ- পশ্চিম বাংলার বিজয় ও সংযুক্তির ইতিহাসের সঙ্গে জাফর খান ও শাহ শফিউদ্দীনের নাম অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। ত্রিবেণী ও পান্ডুয়ায় এ সেনাপতিদ্বয় সম্পর্কে প্রচলিত কাহিনীর জন্য ডি. মনি এর প্রবন্ধ দেখুন। জে. এ. এস. বি. ১৮৭৪, পৃ. ৩৯৩-৪০১; এইচ. ব্লখম্যান : একই সাময়িকী, ১৮৭০, পৃ. ২৮০-৮৩ এবং পি. এ. এস.বি. ১৮৭০, পৃ. ১২১-২৫। ৬৯৭ হিজরি/১২৯৭ খ্রিস্টাব্দের দেবীকোট লিপি এবং ত্রিবেণীতে প্রাপ্ত ৬৯৮ হিজরি/১২৯৮ খ্রিস্টাব্দ এবং ৭১৩ হিজরি/১৩১৩ খ্রিস্টাব্দে উৎকীর্ণ দু'টি লিপিতে জাফর খানের নাম ও উপাধিসমূহ রয়েছে। মোটামুটি সঠিকভাবে তাঁর জীবনের সমৃদ্ধিকাল নির্ধারণে এগুলি আমাদের সাহায্য করে। এ লিপিগুলির একটিতে তাঁর এইতিগীন উপাধি ব্যবহারের ফলে জাফর খান যে তুর্কি বংশোদ্ভূত ছিলেন তা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত; দেখুন জে. এ. এস বি. XXX1X, ১৮৭০, পৃ. ২৮৬-৮৭ ; এ. এইচ, দানী : পূর্বোল্লিখিত , পৃ. ৫-৬, এবং এস. আহমদ পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১২, ১৭-২১। ছোট পান্ডুয়ায় প্রচলিত পরম্পরাগত বিবরণের উপর ভিত্তি করে ব্লখম্যান অনুমান

করেন যে শাহ শফিউদ্দীন ছিলেন জাফর খান এবং ১৩২৪ খ্রিস্টাব্দে পানিপথে মৃত্যুবরণকারী বু আলী কলান্দরের সমসাময়িক; পি. এ. এস. বি. ১৮৭০, পৃ. ১২৪-২৫। মনে হয় এসব যোদ্ধারা উড়িষ্যার বিরুদ্ধে বহু যুদ্ধে জড়িত ছিলেন এবং তাঁরা যাদের মোকাবেলা করেছিলেন সে ভূদেব রাজা এবং পাণ্ডব রাজা হচ্ছে উড়িষ্যার রাজার অধীনে শাসনকারী হিন্দু সর্দারদের নামের পৌরাণিক রূপ মাত্র। আলোচনাধীন অঞ্চল যে প্রায়ই উড়িষ্যার নিয়ন্ত্রণে ছিল সেটা জোর দিয়ে বলার প্রয়োজন নেই। ব্লখম্যান ত্রিবেণীতে "উড়িষ্যার শেষ রাজার ঘাট" এবং পাভুয়ার কাছে "উড়িষ্যার গজপতিদের রাজ্যের সীমান্ত" হিসেবে নির্দেশিত করা হতো এমন একটি পুরাতন সড়ক দেখেছিলেন। প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪। ১৩৫৫ খ্রিস্টাব্দে ইউজবক হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমার মন্দরণ দখল করেছিলেন (হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫২) এবং পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে এটা উড়িষ্যার বিরুদ্ধে সৈন্যবাহিনী পরিচালনার ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছিল। মুসলমানদের অধিকারভুক্ত হওয়ার আগে এটা উড়িষ্যার এক দলপতির সদর দফতর ছিল। উপরন্তু এক "বিজয় অভিযানকালে" দ্বিতীয় নরসিংহ ১২৯৬ খ্রিস্টাব্দে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং সেখান থেকে একটি ফলক উৎকীর্ণ করেছিলেন। এ. বি. এম. হাবিবুল্লাহ : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১৪৪-৪৫।

২৩. সেলিম : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১০৬ ; আবিদ আলী : মেময়েরস, পৃ. ২৫-২৭।

২৪. জৌনপুর ও গুজরাটের মধ্যযুগীয় স্মৃতিসৌধের দেশীয় বৈশিষ্ট্যসমূহের জন্য দেখুন পি. ব্রাউন : ইন্ডিয়ান আর্কিটেকচার (ইসলামিক পিরিয়ড), পৃ. ৪৪, ৪৮, ৫২, ৫৯। নাসির উদ্দীন হাশমী তাঁর দখিন মে উর্দু গ্রন্থে দখিনী উর্দুসাহিত্যের বিকাশ আলোচনা করেছেন। অন্যত্র আমি এ ইঙ্গিত দিয়েছি যে সাহিত্যের ক্ষেত্রে মধ্যযুগে বাংলা ও দাক্ষিণাত্য একই ধরনের বিকাশ লাভ করেছিল। তাদের মৌলিক সাংস্কৃতিক চাহিদা, ইরানের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ এবং তাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা এর একটা প্রধান কারণ ছিল। মধুমালতীর কাহিনী, সাহিত্য পত্রিকা, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ, ১ম সংখ্যা, পৃ. ১২১-২২।

২৫. ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে লণ্ডনের স্কুল অফ ওরিয়েন্টাল অ্যান্ড আফ্রিকান স্টাডিজের আর্নল্ড বেক কর্তৃক নেপালে আবিষ্কৃত বাইশটি গীতিকবিতা শেষপর্যন্ত চর্যাপদ ও শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের মধ্যকার হারানো সূত্র যোগাতে পারে। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এস. বি. দাসগুপ্ত সেগুলির মধ্যে চর্যাচর্য বিনিশ্চয়ের কবিতা-রূপ এবং ভাষার চিহ্ন আবিষ্কার করেছেন। তাঁর মতে নেপালে চচ সঙ্গীত নামে পরিচিত এ গীতিকবিতাগুলি "চর্যাপদ থেকে শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে রূপান্তরের নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া নির্দেশ করে" এবং এগুলি মূলনীতির দিক থেকে "বৈষ্ণব পদাবলীর চেয়ে প্রাচীন চর্যাপদের নিকটতর"। দি স্টেটসম্যান ২৫ শে এপ্রিল ১৯৬৩। এটা লক্ষ্য করা চিত্তাকর্ষক যে বজ্রাচার্য সম্প্রদায়ের একজন নেপালী বৌদ্ধ ভিক্ষুর এ গানগুলি শোনা গিয়েছিল। এ বজ্রাচার্য সম্প্রদায়কে পরীক্ষামূলকভাবে বজ্রায়ন সম্প্রদায়রূপে শনাক্ত করা যায়। চর্যাপদগুলির রচয়িতা সিদ্ধাচার্যগণ এ বজ্রায়ন সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। সাম্প্রতিককালে আবিষ্কৃত গীতিকবিতাগুলি দেবী বাসুলির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে যিনি চণ্ডীদাসের কবিতায়ও বারবার উল্লিখিত হয়েছেন।

২৬. বারাণী : পৃ. ৫৯৩ ; ইয়াহিয়া বিন আহমদ : তারিখ-ই-মোবারকশাহী পৃ. ১২৫।

২৭. ইওয়াজ খলজীর জ্ঞানীদের পৃষ্ঠপোষকতার উল্লেখ করতে গিয়ে মিনহাজ বলেন যে ফিরুজ কোহর বাসিন্দা জামালউদ্দীন গজনভীর পুত্র জালালউদ্দীন সেই সুলতানের দরবারকক্ষে ধর্মীয় বিদ্যা সম্পর্কে বক্তৃতা করার সুযোগ পেয়েছিলেন। পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১৬১-৬২। গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে জৌনপুর গড়ে উঠার আগে সোনারগাঁও বাংলার বাইরের দেশগুলির ছাত্র ও শিক্ষকদের আকৃষ্ট করত। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ও চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে জীবিত শরফউদ্দীন আবু তোয়ামাহ এবং তাঁর শিষ্য শরফউদ্দীন ইয়াহিয়া মনেরী তাঁদের জীবনের বেশকিছু অংশ সোনারগাঁওয়ে কাটিয়েছিলেন। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন এ. করিম ;সোসাল হিস্ট্রি অফ দি মুসলিমস ইন বেঙ্গল, পৃ. ৬৭ ও পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহ এবং পৃ. ৯৭ ও পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহ।

২৮. ফিকাহ্‌র উপর একটি বই, নাম-ই হক, বাংলায় শরফউদ্দীন আবু তত্তয়ামাহ্‌র একজন ছাত্র রচনা করেছিলেন এ মর্মে সামান্য সাক্ষ্যের ভিত্তিতে এ. করিম (প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩ ও পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহ) সে মত প্রকাশ করেছেন এ. বি. এম. হাবিবুল্লাহ তা খণ্ডন করেছেন। জে. এ. এস. বি. ৫ম খণ্ড, ১৯৬০ পৃ. ২১৪।

২৯. ইসলামিকরণের লক্ষ্যে সপ্তদশ শতাব্দীর রচিত শেখ পরাণের নসিয়ত-নামা শেখ মুত্তালিবের কিয়াইত-উল- মুসাল্লিন ও নসরুল্লাহ্ খানের শরিয়তনামার মতো কাব্যের এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। এগুলির বিবরণের জন্য দেখুন ই. হক ; মুসলিম বাঙ্গালা সাহিত্য, পৃ. ১৬৪-৬৬ ও ১৭৭-৭৮ পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত যোগ-তান্ত্রিক বিষয়বস্তু ও ধারণাপূর্ণ মুসলিম কাব্যের চেয়ে অত্যন্ত ভিন্নতর এ রচনাগুলির বিষয়বস্তু ছিল ইসলামি। ইসলামি সাহিত্যের বিকাশ সম্ভবত মুসলমান কবিদের যোগ সুফি ধারণার উৎস তান্ত্রিকতার সাধারণ অধঃপতন, উত্তর ভারতীয় জীবনের উপর হাদিস-সাহিত্যের প্রভাব যা উদার চিন্তাধারার বিরুদ্ধে আব্দুল হক দেহলভীর ক্রোধোদীপ্ত দীর্ঘ বক্তৃতার ফলে তীব্রতর হয়েছিল এবং মোগল শাসনের মাধ্যমে এসব প্রতিক্রিয়াশীল কিছু কিছু ধারণার বাংলায় সম্ভাব্য অনুপ্রবেশের মতো কারণ দিয়ে সম্ভবত ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

৩০. নবীবংশ ও জ্ঞান-প্রদীপের মতো কাব্যে ইতিহাসকে পৌরাণিক কাহিনীর সঙ্গে এবং সুফিবাদকে যোগদর্শনের সঙ্গে সংযুক্তকারী সৈয়দ সুলতান সে সময়ের এ প্রতিক্রিয়াশীল প্রবণতা সম্পর্কে অভিযোগ করেছেন। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে তাঁর রচনাবলি ইসলামি ধ্যান ধারণা তুলে ধরে। তিনি ইসলামকে হিন্দু ভাবাপন্ন করেছেন তাঁর বিরুদ্ধে এ অভিযোগে কবি বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। ওফাতে রসুল. পৃ. ৫ ও পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহ। ইসলামি বিষয়বস্তু নিয়ে লিখেছেন সে সময়ের এমন মুসলমান কবিরা দুঃখ প্রকাশের এক স্পষ্ট মনোভাব দিয়ে তাঁদের রচনা শুরু করতেন।

৩১. নূর কুতুব আলমের মকতুব বর্গ নামে পরিচিত চিঠিগুলিতে স্নায়ু ও চক্র নিয়ন্ত্রণের যোগ অনুশীলনের কোনো উল্লেখ নেই। আল্লাহর প্রতি সুফি অনুরাগ, চরম সত্তায় তাঁর বিশ্বাস, পার্থিব জগতের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও ক্ষণস্থায়ী বস্তুর প্রতি তাঁর নিরাসক্তি এবং শরীয়ার সঙ্গে জড়িত নীতি ও প্রতিষ্ঠানের মতো বিশেষ ধরনের ধর্মীয় বিষয় তাদের আলোচনার বিষয়বস্তু হওয়ায় সুফি পদ্ধতি তাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

৩২. রাঢ়ের কুলীন ব্রাহ্মণদের উল্লেখকারী সর্বপ্রথম গ্রন্থ সম্ভবত রায়-মুকুট বৃহস্পতির পদ-চন্দ্রিকা। পূর্বোল্লিখিত, সুকুমার সেন কর্তৃক উদ্ধৃত ; মধ্যযুগের বাঙ্গলা ও বাঙ্গালী, পৃ. ১৩। কুলীনপ্রথা নিশ্চয় পঞ্চদশ শতাব্দীর আগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

৩৩. এস. বি. দাশগুপ্ত : অবসকিউর রিলিজিয়াস কাল্টস, পৃ. ৫৪-৫৬।

৩৪. আমরা এখানে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ চতুর্থাংশে রচিত বিজয় গুপ্তের মনসা-মঙ্গল এবং বিপ্রদাসের মনসা-বিজয়ের এবং ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত শেখ ফয়জুল্লাহর গোরখ বিজয় ও সত্যপীর এবং কবি কঙ্কনের চন্ডী মঙ্গলের উল্লেখ করতে পারি। সত্যপীর ছাড়া অন্য ধর্মীয় কাব্যগুলি ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থপঞ্জি দেখুন; সত্যপীর থেকে উদ্ধৃতির জন্য দেখুন ই. হক ;পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৮৯।

৩৫. পি. এ. এস. বি. ১৮৭০, পৃ. ১২১।

৩৬. জফির খানের ত্রিবেণী মসজিদ লিপি, ৬৯৮ হিজরি/১২৯৮ খ্রিস্টাব্দ। ব্লখম্যান কর্তৃক উদ্ধৃত, জে. এ. এস. বি. XXXIX, I, ১৮৭০, পৃ. ২৮৬; তুলনীয় এ. এইচ. দানী ঃ পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৬ এবং এম. আহমদ ঃ পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১৯-২০।

৩৭. আমরা এ প্রসঙ্গে কামরূপ, ত্রিপুরা এবং অহোম রাজ্যের খেন এবং কোচ বংশের কথা উল্লেখ করতে পারি। এরা সবাই তিব্বতীয়-বর্মী জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি। মিনহাজ ও উত্তর বাংলায় বসবাসকারী কোচ, মেচ এবং থারুদের দেখেছিলেন। তবকাত-ই-নাসিরী, পৃ. ১৫২ ও ১৫৬। উপজাতীয় নেতার ধর্মান্তরণ সমগ্র উপজাতিকে ধর্মান্তরণের পথে নিয়ে গিয়ে থাকতে পারে।

৩৮. ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদের ৫ম পর্বে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

৩৯. এ. বি. এম. হাবিবুল্লাহ্ কর্তৃক উদ্ধৃত, পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৩৪০।

৪০. এস. বি. দাশগুপ্ত ঃ শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ, পৃ. ১১৩ ও পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহ।

৪১. পাণ্ডুয়ার মসজিদের অভ্যন্তরীণ নকশার জন্য দেখুন জে. এ. এস. বি. ১৮৭০। XXXIX, ১ম খণ্ড, প্লেট VIII এবং IXI পাণ্ডুয়া মসজিদের আদর্শে আদিনা মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছিল বলে পি. ব্রাউনের অভিমত প্রথমোক্ত ইমারতের অনুমিত চতুষ্কোণী নকশার উপর প্রতিষ্ঠিত। পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৩৬। আদিনা মসজিদের আঙ্গিনা তিনদিকে Arcaded cloister দ্বারা ঘেরা এবং এর প্রার্থনাকক্ষের (Sanctuary) একটি সুস্পষ্ট কেন্দ্রীয় মূলকক্ষ (Nave) এবং সুন্দর নকশাযুক্ত পার্শ্ববর্ধিত অংশ (Side Wing) রয়েছে। কিন্তু ছোট পাণ্ডুয়ার মসজিদে এ বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। এর নকশা জাফর খান গাজীর মসজিদের নকশার অনুরূপ।

৪২. গুজরাটের সারখেজের দরিয়া খানের স্কুইঞ্চ (Sqninch) বিশিষ্ট সমাধির সময়কাল পি. ব্রাউন প্রাক-মোগল যুগে নির্ধারণ করেছেন। প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪। কিন্তু বিশুদ্ধ খিলান (Arcuate) পদ্ধতি এবং ধূসর গ্রানাইট পাথরের পরিবর্তে ইটের ব্যবহার এ ইমারতের বৈশিষ্ট্য। যা এটাকে মোগল যুগে নির্মিত বলে নির্দেশ করে।

৪৩. ফার্গুসনের হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়ান অ্যান্ড ইস্টার্ন আর্কিটেকচারের ২য় খণ্ডের ১৪৫ পৃষ্ঠায় ৩৪৪নং কাঠ খোদাই ছবির গঙ্গেশ্বরের মন্দিরের প্রস্থচ্ছেদের (Cross-section) সঙ্গে

২৩১-৩৩ পৃষ্ঠায় ৩৮৭, ৩৮৯ এবং ৩৯০ নং কাঠ খোদাইগুলিতে আহমেদাবাদের মসজিদগুলির উচ্চতার ব্যাখ্যা তুলনীয়।

৪৪. পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৫২-৫৩ এবং ৫৯।

৪৫. মার্শাল ঃ কেম্ব্রিজ হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া, ৩য় খণ্ড, ৬০২ পৃষ্ঠা। তুলনীয়, এ. এইচ. দানী; মুসলিম আর্কিটেকচার ইন বেঙ্গল, পৃ. ৫৮ এবং ৬০।

৪৬. ক্রেসওয়েল ঃ এ শর্ট অ্যাকাউন্ট অফ আর্লি মুসলিম আর্কিটেকচার, পৃ. ১২-১৪।

৪৭. আবিদ আলী ঃ পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১৫১; দানী ঃ মুসলিম আর্কিটেকচার, প্লেট LV, নং ৮০।

৪৮. এ পরামর্শের জন্য আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের ডঃ এম. এস. ইসলামের কাছে কৃতজ্ঞ।

৪৯. ব্রাউন ঃ পূর্বোল্লিখিত, প্লেট XXX, XXXI, চিত্র ২ এবং প্লেট XXXII।

৫০. প্রাগুক্ত, প্লেট XXXII, চিত্র ১।

৫১. ও, ম্যালী এ মত গ্রহণ করেছেন; বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার্স, হুগলী, পৃ. ২৯৮ এবং পি. ব্রাউন ঃ পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৩৭। পরিমাপের জন্য দেখুন কানিংহাম ঃ এ. এস. আই XV, পৃ. ১২৬ ; দানী ঃ মুসলিম আর্কিটেকচার, পৃ. ৪৬।

৫২. জরকুরঘনের মিনার আদিতে খ্রিস্টিয় দশম বা একাদশ শতাব্দীতে নির্মিত হয়েছিল। এ. বি. এম. হাবিবুল্লাহ্ ঃ পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৩৫৯।

৫৩. জে. এ. এস. বি. ১৮৭৪, XXXIX, ১ম খণ্ড, প্লেট XI। বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দেখুন কানিংহাম ঃ পূর্বোল্লিখিত, XV, পৃ. ১২৫; বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার্স, হুগলী, পৃ. ২৯৭-৯৮; ব্রাউন ঃ পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৩৬-৩৭ এবং দানী ঃ মুসলিম আর্কিটেকচার, পৃ. ৪৬ ও ৪৮।

৫৪. বিস্তারিত বর্ণনা ও চিত্রের জন্য দেখুন আঁদ্রে মারিল ও গ্যাস্টন উইত ঃ লো মিনারে দো জ্যাম; এ. বি. এম. হাবিবুল্লাহ ঃ পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৩৫৯-৬০ এবং প্লেট I ও IV। "নোটস অন টু ইন্দো-মুসলিম মনুমেন্টস" শীর্ষক এক প্রবন্ধে (ডঃ শহীদুল্লাহ প্রেজেন্টেশন ভলিউ্যমে প্রকাশিতব্য) আমি এ বিষয়টি আলোচনা করেছি।

৫৫. বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দেখুন কানিংহাম ঃ পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৫৮-৫৯; ফার্গুসন ঃ পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ২৫৯-৬০; আবিদ আলী ঃ পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৫২-৫৫; ব্রাউন ঃ পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৪২, প্লেট CIX, চিত্র I; দানী ঃ পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১১৩-১৫, প্লেট XVII; এ. বি. এম. হোসেন ঃ "এ স্টাডি অফ দি ফিরোজা মিনার অ্যাট গৌড়", জে. এ. এস. পি. ১৯৬৩, ৮ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা, পৃ. ৫৩ ও পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহ।

৫৬. ইলিয়াস শাহের একটি স্বর্ণমুদ্রা যাতে "সিকান্দর-উস-সানী" বা "দ্বিতীয় আলেকজান্ডার" (নং ২৩ ক, রাইট ঃ ক্যাটালগ, ২য় খণ্ড, ২য় অংশ) উপাধি রয়েছে সেটি মনে হয় সুলতানের এ উপাধি ধারণ উপলক্ষে জারি করা হয়েছিল। জৌনপুরের একাংশ অধিকারকে লক্ষণীয় করে তুলে জালালউদ্দীন মোহাম্মদ শাহ মনে হয় একটি স্বর্ণমুদ্রা

জারি করেছিলেন যার দু'পিঠেই তুঘরা অক্ষরে লেখা দেখা যায় (লেনপুলের ক্যাটালগের ৮১ নং)। শামসউদ্দীন মোজাফফরের ৮৯৬ হিজরির স্বর্ণমুদ্রাটি (হাকিম হাবিবুর রহমান সংগ্রহের ১১৯নং) সম্ভবত তাঁর সিংহাসনারোহণ উদ্‌যাপন করা উপলক্ষে উৎকীর্ণ করা হয়েছিল। ঐ তারিখটি ছিল তাঁর রাজত্বের প্রথম বছর। হোসেন শাহের একই ধরনের একটি মুদ্রা (রাইটের ক্যাটালগের ২য় খণ্ডের ১৬৭ নং এবং লেনপুলের ক্যাটালগের ১০৮ নং) তার অস্বাভাবিক ১৭৬.৪ গ্রেন ওজনের জন্য তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। একই সুলতানের ৯১৯ হিজরির "কামরু ও কামতা এবং জাজনগর ও উড়িষ্যা বিজয়ের" উল্লেখকারী অপর একটি স্বর্ণমুদ্রা (লেনপুলের ক্যাটালগের ১২২নং) সম্ভবত স্মারক মুদ্রা ছিল।

৫৭. এন. কে. ভট্টশালী : কয়েন্স অ্যান্ড ক্রনোলজি অফ দি ইন্ডিপেন্ডেন্ট সুলতানস অফ বেঙ্গল, পৃ. ১৪৪ এ. বি. এম. হাবিবুল্লাহ : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ২৯১।

৫৮. একটি মুদ্রার তারিখ ১৯শে সফর, ৬১৬ হিজরি, জে. এ. এস. বি. ১৯২৯, নিউমিসম্যাটিক সাপ্লিমেন্ট, পৃ. ২৭। ৬১৭ বা ৬১৯ হিজরির একটি মুদ্রায় রবি-উস-সানির উল্লেখ রয়েছে, জে. আর. এ. এস. ১৮৭২-৭৩, পৃ. ৩৫৬, নং ৬ ক; রাইট : ক্যাটালগ, ২য় খণ্ড, ২য় অংশ, পৃ. ১৪৫, নং ১। ইওয়াজ খলজীর কিছু কিছু মুদ্রার তারিখ হচ্ছে ২০শে রবি-উস-সানি, ৬২০ এবং জমাদি-উস-সানি, ৬২১। জে. এ. এস. বি. ১৮৮১, পৃ. ৫৭; রাইট : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১৪৫, নং ৩, প্লেট I।

৫৯. এ. করিম : কর্পাস অফ দি মুসলিম কয়েন্স অফ বেঙ্গল, পৃ. ১৬৬ ও পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহ।

৬০. টমাস : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১০৭, নং ৯০ এবং রাইট : কয়েন্স অ্যান্ড মেট্রোলজি অফ দি সুলতানস অফ দিল্লি, পৃ. ৪১, ১৬১ খ।

৬১. "বেঙ্গলস রিলেশন্স উইথ হার নেইবারস" প্রবন্ধে আলোচিত, পূর্বোল্লিখিত।

৬২. প্রাগুক্ত।

৬৩. রাইট : কয়েনেজ অ্যান্ড মেট্রোলজি, নং ৪৯ কে-৫০ বি; জে. আর. এ. এস. ১৮৭২-৭৩, পৃ. ৩৫৯-৬১, নং ৮-১১। পূর্ববর্তী ৫৮নং টীকায় বর্ণিত ইওয়াজের মুদ্রার সঙ্গে এ মুদ্রাগুলি তুলনীয়। তুলনীয়, এ. বি. এম. হাবিবুল্লাহ : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ২৮৭।

৬৪. টমাস : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৩২১, নং ১ ক; রাইট : ক্যাটালগ, ২য় খণ্ড, ২য় অংশ, পৃ. ২০৮, নং ১, পৃ. ২১৬, নং ১১০; লেনপুল : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৯৫, নং ২৬৩।

৬৫. লেনপুল : পূর্বোল্লিখিত, নং ৮১ এবং ৮৩।

৬৬. এ গোটা প্রশ্নটিই "বেঙ্গলস রিলেশন্স উইথ হার নেইবারস" শীর্ষক প্রবন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা করা হয়েছে। পূর্বোল্লিখিত।

৬৭. নীহার রঞ্জন রায় : বাঙ্গালীর ইতিহাস, পৃ. ১৯৯।

৬৮. হেনরি পিরেন : ইকনমিক অ্যান্ড সোসাল হিস্ট্রি অফ মিডিয়েভাল ইউরোপ, পৃ. ১৫ ও পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহ; মিডিয়েভাল সিটিজ, পৃ. ৫৫ ও পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহ।

৬৯. মিনহাজ : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১৪৯; অনুবাদ পৃ. ৫৫৬।

৭০. মুদ্রাতাত্ত্বিক উৎস থেকে আমরা লক্ষ্ণৌতি, সোনারগাঁও, গিয়াসপুর, ফিরুজাবাদ, শহর-ই-নও, মোয়াজ্জামাবাদ, চাওলিস্তান (?) উরফ কামরূ, জন্নাতাবাদ, চাটগাঁও, ফতহাবাদ, মোহাম্মদাবাদ, সুবর্ণগ্রাম (সোনারগাঁও রূপে চিহ্নিত), চাটিগ্রাম (চট্টগ্রামরূপে চিহ্নিত), পাণ্ডুনগর (পাণ্ডুয়া বা ফিরুজাবাদরূপে পরীক্ষামূলকভাবে চিহ্নিত), রোতাসপুর, মাহমুদাবাদ, বারবকাবাদ, মোজাফফরাবাদ, হোসেনাবাদ, চন্দ্রাবাদ (?) নসরতাবাদ, খলিফাতাবাদ প্রভৃতির নাম পাই। মুদ্রার প্রাসঙ্গিক তালিকা ছাড়াও দেখুন ই. টমাস ঃ "অন দি ইনিশিয়াল কয়েনেজ অফ বেঙ্গল", জে. এ. এস. বি. ১৮৬৭, পৃ. ১ ও পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহ; মীরজাহান ঃ "মিন্ট টাউনস অফ মিডিয়েভাল বেঙ্গল", পি. পি. এইচ. সি. ১৯৫৩, পৃ. ২২৪ ও পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহ; এ. করিম ঃ কর্পাস, পৃ. ১৫৭ ও পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহ; পরবর্তী তৃতীয় পরিচ্ছেদের প্রদেশের নাম সম্পর্কিত অধ্যায়।

৭১. ডেনভারস ঃ দি পর্তুগিজ ইন ইন্ডিয়া, ১ম খণ্ড, পৃ.৭৭; হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৫৩।

৭২. বার্বোসা ঃ দি বুক অফ ডুয়ার্টে বার্বোসা, ২য় খণ্ড, পৃ.৩।

৭৩. জে. বি. হ্যারিসন ঃ "ফাইভ পর্তুগিজ হিস্টোরিয়ানস", হিস্টোরিয়ানস অফ ইন্ডিয়া, পাকিস্তান অ্যান্ড সিলোন, পৃ. ১৬৫।

৭৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৬।

৭৫. জে. জে. এ. ক্যাম্পোস ঃ হিস্ট্রি অফ দি পর্তুগিজ ইন বেঙ্গল, পৃ. ২৫।

৭৬. হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৫২।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হোসেন শাহী রাজবংশ

(১৪৯৪-১৫৩৮)

শেষ হাবশী শাসক মুজাফফর শাহের অপকীর্তি দ্বারা ইতিপূর্বে তিমিরাচ্ছন্ন বাংলার ইতিহাসের পাতায় প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে বাংলায় শাসনকারী হোসেন শাহী রাজবংশ দীপ্তি ছড়িয়েছিল। সাধারণভাবে হাবশী শাসন দেশের মঙ্গলের পক্ষে মোটেই উপযোগী ছিল না কারণ নিত্য রাজনৈতিক হত্যা, পুনঃ পুনঃ শাসক পরিবর্তন এবং কুশাসন ও অত্যাচারের ফলে দেশ অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলায় ভরে গিয়েছিল। একটি স্থিতিশীল সরকার প্রতিষ্ঠা করে এবং চারদিকে সীমান্তের বিস্তৃতি ঘটিয়ে হোসেন শাহীরা দেশে শান্তি ও উন্নতি ফিরিয়ে এনে বাংলার ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায়ের সংযোজন করেছিলেন বলে মনে হয়। উপরন্তু, কিছু সামাজিক আন্দোলনও এ যুগকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছিল। এর প্রতিষ্ঠাতা আলাউদ্দীন হোসেন শাহের বিশেষ উল্লেখপূর্বক এ প্রথিতযশা রাজবংশের রাজনৈতিক ইতিহাস মনোযোগ সহকারে পরীক্ষা করা এখানে প্রয়োজন। তাদেরকে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা প্রদানের জন্য বাংলার জনগণ তাঁর কাছে ঋণী।

তাঁর জীবনের অগ্রগতি সম্পর্কিত খণ্ডিত জীবনচরিত এবং কাল্পনিক কাহিনী স্পষ্টভাবে এটাই নির্দেশ করে যে জীবনের প্রায় প্রথম দিকেই তিনি বাংলার সংস্পর্শে এসেছিলেন। হাবশী সরকারের সঙ্গে হোসেন কিভাবে যুক্ত হয়েছিলেন তা স্পষ্টভাবে জানা যায় না। সেলিম এবং ফিরিশতা দু'জনই মনে করেন যে তিনি শামসউদ্দীন মুজাফফর শাহের অধীনে ওয়াজীর পদে আসীন ছিলেন।[১] নিজামউদ্দীনের মতানুসারে তিনি ছিলেন মুজাফফর শাহের একজন সিপাহি বা সাধারণ সৈনিক।[২] এ ধারণা যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয় না। অভিজাত সম্প্রদায় এবং সেনাপ্রধানগণ এমন একজন নিম্নমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিকে তাঁদের শাসক হিসেবে নির্বাচিত করতেন না। কাজেই এটা মনে করা খুবই যুক্তিসঙ্গত যে শেষ হাবশী সুলতানের অধীনে তিনি কোনো কর্তৃত্ব ও দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সেলিমের মতে তিনি শুধু ওয়াজীরই ছিলেন না, মুজাফফর শাহের সরকারের কাজ-কর্মের পরিচালকও ছিলেন তিনি।[৩] মুজাফফর শাহের অধীনে তিনি কতখানি শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলেন ফিরিশতার বিবরণ থেকে তা লক্ষ্য করা যায়।[৪] আমরা যদি মনে করি যে, হোসেন শাহ জীবনের প্রথম ভাগে মুজাফফর শাহের একজন সাধারণ সৈনিক ছিলেন এবং সে সাধারণ অবস্থা থেকে পর্যায়ক্রমে তিনি মন্ত্রীপদে উন্নীত হয়েছিলেন তাহলে নিজামউদ্দীনের ধারণা আংশিকভাবে সত্য হতে পারে। কিন্তু এ অনুমানকে সমর্থন করার মতো কোনো তথ্য

পাওয়া যায় না। রিয়াজের উপর নির্ভর করলে বলা যায় যে, রাঢ়ের কাজীর কন্যাকে হোসেন বিয়ে করেছিলেন এবং তাঁর অনুরোধেই হোসেন সরাসরি সুলতানের মন্ত্রীপদে নিযুক্ত হয়েছিলেন।[৫]

মুজাফফর শাহের মন্ত্রী হিসেবে হোসেনের কার্যাবলির উল্লেখ এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। নিজের মনের উচ্চাশা পূরণের মতো বুদ্ধি ও বিচক্ষণতা তাঁর ছিল। তাঁর উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য তিনি যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন সেগুলি নিশ্চিতভাবেই ছিল তাঁর রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকের পক্ষে হানিকর। হোসেন সৈন্যদের বেতন কমিয়ে দেন এবং বল প্রয়োগপূর্বক রাজস্ব আদায় করেন।[৬] মন্ত্রী, মুজাফফর শাহের উপর নিজের কর্তৃত্ব লাভের উদ্দেশ্যে রাজকীয় ক্ষমতাকে দুর্বল করতে চেয়েছিলেন। ন্যায়সঙ্গতভাবেই এটা অনুমান করা যায় যে এসব অপ্রিয় কার্য ছিল তাঁর পূর্ব-ধারণাকৃত পরিকল্পনার ফল। পরিস্থিতির চাহিদা অনুযায়ী স্বাধীনভাবে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা বা সংকল্পের দৃঢ়তা কোনোটাই মুজাফফর শাহের ছিল না। বিচক্ষণ মন্ত্রী, মুজাফফর শাহ একজন কৃপণ, অশিষ্ট এবং অর্থলিপ্সু শাসক এবং তিনি নিয়তই তাঁকে সংশোধন করার চেষ্টা করেছেন—বহু উপলক্ষেই জনগণকে এ ধরনের কথা বলার পর্যায়ে পৌছেছিলেন।[৭] সম্ভবত তিনি যুগপৎ নিজের প্রতিপত্তি লাভ ও প্রভুর কবর খোঁড়ার ক্ষেত্র তৈরি করছিলেন। হোসেনের বিচক্ষণ ও পরিকল্পিত নীতি আশানুরূপ ফলদান করেছিল। নেতৃস্থানীয় অভিজাতবর্গ ও সেনাপ্রধানদের মধ্যে এটা শাসনকারী কর্তৃপক্ষের প্রতি একটা প্রচণ্ড বিরোধিতার সৃষ্টি করে যা শেষপর্যন্ত সুলতানের সমর্থক এবং অসন্তুষ্ট অভিজাতদের মধ্যে এক রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধেরও সূচনা করে। মন্ত্রী এ সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন এবং তিনি সতর্কতার সঙ্গে অভিজাতদের সঙ্গে যোগদান করেন। দলীয় নেতৃত্ব গ্রহণ করে তিনি গৌড় দুর্গ অবরোধ করেন। এ দুর্গের প্রাচীরাভ্যন্তরে কিছু সৈন্য ও সমর্থক নিয়ে মুজাফফর শাহ নিজেকে অন্তরীণ রেখেছিলেন।[৮] এ সঙ্কটপূর্ণ সন্ধিক্ষণে হোসেন যে ভূমিকা পালন করেছিলেন সেটা তাঁর উচ্চাভিলাষী নীতির সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ বলেই প্রতীয়মান হয়।

মুজাফফরের মৃত্যু নিয়ে ঘটনাপঞ্জি রচয়িতাদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। তবকাত-ই-আকবরীর মতানুসারে প্রাসাদরক্ষী বাহিনীর অধিনায়ককে নিজ দলে টেনে এনে হোসেন একরাতে সুলতানের হারেমে প্রবেশ করে গোপনে তাঁকে হত্যা করেন।[৯] এ মত যে শুধুমাত্র জোয়াও দ্য ব্যারোসই[১০] সমর্থন করেছেন তা নয়। ফিরিশতা যার লেখার উল্লেখ করেছেন তেমন আরও একজন লেখক, হাজী মোহাম্মদ কান্দাহারীও এ মত সমর্থন করেছেন। ফিরিশতা কান্দাহারীর মত গ্রহণ করেননি, সেলিমও তবকাতের উপর আস্থা স্থাপন করেন নি। তাঁদের মতে হতভাগ্য সুলতান যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হয়েছিলেন।[১১] সেলিম এবং ফিরিশতা তাঁদের তথ্যের উৎস উল্লেখ করেন নি। সেলিম, মনে হয়, সম্পূর্ণভাবে ফিরিশতার উপর নির্ভর করেছেন এবং তাঁর বিবরণ প্রায় সম্পূর্ণভাবে পুনঃবর্ণনা করেছেন। কিন্তু মুজাফফরের মৃত্যু সম্পর্কে নিজামউদ্দীনের বক্তব্যের চেয়ে অগ্রাধিকার দিয়ে তাঁদের ভাষ্য কেউই গ্রহণ করতে পারেন না। আমরা

ইতিপূর্বেই দেখেছি যে নিজামউদ্দীনের ভাষ্য ফিরিশতার পূর্ববর্তী অন্য উৎসগুলিতে সমর্থিত হয়েছে। নিজামউদ্দীনের মত এ কারণেই গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় যে এটা মুজাফফরের প্রতি হোসেনের মনোভাবের পূর্বাপর সঙ্গতি প্রকাশ করে।

সুতরাং এটা মোটামুটি নিশ্চিত মনে হয় যে, মুজাফফরের মর্মান্তিক মৃত্যুর পিছনে হোসেনের যথেষ্ট অবদান ছিল। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে কলঙ্কজনক হাবশী শাসনের চূড়ান্ত পরিসমাপ্তি ঘটে। এ ঘটনা মধ্যযুগের বাংলার ইতিহাসে এক উজ্জ্বল অধ্যায়ের সূচনা করেছিল। হোসেনের ওয়াজীরাতের সঙ্গে জড়িত ঘৃণ্য কার্যাবলি ছিল এর এক দুর্ভাগ্যজনক প্রস্তাবনা। মুজাফফরের হত্যার অর্থ এই নয় যে, হোসেন স্বতস্ফলভাবে গৌড়ের সিংহাসনে বসতে পেরেছিলেন। মুজাফফরের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে নেতৃস্থানীয় অভিজাতগণ এক মন্ত্রণাসভায় আনুষ্ঠানিকভাবে মিলিত হয়ে হোসেনকে সুলতান নির্বাচিত করেছিলেন। প্রতিদানে হোসেন শহরে জ্ঞাত ধন-সম্পদ যা পাওয়া যাবে সব তাঁদেরকে দেবার অঙ্গীকার করে এসব লোকদের প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলেন। এরপর গৌড় শহর লুণ্ঠন শুরু হয়। হোসেন অবশ্য পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ার আগেই ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তা আয়ত্তে আনেন। অবিশ্বস্ত পাইকদের এবং উদ্ধত আবিসিনীয়দের কর্মচ্যুত গৌড় থেকে একডালায় রাজধানী স্থানান্তর, জেলাগুলিতে দক্ষ কর্মকর্তা নিয়োগ এবং সব রাষ্ট্রদ্রোহী লোকদের হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করে সুলতান তাঁর রাজত্ব শুরু করেন।[১২] নতুন প্রতিষ্ঠিত শাসন ব্যবস্থার স্থিতিশীলতার জন্য এসব ব্যবস্থা প্রয়োজনীয় ছিল বলে মনে হয়।

মুজাফফরের মৃত্যুর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অবস্থা এটাই নির্দেশ করে যে, অভিজাতদের একটি প্রভাবশালী চক্র হোসেনকে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করেছিল। বারবক শাহ তাঁর রাজত্বকালের প্রথমভাগে যথেষ্ট সংখ্যক হাবশী সৈন্য ও প্রাসাদ-প্রহরী সংগ্রহ করেছিলেন। সক্রিয় সমর্থনের জন্য অটোমান এবং আব্বাসীয় শাসকরা যে জানিজারি বা মমলুক অনুচরদের উপর নির্ভর করতে চেয়েছিলেন তাদের সঙ্গে এদের তুলনা করা যেতে পারে। স্বল্পকালের মধ্যেই আবিসিনীয় ক্রীতদাসরা রাষ্ট্রের উচ্চপদগুলি দখল করে নেয়[১৩], যার ফলে অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে তারা সবচেয়ে শক্তিশালী অংশ হয়ে দাঁড়ায়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে হাবশী সৈন্যদের ক্ষমতা ও প্রভাব সীমিত করার উদ্দেশ্যে ফতেহ্ শাহ্‌র কঠোর প্রচেষ্টা তাঁর হত্যা এবং এরফলে ইলিয়াস শাহী রাজবংশের ধ্বংসের কারণ হয়েছিল। জবরদখলকারী হাবশীরা এদের স্থান পূরণ করেছিল।[১৪] এটা বুঝতে কষ্ট হয় না যে জনগোষ্ঠীর হাবশী অংশ হোসেনের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী তাদের জ্ঞাতি-সম্পর্কিত মুজাফফরকে মরিয়া হয়ে সমর্থন করেছিল। এ অবস্থার আলোকে বিবেচনা করলে হোসেনের প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস নীতি এবং আবিসিনীয়দের উপর নির্যাতন বোধগম্য হয়ে উঠে। প্রশাসনিক যন্ত্র থেকে হাবশী সৈন্যদের সম্পূর্ণভাবে উচ্ছেদ নিশ্চিতভাবেই শূন্যতার সৃষ্টি করেছিল যা নতুন শাসককে স্থানীয় অধিবাসীদের দিয়ে পূরণ করতে হয়েছিল। এভাবেই বাঙালি হিন্দুদের গুরুত্বপূর্ণ পদে উন্নীত হওয়ার বিষয়টি সন্তোষজনকভাবে ব্যাখ্যা করা যায়।

মুজাফফর শাহের পাণ্ডুয়ালিপির তারিখ হচ্ছে ১৭ই রমজান, ৮৯৮ হিজরি/২রা জুলাই, ১৪৯৩ খ্রিস্টাব্দ[১৫] এবং হোসেন শাহের সর্বপ্রথম মুদ্রাগুলির সবক'টির তারিখ হচ্ছে ৮৯৯ হিজরি/১৪৯৪ খ্রিস্টাব্দ।[১৬] সুতরাং এটা তর্কাতীতভাবে প্রতিষ্ঠিত যে, ১৪৯৪ খ্রিস্টাব্দ হচ্ছে হোসেন শাহের রাজত্বের প্রথম বছর। মনে হয় ঐ বছরের প্রথম ভাগে মুজাফফর জীবিত ছিলেন।

হোসেন শাহের রাজত্বকালে চারিদিকে বাংলা রাজ্যের আঞ্চলিক বিস্তৃতি লক্ষ্য করা যায়। এটা সাহিত্যিক, লিপিগত এবং মুদ্রাতাত্ত্বিক উৎসের সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত। এসব উৎস থেকে সংগৃহীত হোসেনের দুঃসাহসিক কার্যাবলিকে পাঁচটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়; (ক) বিহারে যুদ্ধজয়, (খ) কামরূপ ও আসামের সঙ্গে যুদ্ধ, (গ) উড়িষ্যার সঙ্গে যুদ্ধ, (ঘ) ত্রিপুরার সঙ্গে যুদ্ধ এবং (ঙ) চট্টগ্রাম অধিকার।

লোদী সুলতানরা শর্কিদের জৌনপুর রাজ্য গ্রাস করে নিচ্ছিলেন। ১৪৯৪ খ্রিস্টাব্দে সিকান্দর লোদীর হাতে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়ে শেষ শর্কি সুলতান হোসেন শাহ তাঁর একনামা গৌড়ীয় শাসক আলাউদ্দীন হোসেন শাহের কাছে আশ্রয় লাভের উদ্দেশ্যে বাংলায় যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। পূর্ণ সম্মান ও মহানুভবতার সঙ্গে হোসেন শাহ তাঁকে গ্রহণ করেছিলেন এবং ভাগলপুরের কহলগাঁওয়ে তাঁর বাসভবনে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত অবস্থায় শর্কি সুলতান মৃত্যুবরণ করা পর্যন্ত তিনি তাঁর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি যথাযোগ্য দৃষ্টি রেখেছিলেন।[১৭] শর্কি রাজ্যের সঙ্গে হোসেনের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক দিল্লি সুলতানাতের প্রতি তাঁর মনোভাব প্রকাশ করে। অবিলম্বে বাংলায় এক অভিযান পাঠিয়ে সিকান্দর লোদী এ পরিস্থিতির প্রতি তাঁর মনোভাব প্রকাশ করেছিলেন। বর-এ দিল্লি বাহিনীর সম্মুখীন হওয়ার জন্য হোসেন শাহ তাঁর পুত্র দানিয়ালের নেতৃত্বে এক সৈন্যবাহিনী পাঠিয়েছিলেন। সে বছর বিহারে খাদ্যাভাবের দরুণ লোদী সুলতানের সৈন্যবাহিনী প্রয়োজনীয় সরবরাহের অভাবের সম্মুখীন হয়েছিল বলে বদাউনী উল্লেখ করেছেন। সম্ভবত এটা একটা কারণ যে জন্য সিকান্দর বাংলার সুলতানের সঙ্গে শান্তি-চুক্তি সম্পাদন করতে ইচ্ছুক হয়েছিলেন। সন্ধির শর্তানুযায়ী উভয়পক্ষই একে অপরকে আক্রমণ করা থেকে বিরত থাকতে এবং একে অপরের শত্রুকে আশ্রয় না দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সিকান্দর বিহার, তুঘলকপুর এবং সরণে গভর্নর নিযুক্ত করেন।[১৮] সুতরাং ফার্সি উৎসগুলি থেকে আমরা জানতে পারি যে, লোদী সুলতান শর্কি রাজ্যের প্রায় সবটাই দখল করে নিয়েছিলেন। কিন্তু লিপিগত উৎসগুলির বিবরণ ভিন্নতর। সরণ ও মুঙ্গেরে প্রাপ্ত লিপিগুলি[১৯] প্রমাণ করে যে সম্পূর্ণ উত্তর বিহার ও দক্ষিণ বিহারের এক অংশ হোসেন শাহী বাংলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। বিহারে বাংলার সুলতানের আধিপত্য সম্পর্কে পরস্পরবিরোধী তথ্যগুলির সমন্বয় সাধন করা প্রয়োজন। সম্ভবত এ জায়গাগুলি হোসেন শাহ সত্যিই দখল করেছিলেন; কিন্তু এ ঘটনা ফার্সি গ্রন্থকারগণ হয় গোপন নয় উপেক্ষা করেছেন। আবার এটাও সম্ভব যে, হোসেনের সঙ্গে সন্ধিস্থাপনের পরপরই সিকান্দর এ স্থানগুলি দখল করে নিয়েছিলেন; সিকান্দরের অঞ্চল দখল করে হোসেন পরবর্তীকালে তাঁর রাজ্য সম্প্রসারিত করেছিলেন। সুতরাং এ সন্ধি বিহারে হোসেনের

রাজনৈতিক অবস্থার কোনো ক্ষতি করে নি। এ সন্ধির শর্ত তিনি মেনেছিলেন বলেও মনে হয় না।

শেষ শর্কি সুলতান, আলাউদ্দীন হোসেন শাহের তথাকথিত মরণোত্তর মুদ্রাগুলি মনোযোগের সঙ্গে পরীক্ষা করলে একটি কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য প্রকাশ পায়। ১৪৯৪ খ্রিস্টাব্দে রাজ্যহারা হয়ে হোসেন কহলগাঁওয়ে আশ্রয় নিলেও তাঁর কিছু কিছু মুদ্রার তারিখ ৯০১ হিজরি/১৪৯৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৯১০ হিজরি/১৫০৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত।[২০] ইতিহাসের ছাত্রদের জন্য শাসনোত্তর এ মুদ্রাগুলি সমস্যার সৃষ্টি করেছে। লেন-পুলকে[২১] অনুসরণ করে রাইট[২২] ও স্ট্যাপলটন[২৩] "এ মুদ্রাগুলির কোনো কোনোটিকে মরণোত্তর বলে মনে করেন। এ মুদ্রাগুলি বাংলার হোসেন শাহ অথবা তাঁর প্রাদেশিক গভর্নরদের কেউ একজন বেনামীতে জারি করেছিলেন"—স্ট্যাপলটন এ ইঙ্গিতও করেছেন।[২৪] এ মতের পক্ষে স্পষ্ট কোনো সাক্ষ্য না থাকলেও অধিকাংশ পণ্ডিত মনে করেন যে, হোসেন শাহ শর্কি ৯০৫ হিজরি/১৪৯৯ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেছিলেন।[২৫] শর্কি সুলতানের ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের একজন, কুতবন, ৯০৯ হিজরি/১৫০৩ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃগাবত রচনা করেছিলেন। পরাজিত রাজার রাজকীয় গুণাবলির তিনি উচ্চপ্রশংসা করেছেন[২৬] এবং তিনি বিশ্বাস করতেন যে, রাজা আবার তাঁর হারানো রাজকীয় ছত্র বা ছাতা এবং সিংহাসন ফিরে পাবেন। আবার, এ সুলতানের শাসনোত্তর মুদ্রাগুলির মধ্যে সর্বশেষটির তারিখ হচ্ছে ৯১০ হিজরি/১৫০৬ খ্রিস্টাব্দ। কাজেই মনে হয় যে, হোসেন শর্কি অন্ততপক্ষে ঐ বছর পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। শাসনোত্তর এ মুদ্রাগুলি শুধু শর্কি সুলতানদের প্রতিই নয়, দিল্লি সুলতানাতের প্রতিও বাংলার সুলতানের মনোভাব প্রকাশ করে। মনে হয় রাজনৈতিক স্বার্থপ্রণোদিত হয়ে বাংলার সুলতান মুকুটহীন রাজাকে মুদ্রা জারি করার অনুমতি দিয়েছিলেন যাতে শেষোক্তজন জৌনপুর রাজ্যের উপর তাঁর দাবি অব্যাহত রাখতে পারেন।[২৭] সম্ভবত বিহারে ও বাংলার পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে লোদী শাসকদের ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক প্রভাব রোধ করার জন্য এটা ছিল গৌড়-সুলতানের একটি উদ্যোগ।

কামরূপের সঙ্গে বাংলার শত্রুতার প্রকৃতি ছিল প্রথাগত। আলাউদ্দীন হোসেন শাহ বিশ্বস্ততার সঙ্গে এ রীতি অনুসরণ করে কামরূপের বিরুদ্ধে অনেকগুলি অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। সুলতানের মুদ্রা ও লিপিতে আমরা কামরূপ এবং কামতা-এ দু'টি স্থানের উল্লেখ দেখতে পাই। এ দু'টি অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে *বাহারিস্তান-ই-গায়েবী* যথেষ্ট আলোকপাত করেছে। বলা হয়েছে যে, কামরূপ ছিল ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিম তীর থেকে মনাস (মনসা) নদীর পূর্ব তীর পর্যন্ত বিস্তৃত এবং এ নদী এবং পশ্চিমে করতোয়া নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল ছিল কামতা নামে পরিচিত।[২৮] সেন রাজবংশের তৃতীয় শাসক নীলাম্বর পূর্বে বরনদী থেকে পশ্চিমে করতোয়া পর্যন্ত তাঁর ভূ-ভাগ বিস্তৃত করে এবং ঘোড়াঘাট ও কান্তাদুয়ারে তাঁর সদর দফতর এবং বাসস্থান স্থাপন করে। এ উভয় অঞ্চলকে তাঁর অধীনে এনেছিলেন বলে মনে হয়। মন্ত্রীর পুত্রকে নীলাম্বর নৃশংসভাবে হত্যা করেছিলেন এবং কথিত আছে যে, কামরূপ আক্রমণে

নীলাম্বরের মন্ত্রী হোসেনকে গোপনে সাহায্য করেছিলেন। প্রাথমিক পর্যায়ে খেন রাজধানী কামতাপুরে মুসলমান আক্রমণ তেমন বোধগম্যভাবে ফলপ্রসূ হয় নি। রাজধানী অবরোধ করা হয়। এ অবরোধ দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল এবং শেষপর্যন্ত মুসলমানরা কিছু সন্দেহজনক উপায় অবলম্বন করে রাজধানী দখল করতে সক্ষম হয়েছিল।[২৯] এভাবে খেন রাজবংশকে উৎখাত করা হয় এবং কামরূপ ও কামতা গৌড়রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

হোসেন শাহী সুলতানদের ও কামরূপের কোচ রাজাদের মুদ্রার কিছু বিষয়ে সাদৃশ্যের ভিত্তিতে স্ট্যাপলটন অনুমান করেছেন, "... হোসেন শাহী রাজবংশের একটি মুদ্রাকে নরনারায়ণ তাঁর নিজের মুদ্রার আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করার ঘটনাটি সম্ভবত এটাই নির্দেশ করে যে তাঁর পিতা বিশ্ব সিংহ আলাউদ্দীন ও তাঁর বংশধরদের করদরাজা ছিলেন।"[৩০] কিন্তু এ যুক্তি ঐতিহাসিক সমালোচনার পরীক্ষায় টিকে থাকার পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকল্পিত বলে মনে হয়। এটা সত্য যে, এক ধরনের হোসেন শাহী মুদ্রার সঙ্গে কিছু কোচ মুদ্রার সাদৃশ্য অত্যন্ত লক্ষণীয়। হোসেন শাহের সে নমুনার মুদ্রাগুলি নরনারায়ণ তাঁর আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন তার চারটি প্রতিনিধিত্বমূলক মুদ্রার তারিখ হচ্ছে ৯০০, ৯০৯, ৯১২ এবং ৯১৩ হিজরি। এগুলি ১৬১.৫ থেকে ১৬৪.৫ গ্রেন ওজন এবং ১.২´´ থেকে ১.২৫´´ আয়তন বিশিষ্ট। এ মুদ্রাগুলির প্রত্যেক পিঠে নিরেট দু'টি বৃত্ত পরিবেষ্টিত চার পংক্তি লিপি উৎকীর্ণ রয়েছে—দু'টি বৃত্তের মধ্যে আছে বিন্দু-গঠিত আর একটি বৃত্ত।[৩১] উল্লিখিত হোসেন শাহী মুদ্রার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ নরনারায়ণের মুদ্রাটির তারিখ হচ্ছে ১৪৭৭ শকাব্দ এবং এর ওজন হচ্ছে ১৫৭.৪৯ গ্রেন। এর দু'পিঠেই দু'টি বৃত্তের মাঝে ৪ পংক্তির উৎকীর্ণ লিপি রয়েছে—দু'টি বৃত্তের মাঝখানে রয়েছে বিন্দু-গঠিত আর একটি বৃত্ত।[৩২] বাংলার মুদ্রার সঙ্গে কোচ মুদ্রাগুলির সাদৃশ্যের প্রশ্নটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে বাতিল করা না গেলেও হোসেন শাহের সঙ্গে বিশ্বসিংহের কোনো করদ-সম্পর্ক ছিল—একথা অনুমান করার মতো যথেষ্ট কারণও নেই। তৎকালীন কামরূপের ইতিহাস আলোচনাকারী ফার্সি এবং আসামী উৎসগুলিতে কোচ-শাসকের সঙ্গে গৌড়-সুলতানদের অধীনস্থ তার সম্পর্ক অথবা তার সঙ্গে পরোক্ষ যোগাযোগের কোনো উল্লেখ নেই। আসাম, নেপাল, তিব্বত এবং আরাকানের মতো রাজ্যগুলিও সমসাময়িক বাংলার মুদ্রা অনুকরণ করেছিল, যদিও এগুলির একটিও বাংলার করদ-রাজ্য ছিল বলে জানা যায় না। আহোম রাজা সুক্লেনমুনের ১৪৬৫ শকাব্দ/১৫৪৩ খ্রিস্টাব্দের[৩৩] একটি মুদ্রা থেকে দেখা যায় যে, আহোম মুদ্রা ছিল নসরত এবং গিয়াসউদ্দীন মাহমুদের রাজত্বকালের এক ধরনের মুদ্রার আদর্শানুযায়ী তৈরি।[৩৪] নেপালের রাজা জয় মহেন্দ্র মল্ল (১৫৬৬-৭৬ খ্রিস্টাব্দ) তাঁর নিজের মুদ্রার[৩৫] মাঝখানে একটি ক্ষুদ্র বৃত্ত এবং প্রান্তে বিন্দু-সৃষ্ট একটি বৃত্ত গিয়াসউদ্দীন মাহমুদের[৩৬] দু'টি মুদ্রা থেকে নকল করেছিলেন বলে মনে হয়। এ ধরনের মুদ্রা তিব্বতেও প্রচলিত ছিল।[৩৭] একটি জয়ন্তীয়া মুদ্রার প্রধানদিকের প্রথম পংক্তির ডানদিকে তিনটি বিন্দু রয়েছে এবং তার উপরে রয়েছে একটি অর্ধচন্দ্র[৩৮] যা নসরতের একটি মুদ্রা বা গিয়াসউদ্দীনের

রাজত্বকালের তৎসদৃশ একটি মুদ্রার অনুকরণ বলে মনে হয়।[৩৯] পঞ্চদশ শতাব্দীর আরাকানের কোনো কোনো রাজা তাঁদের মুদ্রায় ফার্সি হরফে কলেমা উৎকীর্ণ করতেন।[৪০] কাজেই এটা মোটামুটি নিশ্চিত যে এসব দেশের মুদ্রার উপর বাংলার মুদ্রার প্রভাব ছিল। সুলতানদের মুদ্রা নিশ্চয়ই সন্নিহিত দেশগুলিতে গিয়েছিল। বাংলার সঙ্গে একই সীমানাযুক্ত দেশগুলির শাসকবৃন্দ মুদ্রা জারি করতে চাইলে তাঁরা মনে হয় পূর্ব-ভারতের স্থিতিশীল এবং প্রভাবশালী রাজনৈতিক শক্তি বাংলার মুদ্রার অনুকরণ করতে প্রলুব্ধ হতেন। কামরূপের কোচ রাজাদের মুদ্রা কেন এক শ্রেণীর হোসেন শাহী মুদ্রার আদর্শে নির্মিত হয়েছিল এ থেকে মনে হয় তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। আরও একটি ঐতিহাসিক ঘটনাকে অনুকরণের এ প্রবণতার কারণ রূপে নির্দেশ করা যেতে পারে। খেন রাজবংশের পতনের পর হোসেন শাহ্ ও তাঁর বংশধরগণ বেশ কিছুদিন পর্যন্ত কামরূপের উপর রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ বহাল রেখেছিলেন যার ফলে ঐ অঞ্চলের জনগণ মুসলমান শাসকদের প্রবর্তিত মুদ্রার সঙ্গে পরিচিত হয়ে পড়েছিল। বিশ্বসিংহের উত্তরাধিকারীগণ কামরূপে তাঁদের রাজনৈতিক শক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করার পর জনগণের অভিরুচিকে তাঁদের শাসনের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর উদ্দেশ্যে, মনে হয়, তাঁদের পূর্বসূরিদের মুদ্রার অনুকরণে মুদ্রা জারি করেছিলেন। এ মনস্তত্ত্ব মনে হয় তাঁদের নিজ নিজ মুদ্রায় নাগরি হরফ, সংস্কৃত বিশেষণ এবং এমনকি হিন্দু দেবী লক্ষ্মীর অমার্জিত প্রতিকৃতি রাখতে মোহাম্মদ বিন সাম, ইলতুৎমিশ, ১ম রুকনউদ্দীন ফিরূজ, রাজিয়া, মুইজউদ্দীন বাহরাম, আলাউদ্দীন মামুদ ও অন্যান্য মুসলমান সুলতানকে প্রণোদিত করেছিল।[৪১]

উত্তর ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা ধরে গৌড়ের বিজয়ী সৈন্যবাহিনী পূর্বদিকে অগ্রসর হয়েছিল। আলমগীরনামা অনুসারে পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্য দ্বারা গঠিত হোসেন শাহের সেনাবাহিনী আসামীদের সঙ্গে এক প্রারম্ভিক সংঘর্ষে বিজয়ী হয়। বাংলার বাহিনীকে প্রতিহত করতে ব্যর্থ হয়ে আসামের রাজা পাহাড়ে পশ্চাদপসরণ করেন এবং নিচের সমতল ভূমি মুসলমানরা দখল করে নেয়। ঐ অঞ্চলকে করায়ত্ত করার জন্য নিজ পুত্রকে সেখানে রেখে হোসেন শাহ্ বাংলায় ফিরে আসেন। বর্ষা শুরু হলে রাজা তাঁর অনুচরবৃন্দসহ পাহাড় থেকে নেমে এসে রাস্তা বন্ধ করে দেন এবং মুসলমানদের ঘিরে ফেলে সবাইকে বন্দি করেন।[৪২] 'ফতইয়া-ই-ইব্রিয়া'[৪৩] এবং রিয়াজ-উস-সালাতীনে[৪৪] আমরা এ বিবরণের হুবহু পুনরাবৃত্তি দেখতে পাই।

আহোম বুরুঞ্জীতে এ অভিযান সম্পর্কে বিস্তৃততর বিবরণ পাওয়া যায়। পদাতিক, অশ্বারোহী এবং নৌবহর সমন্বয়ে গঠিত মুসলিম সৈন্যবাহিনী 'মিতমালিক' এবং 'বড় উজির' এর নেতৃত্বে আসাম আক্রমণ করে। ব্রহ্মপুত্রের গতিপথ ধরে তারা দরং জেলা পর্যন্ত অগ্রসর হয় এবং অনতিবিলম্বে বুরাই নদীর তীরে পৌঁছে। তেমেনিতে তারা আহোম রাজার সৈন্যবাহিনী দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং মনে হয় এখানে বাংলার সৈন্যবাহিনী তাদের প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে প্রাথমিক বিজয় লাভ করে। মুসলিম সৈন্যবাহিনীর অধিনায়ক বড় উজির শেষপর্যন্ত পরাজিত হয়ে পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য

হন। মুসলমানদের আরো আক্রমণ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে আহোম রাজা তাঁর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দৃঢ় করেন। মিত মালিক ও বড় উজির পুনরায় শিঙ্গরিস্থ আহোম ফাঁড়ি আক্রমণ করলে সেখানে তাঁরা সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হন। মিত মালিকসহ বাংলার বেশ কিছুসংখ্যক সৈন্য যুদ্ধে নিহত হন এবং বড় উজির পালিয়ে আসতে সক্ষম হন।[৪৫]

গেইট এ ঘটনাকে হোসেন শাহের রাজত্বকালে আরোপ করতে চান না, কারণ তিনি মনে করেন যে এটা ঘটেছিল ১৫২৭ খ্রিস্টাব্দে।[৪৬] কিন্তু মূল বুরুঞ্জীর কোথাও এ তারিখের উল্লেখ নেই। এর অনুবাদকই এ তারিখ দিয়েছেন। এ ঘটনা যে হোসেন শাহের রাজত্বকালের সঙ্গে জড়িত সেটা যথেষ্ট সুপ্রতিষ্ঠিত বলে মনে হয়। উপরোল্লিখিত ঘটনার প্রসঙ্গক্রমে পুরানী আসাম বুরুঞ্জীতে[৪৭] হোসেনের নাম বাংলার খুফাং হিসেবে দেখা যায়। ত্রিপুরার সঙ্গে হোসেনের যুদ্ধের বিবরণ দিতে গিয়ে রাজমালা প্রসঙ্গক্রমে তাঁর আসাম সম্পর্কিত ঘটনাবলিরও উল্লেখ করেছে। কথিত আছে যে ত্রিপুরার রাজার কাছে পরাজিত হয়ে হোসেন "যুদ্ধে আসামী ও কোচ অধিবাসীরা আমার অনিষ্ট করেছে এবং ত্রিপুরার সৈন্যরাও আমাকে অপমান করেছে" বলে ক্রোধে চিৎকার করেছিলেন।[৪৮] আমাদের উদ্ধৃত ফার্সি উৎসগুলির সরবরাহকৃত তথ্যের সঙ্গে এ তথ্যগুলি মিলিয়ে দেখলে আসামে হোসেনের যুদ্ধ ও পরবর্তী পরাজয় সম্পর্কে সন্দেহের কোনো অবকাশ থাকে না। কাজেই বাংলার সুলতানের আসাম-অভিযান সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়, তবে তা কামরূপের উপর তাঁর আধিপত্যে কোনো প্রভাব ফেলেছিল বলে মনে হয় না। নসরত হাজোকে আহোমদের বিরুদ্ধে অভিযানের ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন বলে মনে হয়।

কামরূপ ও আসামের বিরুদ্ধে হোসেন শাহের অভিযানের তারিখগুলি যথাযথভাবে নিরূপণ করা হয় নি। কামরূপ ও আসামের প্রথম গভর্নর দানিয়াল[৪৯] ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দের আগে আসামে তাঁর নতুন পদে যোগ দিতে পারেন না, কারণ কমপক্ষে সে বছর পর্যন্ত তিনি ছিলেন মুঙ্গেরে। আবার ৯০৭ হিজরি/১৫০২ খ্রিস্টাব্দের হোসেন শাহের মালদহ লিপিতে সুলতানের কামরূপ ও কামতা বিজয়ের কথা লিপিবদ্ধ আছে।[৫০] এ সমস্ত কারণে কিছু পণ্ডিত কামরূপ ও কামতা বিজয়কে ১৪৯৪ থেকে ১৫০২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে স্থাপন করার পক্ষপাতী।[৫১] কিন্তু মনে হয় যে এ ধারণা তথ্যসমূহের অগভীর বিবেচনা-প্রসূত। ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দে দানিয়াল যে মুঙ্গেরে ছিলেন তা ৯০৪ হিজরি/১৪৯৭-৯৮ খ্রিস্টাব্দের মুঙ্গের লিপি থেকে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত। সে বছর তিনি পীর নফাহ্ এর মাজারের উপর একটি খিলান করা ছাদ নির্মাণ করেছিলেন।[৫২] কিন্তু ১৪৯৮ সালে কামরূপ অভিযান শুরু হয়েছিল এমন মনে করার কোনো কারণ নেই। "কামু ও কামতা এবং উড়িষ্যা ও জাজনগর বিজয়" লিপিবদ্ধকারী হোসেন শাহী মুদ্রাগুলির তারিখ হচ্ছে ৮৯৯ হিজরি/১৪৯৩ খ্রিস্টাব্দ, ৯১০/১৫০৪, ৯১৫/১৫০৯, ৯১৯/১৫১৩, ৯২১/১৫১৫, ৯২২/১৫১৬ এবং ৯২৪/১৫১৮।[৫৩]

কাজেই দেখা যায় যে, কামরূপ, কামতা এবং উড়িষ্যা বিজয় লিপিবদ্ধকারী সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ মুদ্রাগুলির তারিখ হচ্ছে যথাক্রমে ১৪৯৪ খ্রিস্টাব্দ ও ১৫১৮

খ্রিস্টাব্দ। স্পষ্টতভাবে ১৪৯৪ থেকে ১৫১৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত হোসেন শাহ্ এ দেশগুলির বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েছিলেন। কিন্তু কিছু সুস্পষ্ট কারণে এ প্রস্তাব নিঃশর্তভাবে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। অভিযান যে ১৪৯৪ খ্রিস্টাব্দে শুরু হয়েছিল তা মনে হয় সুপ্রতিষ্ঠিত। কারণ ঐ তারিখ সংবলিত মুদ্রায়ই প্রথমবারের মতো কামরূপ ও কামতা বিজয় সম্পর্কিত লিপি উৎকীর্ণ দেখা যায়। ১৪৯৪ খ্রিস্টাব্দ হোসেন শাহের রাজত্বের প্রথম বছর হওয়ায় অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গতভাবেই এখানে ইঙ্গিত করা যায় যে গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণের অব্যবহিত পরেই তিনি কামরূপের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান শুরু করেছিলেন। উত্তর-পূর্ব সীমান্তের বিষয়টি কেন তাঁর তাৎক্ষণিক মনোযোগ দাবি করেছিল এখানে সেটা ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। মধ্যবর্তী আবিসিনীয় রাজত্বকালের অবকাশ ইতোমধ্যেই কামরূপের বিরুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর অগ্রগতি রোধ করেছিল। এর সুযোগ নিয়ে বাংলার কিছু অঞ্চল দখল করে কামরূপের রাজা সম্ভবত তাঁর রাজ্যের সীমা বর্ধিত করেছিলেন। কথিত আছে যে নীলাম্বর কান্তাদুয়ার ও ঘোড়াঘাট দখল করেছিলেন[৫৪] যা বারবক শাহের রাজত্বকালে (১৪৫৯-১৪৭৪ খ্রিস্টাব্দ)[৫৫] বাংলার অধীনে ছিল। রিসালাত-উস-শুহাদা থেকে দেখা যায় যে এ জায়গাগুলিতে বাংলার সামরিক ফাঁড়ি ছিল। কৌশলগত বিপুল গুরুত্বপূর্ণ এ স্থানগুলি হারানোকে হোসেন প্রশান্ত চিত্তে গ্রহণ করতে পারেন নি। কারণ কান্তাদুয়ারের উপর কামরূপের নিয়ন্ত্রণ ছিল বাংলার সার্বভৌমত্বের প্রতি সুনিশ্চিত হুমকিস্বরূপ। কাজেই পরিস্থিতির চাপে হোসেন শাহ্ প্রথম সুযোগেই কামরূপের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করতে বাধ্য হয়েছিলেন বলে মনে হয়। করতোয়ার অপর তীরস্থ অঞ্চল কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণে থাকলে আহোমদের যে কোনো আক্রমণের বিরুদ্ধে বাংলার উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রক্ষা করা সম্ভব ছিল। বাংলায় করতোয়ার তীরে দু'টি সামরিক ফাঁড়ি ছিল নীলাম্বরের নিয়ন্ত্রণাধীন। তাঁর উস্কানিমূলক কার্যাবলি হোসেনকে খেন রাজ্য আক্রমণের সুযোগ করে দিয়েছিল। মধ্যযুগের বাংলার রাজনৈতিক ভূগোলে ঘোড়াঘাট-কান্তাদুয়ার অঞ্চল এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছিল। ত্রয়োদশ শতকের প্রথম দশকের মতো প্রাথমিক কালেও বখতিয়ারকে তাঁর পরিকল্পিত তিব্বত অভিযানে যাবার আগে ঘোড়াঘাটের প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করতে হয়েছিল।[৫৬] উপরন্তু, কামরূপের মধ্য দিয়ে বিস্তৃত তিব্বত ও বাংলার মধ্যকার বাণিজ্যপথগুলিও[৫৭] হয়তো হোসেনের অত্যন্ত পরোক্ষ লক্ষ্য হয়ে থাকতে পারে।

কিন্তু হোসেনের কামরূপ যুদ্ধের সমাপ্তির তারিখ কি? কিংবদন্তি অনুসারে নীলাম্বরের রাজধানী কামতাপুরের পতন ঘটেছিল ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দে।[৫৮] আমাদের সময়কার পণ্ডিতবর্গ এ তারিখ মেনে নিয়েছেন।[৫৯] কামরূপ ও আসামের ঘটনাবলির সঙ্গে যাঁরা দানিয়ালকে যুক্ত করার পক্ষপাতী এ তারিখ তাঁদের কাছেও সন্তোষজনক মনে হতে পারে। সম্ভবত ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দে, অর্থাৎ কামরূপ অভিযান শুরু হওয়ার ৫ বা ৬ বছর পরে দানিয়াল কামরূপের শাসনকর্তা পদে যোগদান করেছিলেন। এমনকি ঐ বছরে মুঙ্গেরে খিলানবিশিষ্ট ছাদ নির্মাণের কাজ শেষ করেও তিনি ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দে

কামরূপে গিয়ে থাকতে পারেন। সুতরাং হোসেনের কামরূপ অভিযান ১৪৯৪ এবং ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল বলে মনে হয়।[৬০] এটা ১৪৯৮ এবং ১৫০২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে হয়নি যা কিছু পণ্ডিত আমাদের বিশ্বাস করাতে চান। ৯১৯ হিজরি/১৫১৩ খ্রিস্টাব্দের একটি স্বর্ণমুদ্রায় "কামরূপ ও কামতা এবং উড়িষ্যা ও জাজনগর বিজয়" লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।[৬১] যেহেতু বাংলার স্বাধীন সুলতানদের স্বর্ণমুদ্রার সংখ্যা অত্যন্ত কম (এবং তাদের ব্যবহারও অত্যন্ত বিরল) সেহেতু এখানে অনুমান করা যায় যে এ স্বর্ণমুদ্রা কামরূপ ও উড়িষ্যার একাংশ বিজয় সমাপ্ত হওয়ার পর সুলতানের কৃতিত্বের স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে উৎকীর্ণ করা হয়েছিল। এটাই ব্যাখ্যা করে যে ইতিপূর্বে আমাদের উল্লিখিত ৯১০, ৯১৫, ৯১৯, ৯২১, ৯২২ এবং ৯২৪ হিজরির মুদ্রাগুলিতে কেন এসব রাজ্য জয়ের কাহিনীও বারবার দেখা যায়। ৯০৭ হিজরি/১৫০২ খ্রিস্টাব্দের মালদহ লিপি এবং ৯১৮ হিজরি/১৫১২ খ্রিস্টাব্দের সিলেট লিপিতেও[৬২] কামরূপ বিজয়কে অতীতের একটি ঘটনা হিসেবেই কেবল উল্লেখ করা হয়েছে।

কিংবদন্তি থেকে দেখা যায় যে মুসলমানরা ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দে কামতাপুর অধিকার করেছিল। কাজেই এটা খুবই সম্ভাব্য যে, কামতাপুরের পতনের অব্যবহিত পরেই হোসেন আসাম আক্রমণ করেছিলেন। দু'দেশের ভৌগোলিক অবস্থানের সান্নিধ্যের কারণে আসামে যাবার উপায় হিসেবে কামরূপকে ব্যবহার করা হয়েছিল। নিম্নউপত্যকা আয়ত্তে আনার পরই শুধু হোসেন শাহ উত্তর ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা আক্রমণের সাহসী পরিকল্পনার কথা কল্পনা করতে পারতেন। ফার্সি উৎসগুলিতে বর্ণিত আসামে মুসলিম অধিকার এক বছরও স্থায়ী হয়নি, কারণ কথিত আছে যে অভিযান পরবর্তী বর্ষাকালেই মুসলমানরা সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়েছিল। মনে হয় ১৪৯৯ খ্রিস্টাব্দের বর্ষা ঋতুতে এ পরাজয় ঘটেছিল।

বাংলা ও উড়িষ্যার মধ্যে যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করছিল। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে বাংলায় ভ্রমণকারী পর্তুগিজ পরিব্রাজক বার্বোসা বলেছেন যে, উড়িষ্যা কিছুদিনের জন্য 'বেঙ্গলা' রাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল।[৬৩] সেলিম বলেছেন[৬৪] "এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের রায়দের দমন করে এবং উড়িষ্যা পর্যন্ত (দেশগুলি) জয় করে, তিনি (হোসেন) তাঁদের উপর কর ধার্য করেন।" বুকাননের ইতিহাসের পাণ্ডুলিপিতে হোসেনকে উড়িষ্যা বিজয়ের কৃতিত্ব দেওয়া হয়েছে।[৬৫] হোসেন শাহের উড়িষ্যার ঘটনাবলি প্রসঙ্গত উল্লেখকারী সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যে এ বর্ণনার অন্ততপক্ষে আংশিক সমর্থন পাওয়া যায়। বৃন্দাবনদাসের মতানুসারে উড়িষ্যার সঙ্গে তাঁর যুদ্ধের সময় হোসেন শাহ বেশকিছু হিন্দু মন্দির ধ্বংস করেছিলেন।[৬৬] গৃহত্যাগের পর শ্রীচৈতন্য নবদ্বীপ থেকে পুরী যাওয়ার পথে রামচন্দ্র খান, যিনি সম্ভবত হোসেন শাহের সীমান্ত এলাকার একজন কর্মকর্তা ছিলেন, তাঁকে হোসেন ও উড়িষ্যার রাজা প্রতাপ রুদ্র দেবের মধ্যে চলমান সীমান্ত সংঘর্ষের কথা জানিয়ে ছিলেন। ফলে ছত্রভোগে গঙ্গা পাড়ি দেওয়ার জন্য শ্রীচৈতন্যকে খানের সাহায্যের উপর নির্ভর করতে হয়েছিল।[৬৭] অন্যান্য রাজ্যে বেশকিছু বছর কাটিয়ে বাংলায় ফিরে আসার পথে উড়িষ্যার সীমান্ত এলাকার একজন কর্মকর্তা

মুসলমান সুলতানের সঙ্গে শান্তি স্থাপিত হওয়া পর্যন্ত চৈতন্যকে অপেক্ষা করতে অনুরোধ করেছিলেন।[৬৮] চৈতন্য-চরিতামৃতের রচয়িতা অন্যত্র উল্লেখ করেছেন যে, হোসেন শাহ উড়িয়াদের হত্যা এবং উৎকলের দেব-দেবীদের ধ্বংস করবেন এ ভয়ে সনাতন নামক তাঁর একজন কর্মকর্তা তাঁর সঙ্গে উড়িষ্যা অভিযানে যেতে অস্বীকৃতি জানান।[৬৯] মাদলাপঞ্জি অনুসারে 'সুরখান' হোসেন শাহ ১৫০৯ খ্রিস্টাব্দে পুরী আক্রমণ করে বেশ কয়েকটি মন্দির ধ্বংস করেছিলেন। প্রতাপরুদ্র তখন তাঁর রাজ্যে ছিলেন না। ফিরে এসে তিনি মুসলমানদের মন্দরণস্থ তাদের দুর্গে পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য করেন এবং সেটাও তিনি অবরোধ করেন। গোবিন্দ বিদ্যাধর নামে তাঁর একজন হিন্দু কর্মকর্তার বিশ্বাসঘাতকতার জন্য তাঁকে নিজ রাজ্যে ফিরে আসতে হয়েছিল।[৭০] কাজেই বৈষ্ণব সাহিত্যে প্রদত্ত বিবরণ মাদলাপঞ্জি দ্বারা সমর্থিত।

উপরে উদ্ধৃত উৎসগুলি হোসেনের উড়িষ্যা-যুদ্ধের একটি অসংযুক্ত বিবরণ প্রদান করে এবং দেখা যায় যে দু'দেশের মধ্যে এ যুদ্ধ ছিল দীর্ঘস্থায়ী। এ দীর্ঘস্থায়ী সংঘর্ষের শেষ পরিণতি সম্পর্কে কোনো নিশ্চিত ধারণা সৃষ্টিতে এগুলি আমাদের সাহায্য করে না। এ ঘটনা সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাতকারী হোসেন শাহের ৯১৮ হিজরি/১৫১২ খ্রিস্টাব্দের সিলেটলিপির পাঠ নিম্নরূপ[৭১] : "এ অট্টালিকা হশ্‌ত গামহারীয়ান বিজেতা রুকন খান (দ্বারা নির্মিত) যিনি কামরূপ, কামতা, জাজনগর এবং উড়িষ্যা বিজয়ের সময় বহুদিন ধরে উজির এবং সেনাপতি থাকায় রাজার সঙ্গে বহু স্থানে সেনাবাহিনীতে কাজ করেছিলেন। ৯১৮ হিজরিতে (লিখিত)।" বিভিন্ন তারিখের হোসেন শাহী মুদ্রায় উপস্থিত "কামরূপ, কামতা, জাজনগর এবং উড়িষ্যা বিজয়" এ শব্দসমষ্টি এ লিপিতেও দেখা যায়। হোসেন শাহ যে কামরূপ অধিকার করেছিলেন তা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে।[৭২] উড়িষ্যা প্রতাপরুদ্র দেবের মতো একজন শক্তিশালী শাসকের[৭৩] অধীনে ছিল একথা বিবেচনা করে আমরা কি মনে করব যে হোসেন শাহ সে দেশ জয় করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন ? তাহলে সুলতান কেন নিজেকে বার বার জাজনগর ও উড়িষ্যার বিজেতা হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন ? এটা কি হোসেন শাহের মতো একজন শক্তিশালী শাসকের নিষ্ফল দম্ভ ? আমাদের জ্ঞানের বর্তমান পর্যায়ে এসব প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু হোসেন তাঁর উড়িষ্যা অভিযানে অন্ততপক্ষে সাময়িক সাফল্য লাভ করেছিলেন বলে মনে হয়। সুলতানের মুদ্রা ও লিপিতে তাঁকে উড়িষ্যা বিজেতারূপে খেতাব দেওয়া হয়েছে এবং পাণ্ডুয়ায় বুকানন হ্যামিলটন কর্তৃক প্রাপ্ত বাংলার ইতিহাসের পাণ্ডুলিপির দ্বারা এটা সমর্থিত।[৭৪] বাংলা উৎসগুলিও হোসেনকে উড়িষ্যায় মন্দির ও দেব-দেবী ধ্বংসকারীরূপে চিত্রিত করেছে।[৭৫] এসব সাক্ষ্য সম্ভবত ইঙ্গিত করে যে, অন্ততপক্ষে সাময়িকভাবে হলেও হোসেন উড়িষ্যার একাংশ অধিকার করেছিলেন। এ মত প্রতাপরুদ্র দেবের ১৪৩২ শকাব্দের/১৫১০-১১ খ্রিস্টাব্দের কাবালি তাম্রশাসন দ্বারা সমর্থিত। এ লিপি অনুসারে মুসলমান সুলতানের কবল থেকে তাঁর হৃত অঞ্চল পুনরাধিকার করার পর উড়িষ্যার রাজা 'পঞ্চ-গৌড়-অধিনায়ক' বা 'পাঁচ গৌড়ের অধিপতি' উপাধি গ্রহণ করেছিলেন।[৭৬]

আমরা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, কামরূপ বিজয় উল্লেখকারী মুদ্রাগুলিতে উড়িষ্যা বিজয়ের উল্লেখও রয়েছে এবং এ মুদ্রাগুলির মধ্যে সর্বপ্রথমটির তারিখ হচ্ছে ১৪৯৪ খ্রিস্টাব্দ এবং সর্বশেষটির তারিখ হচ্ছে ১৫১৮ খ্রিস্টাব্দ। কাজেই মুদ্রাতাত্ত্বিকভাবে এটা প্রমাণিত যে, ১৪৯৪ খ্রিস্টাব্দে উড়িষ্যা ও কামরূপ অভিযান যুগপৎ শুরু হয়েছিল এবং ১৫১৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।[৭৭] সুতরাং কামরূপ যুদ্ধের চেয়ে উড়িষ্যা-যুদ্ধের স্থায়িত্ব ছিল দীর্ঘতর। মনে হয় যে তারিখ হিসেবে ১৫০৯, ১৫১৩ এবং ১৫১৬ খ্রিস্টাব্দ দানকারী বাংলা উৎসগুলি এবং মাদলাপঞ্জি কোনোভাবে এ যুক্তির বিরোধিতা করে না।[৭৮] কাজেই হোসেন শাহের সমগ্র রাজত্বকাল ধরেই সে উড়িষ্যার সঙ্গে বাংলার যুদ্ধ চলেছিল তা মোটামুটি প্রমাণিত বলেই মনে হয়।

আগে গৌড়ের শাসনাধীন গঙ্গামণ্ডল, পাটীকারা, মেহেরকুল, কৈলাসহর, বেজোরা, ভানুগাছ, বিষ্ণু জুড়ি, লাঙ্গলা এবং বরদাকহাট দখল করে উচ্চাভিলাষী রাজা ধন্যমাণিক্য আঞ্চলিক সম্প্রসারণ-নীতি গ্রহণ করলে পার্শ্ববর্তী রাজ্য ত্রিপুরার সঙ্গে হোসেন শাহী বাংলার সামরিক সংঘর্ষের প্রথম পর্যায় শুরু হয়। ত্রিপুরার রাজা খণ্ডালে একজন গভর্নর নিয়োগ করেছিলেন। জনগণ অবশ্য তাঁকে বন্দি করে গৌড়ের রাজদরবারে পাঠিয়ে দেয়। ধন্যমাণিক্য গভর্নরের দায়িত্ব রায়-কাচ্ছগের উপর ন্যস্ত করেন। বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক এ অঞ্চলের ১২ জন দলপতিকে হত্যা করে তিনি খণ্ডালে দৃঢ়ভাবে তাঁর প্রভুত্ব কায়েম করেন।[৭৯] নিহত দলপতিগণ সম্ভবত বাংলার সুলতানকে সমর্থন জানিয়ে ছিলেন। এ পরিস্থিতিতে হোসেন শাহের কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তা জানা যায় না।

মুসলমানদের হাত থেকে চট্টগ্রাম দখল করে ১৪৩৫ শকাব্দে/১৫১৩-১৪ খ্রিস্টাব্দে ধন্যমাণিক্য সেখান থেকে গৌড়ের সেনাবাহিনীকে বিতাড়িত করেন। সম্ভবত এ সময়ে মুসলমানরা তাঁর হাতে পরাজিত হয়েছিল। এরফলে সুলতান হোসেন শাহ গৌড়মল্লিকের নেতৃত্বে ত্রিপুরার বিরুদ্ধে একটি অভিযান পাঠান। গৌড়মল্লিক গুমতির গতিপথ ধরে অগ্রসর হয়ে কুমিল্লার মেহেরকুল দখল করেন। রায়-কাচ্ছগের নেতৃত্বাধীন শত্রুসেনা কিয়ৎ দূরস্থ মাটির বাঁধে আটকানো নদীর জল ছেড়ে দেয়। জীবিতদের দ্রুতবেগে পশ্চাদপসরণের পর ১৪৩৭ শকাব্দে/১৫১৫-১৬ খ্রিস্টাব্দে ত্রিপুরার রাজা চট্টগ্রাম দখল করে নেন। এ পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে হোসেন শাহ হাতিয়ান খানের নেতৃত্বে ত্রিপুরার বিরুদ্ধে আর একটি অভিযান পাঠান। এ সেনাপতি জমির খানগড়ু অধিকার এবং গগন খানের নেতৃত্বাধীন ত্রিপুরা বাহিনীকে দুঘরিয়াগড়ে প্রাথমিকভাবে পরাজিত করলেও তিনি তাঁর পূর্বসূরি গৌড়মল্লিকের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে ব্যর্থ হন। ফলে এ অভিযানের ফল হয়েছিল আগেরটির অনুরূপ। রাঙ্গামাটি যাওয়ার পথে হাতিয়ান খানের সৈন্যরা রাতে নদীতে ডুবে মারা যায়। গৌড়মল্লিকের সেনাদলকে পরাজিত করতে ধন্যমাণিক্য যে রণকৌশল অবলম্বন করেছিলেন এবারের বিজয়ের মূলেও ছিল অনেকাংশে সে কৌশল। অদক্ষতা ও দূরদৃষ্টির অভাবের জন্য সুলতান হাতিয়ান খানকে শাস্তি দিয়েছিলেন। হোসেন শাহের চতুর্থ অভিযান রাজমালায়

যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করা হয় নি।[৮০]

কিন্তু পূর্বতর সময়ের বাংলা সাহিত্য রাজমালা-প্রদত্ত তথ্যকে সমর্থন করে না। হোসেন শাহের রাজত্বকালে লিখিত পরাগলী মহাভারত অনুযায়ী ত্রিপুরা গৌড়ের সুলতানের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছিল।[৮১] হোসেন শাহের অপর একজন সামসাময়িক, শ্রীকর নন্দীর অশ্বমেধ পর্বে বলা হয়েছে যে ত্রিপুরার রাজা, যিনি সবসময় হোসেনের চট্টগ্রামের গভর্নর ছুটি খানের ভয়ে ভীত থাকতেন, তাঁর দেশে মুসলমান সৈন্যদের সবেগ অগ্রাভিযানের ফলে পাহাড়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত কর হিসেবে বেশকিছু ঘোড়া ও হাতি দিয়ে বাংলার গভর্নরের প্রভুত্ব স্বীকার করে নিয়েছিলেন।[৮২] এ উক্তি লিপির সাক্ষ্য দ্বারাও সমর্থিত। হোসেন শাহের ৯১৯ হিজরি/১৫১৩ খ্রিস্টাব্দের সোনারগাঁও লিপি থেকে দেখা যায় যে, খওয়াস খান ছিলেন সর-ই-লশকর বা "ত্রিপুরা অঞ্চলের সামরিক গভর্নর এবং ইকলিম মুয়াজ্জমাবাদের উজির।"[৮৩] এ শব্দগুচ্ছ মনে হয় এটাই ইঙ্গিত করে যে ইতিপূর্বে মুয়াজ্জমাবাদের গভর্নররূপে নিযুক্ত খওয়াস খানকে পরবর্তীকালে নববিজিত ত্রিপুরা অঞ্চলেও প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। কাজেই হোসেন শাহ কর্তৃক ত্রিপুরার একাংশ বিজয় মোটামুটি প্রমাণিত বলেই মনে হয়। এ সিদ্ধান্তের অনুকূলে এতগুলি স্পষ্ট সাক্ষ্যের বিপরীতে ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে লিখিত রাজমালা প্রদত্ত তথ্যের উপর নিরাপদে নির্ভর করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।[৮৪] রাজমালা ত্রিপুরার সঙ্গে হোসেনের সংঘর্ষের প্রাথমিক পর্যায় উল্লেখ করেছে বলে মনে হয় যখন সুলতান কিছুটা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিলেন। কিন্তু হোসেন কর্তৃক ত্রিপুরার একাংশ অধিকারের মধ্য দিয়ে এ সংঘর্ষের সমাপ্তি ঘটে। কবীন্দ্র পরমেশ্বর এবং শ্রীকর নন্দীর বর্ণনা নির্দেশ করে যে, চট্টগ্রামের গভর্নর পরাগল খান ও ছুটি খান সম্ভবত ত্রিপুরার কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন।

চট্টগ্রামের অধিকার নিয়ে গৌড়, ত্রিপুরা ও আরাকানের রাজাদের মধ্যে বিবাদ ছিল। পূর্বে উল্লিখিত বিবরণ থেকে দেখা যায় যে, সুলতান ও ত্রিপুরার রাজার মধ্যে প্রায়ই চট্টগ্রাম অধিকারকে কেন্দ্র করে যুদ্ধ হতো এবং শেষোক্ত ব্যক্তি ১৫১৩-১৪ খ্রিস্টাব্দে এবং ১৫১৫-১৬ খ্রিস্টাব্দে হোসেন শাহের কাছ থেকে এটি জোরপূর্বক দখল করতে সক্ষম হয়েছিলেন।[৮৫] রাজমালা সুনিশ্চিতভাবে বলছে যে, হোসেন শাহের সঙ্গে যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ত্রিপুরা সাফল্যের সঙ্গে চট্টগ্রামের উপর তার নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখেছিল।[৮৬] কিন্তু শেষ পর্যন্ত যে চট্টগ্রাম সুলতানের অধিকারভুক্ত হয়েছিল তা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত। বলা হয়েছে যে ত্রিপুরাকে নিয়ে হোসেনের সার্বক্ষণিক চিন্তার সুযোগে আরাকানের (রোসাঙ্গ) রাজা চট্টগ্রাম দখল করেছিলেন।[৮৭] অহাদিস-উল-খওয়ানীন বলছে যে, নসরত চট্টগ্রাম থেকে আরাকানীদের তাড়িয়ে দিয়ে এ বিজয়কে স্মরণীয় করে রাখার উদ্দেশ্যে এর নতুন নামকরণ করেছিলেন ফত্‌হাবাদ।[৮৮] এ উক্তি দৌলত উজির বাহরাম খানের লাইলী-মজনু দ্বারা সমর্থিত যার মতানুসারে চট্টগ্রাম দখলের জন্য হোসেন শাহ হামিদ খান নামক একজন উজিরকে পাঠিয়েছিলেন

এবং এর নাম রাখা হয়েছিল ফত্‌হাবাদ।[৮৯] মনে হয়, চট্টগ্রাম জয়ের জন্য নসরতের সঙ্গে হামিদ খানকে পাঠানো হয়েছিল। পরাগলী মহাভারত দৃঢ়তার সঙ্গে বলছে যে পরাগল খানকে চট্টগ্রামের সামরিক গভর্নর নিযুক্ত করা হয়েছিল।[৯০] এ তথ্যকে সমর্থন করে শ্রীকর নন্দী বলছেন, গভর্নর পদে পরাগল খানের পুত্র ছুটি খান তাঁর পিতার স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন এবং তাঁদের রাজনৈতিক সদর দফতর ছিল ফেনী নদীর তীরে অবস্থিত।[৯১] সুতরাং বাংলা সাহিত্য এবং চট্টগ্রামের ফার্সি ইতিহাস থেকে সংগৃহীত সাক্ষ্য চূড়ান্তভাবে প্রমাণ করে যে হোসেন শাহ চট্টগ্রাম অধিকার করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং এটা শেষপর্যন্ত তাঁর রাজ্যের এক অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছিল। ১৫১৭ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগিজ দূত জোয়াও দ্য সিলভীরা কেন চট্টগ্রামকে সুলতানের অধীনে এবং আরাকানের রাজাকে তাঁর সামন্তরূপে দেখতে পেয়েছিলেন এটা তা ব্যাখ্যা করে।[৯২] সুতরাং হোসেন শাহী শাসনাধীন চট্টগ্রামের ইতিহাসের বিকাশে আমরা কয়েকটি পর্যায় চিহ্নিত করতে পারি : প্রথম : রুকনউদ্দীন বারবক (১৪৫৯-১৪৭৪ খ্রিস্টাব্দ)[৯৩] কর্তৃক আরাকানিদের হাত থেকে চট্টগ্রাম পুনরুদ্ধার এবং কমপক্ষে ১৫১৩-১৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত চট্টগ্রামের উপর গৌড়ের একটানা কর্তৃত্ব; দ্বিতীয় : ধন্যমাণিক্যের দ্বারা ১৫১৩ ও ১৫১৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে এ স্থান অধিকার[৯৪]; তৃতীয় : সম্ভবত ১৫১৬ খ্রিস্টাব্দে হোসেনের চট্টগ্রাম পুনর্বিজয়; চতুর্থ : আরাকান রাজ কর্তৃক চট্টগ্রাম অধিকার। তিনি মনে হয় ত্রিপুরাকে নিয়ে হোসেনের সার্বক্ষণিক চিন্তার সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন এবং পঞ্চম : ১৫১৭ খ্রিস্টাব্দে হোসেন কর্তৃক চট্টগ্রাম পুনর্দখল এবং ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত চট্টগ্রামের উপর হোসেন ও তাঁর উত্তরাধিকারীদের অব্যাহত কর্তৃত্ব।[৯৫]

চট্টগ্রামের অধিকার নিয়ে বাংলা, ত্রিপুরা এবং আরাকানের রাজাদের মধ্যে যে ত্রিমুখী যুদ্ধ চলছিল তার মূল কারণ ছিল এর কৌশলগত ও বাণিজ্যিক গুরুত্ব। বাণিজ্যিক জাহাজ, দূত ও বাংলায় আগত বিদেশীদের প্রবেশ ও প্রস্থান নিয়ন্ত্রণ করত এ সমুদ্র বন্দর। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে পাণ্ডুয়া-দরবারে আগত কূটনৈতিক দলের অভ্যর্থনার আয়োজন মুসলমান সুলতান চট্টগ্রামেই করেছিলেন।[৯৬] সাতগাঁও বন্দরের মতো এ নগরীও পর্তুগিজদের মনোযোগের কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠেছিল। তারা একে পোর্টো গ্র্যান্ডে রূপে অভিহিত করত এবং মুসলমান সুলতানদের প্রচুর পরিমাণে রাজস্ব অর্জনকারী শুল্ক-ঘাঁটিগুলি পরবর্তীকালে নিয়ন্ত্রণ করত। উপরন্তু, চট্টগ্রামের উপর কার্যকর নিয়ন্ত্রণ থাকলেই শুধু দেশের দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা যথাযথভাবে জোরদার করা যেত। বাণিজ্যিক ও কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ এ স্থান দখলের সূচনা হিসেবে, মনে হয়, হোসেন শাহ ত্রিপুরা আক্রমণ করেছিলেন। অশ্বমেধ পর্বে নির্দেশ করা হয়েছে যে চট্টগ্রাম বিজয় এবং চন্দ্রশেখর গিরিশ্রেণীর প্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিত ফেনী নদীর তীরে মুসলমানদের একটি সামরিক ঘাঁটি স্থাপনের[৯৭] ফলে ত্রিপুরার রাজার অবস্থান দুর্বল হয়ে পড়ে। তৎকালে বহিঃশত্রুর হামলার সম্মুখীন চট্টগ্রাম থেকে বেশ দূরে তাঁদের সামরিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে হোসেন শাহী সুলতানগণ বাস্তবজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছিলেন। কাজেই এটা কোনো দুর্ঘটনা নয় যে মোগল

গভর্নরগণ ফেনী নদীর তীরে জগদিয়াতে একটি ফাঁড়ি এবং চট্টগ্রামের কাছে কর্ণফুলী নদীর উভয় তীরে শক্তিশালী দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন[৯৮] এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলার নবাবগণ এ স্থানের পাশে চট্টগ্রাম থানার 'অত্যুত্তম ভিত্তি' ফেনী থানা স্থাপন করেছিলেন। ১৭২৯ খ্রিস্টাব্দে আরাকানীদের হাত থেকে পুনরুদ্ধার করার পর চট্টগ্রাম থানার উপর সতর্ক পাহারার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।[৯৯]

হোসেন শাহী আমলের বাংলার সীমান্ত সম্পর্কে সঠিক ধারণা করা অত্যন্ত দুঃসাধ্য। উড়িষ্যা, দিল্লি, কামরূপ, আসাম, ত্রিপুরা এবং আরাকানের সঙ্গে দেশটি যুদ্ধাবস্থায় থাকায় এর সীমান্ত ছিল প্রায়শই অস্থায়ী। তবুও আমাদের হাতে থাকা উৎসগুলির ভিত্তিতে বাংলার সীমান্তের অবস্থা আলোচনা করা সময়োপযোগী।

বাংলার সঙ্গে উড়িষ্যার মিলনস্থলগুলি কোথাও উল্লেখ করা হয় নি। রিসালা ও মাদলাপঞ্জিকে বিশ্বাস করলে মন্দারণে বাংলার একটি সীমান্ত ফাঁড়ি ছিল। এটা ছিল উড়িষ্যার রাজার বিরুদ্ধে সৈন্যবাহিনীর চলাচলের ঘাঁটি।[১০০] মন্দারণ থেকে জাজনগর পর্যন্ত সমগ্র বিস্তীর্ণ এলাকা বাংলা ও উড়িষ্যার মধ্যে এক বিতর্কিত ক্ষেত্র ছিল বলে মনে হয়। উড়িষ্যা রাজ্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে বার্বোসা মন্তব্য করেছেন : "উপকূল ধরে এটা উত্তর দিকে গঙ্গানদী পর্যন্ত বিস্তৃত (কিন্তু তারা এটাকে গৌরিগুয়া নামে ডাকে) এবং এ নদীর অপর তীরে বাংলা রাজ্যের শুরু। সেখানেও ওটিসার রাজা মাঝে মাঝে যুদ্ধে লিপ্ত হন।"[১০১] কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, গঙ্গা নদীকে বাংলা ও উড়িষ্যার সীমান্ত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলা যে তখন উড়িষ্যা থেকে নদীর দ্বারা বিচ্ছিন্ন ছিল তা অস্বীকার করা যায় না। কৃষ্ণদাস কবিরাজ এ নদীর উল্লেখ করেছেন।[১০২] সর্বকালে হিন্দুদের কাছে পবিত্র এবং সর্বজনীনভাবে বিদিত গঙ্গা বাংলা ও উড়িষ্যার মধ্যকার সীমান্ত ছিল না। কারণ হোসেন শাহের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত মন্দারণ বর্তমান গঙ্গার অপর তীরে বহুদূরে অবস্থিত। জোয়াও দ্য ব্যারোসের মানচিত্র থেকে দেখা যায় যে, মন্দারণ নদী থেকে বেশ দূরে ছিল। একই নামে পরিচিত গঙ্গার একটি শাখা নদীকে বার্বোসা মূলনদীর সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছেন বলে মনে হয়। এ প্রস্তাব তুলে ধরার আগে ১৫৫০ খ্রিস্টাব্দে অঙ্কিত জোয়াও দ্য ব্যারোসের মানচিত্রের দিকে দৃষ্টি দেওয়া যেতে পারে যেখানে গঙ্গা নামক একটি নদীকে উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে হুগলী নদীর মোহনায় পড়তে দেখানো হয়েছে। আসল গঙ্গাকে দক্ষিণ পশ্চিম বাংলার অনেক উপরে প্রবাহিত রূপে দেখানো হয়েছে। এ নদী সম্পর্কে দ্য ব্যারোস কি বলেছেন তা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি বলেন "তাহলে দু'টি প্রধান শাখার মাধ্যমে গঙ্গা যেখানে পূর্ব সাগরে তার জল ঢেলে দিচ্ছে সে অঞ্চলে এবং এর জলরাশি থেকে আরও পিছনে সরে আসা স্থল যেখানে ভূগোলবিদদের কাছে গাঙ্গেয় নামে পরিচিত বড় উপসাগর সৃষ্টি হয়েছে এবং যাকে এখন আমরা বাংলা থেকে নামকরণ করি সেখানে বাংলা রাজ্য অবস্থিত। পূর্বদিক হতে এসেছে একটি এবং অন্যটি এসেছে পশ্চিম দিক থেকে। এমন দু'টি উল্লেখযোগ্য নদী এ দুই শাখার মোহনায় এসে পড়েছে, এ দু'টি নদীই রাজ্যের সীমান্ত:..। অন্য নদীটি সপ্তিগাম নামে পরিচিত অন্য এক শহরের নিচ দিয়ে গঙ্গার পশ্চিম বাহুতে পড়েছে....।

মতিগ্রামের নিচ দিয়ে গঙ্গায় পড়া অন্য নদীটি উড়িষ্যা রাজ্যের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত এবং এর উৎস হচ্ছে চৌল-এর নিকটবর্তী অঞ্চলে ভারতীয়দের দ্বারা গেট (ঘাট) নামে অভিহিত পাহাড়ের ঢালে। বহু দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত গঙ্গায় পতিত এটি একটি বড় নদী হওয়ায় স্থানীয় অধিবাসীরা গঙ্গার অনুকরণে এটাকেও গঙ্গা নাম দিয়েছে। তারা এটার জলকেও গঙ্গাজলের মতো পবিত্র মনে করে।"[১০৩]

সতর্কতার সঙ্গে বিশ্লেষণ করলে দ্য ব্যারোসের উপর্যুক্ত বর্ণনায় নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করা যায় : (ক) তাঁর মানচিত্রে অঙ্কিত গঙ্গানদী হচ্ছে বাংলার পশ্চিম সীমান্ত; (খ) সাতগাঁওর নিচে এটা গঙ্গার শাখায় পতিত হয়েছে; (গ) এর উৎস হচ্ছে ঘাট পর্বতমালা এবং (ঘ) হিন্দুরা একে গঙ্গা নামে অভিহিত করে এবং তাদের কাছে এর জল গঙ্গার জলের মতোই পবিত্র। সুতরাং গঙ্গা নামটা ছিল অনুকরণকৃত। এসব কারণে আমরা বার্বোসার গঙ্গাকে ব্যারোসের মানচিত্রের গঙ্গা রূপে শনাক্ত করার পক্ষপাতী। মনে হয় এ নদী বর্তমানের কনসাই[১০৪] নদী ভিন্ন অন্যকিছু নয় যেটাকে পরীক্ষামূলকভাবে হোসেন শাহের বাংলার পশ্চিম সীমান্ত বলে ধরে নেওয়া যায়। উড়িষ্যা রাজ্যকে দ্য ব্যারোস এ নদীর পশ্চিম তীরে স্থাপন করেছেন। হোসেন শাহের অনেক লিপিতে থানা লাওব্লা এবং হোসেনাবাদ ও হাদীগর শহরের সঙ্গে আরশাহ্ সাজলা মঙ্গবাদের উল্লেখ দেখা যায়। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ব্লখম্যান এগুলিকে সঠিকভাবে শনাক্ত করেছেন।[১০৫] কাজেই মনে হয় যে, গঙ্গার দক্ষিণস্থ এবং ভাগীরথীর পশ্চিমের সাতগাঁও, শরিফাবাদ, সুলায়মানবাদ এবং মাদারণ[১০৬] সরকারগুলি হোসেনের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

হোসেন যেখানে প্রভাব বিস্তার করতে পারেন নি সেই সুন্দরবনের উত্তরস্থ প্রান্তিক অঞ্চলগুলি সম্ভবত ছিল তাঁর রাজ্যের দক্ষিণ সীমান্ত। বৃন্দাবনদাস প্রসঙ্গত ছত্রভোগের[১০৭] উল্লেখ করেছেন বাংলায় যার অন্তর্ভুক্তি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত। ত্রিবেণী লিপির[১০৮] সাক্ষ্য থেকে স্পষ্ট দেখা যায় যে ডায়মন্ডহারবারের দক্ষিণে হুগলী নদীর তীরে হাতিয়াগড়রূপে শনাক্তকৃত হাদীগড় তাঁর রাজ্যের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল। এখানে যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুমান করা যায় যে হোসেনের দক্ষিণ সীমান্ত এ স্থান থেকে খলিফতাবাদ বা আধুনিক বাগেরহাট পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, কারণ আলাউদ্দীন হোসেন শাহের রাজত্বকালে বাগেরহাট ছিল বাংলার অন্যতম টাকশাল শহর।[১০৯] বরিশাল জেলার উপরও সুলতানের আইনগত অধিকার ছিল। এটা ছিল ফত্হাবাদ বিভাগের বাঙ্গডোরা তকসিমে অবস্থিত।[১১০] দক্ষিণে তাঁর সীমান্ত ছিল নিরবচ্ছিন্ন।

দক্ষিণ পূর্ব সীমান্ত সম্পর্কে জোয়াও দ্য ব্যারোসের বর্ণনা নিম্নরূপ— "... এই নামের এক শহরে গঙ্গার পূর্ব মোহনায় পড়ে বলে এদের একটিকে আমাদের লোকেরা চটিগম নদী বলে অভিহিত করে। ....আভা এবং ভগরু রাজ্যের শৈল শ্রেণীতে চটিগম নদীর উৎপত্তি এবং উত্তর-পূর্ব থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রবাহিত হয়ে এটা কোদভসকম রাজ্য থেকে বাংলাকে পৃথক করে এবং এ নদীর গতিপথেই বাংলাকে পূর্বদিক থেকে বেষ্টনকারী তিপোরা এবং ব্রেমলিম্ম রাজ্য অবস্থিত।"[১১১]

দ্য ব্যারোসের মানচিত্র থেকে দেখা যায় যে, মানচিত্রকর সেটাকে চটিগম নদী বলে অভিহিত করেছেন সেটা বর্তমান কর্ণফুলি ছাড়া অন্যকিছু নয় সেটা দৌলত উজিরের লাইলী মজনুতেও[১১২] উল্লিখিত হয়েছে। আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি যে হোসেনের গভর্নরদের সদর দফতর ছিল ফেনী নদীর তীরে।[১১৩] কাজেই অন্ততপক্ষে ১৫১৭ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে হলেও ফেনী থেকে কর্ণফুলি পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকা হোসেন শাহের রাজ্যের আওতাভুক্ত ছিল বলে মনে হয়।

পূর্বদিকে গোমতি নদী বাংলাকে ত্রিপুরা রাজ্য থেকে পৃথক করেছে। আমরা দেখেছি যে হোসেনের সৈন্যরা বহুবার এ নদী অতিক্রম করার চেষ্টা করেছিল।[১১৪] হোসেন শাহের সিলেট লিপি[১১৫] পরিষ্কারভাবে নির্দেশ করে যে বাস্তবে সিলেট ছিল বাংলা রাজ্যের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত। দ্য ব্যারোসের মানচিত্রে রীনে দ্য কমোতাহ রূপে দৃষ্ট কামরূপ ছিল বাংলার সর্বোত্তর অঞ্চল। দ্য ব্যারোস কর্তৃক কমোতাহ রূপে চিহ্নিত রাজধানী কামতপুর ছিল দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে মিলিত হওয়া দরল নদীর তীরে অবস্থিত।[১১৬] উত্তরে সম্পূর্ণ উত্তর বিহার ও দক্ষিণ বিহারের একাংশ সম্ভবত হোসেনের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।[১১৭] দ্য ব্যারোস বলেছেন : "এ শৈলশ্রেণী পটন জনগোষ্ঠীও আরও নিচের উড়িষ্যা রাজ্য থেকে বাঙ্গালীদের পৃথক করেছে, শৈলশ্রেণী এবং গঙ্গার জলধারার মাঝে বাংলার সমতলভূমি অবস্থিত।"[১১৮] এ শৈলশ্রেণী ছিল সম্ভবত খগড়পুর পাহাড়। কাজেই মনে হয় যে পর্তুগিজ মনে করেছিলেন যে গঙ্গা এবং পশ্চিমের পাহাড় বাংলাকে 'পটন জনগোষ্ঠী' অথবা বিহারের আফগানদের (পাঠান?) এবং উড়িয়াদের থেকে পৃথক করেছিল। এটাই তিনি স্পষ্টভাবে মানচিত্রে দেখিয়েছেন। সিকান্দরের সৈন্যরা বর্‌হ[১১৯] এ বাঙালি সৈন্যদের সম্মুখীন হয়েছিল যা মনে হয়েছিল বাংলা ও বিহারের মিলনস্থল রূপে চিহ্নিত। রেনেলের মানচিত্রে বরহ্-এর অবস্থান গঙ্গার দক্ষিণ তীরে এবং বিহার শহরের ২২ মাইল উত্তর পূর্বে নির্দেশ করা হয়েছে।[১২০]

নিজামউদ্দীনের মতানুসারে ২৭ বছর কয়েক মাস অর্থাৎ বেশ দীর্ঘদিন রাজত্ব করার পর ৯২৯ হিজরিতে হোসেন শাহ্ মৃত্যুবরণ করেন।[১২১] 'ফিরিশতা'[১২২] এবং সেলিম[১২৩] প্রদত্ত সুলতানের মৃত্যু তারিখ হচ্ছে যথাক্রমে ৯৩০ এবং ৯২৭ যার কোনোটাই গ্রহণযোগ্য নয়। সোনারগাঁও লিপি[১২৪] থেকে দেখা যায় যে ৯২৫ হিজরি/১৫১৯ খ্রিস্টাব্দে হোসেন জীবিত ছিলেন। তাঁর পুত্র নসরত শাহ সেই বছরই মুদ্রা জারি করতে শুরু করেন।[১২৫] কাজেই এটা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত যে ১৫১৯ খ্রিস্টাব্দ ছিল হোসেন শাহের রাজত্বের শেষ বছর।

বাংলাকে ঘিরে রাখা সবক'টি রাজ্যের বিরুদ্ধে হোসেনকে আমরা যুদ্ধ করতে দেখেছি। এটা সত্যিই আশ্চর্যজনক যে এসব শক্তির কোনোটির সঙ্গেই কোনো সামরিক বা রাজনৈতিক মৈত্রী স্থাপন না করেও তিনি বাংলার স্বাধীন মর্যাদা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। আসাম সীমান্তে তাঁর ব্যর্থতা বাংলার রাজনৈতিক জীবনে কোনো প্রতিকূল প্রভাব ফেলেছিল বলে মনে হয় না। এটা শুধু সে দিকে মুসলমান বাহিনীর অগ্রগতি রোধ করেছিল। সিকান্দরের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করে

হোসেন মনে হয় তাঁর সঙ্গে সরাসরি যুদ্ধ পরিহার করেছিলেন। কিন্তু একদা শর্কি রাজ্য গঠনকারী ভূখণ্ডের অংশগুলি দখল করে তিনি শেষপর্যন্ত তাঁর রাজ্যসীমা বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

তাঁর রাজত্বকালে দেশ নিরুপদ্রপ নিরাপত্তা ও শান্তি ভোগ করেছিল এবং এটা নিঃসন্দেহে তাঁর ব্যক্তিগত কর্মনৈপুণ্য এবং তাঁর সরকারের দক্ষতার ফলে সম্ভব হয়েছিল। এমনকি তাঁর রাজত্বের একেবারে গোড়ার দিকে তিনি তাঁর প্রজাদের মনে রেখাপাত এবং বহুলাংশে তাদের কল্পনাকে জয় করেছিলেন বলে মনে হয়। আলাউদ্দীন হোসেন শাহের সমসাময়িক বিজয়গুপ্ত ১৪৯৪-৯৫ খ্রিস্টাব্দে সর্প-উপাসনা-পদ্ধতি সম্পর্কে মনসা-মঙ্গল নামে একটি কাব্য রচনা করেছিলেন। তিনি সুলতানের কৃতিত্বের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেছেন, "সুলতান হোসেন শাহ হচ্ছে রাজাদের তিলক চিহ্ন। যুদ্ধে তাঁকে অর্জুনের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে এবং এ কারণে তিনি প্রভাত-সূর্য-সদৃশ। রাজা তাঁর বাহুবলে পৃথিবী শাসন করেন। তাঁর প্রদত্ত নিরাপত্তার ফলে তাঁর প্রজারা নিয়মিতভাবে সুখ ভোগ করে।"[১২৬] পরবর্তীকালে তাঁর সামরিক, প্রশাসনিক এবং সাংস্কৃতিক সাফল্য বিবেচনা করলে সুলতানের প্রতি কবির এ ভাবাবেগপূর্ণ প্রশংসাবাণী যথাযথ বলে মনে হয়।

হোসেনের ধর্মীয় নীতি সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামিমুক্ত ছিল বলে প্রতীয়মান হয়। সহিষ্ণুতা ও উদারতা ছিল হিন্দুদের প্রতি তাঁর মনোভাবের বৈশিষ্ট্য। হিন্দুরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু পদ লাভ করেছিলেন। এ বিষয়ে বাংলা উৎসগুলি স্পষ্ট ও নিশ্চিত। রূপ ছিলেন মাকর-মল্লিক, এবং সনাতন ছিলেন সুলতানের দবির-ই-খাস। রামচন্দ্র খান দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় একটা ছোট জমিদারি ভোগ করেছিলেন। হিরণ্ময় দাস এবং গোবর্ধন দাসের মজুমদার পরিবারের অবস্থাও ছিল একইরকম। নবদ্বীপের কোতওয়াল ছিলেন জগাই ও মাধাই। আবার, তাঁর মন্ত্রী গোপীনাথ বসু, ব্যক্তিগত চিকিৎসক মুকুন্দ দাস, দেহরক্ষীদের প্রধান কেশব খান ছত্রী এবং টাকশাল-অধ্যক্ষ অনুপ ছিলেন হিন্দু। রাজমালা অনুসারে গৌড়মল্লিককে ত্রিপুরা অভিযানের নেতা নিযুক্ত করা হয়েছিল।[১২৭] কোনো কোনো গভর্নর তৎকালীন হিন্দু কবিদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। পরাগল খান এবং ছুটি খানের নাম প্রবাদবাক্যের মতো কবীন্দ্র পরমেশ্বর এবং শ্রীকর নন্দীর নামের সঙ্গে জড়িত হয়ে রয়েছে। এ দু'জন কবি মহাভারতের বাংলা অনুবাদ করেছিলেন।[১২৮] হোসেন শাহের গৃহীত উদারনীতি তাঁর উত্তরাধিকারীরা অনুসরণ করেছিলেন। নসরতের সৈন্যবাহিনীতে আমরা হিন্দু সৈন্যদের যুদ্ধ করতে দেখতে পাই।[১২৯]

হোসেন শাহ মাঝে-মধ্যে হিন্দুদের উপর অত্যাচার করেছিলেন বলে কিছু লেখক মত প্রকাশ করেছেন।[১৩০] তাঁরা সাধারণত চৈতন্য-চরিতামৃতে উল্লিখিত সুবুদ্ধি রায়ের উপাখ্যান, উড়িষ্যায় হোসেনের মন্দির ধ্বংসের অভিযোগ এবং নবদ্বীপের হিন্দুরা হোসেনের হাতে অত্যাচারিত হয়েছিলেন বলে জয়ানন্দ যে মতপ্রকাশ করেছেন এ সবের উপর তাঁদের যুক্তি স্থাপন করেছেন। কিন্তু তাঁদের যুক্তিগুলি প্রকৃত ঘটনার ভাসাভাসা

অনুসন্ধানের উপর স্থাপিত বলে মনে হয়। সুবুদ্ধি রায়ের ঘটনা সুলতানের গৃহীত স্থির নীতি নির্দেশ করে না। বরং এ থেকে শুধু তাঁর উপর তার স্ত্রীর প্রভাব প্রকাশ পায়। উড়িষ্যায় সুলতানের মন্দির ধ্বংস অপরিহার্যভাবে প্রমাণ করে না যে তিনি হিন্দু বিরোধী ছিলেন, কারণ যুদ্ধের আনুষঙ্গিক বিশৃঙ্খলা ও বিভ্রান্তির সময় এ রকম ধ্বংসকার্য সংঘটিত হতেই পারে। জয়ানন্দ যা বলেছেন নিম্নলিখিত পংক্তিগুলিতে তার সারমর্ম দেওয়া যেতে পারে : নবদ্বীপের ব্রাহ্মণরা গৌড়ের সিংহাসন জবরদখল করবে বলে সুলতানের অনুচরবৃন্দ তাঁকে সংবাদ দিয়েছিল। ক্রোধান্বিত হয়ে সুলতান নবদ্বীপ ধ্বংসের আদেশ দিয়েছিলেন। ব্রাহ্মণদের জাত অপবিত্র করা হয় এবং তাঁদের বহুজনকে হত্যা করা হয়। হিন্দুদের ধর্মকর্ম সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং নবদ্বীপের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ভীষণভাবে ব্যাহত হয়। বিশৃঙ্খলা ও বিভ্রান্তি চরম আকার ধারণ করে যার ফলে তাঁর ভাই বিদ্যা-বাচস্পতিকে গৌড়ে রেখে সার্বভৌম ভট্টাচার্য দেশত্যাগ করে বেনারসে চলে যান।[১৩১]

বাংলা মূলপাঠ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ব্রাহ্মণরা যে গৌড়ের সিংহাসন দখল করবেন এটা নবদ্বীপের হিন্দু সম্প্রদায় বিশ্বাস করেছিলেন—এ তথ্য বৃন্দাবন দাসও সমর্থন করেছেন।[১৩২] এ ধরনের চিন্তার কারণ যাই হোক না কেন এটা সুলতানকে ক্রোধান্বিত করার জন্য যথেষ্ট ছিল। তিনি নবদ্বীপের হিন্দু সমাজে ব্যাপ্ত রাজদ্রোহিতার প্রবণতাকে ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন। উপর্যুক্ত বিবরণে আমরা অন্যান্য হিন্দু সম্প্রদায় বাদ দিয়ে সুলতানকে শুধু ব্রাহ্মণদের উপর অত্যাচার করতে দেখি কেন এটা তা ব্যাখ্যা করে। ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে তাঁর গৃহীত ব্যবস্থাসমূহ সম্পর্কে অনেকে প্রশ্ন তুলতে পারেন। কিন্তু তিনি যা করেছিলেন তার উদ্দেশ্য ছিল রাজদ্রোহিতা দমন করা এবং এতে সাম্প্রদায়িক বোধ বা ধর্মীয় উদ্দীপনার কোনো ভূমিকা ছিল বলে মনে হয় না। উপরন্তু জয়ানন্দ বলেছেন যে, এ ঘটনা ঘটেছিল ১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দে শ্রীচৈতন্যের জন্মের প্রাক্কালে যখন বাংলায় শাসনকারী সুলতান ছিলেন জালালউদ্দীন ফতেহ্ শাহ (১৪৮১-৮৭ খ্রিস্টাব্দ) পূর্ববর্তী সুলতান জালালউদ্দীন কৃত কোনো কাজের জন্য হোসেন শাহকে দায়ী করা যায় না। কথিত আছে যে গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেই হোসেন শহরটি লুঠ করেছিলেন।[১৩৩] জয়ানন্দ মনে হয় এ ঘটনারই উল্লেখ করেছেন যাতে গৌড়ের কিছু হিন্দু হয়তো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন।

তাঁর অধীনে কিছু দায়িত্বপূর্ণ পদে সুলতান যে বহু হিন্দুকে নিয়োগ করেছিলেন সেটা হিন্দুদের প্রতি সুলতানের উদার ব্যবহারের স্পষ্ট নিদর্শন। তাঁর মনের উদারতার প্রতিফলন ঘটেছে বৈষ্ণব সাহিত্যে যা দৃঢ়ভাবে বলছে যে তিনি শ্রীচৈতন্যকে ভগবানের অবতার বলে মনে করতেন এবং শ্রীচৈতন্যের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ছিল।[১৩৪] হিন্দুদের প্রতি তিনি যে দয়া ও সহানুভূতি দেখিয়েছিলেন তা তৎকালীন হিন্দু কবিদের তাঁকে রাজাদের তিলক-চিহ্ন (নৃপতি-তিলক), বিশ্বের অলঙ্কার (জগৎ-ভূষণ) এবং কৃষ্ণের অবতার (কৃষ্ণাবতার) রূপে আখ্যায়িত করতে প্রণোদিত করেছে।[১৩৫]

মুদ্রাতাত্ত্বিক ও লিপির সাক্ষ্য থেকে এটা প্রমাণিত যে প্রাক-হোসেন শাহী বাংলার

সুলতানগণ "ইসলামের ও মুসলমানদের সাহায্যকারী" উপাধি গ্রহণ করতেন।[১৩৬] ইসলামকে কত ঘনিষ্ঠভাবে তাঁরা রাষ্ট্রীয় বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত করতেন এ থেকে তা দেখা যায়। সুলতান ও তাঁর উত্তরাধিকারীরা মুদ্রায় এ উপাধি বাদ দিয়ে সম্পূর্ণভাবে এ নীতি ত্যাগ করেন। অল্পসংখ্যক মুদ্রায় যে কালিমা দেখা যায় তাকে তাঁদের মুদ্রানীতির ঐতিহ্যগত একটি বৈশিষ্ট্য বলা যেতে পারে, এর কোনো ধর্মীয় গুরুত্ব ছিল না। আবার শুধু একটি মুদ্রার[১৩৭] প্রান্তে দৃষ্ট প্রথম চার খলিফার নাম আরবের সৈয়দের সঙ্গে তাদের আত্মীয়তাই কেবল নির্দেশ করে।

উত্তর ভারতের অধিকাংশ সুলতান হিন্দুদের উপর জিজিয়া বা মাথাপিছু কর ধার্য করেছিলেন। কিন্তু হোসেন শাহী বাংলায় সম্ভবত এ বিধি প্রচলিত ছিল না, কারণ সমকালীন বৈষ্ণব সাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষের বর্ণনার জন্য যথেষ্ট স্থান ব্যয় করলেও এর কোনো উল্লেখই করে নি। মুসলমানদের কাছ থেকে সরকার যাকাত আদায় করেছেন বলে মনে হয় না। বস্তুত হোসেন শাহ এবং তাঁর উত্তরাধিকারীরা সম্ভবত এক ধর্মনিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করেছিলেন। এটা শাসক শ্রেণী যে অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে আসীন ছিলেন অনেকাংশে সে কারণে হতে পারে। চারিদিক থেকে গৌড়রাজ্য শত্রুভাবাপন্ন বহু রাজ্য দ্বারা বেষ্টিত ছিল। ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্র থেকে লোদীরা সরে যেতে না যেতেই মোগল সাম্রাজ্যবাদের উদীয়মান ঢেউ সবকিছু জয় করে নিতে শুরু করেছিল। এ অবস্থায় হোসেন শাহ ও তাঁর উত্তরাধিকারীগণ ধর্ম ও মত নির্বিশেষে বিভিন্ন শ্রেণীর জনগণের সমর্থন ও সহানুভূতির ভিত্তিতে নিশ্চয়ই রাষ্ট্রের ভিত্তি মজবুত করার চেষ্টা করেছিলেন।

উপসংহারে বলা যায় যে, হোসেন শাহের রাজত্বকাল মধ্যযুগের বাংলার ইতিহাসে এক উজ্জ্বল যুগের সূচনা করেছিল। পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ছাড়াও সুলতান তাঁর প্রজাদের জন্য সবরকম সুবিধাই দান করেছিলেন। তারাও তাঁকে উচ্চ সম্মান প্রদর্শন করে এর স্বীকৃতি দিয়েছে যার ফলে মধ্যযুগের বাংলার কিংবদন্তির একজন নায়ক রূপে তিনি আজও স্মরণীয় হয়ে আছেন।

২.

১৫১৯ খ্রিস্টাব্দে আলাউদ্দীন হোসেন শাহের জ্যেষ্ঠ পুত্র নসরত শাহ তাঁর উত্তরাধিকারী হিসেবে সিংহাসনে আরোহণ করেন। পিতার জীবদ্দশায়ও নসরত দেশের প্রশাসনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন এবং যুদ্ধবিদ্যার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। পিতার শিক্ষানবিশ হিসেবে রাজকীয় পদের জন্য প্রয়োজনীয় কিছু গুণ তিনি অর্জন করেছিলেন বলে মনে হয়। তাঁর কয়েকটি মুদ্রার তারিখ হচ্ছে ৯২২ হিজরি/১৫১৬ খ্রিস্টাব্দ এবং ৯২৩ হিজরি/১৫১৭ খ্রিস্টাব্দ[১৩৮] যার ভিত্তিতে এটা ইঙ্গিত করা যায় যে প্রকৃতপক্ষে সিংহাসনারোহণের আগেই যুবরাজ হিসেবে নসরত পিতার কাছ থেকে মুদ্রা জারি করার অনুমতি লাভ করেছিলেন।[১৩৯]

সমকালীন উত্তর ভারতে তখন গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটছিল। ইব্রাহীম

লোদীর দুর্বলতার সুযোগে লোহানী এবং ফরমুলীরা পাটনা থেকে জৌনপুর পর্যন্ত সমস্ত অঞ্চল নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেওয়ার চেষ্টা করেছিল। বিহারে লোহানী রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।[১৪০] এ বিশৃঙ্খল রাজনৈতিক অবস্থা নসরতকে আজমগড় পর্যন্ত তাঁর রাজ্য বিস্তৃত করার সুযোগ দিয়েছিল। তাঁর রাজ্যে এ স্থানের অন্তর্ভুক্তি ১৫২৭ খ্রিস্টাব্দের সিকান্দরপুর লিপি[১৪১] দ্বারা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত। সমগ্র তিরহুতকে বাংলার অন্তর্ভুক্ত করে তিনি এটাকে তাঁর শ্যালক আলাউদ্দীন ও মখদুম আলমের নিয়ন্ত্রণে ন্যস্ত করেন। গণ্ডক ও গঙ্গার সঙ্গমস্থলে অবস্থিত হাজীপুর উত্তর বিহারে তাঁর রাজনৈতিক সদর দফতরে পরিণত হয়।[১৪২] আগের পরিচ্ছেদে আমরা ইঙ্গিত দিয়েছি যে এসব ব্যবস্থা বাংলার সামরিক ও কৌশলগত প্রয়োজনপযোগী ছিল। গোগরার ডান তীরে খারীদ নসরতের নিয়ন্ত্রণে থাকায় পূর্বদিকে অগ্রসর হতে গিয়ে বাবর সে অঞ্চলের মধ্য দিয়ে যাবার রাস্তা দেওয়ার জন্য নসরতকে অনুরোধ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন।[১৪৩]

১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে পানিপথের যুদ্ধক্ষেত্রে বাবর লোদী রাজ্যের উপর এক মরণআঘাত হানেন। এটা বাংলার সার্বভৌমত্বের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। বাংলায় পালিয়ে আসা আফগানদের নসরত শুধু নামমাত্র আশ্রয়ই দেন নি, তিনি তাঁদের ভাতা ও ভূ-সম্পত্তিও দিয়েছিলেন।[১৪৪] মনে হয় তিনি মানবহিতৈষণার বিবেচনা দ্বারা প্রণোদিত হয়েছিলেন। ১৫২৭ খ্রিস্টাব্দে খারীদ লুণ্ঠন করে বাবরের সৈন্যরা গোগরা পর্যন্ত অগ্রসর হয়।[১৪৫] বাবরের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের প্রতিপদেই আফগানদের পরাজয় দেখে নসরত তাঁর অনুসরণীয় কর্মপন্থা সম্পর্কে সম্ভবত দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। প্রাচ্যে তাঁর সামরিক নীতির প্রতি নসরতের মনোভাব নিরূপণের উদ্দেশ্যে ১৫২৭ খ্রিস্টাব্দেই বাবর মোল্লা মোহাম্মদ মজহবকে গৌড়ের দরবারে পাঠিয়েছিলেন।[১৪৬] বাবরকে কোনো সরাসরি জবাব না দিয়ে নসরত তাঁর দূতকে প্রায় এক বছর আটকে রেখেছিলেন। ১৫২৮ খ্রিস্টাব্দের শেষ দিকেও বাবর নসরতের মনোভাব সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলেন না, কারণ তিনি বলেছিলেন, "বাঙ্গালীরা বন্ধুভাবাপন্ন ও অকপট কিনা এবং যদি ঐ অঞ্চলে কোনো কারণেই আমার অবস্থান প্রয়োজনীয় না হয় তবে আমি অবস্থান না করে এখনই অন্যত্র চলে যাব কিনা তা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে হবে।"[১৪৭] সমগ্র পরিস্থিতিই বিপজ্জনক হওয়ায় নসরতকে নিরপেক্ষতার ভান করতে হয়েছিল। ১৫২৯ খ্রিস্টাব্দের ১লা জানুয়ারি নসরতের মনোভাব "অনুগত এবং অকপট" একথা জানতে পেরে বাবর বাংলায় কোনো "পদক্ষেপ" গ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। একই মাসে নসরতের দূত, ইসমাইল মিত সুলতানের একটি পত্র ও উপহার নিয়ে বাবরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।[১৪৮] এ ঘটনার মধ্য দিয়ে বাবরের সাথে নসরতের সম্পর্কের প্রথম পর্যায়ের সমাপ্তি ঘটে। নসরতের নিরপেক্ষতাকে বাবর যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছিলেন, কারণ তিনি মনে হয় বুঝতে পেরেছিলেন যে নসরত ও আফগান প্রধানদের মধ্যে সক্রিয় ঐক্য প্রাচ্যে তাঁর রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ করে দেবে। উদ্ভূত ফলাফল এ ইঙ্গিত দান করে যে আফগানদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সমঝোতা স্থাপন করা থেকে নসরতকে বিরত

রাখতে তিনি সফল হয়েছিলেন।

এ ইঙ্গিত করা হয়েছে যে নসরত বাবরের বিরুদ্ধে আফগানদের সক্রিয়ভাবে সাহায্য করেছিলেন।[১৪৯] কিন্তু বাবরের আত্মজীবনীতে বা মুন্তাখাব-উত-তওয়ারিখ, তবকাত-ই-আকবরী, তারিখ-ই-ফিরিশতা এবং তারিখ-ই-সালাতীন-ই-আফগানার মতো উৎসে এ মতের সমর্থন পাওয়া যায় বলে মনে হয় না। নসরতের সঙ্গে আফগানদের সম্পর্কের সঠিক প্রকৃতি নির্ধারণের জন্য বিহার ও সন্নিহিত এলাকাসমূহে বাবরের সামরিক কৃতিত্ব এখানে আলোচনা করা প্রয়োজন। ১৫২৮ খ্রিস্টাব্দের প্রথম দিকে কিছু আফগান প্রধান কনৌজে বাবরের সেনাবাহিনীকে বাধা দেওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করেন।[১৫০] গোগরার তীর ধরে বাবর অগ্রসর হন এবং সরণের শাসনভার শাহ মোহাম্মদ ফরমুলীর উপর অর্পণ করেন।[১৫১] বাংলার নসরত এবং বিহারের মাহমুদ লোদী, জালাল খান শর্কি এবং জালাল খান লোহানীর মতো ব্যক্তিরা বাবরকে বাধা দিতে পারতেন।

এসব রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সাথে বাবরের সম্পর্কের যে বিস্তারিত বিবরণ বাবরের আত্মজীবনীতে পাওয়া যায় তা থেকে স্পষ্ট দেখা যায় যে, বিহারে বাবর বিরোধী যে মিত্র সংঘ তৈরি হতে যাচ্ছিল তার সঙ্গে নসরতের কোনো সম্পর্ক ছিল না। লোহানী শাসক জালাল খানের কাছ থেকে ১৫২৯ খ্রিস্টাব্দে মাহমুদ লোদী বিহার দখল করে নেন। জালাল খান তখন বাবরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান। তিনি সম্ভবত তাঁর অধীনতা স্বীকার করার ইচ্ছা প্রকাশ করে বাবরকে মাঝে মাঝে "শ্রদ্ধাপূর্ণ পত্র" লিখতেন।[১৫২] এসব রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রতি নসরতের কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তা স্পষ্টভাবে জানা যায় না। জালাল ও তাঁর অনুসারীদের নসরতের সৈন্যরা হাজীপুরে আটকে রাখে।[১৫৩] জালাল-সমর্থিত বাবরের সৈন্যবাহিনী বাংলার জন্য বিপদ সৃষ্টি করতে পারে, এ ধারণা থেকেই মনে হয় তারা এ কাজ করেছিল। ইতোমধ্যে বাবর নসরতের নিয়ন্ত্রণাধীন সরণ ও খারীদ পর্যন্ত অগ্রসর হওয়ায়[১৫৪] হাজীপুরের গভর্নরের পক্ষে এরকম ব্যবস্থা গ্রহণ করে শত্রুকে দুর্বল করার চেষ্টা করাটাই স্বাভাবিক ছিল। এ থেকে এরকম ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে মোগল-বিরোধী মৈত্রী সঙ্ঘ গঠনের ব্যাপারে মাহমুদ লোদীর সঙ্গে নসরতের আগে থেকেই একটা বোঝাপড়া ছিল।

কিন্তু আমাদের জন্য এর পরিণাম বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। ১০,০০০ আফগানের এক সেনাদল সংগ্রহ করে মাহমুদ মোগল বিরোধী মৈত্রী সঙ্ঘের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। বায়েজিদ, বিবন, ফতেহ্ খান এবং শের খান সুরের মতো বেশকিছু আফগান নেতাও এতে যোগ দেন। এরা সবাই মোগলদের উপর এক ত্রিমুখী আক্রমণ চালাতে একমত হন। বায়েজিদ ও বিবন উত্তরে গোরখপুরের দিকে চলে যান। ফতেহ্ খানকে সঙ্গে নিয়ে মাহমুদ গঙ্গার তীর ধরে চুনার ও বেনারসের দিকে অগ্রসর হন। বাবরের আত্মজীবনী বিশ্বাসযোগ্য হলে এসব অভিযানের শেষ ফল ছিল মৈত্রী সঙ্ঘের নেতাদের জন্য অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক।[১৫৫] এ ব্যাপারে নসরত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনো ভূমিকা পালন করে থাকলে আমাদের হাতের উৎসগুলিতে তার উল্লেখ থাকত। উপরিউক্ত

বর্ণনার সতর্ক পরীক্ষা, মনে হয়, এ ইঙ্গিত করে যে, মাহমুদের মোগল-বিরোধী পরিকল্পনায় তিনি কোনো অংশ নেন নি।

আফগান নেতাদের পরস্পরবিরোধী স্বার্থ থাকায় তাঁদের পক্ষে এক উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ হওয়া সম্ভব ছিল না। নিজেদের জন্য রাজ্য দখল করার উদ্দেশ্যে মাহমুদ লোদী, জালাল লোহানী এবং জালাল শর্কি একে অন্যের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছিলেন। এটাই ব্যাখ্যা করে কেন মাহমুদ গঠিত মৈত্রী সঙ্ঘ জালাল লোহানী এবং জালাল শর্কির সমর্থনলাভে ব্যর্থ হয়েছিল। শেষোক্ত দু'ব্যক্তিই ইতোমধ্যে মোগল বিজয়ীর ব্যবস্থাপনায় নিজেদের সক্রিয়ভাবে স্থাপন করে বাবরের আধিপত্য স্বীকার করে নিয়েছিলেন।[১৫৬] শেরখান সুরের ব্যাপারটাও একইরকম এবং তিনিও মোগলদের অধীনে চাকুরি গ্রহণ করেছিলেন।[১৫৭] মৈত্রী-সঙ্ঘের অন্তর্নিহিত দুর্বলতা সম্পর্কে নসরত সচেতন থাকায় তিনি এতে যোগ দিয়েছিলেন বলে মনে হয় না। কারণ আফগানদের সক্রিয়ভাবে সমর্থন করে তিনি নিজের স্বার্থ উদ্ধার করতে পারতেন না। মোগলদের বিরুদ্ধে অসফল যুদ্ধে লিপ্ত আফগানদের সঙ্গে আঁতাত বাবরকে অহেতুক উস্কানি দেবে বুঝতে পেরে তিনি মনে হয় তথাকথিত মোগল-বিরোধী মৈত্রী-সঙ্ঘকে এড়িয়ে চলেছেন। আবার তাঁর মৈত্রীসঙ্ঘে যোগদানের জন্য নসরতকে আমন্ত্রণ জানাবার কথা মাহমুদ আদৌ চিন্তা করেছিলেন কিনা তাও সন্দেহের বিষয়। কারণ উত্তর-পশ্চিমে নসরতের ভূ-খণ্ড দখল করার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল যার আংশিক পূরণ ইতোমধ্যে আলোচিত হয়েছে।[১৫৮] ফলে বাংলার সুলতানের মাহমুদের স্বার্থবিরোধী উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত নীতি সম্ভবত মোগল-বিরোধী মৈত্রীসঙ্ঘ থেকে তাঁর বাদ পড়ার জন্য আংশিকভাবে দায়ী ছিল।

বাংলার সুলতান শেষপর্যন্ত বুঝতে পেরেছিলেন যে মোগলদের সঙ্গে সরাসরি সংঘর্ষ অনিবার্য। সরণ এবং খারীদের কিছু অংশ দখল করে পূর্বাঞ্চল দখলের উদ্দেশ্যে এখন তারা পূর্বদিকে আবার অগ্রসর হতে শুরু করবে। এ অবস্থায় নসরত বাধ্য হয়ে মোগলবাহিনীর অগ্রগতিকে বাধা দিতে কিছু বাস্তব ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তিনি কুতব খানকে মোগলদের সঙ্গে কয়েকটি যুদ্ধের জন্য ভরইচের দিকে পাঠান।[১৫৯] এ সম্পর্কে কোনো লিখিত বিবরণ বাবরের আত্মজীবনীতে সংরক্ষিত নেই। ১৫২৯ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে হাজীপুরের গভর্নর মখদুম-ই-আলম গন্তক নদীর তীরে সৈন্য মোতায়েন করেন এবং বাবরের দলে যোগ দিতে উদ্যত বহু আফগানকে আটক করেন। জালাল খান ও তাঁর দলের প্রতি ব্যবহার এবং এসব ঘটনা থেকে এটা যথেষ্ট পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে বাঙ্গালিদের সঙ্গে বাবরের যুদ্ধ 'সম্ভাব্য' হয়ে পড়ছিল। কোনো জরুরি অবস্থার মোকাবেলার জন্য ইতোমধ্যে কিছু রণতরীর সমর্থনপুষ্ট বাংলার বাহিনী গোগরা ও গঙ্গার মিলনস্থলে অপেক্ষা করছিল। বাবর আগেই নসরতকে 'তিনটি শর্ত' সংবলিত একটি চিঠি লিখেছিলেন; কিন্তু নসরত-এর "উত্তর দিতে দেরি করছিলেন।"[১৬০] বাংলার দূত ইসমাইলকে নিম্নলিখিত স্মারকলিপি দিয়ে তাঁর প্রভুর কাছে ফেরত পাঠানো হয়; "আমাদের শত্রুর অনুসরণ করে আমরা এদিক-ওদিক যাব, কিন্তু আপনার আশ্রিত কোনো রাজ্যকে কোনো আঘাত বা তাদের ক্ষতি করা হবে না।

তিনটি শর্তের একটিতে যেমন বলা হয়েছে আপনারা খারীদ বাহিনীকে আমাদের রাস্তা থেকে সরে খারীদে ফিরে যেতে বললে এসব খারীদবাসীদের নিশ্চিত করতে এবং তাদের নিজেদের জায়গায় পৌছে দিতে কিছু তুর্কিকে তাদের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হোক। তারা ফেরিঘাট ত্যাগ এবং অভদ্র ভাষা বন্ধ না করলে কোনো বিপদ এলে সেটা তাদের সৃষ্ট বলে এবং কোনো দুর্ভাগ্যের সম্মুখীন হলে তা তাদের নিজেদের উক্তির ফলরূপে গণ্য করতে হবে।"[১৬১]

এ অংশ থেকে স্পষ্ট দেখা যায় যে, বাবর খারীদের মধ্য দিয়ে যাবার অবাধ রাস্তা চেয়েছিলেন—কিন্তু নসরত এ দাবি মেনে নিয়েছিলেন বলে মনে হয় না।

এর পরিণাম আগে থেকেই জানা ছিল। বাঙ্গালিদের সঙ্গে আসন্ন যুদ্ধের জন্য বাবর এখন তাঁর সেনাপতিদের অবস্থান গ্রহণ সম্পর্কে একটি বিস্তারিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন।[১৬২] রেনেলের মানচিত্র থেকে ভৌগোলিক যে বিবরণ পাওয়া যায় তার সঙ্গে তাঁর বর্ণনা যোগ করলে[১৬৩] স্পষ্ট দেখা যায় যে, সঙ্গমস্থলে বাঙ্গালিদের শিবিরের বিপরীত দিকে গঙ্গার উত্তর ও দক্ষিণ তীরে, গোগরার বাম তীরে এবং দুই নদীর মধ্যবর্তী উচ্চভূমিতে তাঁর সৈন্যবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল। যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থান থেকে দেখা যায় যে, গোগরার উজান ভাটিতে অবস্থিত শিবির থেকে মোগল সৈন্যরা বিভিন্ন দিক থেকে বাংলার বাহিনীকে আক্রমণ করতে পারত। ১৫২৯ খ্রিস্টাব্দের ৪ মে তারিখে মোগল সেনাপতি ঔঘুন বিরদি গোগরা অতিক্রম করে নসরতের পদাতিক বাহিনীর সম্মুখীন হলে শেষপর্যন্ত তারা পালিয়ে যায় এবং অন্য একদল বাঙ্গালি সৈন্য বিহারের দিকে গঙ্গার তীরে অবস্থান গ্রহণকারী জামান মির্জার নেতৃত্বাধীন মোগলদের আক্রমণের চেষ্টা করে। পরের দিনের সংঘর্ষে ফলাফল মোগলদের অনুকূলে নির্ধারিত হয়ে যায় এবং ৬ মে তারিখে বাবর খারীদে ঢুকে "নিরহুন পরগণার কুন্দিহ নামে এক গ্রামে পৌছেন... এটা ছিল সরুর (গোগরা) উত্তর তীরে।"[১৬৪] মোগলদের এ বিজয় ছিল বহুলাংশে তাদের উন্নততর সামরিক কৌশল ও গোগরার পশ্চিম তীরে সুবিধাজনক অবস্থান গ্রহণের ফল। বাবরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নসরতের নিঃসঙ্গতা গোগরার যুদ্ধে প্রকাশ পায়। তিনি আফগানদের মোগল-বিরোধী মৈত্রী সঙ্ঘের সদস্য হলে তাদের কিছু নেতা গোগরায় তাঁর পক্ষ গ্রহণ করতেন। এ যুদ্ধ ছিল গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এরফলে বাবরের রাজ্য গোগরার পূর্ব তীর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল এবং আফগানদের দমনের প্রক্রিয়া সহজতর করেছিল। এ যুদ্ধের ফলে তিনি বাংলার প্রবেশপথ তিরহুতের প্রান্তদেশে পৌছেছিলেন সেখান থেকে গঙ্গার তীর ধরে গণ্ডক ও কোসি নদী অতিক্রম করে তিনি সহজেই বাংলার মূল ভূখণ্ডে প্রবেশ করতে পারতেন। কিন্তু কূটনৈতিক বিবেচনা, মনে হয়, তাঁকে অযোধ্যা ও বিহার জয় করার আগে বাংলার দিকে অগ্রসর হওয়া থেকে বিরত রেখেছিল। আবুল ফতেহ্ নামক মুঙ্গেরের শাহজাদা এবং লশকর উজির হোসেন খান বাবরের নির্দেশিত তিনটি শর্ত স্বীকার করে নেন এবং বাংলার সুলতানের পক্ষে তাঁর সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করেন।[১৬৫] এভাবে আসন্ন এক বড় যুদ্ধ থেকে বাংলা রক্ষা পায়।

নসরতের রাজত্বের সংক্ষিপ্ত বিবরণদানকারী ফার্সি উৎসগুলি শুধু বাবরের কাছে তাঁর আত্মসমর্পণের উল্লেখ করেছে।[১৬৬] কিন্তু এ দু'জনের মধ্যে সম্পর্কের বিস্তারিত বর্ণনা সেগুলিতে নেই যা বাবরের আত্মজীবনীতে পাওয়া যায়। উল্লেখ করা হয়েছে যে, হুমায়ুন ও আফগানদের মধ্যে দৌরাহ্ এর যুদ্ধে নসরত আফগানদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।[১৬৭] স্টুয়ার্টের চেয়ে পূর্ববর্তী ও অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য উৎসে এ ধরনের বক্তব্যের কোনো সমর্থন পাওয়া যায় না। এ লেখক বলেছেন, "তাঁর চরিত্রের ভীরুতার জন্য বাংলার সুলতান এসব ঘটনায় কোনো সক্রিয় অংশগ্রহণ না করলেও বাবরের সঙ্গে তাঁর সন্ধি বিবেচনা না করে তিনি মাহমুদকে তাঁর সাধ্যমতো সবরকম সাহায্য করেছিলেন।"[১৬৮] সুতরাং স্টুয়ার্টের মতানুসারে দৌরাহ্ এর যুদ্ধে নসরতের কোনো সক্রিয় ভূমিকা না থাকলেও তিনি মাহমুদকে পরোক্ষভাবে সাহায্য করেছিলেন। স্টুয়ার্ট তাঁর তথ্যের উৎস উল্লেখ করেন নি। তাঁর দেখা উৎসগুলির মধ্যে (পূর্বোল্লিখিত, XIII-XVIII) শুধু তবকাত-ই-আকবরী, তারিখ-ই-ফিরিশতা এবং রিয়াজ নসরতের রাজত্বকালের অসম্পূর্ণ বিবরণ দিয়েছে। কিন্তু তিনি যে দৌরাহ্ এর যুদ্ধে মাহমুদ লোদীকে পরোক্ষভাবে সাহায্য করেছিলেন এ উৎসগুলির কোনোটিই তারও উল্লেখ করে নি। আফগান উৎসগুলি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নীরব। এটা সত্য যে বাবর কর্তৃক অযোধ্যা ও বিহার থেকে বিতাড়িত কিছু আফগানকে তিনি আশ্রয় দিয়েছিলেন।[১৬৯] উদীয়মান মোগল শক্তির বিরুদ্ধে একটি শক্তিরূপে আফগানদের প্রতিষ্ঠিত করার কোনো ইচ্ছা তাঁর ছিল কিনা তা আমরা জানি না। আব্বাস শেরওয়ানী, বদাউনী, ফিরিশতা, নিজামউদ্দীন, গুলবদন বেগম ও জওহর এ যুদ্ধের সঙ্গে জড়িত ঘটনাবলি বর্ণনা করেছেন।[১৭০] এসব উৎস অনুসারে গুমতির তীরে সংঘটিত দৌরাহ্ এর যুদ্ধে বিবন ও বায়েজিদ নিহত এবং মাহমুদ লোদী পরাজিত হয়েছিলেন। শেরশাহ এতে বিশ্বাসঘাতকের ভূমিকা পালন করেছিলেন এ যুক্তি কানুনগো খণ্ডন করেছেন।[১৭১] এ সব উৎসের কোনোটিই মনে হয় এ যুদ্ধের সঠিক তারিখ দেয় নি। কানুনগোর মতে এ তারিখ হবে ১৫৩১ খ্রিস্টাব্দ।[১৭২] তিনি গুলবদনের বিবরণের উপর নির্ভর করে এটি নির্ধারণের চেষ্টা করেছেন। এটা লক্ষ্য করা কৌতূহলোদ্দীপক যে, উপরে উদ্ধৃত উৎসগুলির কোনোটিই এ যুদ্ধের প্রসঙ্গে নসরতের নাম উল্লেখ করে নি। মনে হয়, নসরত ইতোমধ্যেই আফগানদের অনিশ্চিত ও দ্বিধাপূর্ণ মনোভাব সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে তাদের সঙ্গে যোগদান করা থেকে বিরত থাকেন।

বাবরের মৃত্যুর পর গুজব রটেছিল যে হুমায়ুন বাংলা আক্রমণ করতে আসছেন। গুজরাটের বাহাদুর শাহের সঙ্গে মৈত্রী চুক্তি সম্পাদনের উদ্দেশ্যে নসরত তাঁর দূত মালিক মর্গানকে তাঁর কাছে প্রেরণ করেন। এ প্রস্তাবের প্রতি বাহাদুরের প্রতিক্রিয়া ছিল নসরতের পক্ষে বেশ অনুকূল, কারণ বাহাদুর বাংলার দূতকে মাণ্ডুর দুর্গে অভ্যর্থনা জানান এবং তাঁকে একটি বিশেষ সম্মানজনক পোশাক উপহার দেন।[১৭৩] গুজরাটের সঙ্গে বাংলার বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। দু'দেশের মধ্যে যে রাজনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছিল সেটা ছিল বহুলাংশে একই শত্রুর প্রতি দু'জন শাসকের বিদ্বেষের ফল।

কারণ, নসরতের মতো বাহাদুর শাহেরও হুমায়ুনের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হওয়ার যথেষ্ট রাজনৈতিক কারণ ছিল। কিন্তু এ মৈত্রী বাস্তবায়িত হওয়ার আগেই নসরত মৃত্যুবরণ করেন।

নসরত শাহের রাজত্বকালের শেষ অবধি কামরূপ ও কামতার উপর বাংলার নিয়ন্ত্রণ সম্ভবত অপরিবর্তিত ছিল। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত এ সুলতানের এত বেশি সার্বক্ষণিক চিন্তা হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে আসামের দিকে মনোযোগ দেওয়ার কোনো সুযোগ তাঁর ছিল না। গৌড়ের সুলতানের কাছ থেকে কোনো সাহায্য লাভ ছাড়াই কামরূপ ও কামতার মুসলমান গভর্নরগণ, মনে হয়, তাঁদের নিজেদের উদ্যোগেই আহোমদের বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। এ রকম একটি সামরিক অভিযান শুরু হয়েছিল ১৫৩২ খ্রিস্টাব্দে তুরবক নামে একজন সেনাপতির নেতৃত্বে। তিনি তেমেনি অধিকার করার পর আহোমদের সল দুর্গে আশ্রয় নিতে বাধ্য করেছিলেন। আহোম রাজা চাও-শেং-লুংকে প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করেন এবং বরনদীতে সৈন্য মোতায়েন করেন। মুসলমানরা কলিয়বর পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে তখনকার মতো সেখানেই অবস্থান করতে থাকে।[১৭৪] ১৫৩২ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করায় নসরত আসামের সঙ্গে বাংলার যুদ্ধের সমাপ্তি দেখে যেতে পারেন নি।

নসরত শাহের রাজত্বকাল হোসেন শাহী শাসনের ভাঙ্গন-প্রক্রিয়ার সূচনা করেছিল যা গিয়াসউদ্দীন মাহমুদ শাহের রাজত্বকালে শেষ পরিণতি লাভ করে। তাঁকে উত্তর-পশ্চিমে গণ্ডকের পশ্চিম তীরবর্তী অঞ্চল বাবরকে ছেড়ে দিতে হয়েছিল। বাবর সরণের এবং খারীদের কিছু অংশে শাসন করেছিলেন বলে জানা যায়। ফলে বাংলার সীমান্ত গণ্ডক পর্যন্ত ঠেলে দেওয়া হয়েছিল। পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব সীমান্তে তিনি কোনো ভূখণ্ড হারিয়েছিলেন বলে মনে হয় না। দক্ষিণ-পশ্চিমে কি ঘটেছিল তা পরিষ্কারভাবে জানা যায় না। ৯৩৮ হিজরি/১৫৩০-৩১ খ্রিস্টাব্দের দু'টি সন্তোষপুর লিপি[১৭৫] স্পষ্টতই নির্দেশ করে যে দারকেশ্বর নদীর অপর তীর পর্যন্ত অঞ্চল বাংলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। মনে করা যেতে পারে যে, উড়িষ্যার রাজা প্রতাপ রুদ্র নসরতের রাজ্যাংশ দখল করে তাঁর রাজ্যসীমা বৃদ্ধির চেষ্টা করেছিলেন—এর বিস্তারিত বিবরণ সম্ভবত কোনোদিনই জানা যাবে না।

নসরত শাহের কিছু মহৎ গুণ ছিল যা সমকালীন শাসকদের মধ্যে ছিল বিরল। নিজের ভাইদের প্রতি তাঁর ব্যবহার ছিল সদয় ও কল্যাণমূলক। গুরুত্বপূর্ণ পদে আফগান শরণার্থীদের নিয়োগ করে তাঁদের প্রতিও তিনি সদয় ও মঙ্গলজনক আচরণ প্রদর্শন করেছিলেন যা তাঁর চারিত্রিক মানবহিতৈষণার পরিচায়ক। জীবনের শেষভাগে অবশ্য এর সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছিল।[১৭৬] কীর্তিমান পিতা আলাউদ্দীন হোসেন শাহের তুলনায় তাঁকে দুর্বলচিত্ত মনে হয়। কিন্তু যে বিপজ্জনক প্রকৃতির পরিস্থিতিতে তিনি অবস্থান করছিলেন তাঁর কৃতিত্ব বিচারে সেটা মনে রাখা উচিৎ। তাঁর অবস্থানগত দুর্বলতা অনেকাংশেই ছিল আফগান রাজনীতির অনিশ্চিত প্রকৃতি এবং মোগল রণকৌশলের শ্রেষ্ঠত্বের কারণে। নসরত প্রত্যক্ষভাবে বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা

করেছিলেন এবং বাংলা সাহিত্যে তাঁর নাম বারবার উল্লিখিত হয়েছে। কথিত আছে যে, গৌড়ে তাঁর পিতার সমাধি পরিদর্শনকালে তিনি তাঁর এক ক্রীতদাসের হাতে নিহত হন।[১৭৭]

৩.

মুদ্রাতাত্ত্বিক সাক্ষ্য ইঙ্গিত প্রদান করে যে, নসরত তাঁর ছোট ভাই মাহমুদকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছিলেন।[১৭৮] কিন্তু এটা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত যে তাঁর তরুণপুত্র ফিরূজ তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন, ভাই মাহমুদ নয়। ফিরূজের সিংহাসনারোহণ সম্পর্কে রিয়াজ-এর বর্ণনা নিম্নরূপ[১৭৯] "নসরত শাহ বেমানান মৃত্যু-রস পান করলে তাঁর পুত্র ফিরূজ শাহ অমাত্যদের পরামর্শে সিংহাসনে আরোহণ করেন। মনে হয় এক দল ক্ষমতাশালী অমাত্য মাহমুদের দাবি অগ্রাহ্য করে ফিরূজকে গৌড়ের সিংহাসনে বসিয়েছিলেন। আমরা কল্পনা করে নিতে পারি যে উত্তরাধিকারের প্রশ্নে অমাত্যবর্গ দু'দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিলেন—একদল মাহমুদের দাবির সমর্থন করেছিলেন, অপরদল ছিলেন ফিরূজের সমর্থক। ফিরূজের রাজত্বকাল ছিল খুবই সংক্ষিপ্ত, কারণ সে অখ্যাত অবস্থানে মাহমুদকে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল তাতে তিনি কিছুতেই সন্তুষ্ট হতে পারেন নি, এবং কথিত আছে যে অল্পকিছুদিন পরেই তিনি ফিরূজকে হত্যা করেছিলেন।"[১৮০]

আসামের সঙ্গে বাংলার যুদ্ধ ফিরূজের রাজত্বকালেও চলেছিল বলে মনে হয়। এ যুদ্ধের সঙ্গে তাঁর কোনো প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল না। মুসলমান সেনাপতি তুরবক, যার আসাম অভিযানের কথা ইতোমধ্যেই উল্লেখ করা হয়েছে, গিলধরীতে তাঁর শিবির থেকে আহোমদের সল দুর্গটি দখলের চেষ্টা করেন। আহোম সৈন্যরা বেশ বীরত্বের সঙ্গে দুর্গ রক্ষা করে এবং মুসলমানরা সলের চারপাশের ঘর-বাড়ি পুড়িয়ে দেয় এবং যুদ্ধক্ষেত্রে কয়েকজন আহোম সেনাপতিকে হত্যা করে। স্থলপথ অনুসরণ করে সল দুর্গ অতর্কিতে অধিকার করা অসম্ভব দেখে মুসলমানরা তাদের রণকৌশল পরিবর্তন করে। স্থল ও জল—উভয় পথেই অগ্রসর হয়ে তারা আহোম দুর্গ ঘিরে ফেলে। এ অবরোধ তিন দিন তিন রাত ধরে চলে এবং যে নৌযুদ্ধ হয় তাতে আহোমদের বিজয় হয়। নৌ-বাহিনীর তাজু নামে একজন কর্মকর্তা আরেকবার সল অধিকারের চেষ্টা চালান, কিন্তু দুই মুনিহিলায় তিনি পরাজিত হন। মুসলমানদের জন্য এ যুদ্ধের ফলাফল ছিল খুবই সর্বনাশা। তাঁদের সেনাপতি শঙ্গত এবং আড়াই হাজার সৈন্য এ যুদ্ধে প্রাণ হারায় এবং কুড়িটি জাহাজ ধ্বংস হয়। জনৈক হোসেন খান অশ্বারোহী, পদাতিক ও হস্তিবাহিনীসহ তুরবকের শক্তি বৃদ্ধি করতে এগিয়ে আসেন। দিকরয় নদী পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে মুসলমান সৈন্যরা আহোমদের সঙ্গে এক ভীষণ যুদ্ধে লিপ্ত হয়। কিন্তু এবারও আহোমদের হাতে তাদের শোচনীয় পরাজয় ঘটে। ১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দের শেষভাগে হোসেন খান ভরলি নদীর কাছে আহোমদের আক্রমণ করার চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি পরাজিত ও নিহত হন।[১৮১] এভাবে বাংলার সুলতানদের উত্তর ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা দখলের চেষ্টা সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ

হয়। মুসলমানদের পরাজয়ের একটা নিশ্চিত বড় কারণ ছিল গৌড় থেকে সাহায্যের অভাব এবং তাঁদের নৌ-বাহিনীর দুর্বলতা। আসামে তাঁদের ব্যর্থতার ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী। কামরূপ ও কামতাতেও তাঁরা আর তাঁদের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে পারেন নি। কোচ শক্তিকে সংগঠিত করে বিশ্বসিংহ কুচবিহারে মুসলমান শাসনের অবসান ঘটান বলে মনে হয়। এভাবে বাংলা তার আদি অবস্থায় ফিরে আসে।

কবি শ্রীধর বিদ্যাসুন্দর[১৮২] নামের এক ছন্দোবদ্ধ প্রণয় কাহিনীতে কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে বারবার ফিরুজের নামোল্লেখ করেছেন। তবে শাসক হিসেবে ফিরুজের আলাউদ্দুনিয়া ওয়া-দীন আবুল মোজাফফর ফিরুজশাহ উপাধি গ্রহণ করা ছাড়া তাঁর অন্য কোনো কৃতিত্বের কোনো বর্ণনা মুদ্রা বা শিলালিপির সাক্ষ্য থেকে পাওয়া যায় না। নিচের পংক্তিগুলিতে কবি এ সুলতান সম্পর্কে অত্যন্ত প্রশংসামূলক বর্ণনা দিয়েছেন : "সুলতান নাসির শাহের (নসরত শাহ) সুদর্শন পুত্র এক মৌমাছি যিনি সকল শিল্পকলা রূপ পদ্মের (মধু) উপভোগ করেন। সুলতান ফিরুজ কিছু প্রীতিকর গুণাবলির অধিকারী একজন দয়ালু ব্যক্তি।"[১৮৩] বিদ্যাসুন্দরের রচয়িতা, প্রকাশক ইত্যাদির বৃত্তান্ত সংবলিত অন্যএকটি শেষ পৃষ্ঠায় দেখতে পাওয়া যায় : "সুলতানদের সুলতানের (নসরত) পুত্র কর্ণের মতো উদার ও জ্ঞানী। কবি শ্রীধর বলেন যে ফিরুজ শাহ পঞ্চগুণে ভূষিত।"[১৮৪] কবিসুলভ অতিরঞ্জনের কথা বিবেচনা করেও এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে এ স্তুতিতে কিছুটা সত্যতা রয়েছে। তিনি যে একজন যোগ্য শিল্প-প্রেমিক ছিলেন সেটা তাঁর অকৃত্রিম সাহিত্য-প্রীতি থেকে বুঝা যায়—এ গুণটি তিনি নিশ্চিতভাবেই তাঁর পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছিলেন। যে সকল অভিজাত বাংলার সিংহাসনের জন্য মাহমুদের তুলনায় তাঁকে অধিকতর যোগ্য মনে করেছিলেন—তাঁরা তাঁদের সিদ্ধান্তে ফিরুজের মানবিক গুণাবলি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন বলে মনে হয়। কিন্তু হত্যাকারীর নিষ্ঠুর হাত দৃশ্যত এক অত্যুৎকৃষ্ট শাসনামলের অবসান ঘটায়।

ফিরুজের রাজত্বের নির্ভুল স্থায়িত্বকালের সমস্যাকে কেন্দ্র করে বহু বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। সেলিমের মতানুসারে তিনি তিন বছর রাজত্ব করেছিলেন।[১৮৫] কিন্তু বিব্লিওথেকা ইন্ডিকা সিরিজে রিয়াজ প্রকাশিত হওয়ার আগে রচিত তাঁর হিস্ট্রি অফ বেঙ্গলে স্টুয়ার্ট ফিরুজের রাজত্বকালের স্থায়িত্ব 'তিনমাস' বলে উল্লেখ করেছেন।[১৮৬] আমাদের কালের ঐতিহাসিকবৃন্দ এ মত গ্রহণ করেছেন,[১৮৭] কারণ তাঁরা মনে করেন যে, স্টুয়ার্ট যিনি প্রধানত রিয়াজের উপর ভিত্তি করে তাঁর গ্রন্থ রচনা করেছিলেন তিনি রিয়াজের যে পাণ্ডুলিপিটির সাহায্য নিয়েছিলেন তাতে নিশ্চয়ই তিনি 'তিন মাসের' উল্লেখ দেখতে পেয়েছিলেন। এসব পণ্ডিত মনে করেন যে, ফিরুজের শাসনামলের বিদ্যমান সাক্ষ্য মুদ্রাগুলিরও একমাত্র শিলালিপিটির তারিখ ৯৩৯ হিজরি। এ মত ঠিক নয়। তাঁর বহু মুদ্রার তারিখ ৯৩৯ হিজরি/১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দ[১৮৮] হলেও ঢাকা যাদুঘরে সংরক্ষিত ফিরুজের দু'টি মুদ্রা রয়েছে যাতে স্পষ্টভাবে তারিখ রয়েছে ৯৩৮ হিঃ/১৫৩২ খ্রিস্টাব্দ।[১৮৯] তিনটি শিলালিপি[১৯০] থেকে এটাও দেখা যায় যে ৯৩৮হিঃ/১৫৩২খ্রিস্টাব্দ

হচ্ছে নরসত শাহের রাজত্বের শেষ বছর। সুতরাং যুক্তিসঙ্গতভাবেই বলা যায় যে, ৯৩৮ হিঃ/১৫৩২ খ্রিস্টাব্দে ফিরূজ সিংহাসনে বসেছিলেন। কালনায় পাওয়া[১৯১] এ সুলতানের একমাত্র শিলালিপিটির তারিখ হচ্ছে ১লা রমজান, ৯৩৯ হিঃ/২৭ মার্চ, ১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দ। রমজান আরবি বছরের নবম মাস হওয়ায় এটা মোটামুটি নিশ্চিত যে ফিরূজ ৯৩৯ হিজরিতে প্রায় নয় মাস রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর হত্যাকারী মাহমুদ একই বছরে মুদ্রা জারি করেছিলেন।[১৯২] ইতিপূর্বে যেমন দেখান হয়েছে, ফিরূজ ৯৩৮ হিঃ/১৫৩২ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন। ৯৩৮ হিজরির শেষ মাসে সিংহাসনে বসলেও তিনি নিশ্চয়ই কমপক্ষে নয় মাস রাজত্ব করেছিলেন। বুকানন হ্যামিল্টনের পাণ্ডুয়া পাণ্ডুলিপিতে এ মতের প্রত্যক্ষ সমর্থন পাওয়া যায়। এ পাণ্ডুলিপি অনুসারে "তাঁর (নসরতের) পুত্র ফিরূজ শাহ্ নয় মাস রাজত্ব করার পর তাঁর চাচা মাহমুদ শাহের হাতে নিহত হন।"[১৯৩]

৪.

নসরত শাহের রাজত্বকালে যে ভাঙন-প্রক্রিয়ার সূত্রপাত হয়েছিল মাহমুদ শাহের রাজত্বকালে সেটা চূড়ান্ত অবস্থায় পৌঁছে। তাঁর রাজ্যের বিভিন্ন অংশে সক্রিয়, কেন্দ্র থেকে অপসরণশীল এ শক্তিকে তিনি রোধ করতে পারেন নি। দূরবর্তী এলাকাগুলির দায়িত্বে নিয়োজিত গভর্নরগণ কার্যত স্বাধীন হয়ে পড়েছিলেন বলে মনে হয়। দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে রাজনৈতিক শক্তিগুলির নতুন বিন্যাস ঘটেছিল বলে মনে হয়। খোদা বখশ খান, যিনি সম্ভবত ছিলেন মাহমুদের একজন গভর্নর ও সেনাপতি।[১৯৪] সামন্ত শাসকের মতো আচরণ করতে শুরু করেন। তিনি দ্য ব্যারোসের মানচিত্রে[১৯৫] এমটাডো দো কোভাসডোকাম রূপে চিহ্নিত কর্ণফুলি নদী ও আরাকান পাহাড়ের মধ্যবর্তী এলাকায় তার নিয়ন্ত্রণ বিস্তার করেছিলেন। তাঁর সদর দফতর সোর থেকে তিনি স্বাধীনভাবে কাজ করছিলেন। দ্য ব্যারোস তাঁর সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিশদ বিবরণ দিয়েছেন : "মুসলমান শাসকও একজন বড় ভূ-স্বামীর কোডোভাসকামের রাজ্য বাঙ্গালা ও আরাকানের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। বাঙালিরা একে তাদের রাজ্যের এবং ত্রিপুরা রাজ্যেরও অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করে। কিন্তু এ এলাকাগুলি পর্বতাকীর্ণ হওয়ায় বাঙালিরা বলে যে সেখানকার কিছু শক্তিশালী ভূ-স্বামী বাঙলার রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। একজন যখন অপরজনের চেয়ে নিজেকে বেশি শক্তিশালী বলে দাবি করে তখন প্রতিবেশী রাজ্যগুলির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা স্বাভাবিক বিধায় বাঙালি ও ত্রিপুরাবাসীদের মধ্যে সবসময়ই ঘৃণা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিরাজ করছিল। ত্রিপুরাবাসীরা চৌরাজ্যের অধিবাসীদের সঙ্গে মিত্রতার বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এ চৌরাজ্যও ছিল বাঙালিদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন।[১৯৬] এ রচনাংশটি থেকে দেখা যায় যে খোদা বখশ খানের অধীনস্থ এলাকাটির উপর বাংলার অধিকার সম্ভবত অবিসংবাদী ছিল না। এ স্থানের অধিকার নিয়ে বাংলা ও ত্রিপুরার মধ্যে প্রচণ্ড প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছিল এবং দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে বাংলার আধিপত্যকে দুর্বল করার উদ্দেশ্যে ত্রিপুরা প্রায়ই চাকমাদের রাজ্যের সঙ্গে মিত্রতা

স্থাপন করত। সম্ভবত এটা ছিল বাংলা ও ত্রিপুরার মধ্যে শত্রুতার অনুবর্তন যা হোসেন শাহের আমলে তাৎপর্যপূর্ণ গুরুত্ব লাভ করেছিল। মাহমুদের রাজত্বকালে এ দু'দেশের মধ্যে সম্পর্কের বিস্তারিত বিবরণ সম্ভবত কোনোদিনই জানা যাবে না,কারণ রাজমালা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নীরব এবং দ্য ব্যারোসই আমাদের তথ্যের একমাত্র উৎস। কিন্তু দ্যা ব্যারোস কর্তৃক সরবরাহকৃত অসম্পূর্ণ বিবরণ এ ইঙ্গিত দেয় যে, উত্তর-পশ্চিম-সীমান্তে মাহমুদের দুর্বল অবস্থানের সুযোগ নিয়ে ত্রিপুরা বাংলার ক্ষতিসাধন করে তার আঞ্চলিক বিস্তৃতির এক দুঃসাহসিক চেষ্টা করেছিল। এ পরিস্থিতিতে আরাকান রাজ্যে কি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল তা জানা যায় না। খোদা বখশের ভাগ্যে কি ঘটেছিল তাও একইরকম অনিশ্চিত। তবে ক্যাস্টেনহেডার বর্ণনা[১৯৭] থেকে মনে হয় যে শের খান সূর চূড়ান্তভাবে বাংলা দখল করার পূর্ব পর্যন্ত তিনি তাঁর এলাকা শাসন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আরাকান বা ত্রিপুরার মতো রাজ্যকে যে তিনি প্রতিহত করতে পেরেছিলেন এটা তাঁর কর্মদক্ষতা ও শক্তির পরিচায়ক যা বহুলাংশে ছিল মুসলমানদের "সামরিক শৃঙ্খলা ও গোলন্দাজ বাহিনীর" কারণে। দ্য ব্যারোস এর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন।[১৯৮] দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে এসব ঘটনার ব্যাপারে মাহমুদের কোনো প্রত্যক্ষ অবদান ছিল বলে মনে হয় না।

সে যাই হোক, ইতিহাসের ছাত্রদের কাছে মাহমুদের রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের বিষয়টি দারুণ কৌতূহলোদ্দীপক। সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে হাজীপুরের গভর্নর মখদুম আলম বিহারের লোহানী সুলতানের প্রতিনিধি শের খানের সঙ্গে মৈত্রী-বন্ধনে আবদ্ধ হন। মাহমুদ ১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দে মুঙ্গেরের গভর্নর কুতুব খানকে বিহার আক্রমণের লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে মখদুমের বিরুদ্ধে পাঠান। শের খান বৃথাই বাংলার সুলতানকে এ কর্মপন্থা গ্রহণ করা থেকে বিরত করার চেষ্টা করেন। শের খানের হাতে কুতুব খান পরাজিত ও নিহত হলে শের খান বাংলার ধনদৌলত দখল করে নিজের শক্তি বৃদ্ধি করেন।[১৯৯] মাহমুদের জন্য এটা ছিল একটা সামরিক পরাজয় যা শেষপর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক বিপর্যয় ডেকে আনে। শেরখান বা মখদুম, কাউকেই আর বাংলার পক্ষে নিয়ে আসা সম্ভব ছিল না। এর ফলে মোগল-বিরোধী একটি জোট গঠনের সম্ভাবনা চিরতরে নষ্ট হয়ে যায়।

মাহমুদ মখদুম আলমের বিরুদ্ধে এক সৈন্যবাহিনী পাঠান। মখদুম বহুলাংশে শের খানের সাহায্যের উপর নির্ভরশীল থাকতে আগ্রহী ছিলেন। শের হাজীপুরে ব্যক্তিগতভাবে তাঁর সাথে যোগ দিতে রাজি থাকলেও এটা সম্ভব হয় নি। জালাল খান ও তাঁর লোহানী সমর্থকরা এতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে। ফলে তাঁকে তাঁর একজন প্রতিনিধিকে মখদুমের কাছে পাঠাতে হয়। এরপর যে যুদ্ধ হয় তাতে মখদুম পরাজিত ও নিহত হন।[২০০] এ ঘটনার প্রতি লোহানীরা যে মনোভাব দেখিয়েছিল তা থেকে এ ইঙ্গিত পাওয়া যায় বলে মনে করা যেতে পারে যে শের খানের বিরুদ্ধে সম্মিলিত কার্যক্রম গ্রহণের উদ্দেশ্যে তাঁরা ইতোমধ্যে মাহমুদের সঙ্গে একটা পারস্পরিক বোঝাপড়ায় পৌঁছেছিল। মখদুমের মৃত্যুতে মাহমুদের কোনো লাভ হয়েছিল বলে মনে

হয় না, কারণ শক্তিশালী ঐ গভর্নরের অপসারণের ফলে গণ্ডকের অপর তীরবর্তী গোটা এলাকা আফগান ও মোগল উভয়ের জন্যই উন্মুক্ত হয়ে পড়ে।

বিহারে লোহানী দরবারের ঘটনাপ্রবাহ ছিল যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। আফগানরা দু'টি শত্রুভাবাপন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল বলে মনে হয়, অর্থাৎ এক দলে ছিল শের খানের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ সূরীরা এবং তাদের বিরুদ্ধ দলে ছিল তাদের রাজকীয় পৃষ্ঠপোষক জালাল খান লোহানীর সমর্থক লোহানীরা। শের খানকে হত্যা করার চেষ্টা ব্যর্থ হলে লোহানীরা জালাল খানকে বাংলার মাহমুদের বশ্যতা স্বীকারের উপদেশ দেয়। বাংলা আক্রমণের ভান করে জালাল মাহমুদের সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হন। মাহমুদ তখন বিহার আক্রমণের উদ্দেশ্যে ইব্রাহিম খানের নেতৃত্বে গোলন্দাজ, অশ্বারোহী এবং পদাতিক সৈন্য নিয়ে গঠিত এক বাহিনী প্রেরণ করেন। ১৫৩৪ খ্রিস্টাব্দে সুরুজগড়ের সমতলভূমিতে সংঘটিত এ যুদ্ধে ইব্রাহিম পরাজিত ও নিহত হন এবং জালাল মাহমুদের কাছে ফিরে যেতে বাধ্য হন।[২০১] শেরখানের নিয়ন্ত্রণে ধৈর্যচ্যুত হয়ে বাংলার সুলতানের সাহায্য নিয়ে তাঁর হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য জালাল মাহমুদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর ইচ্ছা কোনোদিনই পূর্ণ হয় নি। তাঁর বাংলায় পালিয়ে যাওয়া বিহারে শের খানের উত্থানকে সহজ করে তুলেছিল। মখদুমের সাহায্যকারী শেরকে শাস্তিদান এবং বিহারের অংশবিশেষ দখল, এ দুই উদ্দেশ্যে মাহমুদ তাঁকে সাহায্য করেছিলেন। কিন্তু জালালের পরাজয় তাঁর এ উচ্চাভিলাষ নষ্ট করে দেয়। এ যুদ্ধের ফলে মাহমুদের সৈন্যবাহিনীর দুর্বলতা এবং তাঁর প্রতিপক্ষের শক্তি প্রকাশ পায়। কাজেই সুরুজগড়ের যুদ্ধ গুরুত্বহীন ছিল না।

গুজরাট নিয়ে হুমায়ুন সার্বক্ষণিকভাবে ব্যাপৃত থাকার সুযোগ নিয়ে ১৫৩৫ সালে শের ভাগলপুর পর্যন্ত এলাকা দখল করে নেন। ১৫৩৬ সালে তিনি তেলিয়াঘড়ির কাছে উপস্থিত হন, তবে পর্তুগিজ সৈন্যদের সহায়তায় বাংলার সৈন্যবাহিনী এটাকে রক্ষা করে। এ গিরিপথ দিয়ে বাংলায় প্রবেশ করা প্রায় অসম্ভব বুঝতে পেরে তিনি তাঁর পুত্র জালালের অধীনে সেখানে একদল সৈন্য রেখে ঝাড়খণ্ড হয়ে অপ্রত্যাশিতভাবে গৌড়ের কাছে উপস্থিত হন। আকস্মিকভাবে শের কাছে চলে আসায় মাহমুদ ভীষণ ভীত হয়ে পড়েন। পর্তুগিজরা তাঁকে গোয়া থেকে সাহায্য আসা পর্যন্ত প্রতিরোধ করার পরামর্শ দিলেও মাহমুদ প্রচুর ক্ষতিপূরণ দিয়ে শেরখানের শত্রুতার কবল থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা করেন। শেরখান তখন তেলিয়াঘড়ি[২০২] পর্যন্ত তাঁর এলাকা বিস্তৃত করেন। সে সময় তেলিয়াঘড়িকে যথার্থভাবেই বাংলার প্রবেশপথ বলে গণ্য করা হতো।

এ সময় বাংলার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে এক নতুন শক্তি সক্রিয় হয়ে উঠছিল। বাংলার ইতিহাসে হোসেন শাহী আমলে এ দেশে পর্তুগিজ শক্তির আবির্ভাব দেখা যায়। মাহমুদের পূর্বসূরি হোসেন এবং নসরত খুব সম্ভব পর্তুগিজদের প্রতি সহানুভূতির মনোভাব পোষণ করতেন না। পর্তুগিজরা তখন বাংলায় বাণিজ্যিক সুবিধা চাচ্ছিল। এফোন্সো দ্য মেলো এবং ডুয়ার্টে দ্য আজেভেডো দৃশ্যত "বাংলায় বাণিজ্য শুরু করার উদ্দেশ্যে" ১৫৩২ সালে চট্টগ্রামে এসেছিলেন। সুলতান তাঁদের সাদরে গ্রহণ

করেন নি এবং তাঁর প্ররোচনায় চট্টগ্রামে বহু পর্তুগিজকে হত্যা করা হয়েছিল। মেলো এবং আজেভেডোকেও বন্দি করা হয়। গোয়ার পর্তুগিজ গভর্নর নুলো দ্য গুনহা পর্তুগিজদের প্রতি সুলতানের মনোভাবের ব্যাখ্যা চেয়ে এবং অবিলম্বে অ্যাফোন্সো দ্য মেলোর মুক্তি দাবি করে ১৫৩৪ সালে অ্যান্টোনিও দ্য সিলভা মেনেজেসকে বাংলায় পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু শের শাহের আক্রমণ প্রতিহত করতে মাহমুদের পর্তুগিজ সামরিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীল হতে বাধ্য হওয়ার আগে পর্যন্ত বাংলার সঙ্গে পর্তুগিজদের সম্পর্কের কোনো উন্নতি হয় নি। ১৫৩৭ সালে পর্তুগিজ গভর্নর তাঁকে জানান যে এখনি তিনি তাঁকে সাহায্য করতে অক্ষম, কিন্তু পরের বছর 'নিশ্চিতভাবেই' তিনি তা করতে পারবেন। ইতোমধ্যে মাহমুদ তাদের চট্টগ্রাম ও সোনারগাঁওয়ে দুর্গ ও কুঠি নির্মাণের অনুমতি দিয়েছিলেন। এসব বাণিজ্যিক কেন্দ্রে শুল্ক-ফাঁড়ি স্থাপনের এবং স্থানীয় জনগণের কাছ থেকে কর আদায়ের অধিকার লাভ বাংলায় পর্তুগিজদের ক্ষমতা বহুলাংশে বৃদ্ধি করে।[২০৩] অদূরদর্শী হওয়ায় মাহমুদ বুঝতেই পারেন নি যে এ ধরনের বিশেষ সুবিধাদান তাঁর রাজ্যের কতটুকু আর্থিক লোকসান ঘটাবে। প্রায় একই সময়ে চট্টগ্রাম ও সোনারগাঁওয়ে "বাংলায় পর্তুগিজদের প্রথম কুঠি প্রতিষ্ঠার" ফলে দেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বিপন্ন হওয়ার উপক্রম হচ্ছিল।[২০৪] আলাউদ্দীন হোসেন শাহ এবং নসরত শাহ সযত্নে বাংলার বাণিজ্যিক স্বার্থ রক্ষা করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের অযোগ্য উত্তরসূরি মাহমুদ শাহ এভাবে সহজেই সেগুলি বিসর্জন দেন।

আগের বছরের চেয়ে ১৫৩৭ সালে শের খানের অবস্থার অনেক উন্নতি ঘটেছিল, কারণ তিনি শুধু কার্যত বিহারের শাসকই হননি, তিনি তেলিয়াঘড়ি গিরিপথের একচ্ছত্র অধিপতিও হয়েছিলেন। বাংলার মাহমুদ অবিবেচক ও নির্বোধ ছিলেন এবং তিনি শের-এর সমকক্ষ ছিলেন না, এমনকি সম্রাট হুমায়ুনও শের-এর সমতুল্য ছিলেন না। পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ এটাই স্পষ্টভাবে তুলে ধরে। দ্বিতীয়বারের মতো শের গৌড়ে এসে বার্ষিক কর হিসেবে মাহমুদের কাছে এক বিশাল অঙ্কের টাকা দাবি করেন। মাহমুদ এ দাবি পূরণ করতে অস্বীকার করলে শের গৌড় অবরোধ করেন। চুনার অবরোধের উদ্দেশ্যে হুমায়ুন চুনারের দিকে অগ্রসর হলে গৌড় দখল সম্পূর্ণভাবে শেষ হওয়া পর্যন্ত চুনারে মোগলদের যুদ্ধে ব্যস্ত রাখার উদ্দেশ্যে শের গৌড় অবরোধ চালিয়ে যাবার জন্য জালাল খান ও খওয়াস খানকে রেখে দ্রুতবেগে চুনায় চলে আসেন। বাঙ্গালিরা অনাহারের সম্মুখীন হওয়ার উপক্রম হলে মাহমুদ দুর্গ থেকে বের হয়ে শত্রুর সম্মুখীন হন। কিন্তু যুদ্ধে আহত ও পরাজিত হয়ে তিনি উত্তর বিহারের হাজীপুরের দিকে পালিয়ে যান। এভাবে ১৫৩৮ সালের ৫ এপ্রিল গৌড় আফগানদের করতলগত হয়। চুনার দখলের পর তখন বরকুণ্ডায় অবস্থানরত হুমায়ুনের কাছে মাহমুদ একজন দূত পাঠিয়ে হুমায়ুনকে বাংলায় শের-এর সৈন্যবাহিনীকে আক্রমণ করার অনুরোধ জানান। দরবেশপুরে হুমায়ুনের সঙ্গে মিলিত হয়ে তিনি তখন বাংলা অভিমুখে অগ্রসর হন। কহলগাঁওয়ে এসে গৌড়ে আফগানদের হাতে তাঁর দুই পুত্রের হত্যার সংবাদ পেয়ে বাংলার হতভাগ্য সুলতান নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণায় প্রাণত্যাগ করেন।[২০৫]

এভাবে ১৫৩৮ সালে বাংলার স্বাধীনতার অবসান ঘটে। তাঁর বিখ্যাত পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া রাজনৈতিক সুবিধাদি নিজের কাজে লাগানোর মতো যোগ্যতা মাহমুদের ছিল না। কূটনৈতিক দূরদর্শিতা বা তাঁর রাজত্বকালে যে সব রাজনৈতিক সমস্যা বাংলার জীবনকে ঘিরে ধরেছিল তার কোনো বাস্তব সমাধানের পথ—কোনোটাই তাঁর ছিল না। ১৫৩৭ সালের আগে পর্তুগিজদের নিজপক্ষে আনতে সক্ষম হলে শের-এর আগ্রাসন প্রতিরোধে তাদের সমর্থন ফলপ্রসূভাবে ব্যবহার করা যেত। কিন্তু অনেক দেরিতে পরিস্থিতির কারণে তাদের সাহায্য নিতে বাধ্য হওয়ার আগে পর্যন্ত এ ধরনের কার্যক্রমের কথা তিনি স্বপ্নেও ভেবেছিলেন বলে মনে হয় না। শের বা হুমায়ুনের সঙ্গে আগে মৈত্রী করলে ১৫৩৮ সালের বিপর্যয়কে হয়তো আরও কয়েক বছর বিলম্বিত করা যেত, কিন্তু রাজনৈতিক পরিস্থিতি উপলব্ধি করতে মাহমুদ সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছিলেন।

১৫৩৮ সাল বাংলার ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ যুগের সমাপ্তি নির্দেশ করে। তখন থেকে শুরু হয় বিশৃঙ্খলা ও বিভ্রান্তির যুগ যা বাংলার জীবনকে সপ্তদশ শতকের গোড়ার দিক পর্যন্ত অশান্ত করে রেখেছিল।

টীকা

১. সেলিম : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১২৮-২৯ এবং ১৩২; ফিরিশতা : তারিখ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩০১।

২. নিজামউদ্দীন : পূর্বোল্লিখিত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৭০।

৩. পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১২৮।

৪. ফিরিশতা : পূর্বোল্লিখিত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩০১।

৫. সেলিম : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১৩২; পরিশিষ্ট খ।

৬. ফিরিশতা : পূর্বোল্লিখিত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩০১; সেলিম : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১২৮; তুলনীয় : হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪০।

৭. সেলিম : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১২৯-৩০।

৮. ফিরিশতা : পূর্বোল্লিখিত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩০১; সেলিম : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১২৮-২৯।

৯. পূর্বোল্লিখিত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৭০।

১০. জে. এ. এস. বি. ১৮৭৩, পৃ. ২৮৭।

১১. সেলিম : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১২৯; ফিরিশতা : পূর্বোল্লিখিত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩০১।

১২. নিজামউদ্দীন : পূর্বোল্লিখিত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৭০; সেলিম : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১৩০ ও ১৩২-৩৩; ফিরিশতা : ২য় খণ্ড, পৃ. ৩০১; তুলনীয় : হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৪।

১৩. হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৫।

১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭।

১৫. জে. এ. এস. বি. ১৮৭৩, পৃ. ২৯০-৯১, প্লেট ৬, নং ২। আবিদ আলী : মেময়েরস অফ গৌড় অ্যান্ড পাণ্ডুয়া, পৃ. ১১৪-১৫; কানিংহাম : এ. এস. আর ১৫শ খণ্ড, পৃ. ৮৪ এবং র‍্যাভেনশ : গৌড়, ইটস রুইন্স অ্যান্ড ইনস্ক্রিপশন্স, পৃ. ৭৭। সুতরাং এটা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত যে মুজাফফরের রাজত্বকালের সর্বশেষ লিপিবদ্ধ তারিখ হচ্ছে ১৭ই রমজান, ৮৯৮ হিজরি/২রা জুলাই, ১৪৯৩ খ্রিস্টাব্দ। মালদহ লিপিতে উল্লিখিত তারিখের ভিত্তিতে হিস্ট্রি অফ বেঙ্গলে (২য় খণ্ড, পৃ. ১৪১) বর্ণিত এ তারিখ ১০ই রবি-উল-আউয়াল, ৮৯৮ হিজরি/৩১শে ডিসেম্বর, ১৪৯২ খ্রিস্টাব্দ নয়। দেখুন, ই. আই. এম, ১৯২৯-৩০, পৃ. ১৩, প্লেট ৭(ক); পি. এ. এস. বি. ১৮৯০, পৃ. ২৪২; এস. আহমদ : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১৪৮।

১৬. এইচ. এন. রাইট : ক্যাটালগ, ২য় খণ্ড, ২য় অংশ, পৃ. ১৭২-৭৬, প্লেট ৫ (বাংলা), নং ১৬৭ ও ১৬৯; লেন-পুল : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৪৪-৪৮, প্লেট ৫ ও ৬, নং ১০৮, ১০৯, ১১৬ এবং ১২৩; এ ডব্লিউ. বোথাম : ক্যাটালগ অফ দি প্রভিন্সিয়াল কয়েন ক্যাবিনেট অফ আসাম, পৃ. ১৬৬, ১৬৮ ও ১৭০, প্লেট ২, নং ১, প্লেট ৪, নং ৫; নিচে পরিশিষ্ট ক।

১৭. নিজামউদ্দীন : পূর্বোল্লিখিত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩১৯ এবং ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৮৭; সেলিম : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১৩৫; ফিরিশতা : পূর্বোল্লিখিত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮১ এবং ২য় খণ্ড, পৃ. ৩১০। তুলনীয়, হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৫।

১৮. নিজামউদ্দীন : পূর্বোল্লিখিত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩২০; আব্দুল কাদির বদাউনী : মুন্তাখাব-উত-তাওয়ারিখ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩১৬-১৭; ফিরিশতা : পূর্বোল্লিখিত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮১-৮২। তুলনীয়, হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৫-৪৬।

১৯. জে. এ. এস. বি. ১৮৭২, পৃ. ৩৩৫ এবং ১৮৭৪, পৃ. ৩০৪; পি. এ. এস. বি. ১৮৭০, পৃ. ২৯৭; তুলনীয়, হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৬।

২০. লেন-পুল : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১০৭; বোথাম : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ২০৪-০৫; এইচ. এন রাইট : ক্যাটালগ, ২য় খণ্ড, পৃ. ২১৮-১৯, নং ১৪৮-১৫৫।

২১. পূর্বোল্লিখিত, ভূমিকা, পৃ..১।

২২. পূর্বোল্লিখিত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২০৭।

২৩. ক্যাটালগ অফ দি প্রভিন্সিয়াল ক্যাবিনেট অফ কয়েন্স, ইস্টার্ন বেঙ্গল অ্যান্ড আসাম, পৃ. ১০৮।

২৪. প্রাগুক্ত।

২৫. প্রাগুক্ত; পৃ. ১০৮; এইচ. এন. রাইট : ক্যাটালগ, ২য় খণ্ড, পৃ. ২০৭; লেন-পুল : পূর্বোল্লিখিত, ভূমিকা, পৃ. ১।

২৬. কুতবন : মৃগাবত, অধ্যাপক আসকারি কর্তৃক উদ্ধৃত, জে. বি. আর এস. ১৯৫৫, ডিসেম্বর XLI, ৪র্থ অংশ, পৃ. ৪৫৮-৫৯।

২৭. "বেঙ্গলস রিলেশন্স উইথ হার নেইবারস"... প্রবন্ধে আলোচিত, পূর্বোল্লিখিত,।

২৮. জাহাঙ্গীরের আমলে কামতার রাজা ছিলেন লক্ষ্মীনারায়ণ এবং তাঁর জ্ঞাতিভ্রাতা পরিক্ষিত নারায়ণ ছিলেন কামরূপের রাজা। লক্ষ্মী-নারায়ণের সাহায্যে মোগলরা কামরূপের রাজাকে দমন করেছিলেন। মির্জা নাথান : বাহারিস্তান-ই-গায়েবী, ইংরেজি অনুবাদ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪৯-৫২; ২য় খণ্ড, পৃ. ৮০৬-০৭, টীকা ১৫ ও ১৬।

২৯. মার্টিন : পূর্বোল্লিখিত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪১০-১১ এবং ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৮০; সেলিম : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১৩৪।

৩০. "কন্ট্রিবিউশন্স টু দি হিস্ট্রি অ্যান্ড এথনোলজি অফ নর্থ-ইস্টার্ন ইন্ডিয়া", জে. এ. এস. বি. ১৯১০, ৬ষ্ঠ খণ্ড, নং ৪, পৃ. ১৫৮।

৩১. এইচ. এন. রাইট : ক্যাটালগ, ২য় খণ্ড, ২য় অংশ, পৃ. ১৭৫-৭৬, নং ১৯৪-৯৭, প্লেট ৫; "বেঙ্গলস রিলেশন্স উইথ হার নেইবারস..." পূর্বোল্লিখিত।

৩২. ব্লখম্যান : "কন্ট্রিবিউশন্স টু দি জিওগ্রাফি অ্যান্ড হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল", ৩য় অংশ, জে. এ. এস. বি, ১৮৭৫, নং ৩; পৃ. ৩০৬। হোসেন শাহী মুদ্রার অনুরূপ অন্যান্য ধরনের কোচ মুদ্রার কথাও স্ট্যাম্পলটন উল্লেখ করেছেন। "কন্ট্রিবিউশন্স টু দি হিস্ট্রি..."। জে. এ. এস. বি. ১৯১০, ৪র্থ অংশ, নং ৪, পৃ. ১৫৮।

৩৩. ভি. এ. স্মিথ : ক্যাটালগ অফ দি কয়েন্স ইন দি ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম, ক্যালকাটা, ১ম খণ্ড, প্লেট ২৯, নং ১। জে. এ. এস. বি. ১৯১০, নং ৪, পৃ. ১৬৩।

৩৪. রাইট : ক্যাটালগ, ২য় খণ্ড, ২য় অংশ, প্লেট ৫, নং ২০৮ ও ২১৬; প্লেট ৬, নং ২১৭; জে. এ. এস. বি. ১৯১০, ৪র্থ খণ্ড, নং ৪, প্লেট ২৩, নং ১১, ১২ ও ১৩।

৩৫. জে. আর. এ. এস. ১৯০৮, প্লেট ২, চিত্র ৯।

৩৬. লেন-পুল : পূর্বোল্লিখিত, প্লেট ৭, নং ১৪৭ ও ১৪৯; জে. আর. এ. এস. ১৯০৮, পৃ. ৬৮৭, নং ১ এবং ২; "বেঙ্গলস রিলেশন্স উইথ হার নেইবারস..." প্রবন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচিত, পূর্বোল্লিখিত।

৩৭. ই. এইচ. ওয়াল্‌শ : "দি কয়েনেজ অফ নেপাল", জে. আর. এ. এস, ১৯০৮, পৃ. ৬৮৪-৮৬। স্ট্যাপলটন : "কন্ট্রিবিউশন্স টু দি হিস্ট্রি...." জে. এ. এস. বি. ১৯১০, ৪র্থ খণ্ড, নং ৪, পৃ. ১৬২।

৩৮. জে. এ. এস. বি. ১৮৯৫ LXIV, নং ৩, প্লেট ২৪, নং ৯; জে. এ. এস. বি. ১৯১০, ৪র্থ খণ্ড, নং ৪, প্লেট ২২, নং ৯।

৩৯. প্রাগুক্ত, ১৯১০, ৪র্থ খণ্ড, প্লেট ২৩, নং ১১ ও ১৩।

৪০. ফেয়ার : হিস্ট্রি অফ বার্মা ইনক্লুডিং বার্মা প্রপার, পেগু, টৌঙ্গু, টেনাসেরিম অ্যান্ড আরাকান, পৃ. ৭৮-৮০। জি. ই. হার্ভে : হিস্ট্রি অফ বার্মা ফ্রম দি আর্লিয়েস্ট টাইমস টু টেন্থ মার্চ, ১৮২৪, দি বিগিনিং অফ দি ইংলিশ কংকোয়েস্ট, পৃ. ১৪০।

৪১. এইচ. এন রাইট : ক্যাটালগ, ২য় খণ্ড, ১ম অংশ, প্লেট ১-৩, নং ২, ১২, ২৫, ৩১, ৪১, ৫২ ইত্যাদি ; বোথাম : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৭২-৭৪ এবং ৭৬-৭৮ প্রভৃতি; বোথাম ও

ফ্রীয়েল : সাপ্লিমেন্ট টু দি ক্যাটালগ অফ দি প্রভিন্সিয়াল ক্যাবিনেট অফ কয়েন্স, আসাম, পৃ. ৩০-৩২ ইত্যাদি; স্ট্যাপলটন : ক্যাটালগ অফ দি প্রভিন্সিয়াল ক্যাবিনেট অফ কয়েন্স ইত্যাদি, পৃ. ৫৮-৬১।

৪২. মির্জা মোহাম্মদ কাজিম : আলমগীরনামা, পৃ. ৭৩০-৩১।

৪৩. বডলেন পাণ্ডুলিপি , অর ৫৮৯, ফলিও ৩৫খ; ব্লখম্যানকৃত ইংরেজি অনুবাদ, জে. এ. এস. বি. ১৮৭২, পৃ. ৭৯।

৪৪. পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১৩৪। হোসেন শাহের আসাম অভিযান সম্পর্কে সেলিমের বিবরণ সম্পূর্ণভাবে আলমগীরনামা ও ফতিয়াহ-ই-ইব্রিয়ার উপর ভিত্তি করে রচিত বলে মনে হয়।

৪৫. দি আহোম বুরঞ্জী : জি. সি. বড়ুয়া কর্তৃক সম্পাদিত ও ইংরেজিতে অনূদিত, পৃ. ৬১ ও ৬৬-৬৭।

৪৬. ই. এ. গেইট : এ হিস্ট্রি অফ আসাম, পৃ. ৮৮।

৪৭. এস. এন. ভট্টাচার্য : এ হিস্ট্রি অফ মোগল নর্থ-ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার পলিসি, পৃ. ৮৬, টীকা।

৪৮. রাজমালা, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪।

৪৯. প্রিন্সেপের ইউসফুল টেবলস এ পুনর্মুদ্রিত আসাম বুরঞ্জী অনুসারে দুলাল গাজী বা দানিয়ালের পরবর্তী দু'জন গভর্নর ছিলেন যথাক্রমে মুসুন্দর গাজী এবং সুলতান গিয়াসউদ্দীন; জে. এ. এস. বি. ১৮৭২, পৃ. ৩৩৫। কিন্তু জি. সি. বড়ুয়া সম্পাদিত ও অনূদিত আহোম বুরঞ্জীতে এ বিবরণ পাওয়া যায় না। বুরঞ্জীর অন্যান্য অনুবাদেও এটা অনুপস্থিত। এসব কারণে বর্তমান লেখক এ তথ্যকে অসঙ্গত বলে কোনো গুরুত্ব দিতে অনিচ্ছুক।

৫০. জে. এ. এস. বি. ১৮৭৪, পৃ. ৩০৩; আবিদ আলী : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১৫৭-৫৮; দানী : বিব্লিওগ্রাফি পৃ. ৪৯ এবং এস. আহমদ : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১৫৯।

৫১. রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় : বাঙ্গলার ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪৭-৪৮ এবং ২৫১; ব্লখম্যান : জে. এ. এস. বি. ১৮৭২, পৃ. ৭৯, টীকা এবং পৃ. ৩৩৫; ১৮৭৩, পৃ. ২৪০ এবং ১৮৭৪, পৃ. ২৮১; এ. সালাম : রিয়াজের ইংরেজি অনুবাদ, পৃ. ১৩২; হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৬-৪৭; গেইট : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৪১, ৪৩ এবং ৮৮; রজনীকান্ত চক্রবর্তী : গৌড়ের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃ. ১১৩।

৫২. জে. এ. এস. বি. ১৮৭২, পৃ. ৩৩৫; দানী : বিব্লিওগ্রাফি, পৃ. ৪৭ এবং এস. আহমদ : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১৫৩-৫৪; বদাউনী : পূর্বোল্লিখিত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩১৭।

৫৩. লেন-পুল : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৪৭, প্লেট ৬, নং ১২২; এইচ. এন. রাইট : ক্যাটালগ, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭৩, প্লেট ৫, নং ১৭৩ (বাংলা); বোথাম : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১৬৯-৭১; এন. কে. ভট্টশালী : হাকিম হাবিবুর রহমান; কালেকশন অফ কয়েন্স, পৃ. ২৪, প্লেট ২, নং ১২০।

৫৪. মার্টিন : পূর্বোল্লিখিত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৮০ এবং ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪১০।

৫৫. রিসালাত-উস-শুহাদা, ১৮৭৪ সালের জে. এ. এস. বির ২৩৫ ও ২৩৭-৩৮ পৃষ্ঠায় মূল পাঠ।

৫৬. হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০।

৫৭. মিনহাজ : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১৫৪।

৫৮. গেইট : পূর্বোল্লিখিত, , পৃ. ৪৩।

৫৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১ এবং ৮৮; গুণভীরম বড়ুয়া : আসাম বুরঞ্জী, পৃ. ৪৯।

৬০. এ বিষয়ে আমার "দি ডেটস অফ হোসেন শাহ'স এক্সপিডিশন্স এগেইনস্ট কামরূপ অ্যান্ড উড়িষ্যা" প্রবন্ধটি দেখুন, জে. এন. এস. আইন. খণ্ড ১৯, ১৯৫৭, ১ম অংশ, পৃ. ৫৪-৫৮।

৬১. লেন-পুল : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৪৭, প্লেট ৬, নং ১২২।

৬২. জে. এ. এস. বি. ১৯২২, পৃ. ৪১৩, প্লেট ৯; দানী : বিব্লিওগ্রাফি, পৃ. ৫৮ এবং এস. আহমদ : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ২৫।

৬৩. দি বুক অফ ডুয়ার্টে বার্বোসা, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৪। বার্বোসা আরও উল্লেখ করেছেন যে দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার অধিবাসীরা বিজয়নগরের শাসনাধীন ছিল (পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১৩৫)। এ উক্তির কিছুমাত্র ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে বলে মনে হয় না। বার্বোসা উড়িষ্যা ও জাজনগরের সীমানা সম্পর্কে এ মন্তব্য করলে তা বিবেচনার যোগ্য হতো, কারণ মাঝে মাঝে এ দু'টি দেশের মধ্যে যুদ্ধ চলত। আর. ডি. ব্যানার্জি : হিস্ট্রি অফ উড়িষ্যা, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩২৩-৩২৬। বাংলা ও বিজয় নগরের মধ্যে কোনো যুদ্ধ হয়নি এবং এ দু'টি রাজ্য পাশাপাশিও নয়। এটা খুবই সম্ভাব্য যে বার্বোসা উড়িষ্যাকে বিজয়নগরের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছেন।

৬৪. পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১৩৩।

৬৫. মার্টিন : পূর্বোল্লিখিত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬১৯।

৬৬. বৃন্দাবন দাস : চৈতন্য-ভাগবত, অন্ত্য, ৪র্থ পরিচ্ছেদ, পৃ. ৩৫০ এবং ৩৫১; "হোসেন শাহ ইন বেঙ্গলি লিটারেচার" এ আমার দ্বারাও উদ্ধৃত, আই. এই. কিউ. খণ্ড ২৩, মার্চ, ১৯৫৬, নং ১, পৃ. ৬২ টীকা ১৮।

৬৭. *বৃন্দাবন দাস : পূর্বোল্লিখিত, অন্ত্য, ২য় পরিচ্ছেদ, পৃ. ৩১৬ : "প্রভু, যেহেতু এখন* সময়টা বিপজ্জনক, দু'দেশের মধ্যে রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। গুপ্তচরদের হাতে ধরাপড়া ভ্রমণকারীদের শূলে চড়ানোর উদ্দেশ্যে রাজারা বিভিন্ন স্থানে ত্রিশূল পুঁতে রেখেছেন। আমি এ স্থানের দায়িত্বে নিযুক্ত কর্মকর্তা। তাঁদের হাতে ধরা পড়লে আমি বিপদে পড়ে যাব। এ অবস্থায় আপনি যেতে চাইলে আপনার দেওয়া যে-কোনো আদেশ আমি মেনে নেব।" আই. এইচ. কিউতেও উদ্ধৃত, পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৬২, টীকা ১৯।

৬৮. কৃষ্ণদাস কবিরাজ : পূর্বোল্লিখিত, মধ্য, ষোড়শ পরিচ্ছেদ, পৃ. ১৭৯। চৈতন্যকে উদ্দেশ্য করে কর্মকর্তা বলেন :

"সামনের অঞ্চল মাতাল মুসলমান রাজার অধীনে। তাঁর ভয়ে কেউ রাস্তায় হাঁটতে পারে না। পিচ্ছলদা পর্যন্ত সমগ্র ভূ-ভাগই রাজার অধীনে এবং তাঁর ভয়ে কেউ নদী পার হতে পারে না। তাঁর সঙ্গে আমাদের সন্ধি স্থাপন করা পর্যন্ত কয়েকদিন অপেক্ষা করুন। তখন আমরা সহজেই নৌকা দিয়ে আপনাকে পাঠিয়ে দেব।" (৬৭ ও ৬৮ নং টীকা মূল থেকে লেখক কর্তৃক অনূদিত) আরও দেখুন আই. এইচ. কিউ. পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৬২, ২০ নং টীকায় প্রাসঙ্গিক বাংলা মূল পাঠ উদ্ধৃত করা হয়েছে। প্রায় একইরকম বিবরণ চৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটকের নব অঙ্কে পাওয়া যায় : এস. মুখোপাধ্যায় : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ২০০-২০১ এ উদ্ধৃত।

৬৯. কৃষ্ণদাস কবিরাজ : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১৯৭; আই. এইচ. কিউ. পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৬৩।

৭০. জে. এ. এস. বি. খণ্ড LXXIX, ১৯০০, ১ম অংশ, নং ২, পৃ. ১৮৬; এস. মুখোপাধ্যায় : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ২০৫-০৭।

৭১. জে. এ. এস. বি. প্লেট ৯, পৃ. ৪১৩। লিপির শুধুমাত্র প্রাসঙ্গিক অংশটুকুই এখানে উদ্ধৃত করা হয়েছে। এর বাকি অংশটুকু সুলতান ফিরুজ শাহের রাজত্বকালে ৭০৩ হিজরিতে সিকান্দর খান গাজী কর্তৃক আরসাহ্ শ্রীহট্ট বিজয় সম্পর্কিত।

৭২. উপরে, পৃ. ৩৮ ও পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহ।

৭৩. আর. ডি. ব্যানার্জি : হিস্ট্রি অফ উড়িষ্যা, ১ম খণ্ড, ৩২২-৩৫।

৭৪. উপরে পৃ. ৪৪ ও পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহ।

৭৫. উপরে পৃ. ৪৫।

৭৬. আর. ডি. ব্যানার্জি : হিস্ট্রি অফ উড়িষ্যা, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩২৮; এস. মুখোপাধ্যায় : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ২১০। ১৪২২ শকাব্দ/১৫০০ খ্রিস্টাব্দের অন্য একটি লিপিতে প্রতাপ রুদ্রদেব "গৌড়াধিপতির" বিরুদ্ধে বিজয় দাবি করেছেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৯। কিন্তু লিপিটির প্রশস্তিমূলক প্রকৃতি খুবই স্পষ্ট। উড়িষ্যার রাজার সমসাময়িক জীবদেবাচার্য কবিদিন্ডিম বলেছেন যে, উড়িষ্যার রাজা তাঁর রাজত্বকালের প্রথম ভাগে "গৌড়ের সুলতানকে পরাজিত করেছিলেন।" প্রাগুক্ত, পৃ. ২১১-১২।

৭৭. জে. এন. এস. আই, ১৯৫৭, ১ম অংশ, পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৫৮।

৭৮. হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৮, টীকা ৩; উপরে পৃ. ৪৮।

৭৯. উপরের বিবরণ এস. মুখোপাধ্যায় কতৃক উদ্ধৃত রাজমালার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পাণ্ডুলিপির (নং ২২৫৯) উপর ভিত্তি করে রচিত; পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ২১৭-১৯। আমি এ কাব্যের যে দু'টি প্রকাশিত অনুবাদ দেখেছি তাতে এ বিবরণ অনুপস্থিত। ত্রিপুরার সঙ্গে বাংলার যুদ্ধের অন্যান্য পর্যায়ের জন্য আমি রাজমালার কে. পি. সেনকৃত সংস্করণের উপর নির্ভর করেছি। এর প্রাসঙ্গিক অংশগুলির সঙ্গে এস. মুখোপাধ্যায় কর্তৃক উদ্ধৃত পরিষদ পাণ্ডুলিপির মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই, পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ২১৯-২৪। অনুরূপ বিবরণের জন্য দেখুন আর. ডি. ব্যানার্জী : বাঙ্গলার ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৫১-২৫২; হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৯।

৮০. রাজমালা, কালিপ্রসন্ন সেন সম্পাদিত, পৃ. ২২-২৮; আই. এইচ. কিউ. পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৬৪-৬৭।

৮১. সুকুমার সেন, বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২৫, টীকা।

৮২. শ্রীকর নন্দী, পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৩-৪; পূর্বোল্লিখিত, আই. এইচ. কিউ় তেও উদ্ধৃত, পৃ. ৬৬-৬৭, টীকা ৫৬।

৮৩. জে. এ. এস. বি. ১৮৭২, খণ্ড XLI, প্রথম অংশ, পৃ. ৩৩৩। দুই প্রদেশের শাসনভার একই ব্যক্তির উপর অর্পণ করা হয়েছিল কারণ ব্লখম্যান কর্তৃক সোনারগাঁও অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত মোয়াজ্জমাবাদ (প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৪) ও ত্রিপুরা ছিল সন্নিহিত অঞ্চল।

৮৪. পূর্বোল্লিখিত, ১ম অংশ, ভূমিকা।

৮৫. উপরে, পৃ. ৪৭।

৮৬. রাজমালা, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩০, ৩১ এবং ৩৩।

৮৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪।

৮৮. হামিদউল্লাহ খান : অহাদিস-উল-খওয়ানীন, পৃ. ১৭-১৮।

৮৯. পূর্বোল্লিখিত। আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ কর্তৃক উদ্ধৃত : বাংলা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫; লাইলী-মজনু, আহমদ শরীফ সম্পাদিত, পৃ. ৭, ৮ এবং ৯; তুলনীয়, বি. পি. পি. খণ্ড LXXVII, ১ম অংশ, পৃ. ৪৮।

৯০. পূর্বোল্লিখিত। ডি. সি. সেন কর্তৃক উদ্ধৃত : বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, পৃ. ৯৪।

৯১. পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৩; আই. এইচ. কিউ. পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৬৮।

৯২. জে. জে. এ. ক্যাম্পোস : হিস্ট্রি অফ দি পর্তুগিজ ইন বেঙ্গল, পৃ. ২৮, টীকা। ও ম্যালী চিটাগাং গেজিটিয়ারের ২২ পৃষ্ঠায় বলছেন যে ১৫১৭ খ্রিস্টাব্দে এটা আরাকানের শাসকের অধীনে ছিল। কিন্তু এ উক্তি কোথাও সমর্থিত হয় নি। তুলনীয়, হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫০।

৯৩. এটা রাস্তিখানের *লিপি* দ্বারা প্রমাণিত। বারবকের একজন কর্মকর্তা মজলিস-ই-আলোর আদেশে তিনি ১৪৭৩-৭৪ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রামে একটি মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৫।

৯৪. উপরে, পৃ. ৪৮।

৯৫. ক্যাম্পোস : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৩০-৪০।

৯৬. চাইনিজ অ্যানালস, বিশ্বভারতী অ্যানালস-এ ইংরেজি অনুবাদ, ১৯৪৫, পৃ. ১১৭, ১২০, ১২৩ এবং ১২৮।

৯৭. পরাগল খানের সামরিক ফাঁড়ি এখন সীতাকুণ্ড পাহাড়ের কাছে পরাগলপুর নামক গুরুত্বহীন একটি গ্রাম। এখানে মধ্যযুগের কোনো পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন দেখা যায় না।

৯৮. শিহাবউদ্দীন তালিশ : পূর্বোল্লিখিত, যদুনাথ সরকারের স্টাডিজ ইন মোগল ইন্ডিয়ায় উদ্ধৃত, পৃ. ১২০-২১।

৯৯. আজাদ-উল-হোসেইনী : নৌবহর-ই-মুর্শিদকুলী খানী, স্যার জে. এন. সরকার অনূদিত; বেঙ্গল নওয়াবস, পৃ. ৪।

১০০. দি রিসালা : জে. এ. এস. বি, ১৮৭৪, পৃ. ২৩৭-৩৮; উপরে পৃ. ৪৫।

১০১. পূর্বোল্লিখিত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৩-৩৪।

১০২. পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১৭৯; উপরে পৃ. ৭৮, টীকা ৬৮।

১০৩. জোয়াও দ্য ব্যারোস : দ্যা এশিয়া, বুক অফ বার্বোসাতে পুনর্মুদ্রিত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪৪-৪৫, পরিশিষ্ট ১।

১০৪. বর্তমান বাংলার মানচিত্রের সঙ্গে জোয়াও দ্য ব্যারোসের মানচিত্র তুলনা করলে এ যুক্তিকে সমর্থিত বলে মনে হয়। রেনেল এবং ভ্যান ডেন ব্রুকের মানচিত্রও এ মতকে সমর্থন করে। বার্বোসার গঙ্গা ক্যাম্বিসনের অনুরূপ যাকে টলেমী গঙ্গার সর্বপশ্চিম মোহনা বলে অভিহিত করেছেন। এইচ. সি. রায় চৌধুরী মনে করেন যে, "ক্যাম্বিসন হচ্ছে সংস্কৃত কাপিসা" এবং "এটা মেদিনীপুরের পাশ দিয়ে প্রবাহিত বর্তমান কাসাইর অনুরূপ এবং রূপনারায়ণের মতো এটাকেও হয়তো ভুল করে গঙ্গার শাখা হিসেবে ধরে নেওয়া হয়েছে।" হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১। কিন্তু এস. মুখোপাধ্যায় (পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ২৮৬) চৈতন্য কর্তৃক অতিক্রান্ত নদীকে মন্ত্রেশ্বর বলে গ্রহণ করতে ইচ্ছুক।

১০৫. এসব নামোল্লেখকারী লিপির জন্য দেখুন ই. আই. এম. ১৯১৫-১৬, পৃ. ১২-১৩, প্লেট ৪; জে. এ. এস. বি. ১৮৭০, পৃ. ২৮৪ এবং ১৯০৯, পৃ. ২৬০; দানী : বিব্লিওগ্রাফি, পৃ. ৫৩-৫৪ এবং ৬৪-৬৫; এস. আহমদ : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১৭৫ ও পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহ। এসব স্থানের শনাক্তকরণের জন্য দেখুন জে. এস. বি. ১৮৭০, ১ম অংশ, পৃ. ২৯৪, টীকা এবং পৃ. ২৯৫ এবং ৯০৯, পৃ. ২৫১-৫২।

১০৬. আইন-ই-আকবরী, জ্যারেট ও সরকার সম্পাদিত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫৩-৫৫।

১০৭. উপরে পৃ. ৪৫। বর্তমানে ছত্রভোগ ২৪ পরগণার ডায়মন্ডহারবার মহকুমায় অবস্থিত।

১০৮. ই. আই. এম. ১৯১৫-১৬, পৃ. ১২-১৩, জে. এ. এস. বি. ১৮৭০, পৃ. ২৮৪।

১০৯. পিতার জীবদ্দশায়ও নসরতকে এখান থেকে মুদ্রা জারি করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। এ মুদ্রাগুলির তারিখ হচ্ছে ৯২২ হিজরি, রাইট : ক্যাটালগ, পৃ. ১৭৭-৭৮, নং ২১১ এবং ২১২; এন. কে. ভট্টশালী : তাইফুর কালেকশন, পৃ. ৩১, প্লেট ৫টি, নং ১৬২; ব্লখম্যান : জে. এ. এস. বি. ১৮৭৩, পৃ. ২৯৭, প্লেট ৯, নং ১০।

১১০. বিজয়গুপ্ত : মনসা-মঙ্গল, বসন্তকুমার ভট্টাচার্য সম্পাদিত, ৩য় সংস্করণ, পৃ. ৪। ১৪৯৪-৯৫ খ্রিস্টাব্দে লিখতে গিয়ে কবি বলছেন যে তাঁর গ্রাম, ফুল্লশ্রী (বর্তমানে বরিশালের একটি গ্রাম) ছিল "মুলুক ফতেহাবাদ বাঙ্গড়োরা তকসিম"-এর অন্তর্ভুক্ত। এটাকে বিশ্বরূপসেনের মধ্যপাড়া লিপিতে উল্লিখিত বাঙ্গালবড়া রূপে পরীক্ষামূলকভাবে শনাক্ত করা যেতে পারে, হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮।

১১১. দ্য ব্যারোস : পূর্বোল্লিখিত, বুক অফ বার্বোসা, ২য় খণ্ডে পুনর্মুদ্রিত, পৃ. ২৪৪-৪৫।

১১২. পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৯।

১১৩. পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৪৯।

১১৪. উপরে পৃ. ৪৭।

১১৫. উপরে পৃ. ৪৫।

১১৬. এ প্রসঙ্গে এ সঙ্গে সংযুক্ত জোয়াও দ্য ব্যারোসের মানচিত্র দেখুন।

১১৭. মুঙ্গেল, বোনহর এবং সারণে প্রাপ্ত হোসেনের লিপিগুলি এ মতকে সমর্থন করে বলে মনে হয়। উপরে পৃ. ৩৭।

১১৮. দি বুক অফ বার্বোসা, ২য় খণ্ডে এম. এল. ডেমস কর্তৃক পুনর্মুদ্রিত, পরিশিষ্ট ১, পৃ. ২৪৫।

১১৯. উপরে পৃ. ৩৭।

১২০. হোসেনের পুত্র নসরতের রাজত্বকাল উত্তর-পশ্চিম দিকে বাংলার আঞ্চলিক বিস্তৃতির দ্বারা বিশেষভাবে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। নিচে, এ পরিচ্ছেদের ২য় অধ্যায়। আরও দেখুন "দি ফ্রন্টিয়ারস অফ বেঙ্গল আন্ডার হোসেন শাহী রুল" শীর্ষক আমার প্রবন্ধ। বি. পি. পি. পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৪৪।

১২১. পূর্বোল্লিখিত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৭১।

১২২. ফিরিশতা : পূর্বোল্লিখিত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩০২।

১২৩. সেলিম : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১৩৫।

১২৪. জে. এ. এস. বি. ১৮৭৩, পৃ. ২৯৫, নং ৩১; দানী : বিব্লিওগ্রাফি, পৃ. ৬১; এস. আহমদ : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১৯৮-৯৯।

১২৫. রাইট : ক্যাটালগ, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭৬-৭৮, অংশ ২, প্লেট ৫, নং ২০৬; লেন-পুল : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৫০-৫১, প্লেট ৬, নং ১৩৪; বোথাম : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১৭২-৭৩, প্লেট ৪, নং ৬; এস. আহমদ : সাপ্লিমেন্ট, পৃ. ৬৬, ৬৭, ৬৯; এন. কে. ভট্টশালী : তাইফুর কালেকশন, পৃ. ৩২-৩৩, প্লেট ৫, নং ১৮১ এবং হাকিম হাবিবুর রহমান কালেকশন, পৃ. ২৬-২৮, প্লেট ৩, নং ১৩৩ ও ১৩৮।

১২৬. পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৪; আমার দ্বারা আই. এইচ. কিউতেও উদ্ধৃত, পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৫৯।

১২৭. এ সব কর্মকর্তার নামোল্লেখের জন্য দেখুন, বৃন্দাবনদাস : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৮, ৮২ (আদি খণ্ড), ২০৫ (মধ্য) এবং ৩১৬ ও ৩৫০ (অন্ত), উপরে পৃ. ৪৫ ও পৃ. ৪৭। হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫১-৫২; সুকুমার সেন, মধ্যযুগের বাঙ্গলা ও বাঙ্গালী, পৃ. ১৪-১৫; কৃষ্ণদাস কবিরাজ : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৭৬, ২৭৮ এবং ২৯৩। হোসেন শাহের সতেরজন হিন্দু কর্মকর্তার দীর্ঘ তালিকার জন্য দেখুন, এস. মুখোপাধ্যায় : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ২৬৪-৮৪।

১২৮. পরাগলী মহাভারত, ডি. সি. সেন কর্তৃক উদ্ধৃত; পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৯৪-৯৬; শ্রীকর নন্দী : পূর্বোল্লিখিত, , পৃ. ৪; নিচে, সাহিত্য বিষয়ক অধ্যায়।

১২৯. মেময়েরস অফ বাবর, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৭৩।

১৩০. রজনীকান্ত চক্রবর্তী : পূর্বোল্লিখিত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০৩, ১০৬, ১০৭ এবং ১২৩; আর, ডি. ব্যানার্জি : পূর্বোল্লিখিত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩০৬-০৭; ডি. সি. সেন : পূর্বোল্লিখিত, পৃ.

৯৩ এবং তমোনাশ দাশগুপ্ত : অ্যাসপেক্টস অফ বেঙ্গলি সোসাইটি ফ্রম ওল্ড বেঙ্গলি লিটারেচার, পৃ. ৯২; এস. মুখোপাধ্যায় : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৩০০ ও পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহ।

১৩১. জয়ানন্দ : চৈতন্য-মঙ্গল, পৃ. ১১-১২।

১৩২. পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১৮ এবং ৭৫।

১৩৩. উপরে পৃ. ৩৫।

১৩৪. বৃন্দাবনদাস : পূর্বোল্লিখিত, অন্ত্য, ৪র্থ, পৃ. ৩৫০ এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ : পূর্বোল্লিখিত, মধ্য, ১ম পৃ. ৭৬।

১৩৫. বিজয় গুপ্ত : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৪; শ্রীকর নন্দী : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৩; ডি. সি. সেন : পূর্বোল্লিখিত, , পৃ. ৭৪ ও ৯৪।

১৩৬. এইচ. এন. রাইট : ক্যাটালগ, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫৪-১৬৩, ২য় অংশ, প্লেট ২, নং ৫২, ৫৭, ৬৬, ৬৮ ইত্যাদি। অন্যান্য ক্যাটালগও দেখুন।

১৩৭. লেন-পুল : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৪৫, প্লেট ৫, নং ১১৮।

১৩৮. এইচ. এন রাইট : ক্যাটালগ, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭৭-৭৮; এ. ডব্লিউ, বোথাম : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১৭২, ভট্টশালী : তাইফুর কালেকশন, পৃ. ৩১, প্লেট ৫, নং ১৬২ এবং জে. এ. এস. বি. ১৮৭৩, পৃ. ২৯৭, প্লেট ৯, নং ১০।

১৩৯. এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন পরিশিষ্ট ক; আরও তুলনীয়; হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫২।

১৪০. বদাউনী : পূর্বোল্লিখিত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩২৮-৩০; ফিরিশতা : পূর্বোল্লিখিত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯০-৯১; নিজামউদ্দীন : পূর্বোল্লিখিত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯০; আহমদ ইয়াদগার : তারিখ-ই-সালাতীন-ই-আফগানাহ্, পৃ. ১৭৬-৭৭; নিয়ামতউল্লাহ্ : তারিখ-ই-খান-জাহান-লোদী, ইলিয়ট ও ডাউসন এর দি হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া অ্যাজ টোল্ড বাই ইটস উন হিস্টোরিয়ান্স, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১০৫-০৬। তুলনীয় : হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫৩।

১৪১. জে. এ. এস. বি. ১৮৭৩, পৃ. ২৯৬। এ লিপি অনুসারে খারীদ ছিল নসরতের একজন গভর্নরের নিয়ন্ত্রণাধীন। হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫৩।

১৪২. সেলিম : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১৩৬; হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫২।

১৪৩. মেময়েরস, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৬৫।

১৪৪. সেলিম : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১৩৭; নিজামউদ্দীন : পূর্বোল্লিখিত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৭১; ফিরিশতা : পূর্বোল্লিখিত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩০২।

১৪৫. মেময়েরস, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৪৪।

১৪৬. প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৩৭।

১৪৭. প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬২৮।

১৪৮. প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৩৭ ও ৬৪০।

১৪৯. হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫৩-৫৭।

১৫০. মেময়েরস, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৯৮ এবং ৬০০।

১৫১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭৫।

১৫২. প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৫৯ ও ৬৬৪।

১৫৩. প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৬৪।

১৫৪. প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৬১, ৬৩৭ এবং ৬৬৪।

১৫৫. প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৫১-৫২, ৬৫৪ এবং ৬৮৫।

১৫৭. প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৫১-৫২, ৬৬৯ এবং ৬৭৬। কানুনগো ইঙ্গিত করেছেন যে বাবর আফগানদের বিরুদ্ধে জালাল শর্কিকে কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন। দেখুন শের শাহ, পৃ. ৬১, টীকা।

১৫৭. মেময়েরস, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৫৯।

১৫৮. উপরে পৃ. ৫৭-৫৮।

১৫৯. সেলিম : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১৩৭; হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫৫।

১৬০. মেময়েরস, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৬৩-৬৫।

১৬১. প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৬৫; তিনটির মধ্যে শুধুমাত্র একটি শর্তের সারাংশ এখানে দেওয়া হয়েছে। অন্য দু'টি শর্ত কোথায়ও স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়নি; তুলনীয়; হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫৫।

১৬২. মেময়েরস, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৬৭-৭০।

১৬৩. এ সঙ্গে সংযুক্ত মানচিত্র দেখুন। বি. পি. পিতে আমার প্রবন্ধও দেখুন, পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৪৪।

১৬৪. মেময়েরস, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৭১-৭৪।

১৬৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭৬-৭৭।

১৬৬. নিজামউদ্দীন : পূর্বোল্লিখিত, ৩য় খণ্ড পৃ. ২৭১; সেলিম : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১৩৭; ফিরিশতা : পূর্বোল্লিখিত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩০২।

১৬৭. হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫৬-৫৭।

১৬৮. হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৪।

১৬৯. উপরে পৃ. ৫৮।

১৭০. আব্বাস : তারিখ-ই-শেরশাহী, ইলিয়ট ও ডাউসন, পূর্বোল্লিখিত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৪৬-৫০; আহমদ ইয়াদগার : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১৮৪-৮৫; বদাউনী : পূর্বোল্লিখিত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬১-৬২; ফিরিশতা : পূর্বোল্লিখিত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১৩ এবং ২২৫; নিজামউদ্দীন : পূর্বোল্লিখিত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৭-৯৮; গুলবদন বেগম : হুমায়ুননামা, ইংরেজি অনুবাদের সঙ্গে সংযোজিত ফার্সি মূল গ্রন্থাংশের পৃ. ১১৫ ও ২৯ এবং জওহর : তাজকিরাত-উল-ওয়াকিয়াত, পৃ. ৩। আরও দেখুন কানুনগো : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৭২-৭৫।

১৭১. পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৭২-৭৫।

১৭২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮, টীকা।

১৭৩. নিজামউদ্দীন : পূর্বোল্লিখিত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৭১; সেলিম : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১৩৮ এবং ফিরিশতা : পূর্বোল্লিখিত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩০২।

১৭৪. আহোম বুরুঞ্জী, জি. সি. বড়ুয়া কর্তৃক সম্পাদিত, পৃ. ৬৮-৬৯। এম. এন. ভট্টাচার্য কর্তৃক মোগল নর্থ-ইস্ট ফ্রন্টিয়ার পলিসিতে পুনর্মুদ্রিত অন্যান্য বুরুঞ্জীতে প্রাপ্ত বিবরণীর সঙ্গে এটা সামঞ্জস্যপূর্ণ, পৃ. ৮৯-৯০। আহোমদের বিরুদ্ধে তুরবকের অভিযান অন্যান্য বুরঞ্জীতেও সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণিত হয়েছে। এস. কে. ভূঁঞা সম্পাদিত : আহোম বুরুঞ্জী, পৃ. ২৫-২৬ দেখুন। দেওধাই আহোম বুরুঞ্জী : এস. কে. ভূঁঞা সম্পাদিত, পৃ. ২৭-২৮। তুলনীয়, হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫৮।

১৭৫. ই. আই. ১৯৫১-৫২, পৃ. ২৪-২৫, প্লেট ১১ ক ও খ (অ্যারাবিক অ্যান্ড পার্শিয়ান সাপ্লিমেন্ট)। বি. পি. পি তে আমার প্রবন্ধ দেখুন, পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৪৬।

১৭৬. কথিত আছে যে রাজত্বকালের শেষভাগে তিনি যথেষ্ট অত্যাচারী হয়ে উঠেছিলেন। ফিরিশতা : পূর্বোল্লিখিত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩০২; সেলিম; পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১৩৮।

১৭৭. সেলিম : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১৩৮। ফিরিশতা বলেছেন যে নসরত নিহত হয়েছিলেন বা স্বাভাবিক মৃত্যু বরণ করেছিলেন এটা তিনি নিশ্চিতভাবে নির্ধারণ করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন; পূর্বোল্লিখিত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩০২।

১৭৮. এমনকি নসরতের রাজত্বকালেও মাহমুদ নিজের নামে মুদ্রা জারি করেছিলেন। এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনার জন্য পরিশিষ্ট 'ক' দেখুন।

১৭৯. ইংরেজি অনুবাদ, পৃ. ১৩৭; তুলনীয়, মূল পাঠ, পৃ. ১৩৯।

১৮০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯।

১৮১. আহোম বুরুঞ্জী, জি. সি. বড়ুয়া সম্পাদিত, পৃ. ৬৯-৭৩। আরও দেখুন, গেইট : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৯০-৯২। এস. এন. ভট্টাচার্য : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৯০-৯২।

১৮২. আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ : গৌড়েশ্বরের আদেশে রচিত বিদ্যা-সুন্দর : এস. পি. পি. ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২২-২৪। বিদ্যাসুন্দরের মূলপাঠের জন্য আরও দেখুন, ১৩৬৪ বঙ্গাব্দের সাহিত্য পত্রিকা, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১৮, ১২০, ১২৩, ১২৫, ১২৯, ১৩১, ১৩২ এবং ১৩৩।

১৮৩. এস. পি. পি. ১৩৪৪ বঙ্গাবন্দ, পৃ. ২৪; সাহিত্য পত্রিকা, ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২০।

১৮৪. এস. পি. পি. ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২৪; সাহিত্য পত্রিকা, ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২৫।

১৮৫. পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১৩৯।

১৮৬. পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১৩৫।

১৮৭. ব্লখম্যান : জে. এ. এস. বি. ১৮৭৩, পৃ. ২৯৮; আব্দুস সালাম : রিয়াজের ইংরেজি অনুবাদ, পৃ. ১৩৭, টীকা।

১৮৮. এইচ. এন. রাইট : ক্যাটালগ, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭৯, প্লেট ৬, ২য় অংশ, নং ২২০; ভট্টশালী : তৈফুর কালেকশন, পৃ. ৩৫; জে. এ. এস. বি. ১৮৭৩, প্লেট ৯, নং ১৩।

১৮৯. ১৯৫৯ সালে জে. এ. এস. বির ৪র্থ খণ্ডে আমার দ্বারা প্রকাশিত, পৃ. ১৭৪। বাংলার কিছু কিছু মুদ্রায় প্রচলিত রীতি অনুযায়ী, এ দু'টির প্রত্যেকটি মুদ্রার উভয় দিকে উৎকীর্ণ লিপিগুলি রয়েছে একটি নিরেট বৃত্তের মধ্যে যার চারপাশে রয়েছে আরেকটি বিন্দু দ্বারা রচিত বৃত্ত। দু'টি মুদ্রাই মোয়াজ্জামাবাদ টাকশাল হতে উৎকীর্ণ করা হয়েছিল।

১৯০. জে. এ. এস. বি. ১৮৭৪, পৃ. ৩০৮; আবিদ আলী : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১৫৩; ই. আই. অ্যারাবিক অ্যান্ড পার্শিয়ান সাপ্লিমেন্ট, ১৯৫১-৫২, পৃ. ২৬-২৭, প্লেট ১১ (ক) এবং ১১ (খ); দানী : বিব্লিওগ্রাফি, পৃ. ৭২-৭৩; এস. আহমদ : ইনস্ক্রিপশন্স, পৃ. ২২৯-৩২।

১৯১. জে. এ. এস. বি. ১৮৭২, পৃ. ১৩৩২ ও ৩৩২ এবং ১৮৭৩, প্লেট ৭, নং ২; দানী : বিব্লিওগ্রাফি, পৃ. ৭৫; এস. আহমদ : ইনস্ক্রিপশন্স, পৃ. ২৩৪-৩৫; মিস মনিরা খাতুন কর্তৃত সংগৃহীত এ শিলালিপিটি এখন কোলকাতার ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে; জে. এন. এস. আই, খণ্ড ২২, পৃ ২১৩, টীকা ৬।

১৯২. এইচ. এন. রাইট, ক্যাটালগ, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭৯; লেন-পুল : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৫৫; ভট্টশালী : তৈফুর কালেকশন, পৃ. ৩৬, প্লেট ৫, নং ১৯৫; জে. এ. এস. বি. ১৮৭৪, পৃ. ৩০৯, প্লেট ১৩, নং ১০।

১৯৩. পূর্বোল্লিখিত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬১৯; জে. এ. এস. পি. ১৯৫৯ এ আমার প্রবন্ধ দেখুন, পৃ. ১৭৯-৮০।

১৯৪. ক্যাম্পোস : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৪২।

১৯৫. এ এলাকার, যার মধ্যে চচুরিয়া বর্তমান চকরিয়া অন্তর্ভুক্ত। মাতামুহুরী নদী ও আরাকান পাহাড় শ্রেণী ছিল বাংলার দক্ষিণ-পূর্ব সীমানা নির্দেশক-এর পরের অঞ্চলগুলিকে রেইনো দ্য আরাকান রূপে দেখানো হয়েছে।

১৯৬. দি বুক অফ ডুয়ার্টে বার্বোসা ,২য় খণ্ডে পুনর্মুদ্রিত দা এশিয়ার উদ্ধৃতাংশ, পরিশিষ্ট ১, পৃ. ২৪৫; আরও দেখুন ফারিয়া ওয়াই সুজা : পর্তুগিজ এশিয়া, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৪১৬; বি. পি. পি তে আমার প্রবন্ধ, পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৪৮-৪৯। প্রতিবেশী একজন সর্দারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পর্তুগিজরা খোদা বখশ খানকে সাহায্য করেছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি তাদেরকে তাঁর সদর দফতর শোর এ বন্দি করে রাখতে দ্বিধা করেন নি। শের খান যখন গৌড় দখল করেন তিনি তখন চট্টগ্রাম শহরটি দখল করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু চট্টগ্রামস্থ পর্তুগিজ প্রতিনিধি নুনো ফার্নান্ডেজ ফ্রেয়ার খোদা বখশের প্রতিদ্বন্দ্বী অমীরজা খানকে সাহায্য করেন; ক্যাম্পোস : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৩১-৩২ এবং ৪২; আরও দেখুন ফারিয়া ওয়াই সুজা : পূর্বোল্লিখিত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩১৪।

১৯৭. ক্যাম্পোস : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৪২।

১৯৮. পূর্বোল্লিখিত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪৫।

১৯৯. নিজামউদ্দীন : পূর্বোল্লিখিত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৪; সেলিম : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১৩৯-৪০; আহমদ ইয়াদগার : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১৮০; ইলিয়ট ও ডাওসনে আব্বাস : পূর্বোল্লিখিত,

৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৩৩; ফিরিশতা : পূর্বোল্লিখিত, ১ম খণ্ড; পৃ. ২২৩, বদাউনী : পূর্বোল্লিখিত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬০; হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬০।

২০০. সেলিম : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১৪০; আব্বাস : পূর্বোল্লিখিত ইলিয়ট ও ডাওসন, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৩৪; হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬০।

২০১. আহমদ ইয়াদগার : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১৮১-৮২; নিজামউদ্দীন : পূর্বোল্লিখিত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৪-৯৫; আব্বাস : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৩৩৮-৪২; ফিরিশতা : পূর্বোল্লিখিত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২৩-২৪; বদাউনী : পূর্বোল্লিখিত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬০; হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬১।

২০২. আহমদ ইয়াদগার : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১৮৩; আব্বাস : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৩৫৫-৫৬; ক্যাম্পোস : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৩৮-৩৯; সেলিম : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১৪০; ফারিয়া ওয়াই সুজা : পূর্বোল্লিখিত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪১৯-২০; শের খান অনুসৃত পথের জন্য দেখুন, কানুনগো : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১২০-২৪; হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬২-৬৩, টীকা ২।

২০৩. ক্যাম্পোস : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৩৩-৪০; ফারিয়া ওয়াই সুজা : পূর্বোল্লিখিত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪১৭-২০।

২০৪. ক্যাম্পোস : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৩৯।

২০৫. সেলিম : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১৪০-৪৪; গুলবদন : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১৩৩-৩৪; ফার্সি মূলপাঠ (অনুবাদের সঙ্গে সংযুক্ত) : পৃ. ৩৯-৪০; নিজামউদ্দীন : পূর্বোল্লিখিত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪১ এবং ৯৯; ফিরিশতা : ১ম খণ্ড, পৃ. ২২৫; আব্বাস : পূর্বোল্লিখিত, ইমামুদ্দীন কর্তৃক সম্পাদিত মূলপাঠ, পৃ. ১০৩ ও পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহ; ক্যাম্পোস : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৪০-৪১; কানুনগো : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১৬০-৬২। তেলিয়াঘরি হয়ে গৌড়ে পৌঁছে হুমায়ুন দেখতে পান যে আফগানরা এখান থেকে সৈন্য সরিয়ে নিয়ে গেছে। গৌড়কে জান্নাতাবাদ নামদিয়ে তিনি সেখানে বিলাসবহুল প্রশান্তি উপভোগ করতে থাকেন। বিহার ও উত্তর ভারতের ঘটনাপ্রবাহ ছিল রাজকীয় স্বার্থের পক্ষে সম্পূর্ণভাবে হানিকর। আগ্রায় মির্জা হিন্দাল বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং গোটা দক্ষিণ বিহার দখল করে শের মোগলদের জন্য যথেষ্ট ঝামেলার সৃষ্টি করছিলেন। হুমায়ুনকে তখন আগ্রা রওয়ানা হতে হয়। পথে চৌসায় তিনি শের খানের হাতে পরাজিত হন। এ ঘটনার পর ১৫৩৯ সালে শের আবার বাংলা দখল করে নেন। নিজামউদ্দীন : পূর্বোল্লিখিত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪২-৪৬ এবং ৯৯-১০০; গুলবদন : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১৩৪-৩৬; আকবরনামা : বিব্লিওথেকা ইন্ডিকা মূলপাঠ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫৯-৬০; ফিরিশতা : ১ম খণ্ড, পৃ. ২২৬; বদাউনী : ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪৮-৫২; জওহর : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১৭-২৫; আব্বাস : মূলপাঠ, পৃ. ১২৪ ও পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহ; ক্যাম্পোস : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৪১; সেলিম : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১৪৪-৪৭; তুলনীয়, হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬৩-৬৪।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
হোসেন শাহী সুলতানদের শাসনব্যবস্থা

পর্যালোচনাধীন আমলের শাসনব্যবস্থা নিঃসন্দেহে কৌতূহলোদ্দীপক বিষয়। আমাদের হাতে যে সব উপাদান রয়েছে তা অসম্পূর্ণ হলেও মুদ্রা ও লিপির সাক্ষ্যের ভিত্তিতে হোসেন শাহী রাষ্ট্রের বিভিন্ন দিকের ওপর আলোকপাত করার চেষ্টা করা যেতে পারে। সমসাময়িক ফার্সি ও বাংলা উৎসগুলি থেকে সংগৃহীত তথ্যাবলি এ সাক্ষ্যের সম্পূরক।

সম্পূর্ণ নতুনভাবে একটি প্রশাসনিক কাঠামো তৈরি করা হোসেন শাহীদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। আগে থেকেই প্রচলিত একটি ব্যবস্থা তাঁরা পেয়েছিলেন। ইলিয়াস শাহী এবং আবিসিনীয়রা এটাকেই সম্প্রসারিত ও অনুসরণ করেছিলেন। হোসেন শাহ ও তাঁর উত্তরসূরিরা শুধু প্রচলিত ব্যবস্থার কিছুটা উন্নতি সাধন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। হোসেন শাহী বংশের প্রতিষ্ঠাতা, আলাউদ্দীন হোসেন শাহ শেষ আবিসিনীয় সুলতান শামসউদ্দীন মোজাফফর শাহের (১৪৯১-১৪৯৩) প্রশাসনিক ব্যাপারে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। সন্দেহ নেই যে প্রশাসনের দুর্বল দিকগুলি খুঁটিয়ে দেখার সুযোগ তাঁর হয়েছিল। সুতরাং এটা খুবই সম্ভাব্য যে গৌড় রাজ্যের প্রশাসনিক নীতিমালা প্রণয়নে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তাঁকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। প্রশাসনিক অনিয়ম যে আবিসিনীয় শাসনামলে রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতার পরিপন্থী হয়েছিল সে সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন। এ থেকেই আমরা তাঁর পাইকদের দল ভেঙ্গে দেওয়া ও যাদের ষড়যন্ত্র ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা ইতোমধ্যেই দেশকে প্রবলভাবে আলোড়িত করেছিল, সেই আবিসিনীয়দের দেশ থেকে নির্বাসিত করার কারণ খুঁজে পাই। রাজ্যের রাজনৈতিক ব্যবস্থার দিকে মনোযোগ দিয়ে হোসেন প্রশাসনিক কেন্দ্র গৌড় থেকে একডালায় স্থানান্তরিত ও বিভিন্ন প্রদেশে বেশকিছু দক্ষ গভর্নর নিয়োগ করেন এবং অবাধ্যদের নিজের নিয়ন্ত্রণে আনেন।[১] এ ব্যবস্থাগুলি থেকে দেশে প্রশাসনিক সংস্কার প্রবর্তনে সুলতানের মনোযোগ ও উদ্বেগের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সুতরাং হোসেন শাহীরা যে পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলেন তা থেকে এ ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে প্রশাসনের খুঁটিনাটি ব্যাপারে তাঁদের পূর্বসূরিরা তাঁদের ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছিলেন।

এটা ইতিহাসের একটা সুপ্রতিষ্ঠিত সত্য যে বখতিয়ারের আক্রমণের সময় থেকে চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইলিয়াস শাহীরা সফলতার সঙ্গে এদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করা পর্যন্ত বাংলা প্রায়ই ছিল দিল্লি সুলতানাতের একটি প্রদেশ। এ আমলে বাংলার প্রশাসনিক ব্যবস্থা সম্ভবত ছিল দিল্লি সুলতানাতের প্রশাসনিক ব্যবস্থার প্রায় অনুরূপ কাছাকাছি অনুলিপি। অনুমান করা যেতে পারে যে, উত্তর ভারতীয় কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য ইলিয়াস শাহী এবং আবিসিনীয়দের প্রশাসনিক ব্যবস্থার মাধ্যমে হোসেন শাহীদের কাছে

পৌঁছে ছিল। এগুলি হোসেন শাহী প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করেনি বলে মনে হলেও সেগুলি ক্রমে ক্রমে তাঁদের ব্যবস্থায় আত্তীভূত হয়ে পড়ে। আমাদের জ্ঞানের বর্তমান পর্যায়ে হোসেন শাহীরা ইলিয়াস শাহী ও দিল্লি সুলতানদের কাছ থেকে যা গ্রহণ করেছিলেন সেগুলিকে তাঁদের নিজেদের মৌলিক অবদান থেকে পৃথক করা সম্ভব নয়। কিন্তু হোসেন শাহীদের ব্যবহৃত কিছু কিছু আরবি উপাধি ইলিয়াস শাহী ও তুর্কি-আফগান শাসকদের অনুসৃত ব্যবস্থায় প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায়।[২]

হোসেনশাহী শাসকবৃন্দ যে রাষ্ট্র গড়ে তুলেছিলেন সেটা তার নীতি-নির্দেশনার জন্য সম্ভবত আলাউদ্দীন হোসেন শাহের কাছে ঋণী যা তাঁর উত্তরসূরিরা মাঝে মধ্যে সামান্য পরিবর্তন করে অনুসরণ করেছিলেন। বংশের প্রতিষ্ঠাতা কর্তৃক গৃহীত সাধারণ নীতিগুলি সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তন করার কোনো প্রয়োজনই নসরত, ফিরুজ ও মাহমুদের হয় নি। গোটা রাজনৈতিক যন্ত্রটি মনে হয় সময় ও পরিস্থিতির দাবির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল।

রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে সুলতান ছিলেন সব ক্ষমতার উৎস। শাসন-কাঠামোর সঙ্গে তিনি ছিলেন অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত, যার ফলে তাঁকে বাদ দিয়ে সম্পূর্ণ ছবিটা অচিন্ত্যনীয় হয়ে পড়ে। কামরূপ-কামতা এবং জাজনগর-উড়িষ্যার[৩] বিরুদ্ধে কোনো কোনো অভিযানে তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে নেতৃত্ব দিতে হয়েছিল। এ থেকে ধারণা করা যেতে পারে যে রাজধানীতে তাঁর অনুপস্থিতির সময়ে শাসন কাজ চালাবার জন্য মাঝে মাঝে তাঁর ক্ষমতা কোনো কর্মচারীকে অর্পণ করতে হতো। কিন্তু এটা ছিল নিশ্চিতরূপেই একটি সাময়িক ব্যবস্থা এবং চূড়ান্ত ক্ষমতা সুলতানের ওপরই ন্যস্ত থাকত।

আলাউদ্দীন হোসেন শাহ "প্রমাণ ও সাক্ষ্যে আল্লাহ্‌র খলিফা"—এ রাজকীয় উপাধি গ্রহণ করেছিলেন।[৪] তাঁর উত্তরসূরিরাও অনুরূপ উপাধি গ্রহণ করেছিলেন কিনা তা জানা যায় নি। হোসেন শাহের এ উপাধি গ্রহণকে তাঁর নীতির একটি আকস্মিক বৈশিষ্ট্য বলে মনে হয় না। তিনি জালালউদ্দীন মোহাম্মদ শাহ কর্তৃক প্রচলিত ও কোনো কোনো ইলিয়াসশাহী এবং আবিসিনীয় সুলতান কর্তৃক অনুসৃত রীতি আবার চালু করেছিলেন মাত্র। বস্তুত খলিফাতুল্লাহ্‌ উপাধির এক দীর্ঘ সাংবিধানিক ও ঐতিহাসিক পটভূমি রয়েছে। ইওয়াজ খলজী, মুঘিসউদ্দীন ইউজবেক, রুকনউদ্দীন কায়কাউস, শামসউদ্দীন ফিরুজ এবং তাঁর পুত্ররা সবাই প্রকাশ্যে খলিফার বৈধ ক্ষমতা স্বীকার করেছিলেন এবং তাঁরা সবাই তাঁদের মুদ্রায় আব্বাসীয় খলিফার নামোল্লেখ করেছিলেন। এসব সুলতান নিজেদের 'বিশ্বাসীদের নেতার সাহায্যকারীরূপে' ঘোষণা করেন। স্বাধীন বাংলা রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর খিলাফত প্রতিষ্ঠানটির প্রতি বাংলার সুলতানদের মনোভাবের সামান্য পরিবর্তন ঘটে। তাঁরা মুদ্রায় খলিফার নাম বাদ দিয়ে 'বিশ্বাসীদের নেতার সাহায্যকারী', এবং "ইসলাম ও মুসলমানদের সাহায্যকারী" এ বাণীগুলি উৎকীর্ণ করতে শুরু করেন। জালালউদ্দীন মোহাম্মদ শাহই বাংলার ইতিহাসে সর্বপ্রথম নিজেকে খলিফাতুল্লাহ বা 'আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি' বলে ঘোষণা করেন। পরবর্তী ইলিয়াস শাহীদের কেউ কেউ এবং অন্তত একজন আবিসিনীয় সুলতান এ দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেছিলেন।[৫]

দিল্লি সুলতানাতেও একইরকম প্রক্রিয়া চলছিল। এ অঞ্চলের সুলতানরা বাগদাদের

খলিফার কাছ থেকে সনদ লাভ করার পর তাঁদের শাসনের স্বীকৃতি পেতেন। দিল্লির সুলতানদের মধ্যে ইলতুৎমিশ এবং মোহাম্মদ বিন তুঘলক এ ধরনের সনদ লাভ করেছিলেন। কোনো কোনো সুলতান খলিফার স্বীকৃতি না পেয়েও তাঁর আনুগত্য স্বীকার করতেন। এ থেকেই বুঝা যায় কেন খলিফা মুসতাসিমের মৃত্যুর বহু পরেও দিল্লি থেকে উৎকীর্ণ মুদ্রায় তাঁর নামোল্লেখ করা হতো। রুকনউদ্দীন ইব্রাহীম এবং আলাউদ্দীন খলজী যথাক্রমে নাসির-ই-আমীর-উল-মু'মিনিন ও ইয়ামিন-উন-খিলাফত উপাধি গ্রহণ করে খলিফার বৈধ ক্ষমতায় তাঁদের আস্থা ঘোষণা করেছিলেন। সাঈয়ীদ, লোদী এবং বাহমনী সুলতানরা প্রথানুযায়ী খলিফার আইনসঙ্গত মর্যাদার প্রতি আস্থা প্রকাশ করে অনুরূপ প্রক্রিয়া অনুসরণ করেছিলেন। দিল্লির কুতবউদ্দীন মোবারক শাহ নিজেকে "দুই জাহানের পালকের খলিফা", "সবচেয়ে শক্তিমান ইমাম" এবং "বিশ্বাসীদের নেতা" রূপে ঘোষণা করেছিলেন।[৬]

এভাবে ভারতে এবং প্রাক-মোগল আমলে বাংলায়ও আব্বাসীয় খলিফার আইনসম্মত অবস্থান প্রশ্নাতীতভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। খিলাফতের পতনের পর বিভিন্ন শাসক খিলাফতের উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। এ ধরনের রাজনৈতিক পরিবেশে হোসেন শাহ উন্নতি লাভ করেছিলেন। কাজেই তাঁর খিলাফত উপাধি গ্রহণ মনে হয় সহজেই বোধগম্য বিষয়। সুন্নী মুসলমান বিশ্বে খিলাফত প্রতিষ্ঠানটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করায় সম্ভবত হোসেন শাহ খিলাফতের উপাধি গ্রহণ করে বাংলার সুন্নী মুসলমানদের সমর্থন লাভ করতে চেয়েছিলেন। সুতরাং তাঁর এ কাজ শাসক হিসেবে তাঁর মর্যাদাকে কল্পিত বৈধতা দান করেছিল। অন্যথায় আবিসিনীয়দের উৎখাত করে নিজে ক্ষমতাসীন হয়েছিলেন বলে হোসেন শাহকে জবরদখলকারী রূপে গণ্য করা হতে পারত। এ উপাধি গ্রহণের পিছনে রাজনৈতিক যে উদ্দেশ্যই তাঁকে প্রণোদিত করে থাকুক না কেন, এখানে এটা বলা যেতে পারে যে, বাংলায় হোসেন শাহ ছিলেন দৃশ্যত একজন বৈধ সার্বভৌম সুলতান। তাঁর উত্তরসূরিরা কেন এ উপাধি গ্রহণ করেন নি তার কারণ নিশ্চিতভাবে বলা যায় না।

উত্তরাধিকারের কোনো ধরাবাঁধা নিয়ম ছিল না, জ্যেষ্ঠের উত্তরাধিকার লাভের আইনও যথাযথভাবে প্রয়োগ করা হতো না। এ বৈশিষ্ট্যটি বাবর, ফারিয়া ওয়াই সুজা এবং নিজামউদ্দীন লক্ষ্য করেছিলেন।[৭] প্রত্যেক সুলতানের মৃত্যুর পরেই সাধারণত দেখা দিত বিশৃঙ্খলা ও বিভ্রান্তি। শাসক নির্বাচনে অভিজাতবর্গ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন। এরকম পরিস্থিতিতে উত্তরাধিকারের কোনো নিয়মানুগ নীতিই অনুসরণ করা যেত না। হোসেন শাহ সম্ভবত তাঁর সিংহাসনের উত্তরাধিকারীরূপে নসরত শাহকে মনোনীত করেছিলেন, কারণ ১৫১৬ সালে নসরতশাহ নিজের নামে মুদ্রা উৎকীর্ণ করেছিলেন।[৮] এ বিশেষ অধিকার শুধুমাত্র যুবরাজকেই দেওয়া যেত। মাহমুদের কিছু মুদ্রা[৯] এ ইঙ্গিত দেয় যে তিনিই ছিলেন প্রকৃত উত্তরাধিকারী। সুলতানাতে নসরত তাঁর পিতার উত্তরাধিকার লাভ করলেও তাঁর ছোট ভাই মাহমুদ তাঁর উত্তরাধিকারী হতে পারেন নি। কারণ অভিজাতবর্গ মাহমুদের দাবি অগ্রাহ্য করে নসরতের পুত্র ফিরূজকে গৌড়ের সিংহাসনে বসান। মাহমুদ অবশ্য ফিরূজকে হত্যা করে সিংহাসনে বসে তাঁর উত্তরাধিকারের দাবি প্রতিষ্ঠিত

করেছিলেন।[১০] প্রাক-হোসেনশাহী আমলেও উত্তরাধিকারের এ অনিয়ম একটি নিয়মিত বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে আমরা হোসেন শাহী আমলের প্রশাসনিক ব্যবস্থার একটি অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করতে পারি। শাসনকারী সুলতান সম্ভবত যুবরাজকে তাঁর নিজের নামে মুদ্রা উৎকীর্ণ করার অনুমতি দিতেন।[১১]

সুলতানের বহু ব্যক্তিগত ভৃত্য ও কর্মচারী ছিল। একজন প্রধান দেহরক্ষীর অধীনে বহু দেহরক্ষী ছিল। বাংলা উৎসগুলি থেকে আমরা হোসেনের রক্ষী-প্রধান হিসেবে কেশব খান ছত্রীর নাম পাই।[১২] বহুসংখ্যক প্রাসাদ-রক্ষী রক্ষী-ভবন ও বাদক-মঞ্চে মোতায়েন করা হতো। তারা ছিল একজন সেনানায়কের অধীনে ন্যস্ত। হোসেনের রক্ষীরা পাইকদের স্থলাভিষিক্ত হয়। পাইক ও তাদের সেনানায়কবৃন্দ এক সুলতানকে সিংহাসনচ্যুত বা হত্যা করে অপর একজনকে সিংহাসনে বসিয়ে আবিসিনীয় ও ইলিয়াস শাহীদের আমলে এক চরম অনিষ্টকর ভূমিকা পালন করে আসছিল।[১৩] একজন ব্যক্তিগত চিকিৎসক বা অন্তরঙ্গ ব্যক্তি ছিলেন[১৪] যার কাছে চিকিৎসা সম্পর্কিত সবরকম সাহায্য পাওয়া যেত।

লিপির সাক্ষ্য থেকে দেখা যায় যে একজন শরাবদার-ই-গায়ের-মহল্লী[১৫] বা 'প্রাসাদের বাইরে পান-পাত্রবাহক' ছিলেন। তিনি জমিদার-ই-গায়ের মহল্লী রূপেও পরিচিত ছিলেন।[১৬] আবিসিনীয় ও ইলিয়াশ শাহী আমলেও এ দপ্তরটি ছিল।[১৭] দিল্লি সুলতানাতের আমলে আমরা এ কর্মচারীটির সাক্ষাত পাই না। দৃশ্যত উপাধিটি গুরুত্বপূর্ণ না হলেও নিঃসন্দেহে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর ছিল। সুলতানের অভিযানকালে তাঁর সঙ্গী একজন স্থানীয় গভর্নরকে সাধারণত এ দায়িত্ব দেওয়া হতো। অনুমান করা যেতে পারে যে তাঁর দায়িত্ব ছিল সুলতানকে সরবরাহ করা পানীয়ের তত্ত্বাবধান করা। এটা ছিল বিষপ্রয়োগের বিরুদ্ধে সতর্কতামূলক কাজ। পানীয়ের সঙ্গে সহজেই বিষ দেওয়া যেত বলে প্রয়োজনের তাগিদেই এ দায়িত্ব সুলতানের পূর্ণ আস্থাভাজন একজনের ওপর অর্পণ করা হতো। শরাবদার-ই-গায়ের-মহল্লী শব্দগুচ্ছটি থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে প্রাসাদের অভ্যন্তরেও পানীয়ের তত্ত্বাবধান করার জন্য সুলতানের অন্যএকজন শরাবদার ছিল। বস্তুত দিল্লি সুলতানাতে আমরা এরকমই দেখতে পাই। যেখানে সাধারণত সাকী-ই-খাস পানীয় পরিবেশন করত।[১৮]

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে রাজপরিবারে বিভিন্ন নিম্নতর ও উচ্চতর কর্মচারীর প্রয়োজন হতো। এদের সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। দিল্লির সুলতানদের ওয়াকিল-ই-দার, আমির হাজিব, নায়েব বারবক, নকিব এবং অন্যান্য কর্মচারী ছিল। এদের দায়িত্ব ছিল যথাক্রমে রাজকীয় গৃহস্থালী নিয়ন্ত্রণ, দরবারের অনুষ্ঠানাদির ব্যবস্থাপনা, সুলতানের সহকারীরূপে দায়িত্ব পালন, সৈন্য ও জনসাধারণের মধ্যে আদেশ ঘোষণা করা ইত্যাদি।[১৯] যুক্তিসঙ্গতভাবে আমরা এখানে ধরে নিতে পারি যে দিল্লির সুলতানদের অধীনস্থ কর্মচারীদের সঙ্গে উপাধির পার্থক্য থাকলেও হোসেন শাহীরা এ ধরনের কর্মচারীদের ব্যবহার পরিহার করতে পারেন নি। মনে হয়, খোজা ও ক্রীতদাসরা রাজকীয় গৃহস্থালীতে বিভিন্ন ধরনের কাজে নিযুক্ত ছিল। বস্তুত হাবশী শাসনামলে তারা সুলতান ও সুলতান-নির্বাচকের ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। পর্তুগিজ পরিব্রাজক ডুয়ার্টে বার্বোসার

মতানুসারে তাদের মধ্যে কেউ কেউ আর্থিকভাবে লোভনীয় পদে অধিষ্ঠিত ছিল।[২০] নিজামউদ্দীনের মতানুসারে নসরত শাহ গুজরাটে দূত হিসেবে যে মালিক মর্গানকে পাঠিয়েছিলেন তিনি ছিলেন একজন খোজা।[২১]

সুলতান দরবারে বসতেন এবং গুরুত্বপূর্ণ অভিজাতবর্গ ও কর্মচারীদের সঙ্গে মিলিত হতেন। মাঝে মাঝে তিনি তাঁদের সম্মানসূচক উপাধি প্রদান করতেন এবং গভর্নরদের সম্মানসূচক পোশাক উপহার দিতেন এবং উচ্চপদস্থ কর্মচারী, সেনাপতি এবং প্রশাসকদের নিযুক্তি প্রদান করতেন।[২২] বলাই বাহুল্য যে, পরাক্রমশালী হোসেন শাহ ও তাঁর উত্তরসূরিদের জনগণের কল্পনাকে আকৃষ্ট করার জন্য সুসজ্জিত অট্টালিকায় জাঁকজমকপূর্ণ দরবার ছিল।

সুলতানের কার্যাবলি সম্পর্কে আমরা কিছু না জানলেও এখানে বলা যায় যে, রাজ্য রক্ষা, কর আদায়, আইন প্রয়োগ, শৃঙ্খলা রক্ষা, কর্মচারী নিয়োগ এবং জনস্বার্থের প্রতি খেয়াল রাখা ছিল তাঁর কার্যাবলির অন্তর্ভুক্ত। এগুলি সবসময়ই রাজকীয় দায়িত্ব ছিল।

২.

অভিজাতবর্গ প্রশাসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন। আরব, পাঠান, মোগল ও বাঙ্গালিদের মতো বিভিন্ন জাতীয় উপাদান নিয়ে গঠিত ছিল অভিজাত শ্রেণী।[২৩] অভিজাতরা খান-ই-আজম, খাকান-ই-মোয়াজ্জম, পহলওই-আসর-ওয়াজ-জামান, খান-ই-মোয়াজ্জম, মজলিস-উস-মজালিস, আল-মালিক-উল-মোয়াজ্জম-ওয়াল-মোকাররম, মালিক-উল-উমারা ওয়াল-ওয়াজারা, মহাপাত্রাধিপত্র ইত্যাদির মতো জমকালো ধ্বনিসমৃদ্ধ সম্মানসূচক উপাধি লাভ করতেন।[২৪] প্রশাসক, সেনাপতি এবং কখনও কখনও রাজ-নির্বাচকরূপে তাঁরা সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে প্রভাব বিস্তার করতেন। অভিজাতরা বংশানুক্রমিক ছিলেন বলে মনে হয় না। ফিরূজ ও মাহমুদের শাসনামলে অভিজাতরাই যখন সে সময়ের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির মীমাংসা করতেন তখন তাঁদের প্রভাব যথেষ্ট বেড়ে যায়।[২৫] এ গ্রন্থের পরবর্তী এক অংশে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে যে তাঁদের মধ্যে অন্তত কিছুসংখ্যককে নিয়ে এদেশে রাজস্ব-ভোগী গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়েছিল। এটা মোটামুটি সুপ্রতিষ্ঠিত যে তাঁরা মোগল ও প্রাক-মোগল যুগের ভারতে জায়গির ভোগ করছিলেন। হোসেন শাহী আমলের বাংলার অভিজাতবর্গ তাঁদের উত্তর ভারতীয় প্রতিপক্ষদের চেয়ে খুব ভিন্নতর ছিলেন বলে মনে হয় না। পাল ও সেনদের আমলে বাংলার শাসন ব্যবস্থায় যে কিছুটা সামন্ততান্ত্রিক ভিত্তি ছিল মুসলমান শাসনের প্রাথমিক যুগে তার তেমন কোনো উপলব্ধি যোগ্য পরিবর্তন হয়েছিল বলে মনে হয় না। বখতিয়ার প্রবর্তিত সরকার পদ্ধতি স্পষ্টরূপে এর সামন্ততান্ত্রিক চরিত্র নির্দেশ করে। বখতিয়ার গোটা দেশকে কয়েকটি সামরিক অংশে বিভক্ত করে সেগুলি কয়েকজন সামরিক কর্মচারীর মধ্যে ভাগ করে দিয়েছিলেন যারা মুক্তি নামেও পরিচিত।[২৬] বহুদিন পরেও এ ধরনের সরকার প্রচলিত ছিল। কথিত আছে যে, বাংলা অভিযানের সময় ফিরূজ তুঘলক অভিজাতবর্গকে প্রদত্ত ভূমির পরিমাণ বৃদ্ধি এবং সামরিক কর্মচারীদেরকেও প্রদত্ত জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করার অঙ্গীকার করেছিলেন। মনে

হয় এক্তা বা অনুরূপ কোনো ব্যবস্থা প্রাক-মোগল বাংলায় প্রচলিত ছিল। হোসেন শাহী আমলের সামরিক গভর্নররা সম্ভবত মুক্তিদের মতো রাজস্ব-স্বত্ব ভোগ করতেন। বাংলার প্রশাসনে বিকেন্দ্রীকরণের যে প্রবণতা বাবর লক্ষ্য করেছিলেন এবং বাংলা সাহিত্যে কর-সংগ্রাহকদের নিয়ন্ত্রকরূপে প্রাদেশিক ওয়াজীরের যে চিত্র পাওয়া যায় তা এ ইঙ্গিতকে জোরদার করে। হোসেন শাহী সুলতানদের রাজত্বকালে বাংলায় মনসবদারি প্রথা প্রচলিত ছিল বলে বাবর যে উল্লেখ করেছেন[২৭] সমকালীন উৎসগুলিতে সে বক্তব্যের কোনো সমর্থন পাওয়া যায় না। মনে হয় তিনি বাংলার স্থানীয়-ভূস্বামী ও প্রাদেশিক গভর্নরদের মনসবদারদের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছেন।

৩.

অন্যদের সাহায্য না নিয়ে প্রশাসনিক কাজকর্ম চালানো হোসেন শাহীদের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। রাষ্ট্রযন্ত্র সহজে ও ক্ষিপ্রতার সঙ্গে চালানোর জন্য তাঁদের বহুসংখ্যক কর্মচারীর উপর নির্ভর করতে হতো। মনে হয় রাজ্যে অর্থ, পত্রযোগাযোগ, পুলিশ, বিচার এবং সামরিক বিভাগের মতো বহু দপ্তর ছিল যদিও তাদের কাজ ও অধিক্ষেত্র সুনির্দিষ্ট ছিল কিনা সেটা স্পষ্ট নয়। দিল্লির সুলতানদের ও শের শাহের আমলেও এ বিভাগগুলি সক্রিয় ছিল। এ সব বিভাগের কাজ হোসেন শাহীরা পরিহার করতে পেরেছিলেন একথা চিন্তা করার আমাদের কোনো কারণ নেই। এ বিভাগগুলি সবসময়ই অপরিহার্যরূপে সব শাসন ব্যবস্থার সঙ্গেই জড়িত।

প্রধানমন্ত্রীর বিভিন্ন দপ্তরের ওপর এক ধরনের নিয়ন্ত্রণমূলক প্রভাব ছিল। শেষ হাবশী সুলতানের আমলে সৈয়দ হোসেন ছিলেন ওয়াজীর এবং সরকারি বিষয়াদির প্রশাসক। সৈন্যদের বেতন প্রদান, খাজাঞ্চি-খানার নির্মাণ কাজ শুরু এবং প্রজাদের কাছ থেকে অত্যন্ত চড়া হারে রাজস্ব দাবি করা ছিল তাঁর প্রত্যক্ষ দায়িত্ব।[২৮] হাবাশ খান নামে আমরা একই ধরনের অন্যএকজন কর্মচারি পাই যিনি নাসিরউদ্দীন মাহমুদের (১৪৯০-৯১) অর্থসংক্রান্ত ও প্রশাসনিক বিষয়াবলির সঙ্গে জড়িত ছিলেন।[২৯] এটা অবশ্য প্রাক হোসেন শাহী আমলে যাকে বলা যায় প্রধান প্রশাসকের অবস্থান সম্পর্কিত তথ্য। এখানে অনুমান করা যেতে পারে যে হোসেন শাহীরাও এ দপ্তরটি বজায় রেখেছিলেন।[৩০] ফিরিশতা ও সেলিম যা বলেছেন তা থেকে এটা যথেষ্ট পরিষ্কার যে কেন্দ্রে এ দপ্তরটি অর্থ ও সামরিক বিভাগের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত ছিল এবং এই কর্মকর্তা মাঝে মাঝে সুলতানের অভিন্ন হৃদয় বন্ধুর দায়িত্ব পালন করতেন।

পত্রযোগাযোগ বিভাগ সম্ভবত কেন্দ্রীয় সচিবালয়ের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল। এটা ছিল দবীর-ই-খাস[৩১] বা একান্ত সচিবের নিয়ন্ত্রণে। তিনি সুলতানের সঙ্গে তাঁর কর্মচারীবৃন্দ এবং করদরাজা বা বিদেশী রাজ্যের শাসকদের সকল চিঠিপত্র সংক্রান্ত কাজ করতেন। যেহেতু মাঝে মাঝে দবীর-ই-খাসকে গোপনীয় চিঠিপত্র নিয়ে কাজ করতে হতো, ধারণা করা যায় যে তিনি সুলতানের সম্পূর্ণ আস্থাভাজন ছিলেন। দিল্লি সুলতানাতে

এ বিভাগের প্রতিরূপ ছিল "ওয়াজীরাত এ যাবার সোপান"।[৩২] মনে হয় যে তাঁর দায়িত্ব পালনে দবীর-ই-খাসকে কয়েকজন অধস্তন দবীর সাহায্য করতেন। এ বিভাগের জন্য কার-ই-ফরমান[৩৩] এবং কাতিবদের সহযোগিতার প্রয়োজন ছিল। সম্ভবত কার-ই ফরমানের দায়িত্ব ছিল সংশ্লিষ্টদের প্রতি রাজকীয় আদেশ জারি করা এবং কাতিবরা বিভিন্ন চিঠিপত্র ও দলিলের অনুলিপি তৈরি করতেন। কিছুটা পূর্ববর্তী আমলের একটি লিপি থেকে স্পষ্টভাবে দেখা যায় যে বিভিন্ন ধরনের হস্তলিপি-রীতিতে দক্ষতার কারণে কাতিবরা মাঝে মাঝে জরীন দস্ত[৩৪] বা সোনালি হস্তের অধিকারীর মতো উপাধি লাভ করতেন।

১৫১২ সালের দেবীকোট লিপিতে প্রধান পুলিশ কর্মকর্তা বা কোতওয়াল-বকালীর অধীনে প্রাদেশিক দপ্তর হিসেবে পুলিশ বিভাগ বা দিওয়ান-ই-কোতওয়ালীর উল্লেখ রয়েছে।[৩৫] যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুমান করা যেতে পারে যে এ দিওয়ানের কেন্দ্রীয় একজন প্রতিরূপও ছিলেন। এ বিভাগে বহুসংখ্যক অধস্তন কোতওয়াল ছিলেন যাদের দায়িত্ব ছিল শহরে শান্তি বজায় রাখা ও অপরিচিত ব্যক্তিদের গতিবিধির ওপর নজর রাখা। ফৌজদারি মামলার বিচার করতেন একজন বিচারক বা মুনসিফ তাঁর বিচারালয়ের সঙ্গে এ বিভাগ জড়িত ছিল। সম্ভবত সুসংগঠিত একটি গুপ্তচর বিভাগ ছিল যা সুলতানকে তাঁর রাজ্যে বা আশে পাশে কি ঘটছে সে সম্পর্কে নিয়মিত অবহিত রাখতেন। সুলতান কর্তৃক নিযুক্ত এসব গুপ্তচরকে বাংলা সাহিত্যে জাসু বা দানীরূপে আখ্যায়িত করা হয়েছে।[৩৬] এভাবে তাঁর রাজ্যের দূরবর্তী এলাকার গভর্নরদের উপর ফলপ্রসূ নিয়ন্ত্রণ কার্যকর করতে এ গুপ্তচর ব্যবস্থা সুলতানকে প্রভূত সাহায্য করেছিল।

হোসেন শাহীদের বিচার বিভাগ সম্পর্কে আমরা কিছু না জানলেও এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে একজন বিদ্বান ব্যক্তি আইনগত সমস্যাবলি ও মুসলিম প্রথাগুলির ব্যাখ্যা করতেন। তিনি ছিলেন "আইনজীবী ও হাদিস-শিক্ষকদের প্রধান।" তিনি মালিক-উল-উমারা ওয়াল ওয়াজারারূপেও পরিচিত ছিলেন যার উল্লেখ নসরত শাহের সোনারগাঁও লিপিতে[৩৭] রয়েছে। অপরাধীদের একজন প্রধান কারাপালের[৩৮] অধীনস্থ কয়েদখানায় আটকে রাখা হতো।

অর্থ দপ্তর সম্পর্কে কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। এটা সহজেই বুঝা যায় যে রাজ্যের বিপুল রাজস্ব, শুল্ক এবং অন্যান্য ধরনের আয় এ বিভাগের অধীনে ন্যস্ত করা হতো এবং প্রধানমন্ত্রী এ বিভাগের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। তুর্কি-আফগান ও মোগলদের সময় ব্যবস্থাটা এরকমই ছিল। ফতেহ শাহের ১৪৮৪ সালের গৌড় লিপিতে[৩৯] ওয়াজীর-ই-লশ্‌কর নামে আখ্যায়িত একজন কর্মচারীর উল্লেখ আছে। মনে হয় প্রাক-মোগল আমলের লিপিগুলিতে প্রায়ই উল্লিখিত ওয়াজীর-ওয়া-সর-লশকর পদের স্থানে ভুলবশত এটা ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু হোসেন শাহের সিলেট লিপি[৪০] এবং বাবরের আত্মজীবনীতেও[৪১] এ পদটি দেখতে পাওয়া যায় যেখানে এটাকে লশ্‌কর ওয়াজীর রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। আহোম বুরঞ্জীতে এটাকে সম্ভবত বড় ওয়াজীর রূপে দেখা যায়।[৪২] আত্মজীবনী ও বুরঞ্জী দু'টোতেই এ কর্মচারীকে সামরিক বিষয়ের সঙ্গে জড়িত করা হয়েছে। কাজেই বলা যেতে পারে যে এ কর্মচারী সামরিক বিভাগের অর্থসংক্রান্ত দিকটি

দেখতেন।[৪৩] সুতরাং, মনে হয়, এটা ছিল মোগলদের মীর বখশির দপ্তরের অনুরূপ। ধরে নেওয়া যায় যে, সৈন্যদের বেতন প্রদানের ব্যাপারে এ কর্মচারীকে অর্থ দপ্তরের প্রধানের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হতো। রাজধানীতে টাকশালে মুদ্রা উৎকীর্ণ করে খাজাঞ্চিখানায় জমা রাখা হতো। টাকশাল ও খাজাঞ্চিখানার ব্যবস্থাপনার জন্য একজন টাকশাল প্রধান ও খাজাঞ্চি ছিলেন। হোসেন শাহী বহু মুদ্রায় খাজনাহ[৪৪] শব্দটি দেখে মনে হয় যে সেগুলি সরাসরি কেন্দ্রীয় খাজাঞ্চিখানা থেকে জারি করা হয়েছিল।

হোসেন শাহীদের সম্ভবত সামরিক বিভাগের এক্তিয়ারভুক্ত সুসংগঠিত সেনাবাহিনী[৪৫] ছিল। হোসেন শাহী সেনাবাহিনী পদাতিক পাইক, অশ্বারোহী, গোলন্দাজ, নৌ ও হস্তীবাহিনীর সমন্বয়ে গঠিত ছিল।[৪৬] প্রথম ইলিয়াস শাহীদের আমল থেকেই বাঙ্গালি পাইকরা বেপরোয়া সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করছিল। এমনও হয়েছে যে তারা দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির মোকাবেলা করেছে যা গুরুতর বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে বাংলার স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে বিঘ্নিত করেছে। দিল্লি সুলতানাতের অংশ থাকা কালেও বাংলা দিল্লির সুলতানদের শ্রেষ্ঠ পাইক সরবরাহ করেছে।[৪৭] জোয়াও দ্য ব্যারোসের মতানুসারে হোসেন শাহী পাইকরা তীর, ধনুক ও বন্দুক ব্যবহার করত।[৪৮] নসরত শাহের সৈন্যদের মুখোমুখি হওয়ার সুযোগ বাবরের হয়েছিল। তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে বাঙ্গালি পদাতিক সৈন্য-বিন্যাসের বর্ণনা দিয়েছেন। সাধারণত সৈন্যদের তিন থেকে চার ভাগে শ্রেণীবদ্ধভাবে দাঁড় করানো হতো যাতে তারা শত্রুবাহিনীকে পার্শ্বদেশে আক্রমণ করতে পারে এবং প্রাণপণে আক্রমণ করে যেতে পারে। বিন্যাস না ভেঙ্গে সেনাপতি পদাতিক সৈন্যদের সামনে এগিয়ে দিতেন এবং এভাবে অগ্রসর হতেন।[৪৯] এই ছিল সৈন্য-বিন্যাসের বৈশিষ্ট্য যা স্বভাবতই বাবরের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল।

সম্ভবত অশ্বারোহী বাহিনী ছিল হোসেন শাহী সেনাবাহিনীর দুর্বলতম অংশ। এ অঞ্চলে ভাল ঘোড়া না পাওয়ায় ঘোড়া সরবরাহের জন্য তাঁদের সবসময়ই বিদেশের উপর নির্ভর করতে হতো। প্রাক-মোগল বাংলার লিপি থেকে আমরা সর-ই-খৈল[৫০] এবং সিপাহ্-সালার[৫১], অশ্বারোহী বাহিনীর এ দু'জন কর্মচারীর উপাধির কথা জানতে পারি যদিও শেষোক্তটির পাঠ সন্দেহজনক। সিপাহসালার শব্দটি কিন্তু মাহুয়ান[৫২] ব্যবহার করেছেন। তিনি পঞ্চদশ শতকের গোড়ার দিকে বাংলায় এসেছিলেন। হোসেন শাহীদের অশ্বারোহী বাহিনীর সংগঠন সম্পর্কে কোনো ধারণা করার জন্য এ দু'টি উপাধি মোটেই যথেষ্ট নয়। সমকালীন উত্তরভারতীয় সামরিক সংগঠনে তাদের কিভাবে ব্যবহার করা হয়েছিল সেটা আমরা দেখতে পারি। সাধারণত একজন সর-ই-খৈলের অধীনে কয়েকজন অশ্বারোহীকে ন্যস্ত করা হতো; একজন সিপাহ্-সালারের অধীনে থাকতেন কয়েকজন সর-ই-খৈল; একজন আমিরের অধীনে ছিলেন কিছুসংখ্যক সিপাহ্-সালার; আমিররা ছিলেন খানদের অধীনে।[৫৩] অবশ্য এটা ছিল তত্ত্বীয় ব্যবস্থা বাস্তবে যার বহু পরিবর্তন হয়েছিল এবং সিপাহ্-সালার পদটি প্রায়ই সর্বাধিনায়ককে বুঝাত। উত্তর ভারতে অশ্বারোহী কর্মকর্তাদের শ্রেণীবিন্যাস যাই হোক না কেন আমাদের এমন মনে করার কোনো কারণ নেই যে কোনো পরিবর্তন ছাড়াই বাংলায় সেটা গৃহীত হয়েছিল। মনে হয়, বাংলায় সর্বাধিনায়ক

সিপাহ্-সালার রূপে অভিহিত ছিলেন এবং সর-ই-খৈল ছিলেন অশ্বারোহী বাহিনীর প্রধান। ইলিয়াস শাহীদের সৃষ্ট অশ্বারোহী বাহিনীর সংগঠন হোসেন শাহীদের আমলেও অব্যাহত ছিল।

গোলন্দাজ বাহিনী ছিল সেনাবাহিনীর একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। বাবর এটাকে বাংলার সেনাবাহিনীর এক অত্যন্ত কার্যকর অংশরূপে বর্ণনা করেছেন।[৫৪] দ্য ব্যারোস বলেছেন যে আরাকান ও ত্রিপুরার রাজাদের ওপর বাংলার সুলতানরা যে সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিলেন তার মূলে ছিল প্রধানত তাঁদের গোলন্দাজ বাহিনীর দক্ষতা।[৫৫] নিজেদের বড় বড় কামান ও গাদা বন্দুক থেকে গুলি-গোলা ছোঁড়ার জন্য আহোম বুরুঞ্জী বাঙালিদের কৃতিত্ব দিয়েছেন। বস্তুত ব্যবহৃত কামান ও বন্দুক ছিল বিভিন্ন আকারের এবং গোলা-বারুদের জন্য বাংলার সুলতানদের সুখ্যাতি ছিল।[৫৬]

বাংলা নদী-নালায় ভরপুর হওয়ায় নৌবাহিনী বিভাগ ছিল অপরিহার্যরূপে আবশ্যকীয়। এ দেশের নিয়ন্ত্রণ অশ্বারোহী বাহিনী মাত্র ছয় মাসের জন্য নিশ্চিত রাখতে পারত। পক্ষান্তরে বাঙালি পাইকদের সমর্থনপুষ্ট নৌবাহিনী বর্ষাকালের বছরের বাকি ছয়মাস শত্রুপক্ষের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখতে পারত। দিল্লির সুলতানদের শক্তিশালী নৌবাহিনী না থাকায় তাঁরা সাধারণত শুষ্ক মৌসুমে বাংলা আক্রমণ করতেন, কারণ বর্ষাকালে কোনো কার্যকর অগ্রগতি সম্ভবপর ছিল না। ইওয়াজের আমল থেকে রণতরীর বহর এদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছিল। আলাউদ্দীন হোসেন শাহ ও তাঁর উত্তরসূরিরা বিভিন্ন যুদ্ধে তাঁদের নৌবহর ব্যবহার করেছিলেন[৫৭] এবং সম্ভবত সাফল্যও লাভ করেছিলেন। ফতেহ শাহের ১৪৮২ সালের ধামরাই লিপিতে[৫৮] সরকারি উপাধি মীর-ই-বহর বা নৌ-সেনাপতির উল্লেখ আছে। এটা খুবই সম্ভাব্য মনে হয় যে হোসেন শাহীরাও এ পদটি বহাল রেখেছিলেন। নৌ-বিভাগ এ কর্মকর্তার অধীনে ন্যস্ত ছিল। আবুল ফজলের মতানুসারে নৌ-সেনাপতির দায়িত্ব ছিল নিম্নরূপ :

(ক) নদীপথে চলাচলের জন্য সবধরনের নৌকা তৈরি; (খ) রণ-হস্তী বহন করার জন্য মজবুত নৌকা তৈরি;(গ) দক্ষ নাবিক সংগ্রহ; (ঘ) নদীর তত্ত্বাবধান এবং (ঙ) ফেরিঘাটে শুল্ক আদায় করা। নৌ-দপ্তরের কার্যাবলি সম্পর্কে একইরকম ধারণা বাহারিস্তান-ই-গায়েবী থেকেও পাওয়া যায়।[৫৯] হোসেন শাহী শাসনামলের শেষদিকে বাংলার নৌশক্তি মনে হয় ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়েছিল।

বাংলার সেনাবাহিনীতে হাতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। হাজী ইলিয়াসের ক্ষমতা ছিল বহুলাংশে শক্তিশালী ও বিশাল হস্তীবাহিনীর ওপর নির্ভরশীল। আহোমদের সঙ্গে যুদ্ধে নসরত শাহ হাতি ব্যবহার করেছিলেন। কথিত আছে যে আহোমরা সেগুলির কয়েকটি দখল করেছিল।[৬০] তৃতীয় মাহমুদ শাহের সেনাপতি কুতুব খানকে পরাজিত করে শেরখান বেশ কয়েকটি হাতি দখল করেছিলেন।[৬১] দিল্লি সুলতানাতে শাহানা-ই-পিল নামে আখ্যায়িত একজন কর্মকর্তা হস্তীবাহিনীর দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন। হোসেন শাহীদেরও অনুরূপ কোনো দপ্তর ছিল কিনা তা জানা যায় না। কিন্তু এটা নিশ্চিত যে তাঁরা যে হস্তীবাহিনী পুষতেন, তার জন্য আস্তাবল-রক্ষকসহ বহু লোকের দরকার হতো।

৪.

সংশ্লিষ্ট উপাদানের অতি-স্বল্পতার জন্য হোসেন শাহীদের রাজস্ব-ব্যবস্থার মূল্যায়ন করা খুবই কঠিন। মধ্যযুগীয় বাংলার রাজস্ব-ব্যবস্থা সম্পর্কে আবুল ফজল যা বলেছেন আমরা সেটা বিবেচনা করতে পারি। তিনি মন্তব্য করেছেন : "জনসাধারণ অনুগত এবং তারা নিয়মিতভাবে খাজনা দেয়। তারা বার্ষিক খাজনা আটটি মাসিক কিস্তিতে পরিশোধ করে। এখানে সরকার ও চাষীদের মধ্যে শস্য-ভাগের রেওয়াজ না থাকায় তারা নিজেরাই খাজনা গ্রহণের নির্দিষ্ট স্থানে মোহর ও টাকা নিয়ে আসে। সবসময়ই প্রচুর শস্য ফলে, মাপের উপর জোর দেওয়া হয় না এবং রাজস্বের দাবি ফসলের মূল্যের ওপর নির্ধারণ করা হয়। দয়াপরবশ হয়ে সম্রাট এ রীতি অনুমোদন করেছেন।"[৬২] সযত্নে বিশ্লেষণ করলে এ বর্ণনায় নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি দেখা যায় : (ক) সরকারের বার্ষিক খাজনা আটটি মাসিক কিস্তিতে দেওয়া হতো; (খ) চাষীরা সরকারকে সরাসরি নগদ অর্থ প্রদান করত; (গ) সাধারণত শস্যের মূল্য বিচার ব্যবস্থা অনুসরণ করা হতো; (ঘ) জরিপ ও মাপের প্রতি জোর দেওয়া হতো না; এবং (ঙ) আবুল ফজল যা বলেছেন তা প্রাক-মোগল বাংলার সঙ্গে সম্পর্কিত এবং এ প্রাচীন ব্যবস্থা আকবর বহাল রাখতে অনুমতি দিয়েছিলেন।

এ বিবরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটা ষোড়শ শতকের শেষ চতুর্থাংশে প্রচলিত রাজস্ব-ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রচুর আলোকপাত করে। উল্লিখিত রীতিগুলি বিশৃঙ্খলার সময়ে এবং হোসেন শাহী আমলেও বাংলায় প্রচলিত থেকে থাকতে পারে কারণ সূর ও কররানীদের দেশের রাজস্ব-ব্যবস্থায় সম্পূর্ণ পরিবর্তন আনার কোনো অবকাশ ছিল না। এ রকম পরিস্থিতি হওয়া সত্ত্বেও আবুল ফজলের বর্ণনা শর্তহীনভাবে গ্রহণ করা যায় না। পর্যালোচনাধীন আমলে সমস্ত দেশে রাজস্ব-ব্যবস্থার একইরূপ সম্ভবত বিরল ছিল। প্রাদেশিক গভর্নরদের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকায় এ বর্ণনা সত্য হলেও এ ব্যবস্থা স্থানীয় মজমুয়াদারদের ও পর্তুগিজ ইজারাদারদের অধীনস্থ এলাকা সম্পর্কে প্রযোজ্য নয়। বাংলার কোনো কোনো এলাকায় এদের অস্তিত্ব আবুল ফজলের সরাসরি রাজস্ব প্রদানের সম্ভাবনার সুস্পষ্ট বক্তব্যের বিরুদ্ধে জোরদার যুক্তি হিসেবে কাজ করে। আবার একটি বাংলা গ্রন্থে তকসিম শব্দটির উপস্থিতি[৬৩] দেশের কোনো কোনো অংশে অন্তত শস্য-ভাগের রীতির অস্তিত্ব নির্দেশ করে। মোরল্যান্ডের মতানুসারে[৬৪] তকসিম উৎপন্ন শস্যের ভাগাভাগির সঙ্গে সম্পর্কিত। কিছুটা আগের আমল সম্পর্কে বর্ণনা দিতে গিয়ে ইবনে বতুতা আমাদের এ তথ্য দিচ্ছেন যে 'নীল নদীর' উভয় তীরের কৃষকরা তাদের উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক সরকারকে দিত।[৬৫] নগদ অর্থে রাজস্ব প্রদান ছিল নিয়মিত ব্যবস্থা এ মতও ঐ আমলে মুদ্রা ব্যবহারের স্বল্পতার কারণে সম্ভবত একইরকম অগ্রহণযোগ্য। জরিপের ওপর 'জোর দেওয়া' না হয়ে থাকলেও দেশে এটা একেবারেই অনুপস্থিত ছিল তা মনে করারও পর্যাপ্ত কারণ আমাদের কাছে নেই। কবি কঙ্কণের কাঠা ও কুড়ার মতো জরিপের সেকেলে মানের এককের প্রাসঙ্গিক উল্লেখ এটাই নির্দেশ করে যে বাংলায় জরিপ ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। প্রজাদের যন্ত্রণাকাতর সনির্বন্ধ প্রার্থনায় কান না দিয়ে শিকদার ১৫ কাঠায় এক কুড়া হিসেবে মাপছিলেন[৬৬] কবির এ উক্তি এ ইঙ্গিত দেয় যে পরিবৃত্তিকালে বাংলায় দায়িত্বে

নিয়োজিত মোগল কর্মচারীরা প্রচলিত জরিপব্যবস্থায় পরিবর্তন আনছিলেন যা জনগণের দুর্দশার কারণ হয়েছিল। কাজেই যুক্তিসঙ্গতভাবে এ ইঙ্গিত করা যায় যে দেশের কোনো কোনো অঞ্চলে জরিপ ব্যবস্থা অনুসরণ করা হতো এবং অন্যান্য অঞ্চলে ফসলের মূল্য বিচারের ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল।

প্রাদেশিক গভর্নরদের নিয়ন্ত্রণাধীন জমি থেকে এবং স্থানীয় জমিদার ও পর্তুগিজ ইজারাদারদের কাছ থেকে সুলতানরা তাঁদের রাজস্ব লাভ করতেন। ধর্মীয় উদ্দেশ্যে প্রদত্ত জমিগুলি সাধারণত করমুক্ত ছিল।

মজমুয়াদাররূপে পরিচিত এক শ্রেণীর লোক ছিলেন। চৈতন্য চরিতামৃত হিরণ্যদাস ও গোবর্ধন দাসের মালিকানাধীন জমিদারির উল্লেখ করেছে যাঁরা কর হিসেবে ২০ লাখ আদায় করে সরকারকে ১২ লাখ দিতেন।[৬৭] এ থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলায় মজমুয়াদারির প্রকৃতি দেখা যায়। সুতরাং মজমুয়াদাররা ছিলেন ঠিকাদার শ্রেণীর যারা কৃষকদের কাছ থেকে যা আদায় করা হতো তা থেকে একটা নির্দিষ্ট অঙ্কের টাকা রাজকীয় কোষাগারে প্রদান করতেন। তাঁদের জমিদারিতে এসব ইজারাদার তাঁদের খুশিমতো রাজস্ব ব্যবস্থা চালাতেন। মাঝে মাঝে তাঁরা চাষীদের উপর অত্যাচারমূলক দাবি করতেন। নির্দিষ্ট অঙ্কের টাকা পেয়েই সন্তুষ্ট থাকায় সরকার এসব জমিদারির অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে খোঁজখবর নেবেন তা আশা করা যায় না। কিন্তু মজমুয়াদারদের এসব জমিদারিতে বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকারের দাবি ছিল না। মাঝে মাঝে এগুলির বদল হতে পারত।[৬৮] এটা মনে হয় মজমুয়াদারদের ব্যক্তিগত খামখেয়ালিপনার উপর একটি নিশ্চিত বাধারূপে কাজ করেছিল। মজমুয়াদাররা প্রাদেশিক গভর্নরদেরও কর্তৃত্বাধীন থাকতেন যাঁরা তাঁদের কার্যকলাপের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। এর উদাহরণ হিসেবে আমরা রামচন্দ্র খানের ঘটনা উল্লেখ করতে পারি। বকেয়া খাজনার জন্য মুসলমান ওয়াজীর তাঁর উপর নির্দয়ভাবে অত্যাচার করেছিলেন।[৬৯]

পর্তুগিজরাও এদেশে রাজস্ব-আদায়ের অধিকার লাভ করেছিল। তৃতীয় মাহমুদ শাহ তাদের সাতগাঁও ও সোনারগাঁওয়ে শুল্ক নিয়ন্ত্রণ, সেখানে কুঠি নির্মাণ এবং পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলিতে রাজস্ব আদায়ের অনুমতি দিয়েছিলেন।[৭০] মনে হয় যে এসব পর্তুগিজ উপনিবেশ পূর্বে আলোচিত মজমুয়াদারির অনুরূপ ছিল। সুলতানের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ছিল চুক্তিভিত্তিক যা অনুসারে তারা সুলতানকে বার্ষিক কর দিত এবং নিজেদের এলাকার রাজস্ব-বিষয়াদি পরিচালনা করত। আব্দুল হামিদ লাহোরী আমাদের জানাচ্ছেন যে, পর্তুগিজরা "অল্প-রাজস্বের" বিনিময়ে সাতগাঁও লাভ করেছিল।[৭১] এর অর্থ হচ্ছে পর্তুগিজ ইজারাদারদের জন্য প্রচুর অর্থ সুবিধা থাকত এবং তারা সুলতানকে যে কর দিত তা ছিল নেহাৎই নামে মাত্র ধরনের। ক্যাস্টানহেডা[৭২] যা বলেছেন তা থেকে মনে হয় যে চট্টগ্রামস্থ শুল্ক-ভবনের প্রধান হিন্দু ও মুসলমান অধিবাসীদের কাছ থেকে প্রচুর কর আদায় করতেন। এ সব এলাকায় পর্তুগিজদের অনুসৃত ভূমি সম্বন্ধীয় পদ্ধতির প্রকৃতি সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। এ সম্পর্কে মোরল্যান্ড যে অনুমান করেছেন তা নিম্নরূপ : "বিরাজমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এটা অনুমান করা যুক্তিসঙ্গত হবে এসব পত্তনি ছিল দাবি মিটানোর

ইজারাদারি প্রকৃতির, অর্থাৎ খালি জমির জন্য একটা নির্দিষ্ট বার্ষিক কর গ্রহণ করা হতো। লাভ পাওয়ার জন্য ইজারাদারকে এ জমি চাষের আওতায় আনতে হতো"।[৭৩] এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এ বক্তব্য প্রমাণ করার মতো কোনো কিছুই এখন পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। এটা স্বাভাবিক যে এসব এলাকায় যারা বসবাস করতে শুরু করছিল পর্তুগিজরা সে সব খ্রিস্টানকে যুক্তিসঙ্গত সুবিধাদি দিচ্ছিল।

আলোচ্য আমলে বাংলায় জায়গিরদারি একটা নিয়মিত ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছিল কিনা তা আমরা জানি না। নিজামউদ্দীন আমাদের জানাচ্ছেন, "সে সময়ের জরুরি প্রয়োজনের ভিত্তিতে নসিব শাহ্ যতটা সম্ভব তাদের সকলকে জায়গির দান করেছিলেন"।[৭৪] সেলিম[৭৫] ও ফিরিশতাও[৭৬] একইরকম ধারণা ব্যক্ত করেছেন। তাঁরা অবশ্য 'জায়গির' শব্দটি ব্যবহার করেন নি। এ দু'জন গ্রন্থকার বাবরের আক্রমণ থেকে রক্ষা পেয়ে বাংলায় পালিয়ে আসা আফগান রাজনৈতিক শরণার্থীদের কথা উল্লেখ করেছেন। আমাদের গ্রন্থকাররা তারা নসরত শাহের অধীনে চাকুরি গ্রহণ করেছিলেন এমন কোনো কথা না বলায় এসব শরণার্থী বাংলায় জায়গির ভোগ করেছিলেন এ মত সমর্থন করার আমাদের কোনো কারণ নেই। জায়গির শব্দটি যথাযথ অর্থে রাজকার্যে নিয়োগের অবশ্যম্ভাবী অনুসিদ্ধান্তরূপেই আসে। উত্তর ভারতে জায়গির ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে পরিচিত নিজামউদ্দীন মনে হয় বাংলার আফগান বসতিগুলিকে জায়গিরদারির সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছেন। এ বসতিগুলি ইজারাদারি প্রকৃতির হতে পারত যা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। আমরা কি তাহলে এ ইঙ্গিতই দেব যে জায়গিরদারি বাংলায় সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত ছিল? কিছু কারণে এ প্রশ্নের ইতিবাচক উত্তর দেওয়া যায় না। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এটা ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। বস্তুত নিজামউদ্দীন জমিদারি ও জায়গিরদারির মধ্যে পার্থক্য করেছেন যখন তিনি বলছেন যে সিকান্দর লোদী বিহারে জমিদারদের কাছ থেকে কিছু পরগণা নিয়ে জায়গির হিসেবে তাঁর নিজের লোকদের দিয়েছিলেন।[৭৭] গ্রন্থকার স্পষ্টভাবেই বলছেন এ ব্যবস্থা ইব্রাহিম লোদীর আমলেও প্রচলিত ছিল।[৭৮] পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বাংলায় আগত মাহুয়ান সৈন্য ও সামরিক কর্মকর্তাদের নগদ বেতন নিতে দেখেছিলেন এবং তিনি 'তঙ্কা' ও 'কড়ির' ব্যাপক প্রচলনও লক্ষ্য করেছিলেন।[৭৯] নগদ অর্থে বেতন প্রদান প্রথা জায়গির ব্যবস্থা প্রচলিত থাকার সম্ভাবনাকে নিরোধ করে না কারণ উভয় ব্যবস্থাই পাঁশাপাশি এদেশে চলতে পারত। সে আমলে মুদ্রার প্রচলন সীমাবদ্ধ থাকায় জায়গিরদারির মতো ব্যবস্থার মাধ্যমেই শুধু সুবিধাজনকভাবে বেতন দেওয়া সম্ভবপর ছিল।

জমিদারি ব্যবস্থা আধুনিক অর্থে সম্ভবত অনুপস্থিত ছিল। আবুল ফজল বলছেন যে শুধুমাত্র ফতেহাবাদ সরকারেই তিন শ্রেণীর জমিদার ছিলেন এবং সরকার সুলায়মানবাদের স্বাধীন তালুকদারদের কাছ থেকে প্রাপ্ত রাজস্বের পরিমাণ ছিল ২১৩,০৬৭ দাম।[৮০] কবি কঙ্কণ বলেছেন যে, তিনি বাস করতেন গোপীনাথ নিয়োগীর তালুকে।[৮১] এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে টোডরমলের রাজস্ব তালিকায়, যা ছিল আবুল ফজলের তথ্যের ভিত্তি, ইজারাদারি ও জমিদারিকে গুলিয়ে ফেলা হয়েছে। আবার কবি কঙ্কণ যা বলেছেন

সেটা শুধু ক্রান্তিকালের জন্যই প্রযোজ্য হতে পারে, অপরিহার্যরূপে পর্যালোচনাধীন আমলের জন্য নয়। কোনো কোনো লেখক বাংলার কিছু জমিদার পরিবারের প্রাচীনত্ব নির্দেশ করার চেষ্টা করেছেন।[৮২] কিন্তু তাঁদের মতামতের ভিত্তি হচ্ছে সাধারণত স্থানীয় কিংবদন্তি যা ঐতিহাসিকতার দিক থেকে সবসময় বিশ্বাসযোগ্য নয়। মনে হয় যে, বিশৃঙ্খলার সময় মজমুয়াদার ও ইজারাদার বংশানুক্রমিক জমিদারে পরিণত হয়েছিলেন। জমিদারি শব্দটি কত বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হতো মোরল্যান্ড সেটা দেখিয়েছেন।[৮৩] স্থানীয় ইজারাদারদের জমিদার রূপে গণ্য করলে আমাদের বলার কিছু নেই। আমাদের মনে হয় যে হোসেন শাহী বাংলায় এ ব্যবস্থা নির্দিষ্ট কোনো একটি বা কয়েকটি পরিবারে বংশানুক্রমিক ছিল না।

শুল্ক ছিল আয়ের অন্য একটি উৎস। সাধারণত এ শুল্ক আদায় করা হতো নৌ-স্টেশনে। দেশের বিভিন্ন বন্দর ও শহরেও তা আদায় করা হতো। সাধারণত বন্দরগুলিতে শুল্ক-ভবন থাকত এবং এর প্রত্যেকটি ছিল সুলতান কর্তৃক সরাসরিভাবে নিযুক্ত একজন শুল্ক-প্রধানের অধীনে।[৮৪] পর্তুগিজ বিবরণগুলিতে চট্টগ্রাম ও সাতগাঁওয়ের শুল্ক-ভবনের উল্লেখ আছে। প্রধান শুল্ক কর্মকর্তা সম্ভবত প্রাদেশিক গভর্নরের মতোই শক্তিমান ছিলেন। তখনকার দিনে টাকশাল ছিল আয়ের একটি নিয়মিত উৎস।

হোসেন শাহীরা বিভিন্ন জনহিতকর কাজেও মনোযোগী ছিলেন যার সাক্ষ্য এ আমলের অসংখ্য লিপি থেকে পাওয়া যায়। জল সরবরাহের জন্য দিঘি ও সেতু এবং মসজিদ[৮৫] তাঁরা তৈরি করেছিলেন যা নিঃসন্দেহে যাতায়াতের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি ও দেশের অন্তর্দেশীয় বাণিজ্যকে যথেষ্ট সহজসাধ্য করেছিল। আবার এসব জনহিতকর কাজের সঙ্গে বহুসংখ্যক শ্রমিকের কর্মসংস্থান জড়িত ছিল যা দেশে অর্থ বণ্টনকে সহজতর করেছিল। কিন্তু জনহিতকর কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কোনো নিয়মিত সরকারি দপ্তর ছিল কিনা তা পরিষ্কারভাবে জানা যায় না।

৫.

বাংলা যে সব প্রদেশে বিভক্ত ছিল তার সঠিক তালিকা দেওয়া সহজ নয়। আইনে নিম্নলিখিত আঞ্চলিক এককের উল্লেখ রয়েছে।[৮৬] লক্ষ্ণৌতি, পূর্ণিয়া, তাজপুর, পঞ্জরাহ, ঘোড়াঘাট, বারবকাবাদ, বাগুহা, সিলেট, সোনারগাঁও এবং চাটগাঁও সরকারগুলি নিয়ে গঙ্গার উত্তর ও দক্ষিণ তীরের অঞ্চল গঠিত ছিল। গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ জুড়ে ছিল সাতগাঁও, মাহমুদাবাদ, ফতেহাবাদ এবং বাকলা। গঙ্গার দক্ষিণে ও ভাগীরথীর পশ্চিমে ছিল তাণ্ডা, শরীফাবাদ, সুলায়মানাবাদ এবং মন্দারণ পরগণা।

ব্লখম্যান ইঙ্গিত করেছেন যে উপরোক্ত বিভাগগুলি হচ্ছে প্রাক-মোগল বাংলার রাষ্ট্রীয় ও রাজস্বসংক্রান্ত একক। পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করলে এ অনুমান টিকে না। টোডরমলের যে রাজস্ব-তালিকায় এ সরকারগুলি দেওয়া হয়েছে সেটা তৈরি করা হয়েছিল ১৫৮২ সালে, যখন মোগল সাম্রাজ্য নিশ্চিত রূপ ধারণ করে নি। এটা শুধু বাংলার এক আদর্শ চিত্রই তুলে ধরে। এ থেকেই ব্যাখ্যা পাওয়া যায় যে আকবর ও জাহাঙ্গীরের

আমলে চাটগাঁও বিজিত না হলেও কেন এই রাজস্ব-তালিকায় এর নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। বস্তুত আইনে উল্লিখিত এলাকার চেয়ে হোসেন শাহী বাংলার আঞ্চলিক বিস্তৃতি ব্যাপকতর ছিল। কিন্তু আইন সরবরাহকৃত তথ্য নির্বিচারে নাকচ করে দেওয়া যায় না কারণ সে আমলের কিছু লিপিতে ত্রিপুরা ও সিলেটের মতো এসব বিভাগের কয়েকটির উল্লেখ রয়েছে।[৮৭] আবার হোসেনাবাদ, ফতেহাবাদ, নসরতাবাদ, মোয়াজ্জমাবাদ, খলিফতাবাদ, বারবকাবাদ, মোহাম্মদাবাদ, মাহমুদাবাদ এবং মোজাফফরাবাদ ছিল সে আমলের টাকশাল নগরী।[৮৮]

অনুমান করা যায় যে হোসেন শাহী বাংলায় এগুলি ছিল প্রাদেশিক রাজধানীও। এগুলির প্রত্যেকটিই একটি এলাকার প্রতিনিধিত্ব করত যার নামানুসারে এর নামকরণ করা হয়েছিল। হোসেনাবাদ, নসরতাবাদ এবং মাহমুদাবাদকে গৌড়ের সমার্থক হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। বাংলা সাহিত্য এবং পর্তুগিজ বিবরণ থেকে জানা যায় যে, চট্টগ্রাম হোসেন শাহীদের নিয়ন্ত্রণে ছিল।[৮৯] হোসেন শাহী লিপিমালায় আরসাহ্ সাজলামংখবাদের উল্লেখ বারবার দেখা যায়।[৯০] সারণ ও মুঙ্গেরে প্রাপ্ত বাংলার লিপি থেকে দেখা যায় যে বিহারের উত্তর ও দক্ষিণ অংশ হোসেন শাহী রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। নিজামউদ্দীন ও বাবরও একই ধরনের তথ্য দিয়েছেন।[৯১] আইনে সরকার হিসেবে যে মন্দারণের উল্লেখ আছে তার কিছু অংশ হোসেন শাহী রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কাজেই মুদ্রা ও লিপির সম্পূরক সাক্ষ্য এবং আইন থেকে আমরা হোসেন শাহী রাজ্যের নিম্নলিখিত প্রদেশগুলি পাই : (১) চট্টগ্রাম, (২) ত্রিপুরা, (৩) ইকলিম মোয়াজ্জমাবাদ, (৪) সিলেট, (৫) ফতেহাবাদ, (৬) খলিফতাবাদ, (৭) লক্ষ্ণৌতি বা হোসেনাবাদ, (৮) বারবকাবাদ, (৯) সাতগাঁও, (১০) আরসাহ্ সাজলা মংখবাদ, (১১) হাজীপুরে সদর দপ্তর সহ উত্তর বিহার, (১২) মুঙ্গেরে রাজনৈতিক কেন্দ্রসহ দক্ষিণ বিহার এবং (১৩) নব-বিজিত কামরূপ ও কামতা অঞ্চল। পঞ্জরাজ, ঘোড়াঘাট, তাজপুর এবং পূর্ণিয়া আলাদা প্রদেশ হিসেবে ছিল কিনা সেটা আমরা জানি না। এগুলি সম্ভবত হোসেন শাহীদের উত্তর বিহার, বারবকাবাদ এবং লক্ষ্ণৌতি প্রদেশের অংশ হিসেবে ছিল। অনুরূপভাবে মন্দারণ হয়তো আরসাহ সাজলামংখবাদ এবং বাকলা ফতেহাবাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সোনারগাঁও সম্ভবত ছিল ইকলিম মোয়াজ্জমাবাদের অন্তর্ভুক্ত।

এ প্রদেশগুলির প্রত্যেকটি ইকলিম, মুলক্ বা আরসাহ্ এসব বিভিন্ন নামে অভিহিত ছিল।[৯২] কাজেই প্রশাসনিক পরিভাষায় দেশে তেমন কোনো ঐক্যরূপ ছিল না। ত্রয়োদশ শতকের মতো পূর্ববর্তী আমলেও বাংলার বিভিন্ন অংশের জন্য ইকলিম, আরসাহ্ এবং দিয়ার শব্দগুলি ব্যবহার করা হয়েছিল।[৯৩] মোহাম্মদ বিন তুঘলকের মুদ্রায় আরশাহ্ সাতগাঁওয়ের উল্লেখ আছে।[৯৪] ইলিয়াস শাহী আমলের বহু মুদ্রাতেও এ নামগুলি পাওয়া যায়।[৯৫] সিকান্দর শাহের ৭৫৯ হিজরির একটি মুদ্রায়[৯৬] মুল্ক চাওয়ালিস্তান উরফ আরসাহ্ কামরূ এ শব্দ-সমষ্টি দেখতে পাওয়া যায়। এ থেকে এটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান যে মুলক ও আরসাহ্ শব্দ দু'টি অভিন্ন। এটা স্পষ্ট যে, যে সব মুদ্রায় এ শব্দগুলি পাওয়া যায় সেগুলি যে প্রদেশ থেকে মুদ্রাগুলি জারি করা হয়েছিল তারই প্রতিনিধিত্বমূলক। এর

সবগুলিই প্রচলিত ছিল এবং হোসেন শাহী বা ইলিয়াস শাহী সুলতানদের কেউই এসব শব্দের ব্যবহারের ক্ষেত্রে ঐক্যরূপ আনার কোনো চেষ্টা করেছিলেন বলে মনে হয় না।

কাজেই আমরা দেখি যে শের শাহ্ এবং মোগল সম্রাটদের দ্বারা ব্যবহৃত সরকার শব্দটি হোসেন শাহী বাংলায় ছিল সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত। ব্লখম্যান অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, আরসাহ্ শব্দটি একাধিক পরগণাকে বুঝাত এবং এটা মোগলদের সরকার শব্দটির সঙ্গে সমভাবে বিনিময়।[৯৭] এ অনুমান ভ্রান্ত, কারণ প্রায়োগিক অর্থে হোসেন শাহীদের আরসাহ্ বা ইকলিম মোগলদের সরকারের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। একটি আরসাহ্র আঞ্চলিক ব্যাপ্তি সরকারের মতো হতে পারত। কিন্তু সরকার ছিল মোগলদের প্রদেশের একটি অংশ এবং আরসাহ্ ছিল হোসেন শাহী রাজ্যের প্রদেশ। এ প্রদেশগুলির প্রত্যেকটি কয়েকটি মহলে[৯৮] বিভক্ত ছিল। গ্রাম ছিল সর্বনিম্ন রাজস্ব একক।

প্রদেশ ছিল সর-ই-লশ্কর ওয়া ওয়াজীর[৯৯] উপাধিধারী একজন কর্মকর্তার অধীনে ন্যস্ত। এখানে এ উপাধিটির ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে। এর দু'টি অংশ রয়েছে, যথা সর-ই-লশ্কর বা প্রধান সেনাপতি এবং ওয়াজীর যা সাধারণত একজন মন্ত্রীকে বুঝায়। কিন্তু হোসেন শাহী আমলের বাংলায় সাধারণভাবে স্বীকৃত অর্থে ওয়াজীর শব্দটি ব্যবহার করা হতো বলে মনে হয় না। এখানে এ ইঙ্গিত দেওয়া যেতে পারে যে এটা একজন রাজস্ব কর্মকর্তাকে বুঝাত। বস্তুত ভারতের ইতিহাসে রাজস্ব কর্মকর্তা অর্থে এ শব্দটি বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। গিয়াসউদ্দীন তুঘলক মালিক বুরহানউদ্দীনের ওপর দিওগীরের ওয়াজীরের দায়িত্ব ন্যস্ত করেছিলেন।[১০০] একইভাবে রাজস্ব প্রশাসনের জন্য রাজী-উল-মুলক মাবারের, মালিক আশরাফ তিলঙ্গের[১০১] এবং মালিক আবু রিজা লক্ষ্ণৌতির[১০২] ওয়াজীর নিযুক্ত হয়েছিলেন। আকবরের আমলে প্রাদেশিক দিওয়ানরা আদিতে ওয়াজীররূপে আখ্যায়িত হতেন। আমাদের পর্যালোচনাধীন আমলের বাংলা উৎসগুলি এ কর্মকর্তাকে দেশের রাজস্ব-প্রশাসনের সঙ্গে জড়িত করেছে।[১০৩] কাজেই এটা যথেষ্ট নিশ্চিত মনে হয় যে, হোসেন শাহীদের প্রাদেশিক গভর্নররা তাঁদের নিজ নিজ প্রদেশের সামরিক ও অর্থ বিভাগের প্রধান ছিলেন। প্রদেশের সর্বোচ্চ সামরিক কর্মকর্তা হিসেবে তাঁর দায়িত্ব ছিল যুদ্ধের সময় কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে তাঁর অধীনে ন্যস্ত সৈন্যদের পোষণ করা। রাজস্ব কর্মকর্তা হিসেবে তাঁকে বহুসংখ্যক অধস্তন কর্মচারীর সাহায্যে দেশের রাজস্ব-প্রশাসনের তদারকি করতে হতো।

এ থেকে এ সিদ্ধান্তে আসা যায় না যে, সারাদেশে একইরকম প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। এ থেকেই আমরা ব্যাখ্যা পাই, কেন গভর্নররা বিভিন্ন অবস্থানে ছিলেন। কোনো একটা বিশেষ এলাকার কোনো শহরের দায়িত্বে এ কর্মকর্তাকে নিয়োগ করা হতে পারত যেখানে তিনি নির্বিঘ্নে একাধিক দপ্তরের দায়িত্ব পালন করতে পারতেন। হোসেন শাহের দেবীকোট লিপি থেকে দেখা যায় যে, মোজাফফরাবাদ শহরের সর-ই-লশ্কর ওয়া ওয়াজীর খান রুকন খান আলাউদ্দীন সরহতী ফিরুজাবাদ নামের অন্য একটি শহরের কোতওয়াল-ই-বক-আলী বা প্রধান পুলিশ কর্মকর্তা এবং মুনসিফ-ই-দিওয়ান-ই-কোতওয়ালী বা ফৌজদারি আদালতের বিচারকও ছিলেন।[১০৪] এক্ষেত্রে, শুধুমাত্র একটি

শহরের গভর্নরের কার্যাবলি একজন প্রাদেশিক গভর্নরের কার্যাবলির মতো ততটা জটিল ছিল না; যার ফলে অন্যান্য শহরেও বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হতো। আবার একজন গভর্নর একটি প্রদেশ ও বহুসংখ্যক শহর ও মহলের ওপর তাঁর ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারতেন।[১০৫] দু'ভাবে এর ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে : (ক) যে প্রদেশের দায়িত্ব এ কর্মকর্তাকে দেওয়া হতো এসব শহর ও মহল হয়তো সে প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং এগুলির সামরিক ও বেসামরিক প্রশাসন ছিল গভর্নরের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে। (খ) আবার এগুলি তাঁর প্রদেশের বাইরে হলে এগুলির ওপর তাঁর প্রশাসনিক দায়িত্বের বিস্তৃতির অর্থ হচ্ছে যে তাঁকে অতিরিক্ত পদ ও দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। শুধুমাত্র একটি লিপিতে[১০৬] একই ব্যক্তিকে এক প্রদেশের সর-ই-লশ্‌কর এবং অন্য এলাকার ওয়াজীর রূপে দেখতে পাওয়া যায়। এ থেকে এ ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, একটি প্রদেশের সর্বোচ্চ সামরিক কর্মকর্তা পার্শ্ববর্তী প্রদেশের সর্বোচ্চ রাজস্ব-কর্মকর্তা হিসেবেও দায়িত্ব পালন করতে পারতেন। সীমান্তবর্তী এলাকার থানা বা সামরিক ফাঁড়িগুলি প্রায়ই তাদের সন্নিহিত প্রদেশের গভর্নরের নিয়ন্ত্রণে ন্যস্ত করা হতো।[১০৭]

এ সব সামরিক গভর্নরের প্রভাব ও ক্ষমতা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। তাঁদের ক্ষমতা হ্রাস করার জন্য সম্ভবত কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। সুলতান গভর্নরদের নিয়োগ করতেন এবং তাঁদের বরখাস্তও করতে পারতেন এবং বরখাস্ত করা হলে সাময়িক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতো। বাবর মন্তব্য করেছেন যে, "সুলতান কোনো ব্যক্তিকে বরখাস্ত করে তাঁর জায়গায় অন্য কাউকে নিয়োগ করতে মনস্থির করলে সে দপ্তরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল অধস্তন কর্মচারীই সে দপ্তরের (নতুন) কর্মকর্তা হয়ে পড়ে।"[১০৮] এ মন্তব্যের অর্থ এই দাঁড়ায় যে উর্ধ্বতন কোনো কর্মকর্তাকে বরখাস্ত করা হলে সে দপ্তরের সঙ্গে জড়িত অধস্তন কর্মকর্তারাও তাত্ত্বিকভাবে বরখাস্ত হতেন। কিন্তু তাদের আবার স্ব স্ব পদে নিয়োগ করা হতো। কাজেই অধস্তন কর্মকর্তারাও নিরাপত্তাহীনতার ভয়ে ভুগতেন যা কোনো অবাধ্য বা বিদ্রোহী গভর্নর বা কর্মকর্তার অন্ধ সমর্থক হওয়া থেকে তাঁদের বিরত রাখত। কোনো বিশেষ পরিবারে গভর্নরের পদ বংশানুক্রমিক ছিল বলে মনে হয় না। আবার গভর্নরকে এক প্রদেশ থেকে অন্য প্রদেশে বদলি করা হতো।[১০৯] এসব ব্যবস্থা যে কেন্দ্রাতিগ শক্তি প্রবণতা মাঝে মাঝে সক্রিয় হয়ে উঠতে পারত তাকে নিয়ন্ত্রণে রেখেছিল। বাবরের বক্তব্য নির্ভরযোগ্য হলে বলা যায় যে, প্রদেশ থেকে সংগৃহীত রাজস্ব সে প্রদেশের প্রশাসনিক ব্যয় নির্বাহের জন্য খরচ করা হতো। "এ সব ব্যয় নির্বাহের জন্য অন্যান্য এলাকায় কোনো কর আরোপ করা হতো না"।[১১০]

মহলগুলি সাধারণত শিকদার ও জঙ্গদার[১১১] উপাধিধারী একজন কর্মকর্তার অধীনে ন্যস্ত করা হতো। প্রথমোক্ত উপাধি থেকে এ ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, তিনি তাঁর অধীনস্থ এক বা একাধিক মহলের রাজস্ব-প্রশাসনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। দ্বিতীয় উপাধিটি এ দপ্তরের সামরিক চরিত্র নির্দেশ করে। কাজেই আলোচ্য কর্মকর্তাকে তাঁর মহলগুলিতে নিযুক্ত সৈন্যদের নিয়ন্ত্রণ করতে হতো। সুতরাং তিনি প্রদেশের সামরিক গভর্নরের অধস্তন ছিলেন—এ তথ্যের প্রমাণ বারবক শাহের দিনাজপুর লিপিতে পাওয়া যায়। এ লিপিতে

“জোর ও বারোর” এর শিকদার ও জঙ্গদার একটি মসজিদ নির্মাণ করে স্থানীয় গভর্নরের আদেশ পালন করেছিলেন বলে মনে হয়। গ্রামগুলি থেকে রাজস্ব আদায়ে মুকাদ্দম[১১২] তাঁকে সাহায্য করতেন। তাঁর নিজের এলাকার প্রশাসনিক খরচ মিটানোর পর শিকদার নিশ্চয়ই উদ্বৃত্ত রাজস্ব প্রাদেশিক গভর্নরকে পাঠাতেন।

প্রাদেশিক শাসন-যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত অন্যান্য কর্মচারীদের সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানা যায় না। এটা অত্যন্ত সম্ভাব্য মনে হয় যে, প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা ছিল কেন্দ্রীয় কাঠামোর অনুরূপ। আমরা ইতোমধ্যেই দেখেছি যে কোতওয়াল-ই-বক-আলা উপাধিধারী একজন কর্মকর্তার অধীনে ছিল পুলিশ বিভাগ। একজন মুন্সিফের অধীনে ফৌজদারি আদালত সম্ভবত এ বিভাগের সঙ্গে জড়িত ছিল।

বিচার বিভাগ নিঃসন্দেহে ছিল গুরুত্বপূর্ণ। বিজয় গুপ্তের মনসা-মঙ্গলে কাজী, হাওলাদার[১১৩] নামে পরিচিত অন্য একজন কর্মকর্তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, যিনি মনে হয় একজন পুলিশ কর্মকর্তা ছিলেন। বিচার বিভাগীয় প্রশাসন পরিচালনা করা ছাড়াও কাজী বিভিন্ন বেসামরিক বিষয়ের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তাঁরা শহর ও গুরুত্বপূর্ণ গ্রামের দায়িত্বে থাকতেন।[১১৪] কাজীদের প্রায়ই ধর্মীয় উদ্দেশ্যে প্রদত্ত সম্পত্তি তদারক এবং উইলবলে প্রাপ্ত সম্পত্তির মোল্লা ও জমিদার কর্তৃক প্রতারণা নিরোধ করতে হতো যা নসরত শাহের সাতগাঁও লিপিতে কাজী ও হাকিমের অন্যতম “আন্তরিক কর্তব্য” হিসেবে উল্লিখিত হয়েছে। প্রাদেশিক রাজধানীর কাজী প্রাদেশিক গভর্নরের অধীনে ছিলেন বলে মনে হয়। চৈতন্য-ভাগবতে কাজীকে চূড়ান্ত পর্যায়ে মুলুকপতি বা প্রাদেশিক গভর্নরের নির্দেশানুযায়ী মামলার নিষ্পত্তি করতে দেখা যায়।[১১৫] দোষী ব্যক্তিদের কখনো কখনো দৈহিক শাস্তি দেওয়া হতো।

এসব কর্মকর্তা ছাড়াও অর্থ, পত্রযোগাযোগ এবং সামরিক বিষয় সংক্রান্ত অন্যান্য দপ্তরও সম্ভবত ছিল যেগুলি সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। নিশ্চিতভাবেই টাকশাল কর্মকর্তাদের অধীনে ন্যস্ত প্রাদেশিক টাকশাল শহরগুলি থেকে মুদ্রা উৎকীর্ণ করা হতো।

৬.

এখানে লক্ষ্য করা যেতে পারে যে, বাংলার লিপিগুলিতে প্রাপ্ত আরসাহ্, মুক্‌তা, জামদার, শারাবদার, কোতওয়াল, কাজী, ওয়াজীর, খান-ই-আজম, খাকান-ই-মোয়াজ্জম এবং মজলিস[১১৬] এর মতো প্রশাসনিক পদ ও সম্মানসূচক উপাধিগুলির কিছু কিছু প্রাক-মোগল আমলের গুজরাটের লিপিগুলিতেও পাওয়া যায়।[১১৭] গুজরাটের লিপিগুলিতে প্রাপ্ত আরিজ (সামরিক বাহিনীর প্রধান বেতন প্রদানকারী) এবং খোয়াজা-সরা এর মতো আরও কিছু সরকারি পদ[১১৮] প্রাক-মোগল আমলের বাংলার ইতিহাস সম্পর্কে রচিত ফার্সি ঘটনাপঞ্জিগুলিতেও পাওয়া যায়।[১১৯] গুজরাটের আহমদ শাহের ৮৫৫ হিজরি/১৪৫২ সালের একটি লিপিতে[১২০] মালিক শাবান নামক জনৈক কর্মকর্তাকে ডলাঙ্গল নিষ্কর জমিদানের উল্লেখ আছে। মুকুন্দরামের কালকেতু রাজ্যের বর্ণনা থেকে এ ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে মধ্যযুগে বাংলার চাষীকে প্রায়ই তার মালিকানাধীন জমি চাষ করতে প্রয়োজনীয়

লাঙ্গলের সংখ্যানুযায়ী কর দিতে হতো।[১২১] কাজেই এটা সম্ভাব্য মনে হয় যে প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বাংলা ও গুজরাটের মধ্যে একটা পারস্পরিক যোগাযোগের প্রক্রিয়া বর্তমান ছিল। হোসেন শাহী বাংলার সঙ্গে গুজরাটের স্থাপত্য শিল্প ও হস্তলিপি বিদ্যার আশ্চর্যজনক সাদৃশ্য এবং এ দুই দেশের মধ্যে যে রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক বর্তমান ছিল বলে তা উপরোক্ত সিদ্ধান্তকে জোরদার করে বলে মনে হয়।

বাংলার প্রশাসনিক বৈশিষ্ট্যগুলি মনে হয় আরাকানে ছড়িয়ে পড়েছিল কারণ দৌলত কাজী[১২২] বলেছেন যে সপ্তদশ শতকের গোড়ার দিকে আরাকানের একজন কর্মকর্তা, আশরাফ খানের উপাধি ছিল ওয়াজীর লশ্‌কর। বাংলার সুলতানদের সঙ্গে কিছুসংখ্যক আরাকানি শাসকের সম্পর্কের কথা সবারই জানা। কথিত আছে যে পঞ্চদশ শতকের প্রথম দিকে গৌড়ে নির্বাসিত নরমীখল বাংলার সুলতানের সহায়তায় তাঁর রাজ্য ফিরে পেয়েছিলেন। তাঁর উত্তরসূরিরা মুসলমান নাম ও উপাধি ব্যবহার এবং কলিমাহ্‌ যুক্ত মুদ্রা উৎকীর্ণ করতে শুরু করেছিলেন।[১২৩] মনে হয় এসব পরিস্থিতি তদানীন্তন আরাকানের শাসন ব্যবস্থার ওপর বাংলার প্রভাবের কারণ ব্যাখ্যা করে।

৭.

প্রদেশগুলির উপর কেন্দ্রের যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণ থাকা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় ক্ষমতা বা শাসক দুর্বল হলে কেন্দ্রাতিগ শক্তিগুলি স্থানীয় ব্যাপারে সক্রিয় হয়ে উঠতে পারত। ছোটখাট রাজার মতো আচরণকারী গভর্নরের ক্ষমতা প্রায়ই সর্বময় হয়ে উঠত। হোসেন শাহ বা তাঁর প্রত্যক্ষ উত্তরাধিকারী নসরত শাহের রাজত্বকালে আমরা কোনো গভর্নরের বিদ্রোহের কথা শুনতে পাই না। পর্যালোচনাধীন আমলের শেষদিকে প্রশাসনিক যন্ত্র যখন বিকল হয়ে পড়ছিল তখন দূরবর্তী এলাকার গভর্নররা প্রায় স্বাধীন হয়ে উঠেছিলেন। এ প্রসঙ্গে চট্টগ্রামের গভর্নর খোদা বখশ খান এবং উত্তর বিহারের গভর্নর মখদুম আলমের দৃষ্টান্ত তুলে ধরা যেতে পারে।[১২৪]

শাসকদের সতর্কতা সত্ত্বেও স্থানীয় কর্মকর্তারা প্রায়ই জনগণের ওপর অত্যাচার করতেন। বিজয়গুপ্তের মনসা-মঙ্গলের হাসান-হোসেন উপাখ্যান থেকে এটাই প্রকাশ পায়।[১২৫] রামচন্দ্র খানের জমিদারির অন্তর্ভুক্ত দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার একটি গ্রাম কিভাবে মুসলমান ওয়াজীর ধ্বংস করে দিয়েছিলেন চৈতন্য-চরিতামৃতে তা দেখা যায়।[১২৬] আবার, হোসেন শাহ রূপের উৎপীড়নমূলক আচরণ সম্পর্কে অসন্তোষ প্রকাশ করতেন।[১২৭] কাজেই মনে হয় যে অত্যাচারপ্রবণ স্থানীয় কর্মকর্তাদের কার্যকর নিয়ন্ত্রণে রাখার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। সম্ভবত এটা হয়েছিল বিকেন্দ্রীকরণের প্রবণতা থেকে যা হোসেন শাহী আমলের বৈশিষ্ট্যগুলি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। প্রশাসন এসব ত্রুটিমুক্ত না হলেও পক্ষপাতহীন-ভাবে বলা যায় যে অন্ততপক্ষে প্রথম দু'জন শাসকের আমলে এ ধরনের উৎপীড়ন ছিল বিরল ব্যতিক্রম।

হোসেন শাহী শাসন জনগণের যে প্রভূত উপকার করেছিল তার তুলনায় এর ত্রুটি ছিল খুবই সামান্য। ধর্মীয় গোঁড়ামিমুক্ত সরকারের অধীনে সকল শ্রেণীর লোকই বিভিন্ন

সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেছিল। সম্পূর্ণরূপে উদারনীতি অনুসরণে হয়তো শাসকবৃন্দ রাজনৈতিক বিবেচনার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, তবুও দেশের স্বার্থ উন্নয়নে এটা যথেষ্ট সহায়ক হয়েছিল। শাসক ও শাসিতের মধ্যে ক্রমান্বয়িক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের পুনঃস্থাপন ছিল এ যুগের বৈশিষ্ট্য এবং এটা এক নতুন সামাজিক-রাজনৈতিক জীবনযাত্রার সূত্রপাত করেছিল। হোসেন শাহীরা জনগণের স্বার্থের সঙ্গে নিজেদের এতই অভিন্ন করে ফেলেছিলেন যে, তাঁদের দেশের সন্তানরূপেই গণ্য করা হতো। তাদের সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করে এবং জীবনের বিভিন্ন দিককে স্থানীয় আভা দিয়ে তাঁরা হয়ে উঠেছিলেন জনগণের উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রতীক। এমন সরকারের সহৃদয় প্রভাবে ব্যবসা ও শিল্পে অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটেছিল। শিল্প ও স্থাপত্য যথেষ্ট যত্নলাভ করেছিল এবং জাতীয় সমৃদ্ধির যথেষ্ট বৃদ্ধি ঘটেছিল বলে মনে হয়। এ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে এ দেশের ইতিহাসে হোসেন শাহী শাসন এক উল্লেখযোগ্য দিক।

টীকা

১. পূর্ববর্তী উপরে, ২য় পরিচ্ছেদ, পৃ. ৩৫।

২. এ বিষয়ে বিশদ ব্যাখ্যার জন্য নিম্নে দেখুন।

৩. ৯১৮ হিজরি/১৫১২ সালের হোসেন শাহের সিলেট লিপির শব্দপ্রয়োগ থেকে দেখা যায় যে, এসব অভিযানে তিনি নিজে অংশ নিয়েছিলেন। পৃ. ৪৫-৪৬।

৪. হোসেন শাহের কিছু লিপিতে এ উপাধির উল্লেখ রয়েছে। দেখুন, আবিদ আলী, পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৬৩, টীকা ১, পৃ. ৮১ ও ১৫০; জে. এ. এস. বি, ১৮৭৪, পৃ. ৩০২ ও ১৮৯৫, পৃ. ২২৪-২২৫; র‍্যাভেনশ : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৭৮, প্লেট ৫০, নং ২; ই. জি. গ্লেজিয়ার : রিপোর্ট অন দি ডিস্ট্রিক্ট অফ রংপুর, পৃ. ১০৮; কানিংহাম : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৭৫; ই. আই. ২য় খণ্ড, পৃ. ২৮৫; ডি. আর. এস. মনোগ্রাফ, নং ৭, পৃ. ৩৮, প্লেট ১৬, ৩৪; দানী : বিব্লিওগ্রাফি, পৃ. ৪৫; এস. আহমদ : ইনস্ক্রিপশন্স, পৃ. ১৫১; তুলনীয়, জে. এ. এস. পি তে আমার পর্যালোচনামূলক প্রবন্ধ, ১৯৫৮, পৃ. ২০৭।

৫. এ. করিম : কর্পাস, পৃ. ১৬৬ ও পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহ; তুলনীয়, জে. এ. এস. পি তে আমার পর্যালোচনামূলক নিবন্ধ, ১৯৫৮, পৃ. ২০৭।

৬. এসব বিষয়ে আলোচনার জন্য দেখুন, আই, এইচ, কোরেশী : দি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ দি সুলতানস অফ দিল্লি, পৃ. ২৭৩ ও পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহ; এ. করিম : জে. এন. এস আই, খণ্ড ১৭, ২য় ভাগ, পৃ. ৮৮।

৭. মেময়েরস, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৮২-৮৩; ফারিয়া ওয়াই সুজা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১৭; নিজামউদ্দীন, পূর্বোক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৬৮।

৮. রাইট : ক্যাটালগ, ২য় খণ্ড, ২য় ভাগ, পৃ. ১৭৭-৭৮, নং ২১১ ও ২১২ (বাংলা)

৯. পরিশিষ্ট ক।

১০. উপরে ২য় পরিচ্ছেদ, পৃ. ৬৫ ও ৬৭।

১১. দেখুন পরিশিষ্ট ক।

১২. বৃন্দাবন দাস : পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫০; কৃষ্ণদাস কবিরাজ : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৭৬।

১৩. সেলিম : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১১৯-২০, ১২৬, ১২৭ ও ১৩২-৩৩; ফিরিশতা : পূর্বোল্লিখিত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৯৯ ও ৩০১-৩০২; নিজামউদ্দীন : পূর্বোল্লিখিত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৬৮-৭০।

১৪. সুকুমার সেন : মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালি, পৃ. ৮।

১৫. জে. এ. এস. বি. ১৮৭২, পৃ. ১০৬; ই. আই. এম. ১৯২৯-৩০, পৃ. ১২-১৩; কানিংহাম : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৯৯-১০০; দানী : বিব্লিওগ্রাফি, পৃ. ৫৭; এস. আহমদ : ইনস্ক্রিপশন্স, পৃ. ১৯০।

১৬. হোসেন শাহের ৯১১ হিজরি/১৫০৫ সালের সিলেট লিপি দেখুন, জে. এ. এস. বি. ১৮৭৩, পৃ. ২৯৩-৯৪; দানী : বিব্লিওগ্রাফি পৃ., ৫৩; এস. আহমদ : ইনস্ক্রিপশন্স, পৃ. ১৬৯; ১৯৫৮ সালের জে. এ. এস. পিতে আমার নিবন্ধ দেখুন, পৃ. ২০৮-০৯।

১৭. ফতেহ্ শাহের ৮৮৯ হিজরি/১৪৮৪ সালের সোনারগাঁও লিপি দেখুন, জে. এ. এস. বি. ১৮৭৩, পৃ. ২৮৬; কানিংহাম : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১৪১; বারবক শাহের ৮৬০ হিজরি/১৪৫৫ সালের ত্রিবেণী লিপি দেখুন, জে. এ. এস. বি. ১৮৭০, পৃ. ২৯০ এবং জে. এ. এস. বি. ১৮৭৩, পৃ. ২৭৩, টীকা।

১৮. মিনহাজ : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ২৪২।

১৯. আই. এইচ. কোরেশী : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৫৯-৬৩।

২০. বার্বোসা : পূর্বোল্লিখিত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৭।

২১. নিজামউদ্দীন : পূর্বোল্লিখিত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৭১; আরও দেখুন, সেলিম : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১৩৮।

২২. পরাগলী মহাভারত অনুসারে হোসেন শাহ চট্টগ্রামের নবনিযুক্ত লস্কর পরাগল খানকে একটি মহামূল্যবান পোশাক ও ঘোড়া দান করে তাঁকে মহিমান্বিত করেছিলেন। পূর্বোল্লিখিত; ডি.সি. সেন কর্তৃক উদ্ধৃত, পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৯৪। একই রকম তথ্য অশ্বমেধপর্বেও পাওয়া যায়, পৃ. ৩। ত্রিপুরা অভিযানকালে হোসেন বহু সেনাপতি নিযুক্ত ও বরখাস্ত করেছিলেন; রাজমালা, পৃ. ২২-২৮। স্পষ্টতই এটা দরবারেই করা যেত যার এক প্রাণবন্ত বর্ণনা আমরা চৈনিক বিবরণগুলিতে দেখতে পাই, সি. ইয়াং চাও কুংটিয়েন লু, সিং চা শেংলান এবং শু ইউ চৌ সেউলু : বিশ্বভারতী অ্যানালস এ বাগচী কর্তৃক অনূদিত, ১৯৪৫, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২১-২২, ১২৬-২৭ ও ১৩১।

২৩. সেলিম : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১৩৩; হোসেন শাহীদের হিন্দু কর্মচারীদের নাম আমরা বাংলা উৎসগুলিতে পাই।

২৪. হোসেন শাহী শাসকদের লিপিতে এসব উপাধি পাওয়া যায়। এ গ্রন্থে ব্যবহৃত বিভিন্ন সাময়িকী ও গ্রন্থে এগুলি প্রকাশিত হয়েছে; আরও দেখুন আমার লেখা দানীর বিব্লিওগ্রাফির সমালোচনা, পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ২১০।

২৫. মাহমুদের স্বার্থক্ষুণ্ন করে ফিরূজকে ক্ষমতাসীন করার জন্য অভিজাতরাই দায়ী ছিলেন। রিয়াজ, পৃ. ১৩৯-৪০; উপরে পৃ. ৬৫।

২৬. মিনহাজ : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১৫৬-৫৮।

২৭. মেময়েরস, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৮২।

২৮. সেলিম : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১২৮; ফিরিশতা : পূর্বোল্লিখিত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩০১।

২৯. সেলিম : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১২৬-২৭; ফিরিশতা : পূর্বোল্লিখিত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩০০।

৩০. সনাতন তাঁর একটি গ্রন্থে বলেছেন যে তিনি ছিলেন হোসেন শাহের মহামন্ত্রিণ বা প্রধানমন্ত্রী। এস. কে. দে : আর্লি হিস্ট্রি অফ দি বৈষ্ণব ফেইম অ্যান্ড মুভমেন্ট ইন বেঙ্গল, পৃ. ১১০।

৩১. কৃষ্ণদাস কবিরাজ : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৭৬। আরও দেখুন চৈতন্য-ভাগবত, পৃ. ৮২ ও ৮৩।

৩২. আই. এইচ. কোরেশী : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৮৬-৮৮; তুলনীয় এ. বি. এম. হাবিবুল্লাহ; পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ২৩৯।

৩৩. ১৫২৮ সালের নসরত শাহের দেওতলা লিপি দেখুন; আবিদ আলী : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১৭১; দানী : বিব্লিওগ্রাফি, পৃ. ৭০; এস. আহমদ : ইনস্ক্রিপশন্স, পৃ. ২২২; তুলনীয়, জে. এ. এস. পি, ১৯৫৮, পৃ. ২০৮।

৩৪. সিকান্দর শাহের ১৩৬৩ সালের দেবীকোট লিপি দেখুন; জে. এ. এস. বি. ১৮৭২, পৃ. ১০৫; কানিংহাম : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৯৪; ই. আই. এম, ১৯২৯-৩০, পৃ. ১০-১১, প্লেট ৭(ক); দানী : বিব্লিওগ্রাফি, পৃ. ১২; এস. আহমদ : ইনস্ক্রিপশন্স, পৃ. ৩৫।

৩৫. জে. এ. এস. বি. ১৮৭২, পৃ. ১০৬; কানিংহাম : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১০০; ই. আই. এম, ১৯২৯-৩০, পৃ. ১২-১৩, প্লেট ৮(খ); দানী : বিব্লিওগ্রাফি, পৃ. ৫৭; এস. আহমদ : ইনস্ক্রিপশন্স, পৃ. ১৯০।

৩৬. বৃন্দাবন দাস : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৩১৬।

৩৭. জে. এ. এস. বি. ১৮৭২, পৃ. ৩৩৭-৩৮; কানিংহাম : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১৪৪; দানী : বিব্লিওগ্রাফি, পৃ. ৬৭; এস. আহমদ : ইনস্ক্রিপশন্স, পৃ. ২০৯।

৩৮. কৃষ্ণদাস কবিরাজ : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ২০৫।

৩৯. ই. আই. ২য় খণ্ড, পৃ. ২৮৭-৮৮; আবিদ আলী : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৮৭, প্লেট ৪; কানিংহাম : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৬৫, প্লেট ২৩; দানী : বিব্লিওগ্রাফি, পৃ. ৩৬।

৪০. জে. এ. এস. বি. ১৯২২, পৃ. ৪১৩, প্লেট ৯; এস. আহমদ : ইনস্ক্রিপশন্স, পৃ. ২৫।

৪১. পূর্বোল্লিখিত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৭৬; আরও দেখুন, আমার সমালোচনা, জে. এ. এস. পি. ১৯৫৮, পৃ. ২১০।

৪২. পূর্বোল্লিখিত, জি. সি. বড়ুয়া সম্পাদিত, পৃ. ৬১ ও ৬৩।

৪৩. এ পরিচ্ছেদের পরবর্তী এক অংশে এই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে ওয়াজীর রূপে পরিচিত এ আমলের প্রাদেশিক গভর্নর তাঁর সামরিক দায়িত্বের বাইরে প্রাদেশিক অর্থ বিভাগের দায়িত্বও পালন করতেন। বহু লিপিতে প্রাপ্ত সর-ই-অশ্‌কর পদটির উল্লেখ থেকে এ ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ওয়াজীর পদটির আর্থিক তাৎপর্যের প্রতি কোনো গুরুত্ব আরোপ করলে ওয়াজীর লশ্‌কর শব্দ-গুচ্ছের অর্থ সেনাবাহিনীর প্রধান বখশির দপ্তর বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। সম্ভবত এটা যুদ্ধ-মন্ত্রীর দপ্তরকে বুঝায় না।

৪৪. লেন-পুল : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৪৪, ৪৬ ও ৪৯, প্লেট ৫, নং ১০৮ ও ১১৬। এইচ. এন. রাইট : ক্যাটালগ, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭২-৭৪ ও ১৭৬, ২য় ভাগ, প্লেট ৫, নং ১৬৭ ও ১৮১; বথাম : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১৭০-৭১ এবং ১৭৩, প্লেট ২, নং ১।

৪৫. হোসেন শাহীদের সৈন্য-সংখ্যা সম্পর্কে নিচের বিবরণ থেকে একটি মোটামুটি ধারণা লাভ করা যায়। ১৪৯৮ সালে ভাস্কো-ডা-গামা মন্তব্য করেছিলেন :

"বেঙ্গোলায় একজন মুসলমান রাজা আছেন এবং সেখানে খ্রিস্টান ও মুসলমানদের মিশ্র জনগোষ্ঠী রয়েছে। এর সৈন্যসংখ্যা হবে প্রায় ২৪ হাজার যার মধ্যে রয়েছে ১০ হাজার অশ্বারোহী, ৪শত যুদ্ধহস্তী এবং অবশিষ্ট পদাতিক।" ক্যাম্পোস কতৃক উদ্ধৃত, পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ২৫। শিহাবউদ্দীন তালিশ প্রদত্ত সংখ্যার সঙ্গে এটা মিলে। তাঁর মতে হোসেন শাহ ২৪,০০০ সৈন্য নিয়ে আসাম আক্রমণ করেছিলেন; জে. এ. এস. বি. ১৮৭২, পৃ. ৭৯। কিন্তু বডলীন পাণ্ডুলিপিতে (ও আর ৫৮৯, ফলিও ৩৫ খ) এ সংখ্যাকে ২০,০০০ রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। মনে হয় যে আহোমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সুলতান তাঁর গোটা সৈন্যবাহিনীকে ব্যবহার করেছিলেন। এটা অসম্ভব কারণ সম্ভাব্য বহিঃআক্রমণ থেকে সতর্কতামূলক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা হিসেবে সুলতান নিশ্চয়ই রাজধানী ও বিভিন্ন সীমান্তে বেশকিছু সৈন্য রেখে গিয়েছিলেন। মোট সৈন্যসংখ্যা নিশ্চয়ই ২৪,০০০ ছাড়িয়ে গিয়েছিল। আহোমদের আক্রমণকালে নসরত শাহের সেনাবাহিনী ১০০০ অশ্বারোহী, স্থল ও নৌবাহিনী মিলিয়ে ১০ লক্ষ সৈন্য, এক বিশাল গোলন্দাজ বাহিনী ও ৩০টি হাতি নিয়ে গঠিত ছিল। আহোম বুরঞ্জী, জি. সি. বড়ুয়া কর্তৃক সম্পাদিত, পৃ. ৬৭-৬৮; গেইট : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৯০। ১০ লক্ষ অবশ্যই এক অবিশ্বাস্য সংখ্যা। নসরত শাহের এ সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধির দু'টি ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে, (ক) সম্ভবত বুরুঞ্জী মুসলমান সৈন্যদের সংখ্যা বাড়িয়ে বলেছে। (খ) অন্যভাবে এ ইঙ্গিত দেওয়া যেতে পারে যে নসরতের আমলে সৈন্যসংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল। এ পরিবর্তনের প্রধান কারণ ছিল মোগল সাম্রাজ্যবাদের নতুন ঢেউ যা নসরত প্রতিরোধ করতে ব্যর্থ হচ্ছিলেন। বিশাল সংখ্যক পদাতিক বাহিনী ও বহু হাতি ছাড়াও হাজী ইলিয়াসের ৯০,০০০ অশ্বারোহীর এক বাহিনী ছিল; হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০৮। ভাসকো ডা গামার বিবরণ থেকে এটা বুঝা যায় যে হোসেন শাহ সৈন্যসংখ্যা ২৪,০০০ এ কমিয়ে এনেছিলেন। তবে তাঁর প্রত্যক্ষ উত্তরসূরি সেটাকে এত বাড়িয়ে ছিলেন যে সংখ্যায় সেটা ইলিয়াস শাহী সৈন্যদের ছাড়িয়ে গিয়েছিল। সে ক্ষেত্রে নসরতের সৈন্যসংখ্যা ২৪,০০০ থেকে ১০ লক্ষে বাড়াতে হয়েছিল। কিন্তু এ বৃদ্ধি অস্বাভাবিক মনে হয়।

৪৬. আহোম বুরঞ্জী, জি. সি. বড়ুয়া কর্তৃক সম্পাদিত, পৃ. ৬৭-৭৩; মেময়েরস, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৭১-৭৩; তবকাতই-আকবরী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৫; ইলিয়ট ও ডওসনে আব্বাস : পূর্বোল্লিখিত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৩৯--৪২।

৪৭. বারানী : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৫৯৩।

৪৮. ক্যাম্পোস : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৩৪।

৪৯. মেময়েরস, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৭৩।

৫০. বারবক শাহের ১৪৬৫ সালের ত্রিবেণী লিপি দেখুন, জে. এ. এস. বি. ১৮৭০, পৃ. ২৯০; দানী : বিব্লিওগ্রাফি, পৃ. ২১; এস. আহমদ : ইনস্ক্রিপশন্স; পৃ. ৬৯।

৫১. হোসেন শাহের ১৪৯৪-৯৫ সালের মন্দারণ লিপিতে সাহলার মোবারক শব্দগুচ্ছটি রয়েছে, জে. এ. এস. বি. ১৯১৭, পৃ. ১৩৪। মনে হয় যে পূর্ণাঙ্গ শব্দগুচ্ছটির প্রথম শব্দ সিপাহ্ অদৃশ্য হয়ে গেছে।

৫২. মাহুয়ানস অ্যাকাউন্ট, জে. আর. এ. এস, ১৮৯৫, পৃ. ৫৩২; আরও দেখুন, বিশ্বভারতী অ্যানালস এ চৈনিক বিবরণ, ১৯৪৫, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১৮।

৫৩. বারাণী : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১৪৫; তুলনীয়, এ. বি. এম. হাবিবুল্লাহ্ : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ২৬৮।

৫৪. মেময়েরস, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৭২।

৫৫. উপরে, পৃ. ৬৯।

৫৬. উপরোল্লিখিত, জি. সি. বড়ুয়া কর্তৃক সম্পাদিত, পৃ. ৬৮, ৭০, ৭২ ও ৭৩।

৫৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭ ও ৭০-৭১। শিহাবউদ্দীন তালিশ : পূর্বোল্লিখিত। জে. এ. এস. বি. ১৮৭২, পৃ. ৭৯। বডলীন পাণ্ডুলিপি (ও আর ৫৮৯, ফলিও ৩৫ খ); হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৭, ১৫৩ ও ১৫৮।

৫৮. জে. এ. এস. বি. ১৮৭২, পৃ. ১০৯-১১০; এস. আহমদ : ইনস্ক্রিপশন্স, পৃ. ১১৮।

৫৯. পূর্বোল্লিখিত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪-৮, ২৯, ৩৪, ৪৭, ৪৮, ৬০-৬২, ১২১, ১৬৫ ইত্যাদি।

৬০. আহোম বুরঞ্জী, জি. সি. বড়ুয়া কর্তৃক সম্পাদিত, পৃ. ৬৮, ৭১-৭২ ও ৭৩।

৬১. নিজামউদ্দীন : পূর্বোল্লিখিত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৪।

৬২. আইন, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৪।

৬৩. বিজয় গুপ্ত : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৪।

৬৪. দি অ্যাগ্রারিয়ান সিস্টেম অফ মোসলেম ইন্ডিয়া, পৃ. ২৪৩-৪৭, পরিশিষ্ট ঙ।

৬৫. রেহলা, মাহদী হোসেন কর্তৃক ইংরেজি অনুবাদ, পৃ. ২৪১।

৬৬. কবি কঙ্কণচণ্ডী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২।

৬৭. পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ২৯৩।

৬৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৩-৯৪।

৬৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৮।

৭০. ক্যাম্পোস : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৩৯ ও ৪৬।

৭১. গাদিশাহনামা, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৩৪ ও ৪৩৭; ইলিয়ট ও ডাওসন : পূর্বোল্লিখিত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৩২।

৭২. ক্যাম্পোস কর্তৃক উদ্ধৃত, উপরোল্লিখিত, পৃ. ৪৬।

৭৩. মোরল্যান্ড : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১৯০।

৭৪. নিজামউদ্দীন : পূর্বোল্লিখিত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৭১; ইংরেজি অনুবাদ ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৪৪।

৭৫. পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১৩৭।

৭৬. পূর্বোল্লিখিত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩০২।

৭৭. নিজামউদ্দীন : পূর্বোল্লিখিত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩২০; আরও দেখুন পৃ. ৩৩২ ও ৩৩৫।

৭৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৩। শের শাহ ও হুমায়ুনের আমলে জায়গিরের উল্লেখের জন্য দেখুন তবকাত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৮, ৮৬ এবং ৮৭।

৭৯. মাহুয়ানস অ্যাকাউন্ট : জে. আর. এ. এস, ১৮৯৫, পৃ. ৫৩০। আরও দেখুন ইং ইয়াই শেং লান, বিশ্বভারতী অ্যানালস, ১৯৪৫, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১৭, এবং সিইয়াং চাও কুং টিয়েন লু, পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১২৫।

৮০. আইন, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৪ ও ১৫৪।

৮১. পূর্বোল্লিখিত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২।

৮২. জে. সি. বসু : মেদিনীপুরের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৯৮-৯৯ ও ৫০৪-৫৩৩; আরও দেখুন এস. কে. রায় চৌধুরী : ময়মনসিংহের বরেন্দ্র ব্রাহ্মণ জমিদার, ২য় খণ্ড।

৮৩. পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১৯১-৯৪।

৮৪. বার্বোসা : পূর্বোল্লিখিত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৮; ক্যাস্টানহেডা : ক্যাম্পোস কর্তৃক উদ্ধৃত, পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৪৬; ঐ গ্রন্থের পৃ. ৩৯ দেখুন।

৮৫. নিম্নলিখিত গ্রন্থ ও সাময়িকীগুলিতে প্রকাশিত লিপিগুলি দেখুন; জে. এ. এস. বি. ১৮৬১, পৃ. ৩৯০; ১৮৭২, পৃ. ৩৩৭-৩৮; ১৮৭৪, পৃ. ৩০৩ ও ৩০৮; ১৯০৯, পৃ. ২৬০; আই. এইচ. কিউ : ৭ম খণ্ড, ১৯৩১, পৃ. ১৮; এ. এস. আর. খণ্ড ১৫, পৃ. ১৪৪; আবিদ আলী : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১৫৩ ও ১৫৭-৫৯, র‍্যাভেনশ : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৯৪, প্লেট ৫৮, নং ২৪; ই. আই. এম. ১৯৩৩-৩৪, পৃ. ৩; জে. বি. ও. আর. এস. ৪র্থ খণ্ড, ১৯১৮, পৃ. ১৮৪-৮৬।

৮৬. আইন, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪২-৫৫; ব্লথম্যান : "কন্ট্রিবিউশন্স টু দি জিওগ্রাফি অ্যান্ড হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, ২য় ভাগ, জে. এ. এস. বি. ১৮৭৩, পৃ. ২১৫-২১৮।

৮৭. লিপিগুলির জন্য দেখুন, জে. এ. এস. বি, ১৮৭২, পৃ. ৩৩৩-৩৪; ১৮৭৩, পৃ. ২৮৫-৮৬; কানিংহাম : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১৪১; দানী : বিব্লিওগ্রাফি, পৃ. ৫৯ ও ৬৩; এস, আহমদ : ইনস্ক্রিপশন্স, পৃ. ১৯০ ও ১৯২; সে আমলের লিপিতে উল্লিখিত থানা লাউড ছিল সিলেটের অংশ।

৮৮. লেন-পুল : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৪৫, ৪৭-৪৮, ৫০-৫১ এবং ৫২-৫৫ রাইটন : ক্যাটালগ, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭২-৮০; বথাম : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১৬৬-৬৯ ও ১৭২-৭৩।

৮৯. পরাগলী মহাভারত, ডি. সি. সেন কর্তৃক উদ্ধৃত, পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৯৪; শ্রীকর নন্দী : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৩; ক্যাম্পোস : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৩৪ ও ৩৯।

৯০. জে. এ. এস. বি. ১৮৭০, পৃ. ২৮৪; ১৯০৯, পৃ. ২৬০; ই. আই. এম, ১৯১৫-১৬, পৃ. ১২-১৪; এস. আহমদ : ইনস্ক্রিপশন্স, পৃ. ১৭৫ ও পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহ।

৯১. বাবর : পূর্বোল্লিখিত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৮৬; নিজামউদ্দীন : পূর্বোল্লিখিত, তবকাত-ই-আকবরী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৪।

৯২. হোসেন শাহী আমলের লিপিসমূহে এদের উল্লেখ আছে। দেখুন জে. এ. এস. বি. ১৮৭০, পৃ. ২৮৪, ২৯০ এবং ২৯৪; ১৮৭২, পৃ. ৩৩৩-৩৪; এবং ১৮৭৩, পৃ. ২৬৬ ও ২৯৩-৯৪; ই. আই. এম. ১৯১৫-১৬, পৃ. ১২-১৪; কানিংহাম : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১৪১; দানী : বিব্লিওগ্রাফি, পৃ. ৫৩ ও ৬৩; এস. আহমদ : ইনস্ক্রিপশন্স, পৃ. ১৭৫ ও পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহ ও পৃ. ১৯২। মুল্‌ক শব্দটি বিজয়গুপ্তের মনসা-মঙ্গলে পাওয়া যায়, পৃ. ৪।

৯৩. বারানী : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৯৩; জে. এ. এস. বি. ১৯৫৮-তে আমার পর্যালোচনা দেখুন, পৃ. ২০৯; আব্দুল করিম : প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২।

৯৪. রাইট : ক্যাটালগ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪০।

৯৫. লেন-পুল : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৩৫; রাইট : ক্যাটালগ, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫২, ১৫৩, ১৫৫, ১৫৬ এবং ১৫৯।

৯৬. প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫২।

৯৭. জে. এ. এস. বি. ১৮৭০, পৃ. ২৯৫।

৯৮. প্রাগুক্ত, ১৮৭০, পৃ. ২৯৪ এবং ১৮৭৩, পৃ. ২৭২-৭৩; আইন, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪২-৫৫। বারবক শাহের ৮৬৬ হিজরি/১৪৫৯ সালের বরলিপি থেকে দেখা যায় যে সর গোমস্তা বা প্রধান হিসাবরক্ষক ছিলেন একটি কসবাহ্‌র দায়িত্বে নিযুক্ত; ই. আই. ১৯৫৩-৫৪, পৃ. ২১, প্লেট ৮ (ক); দানী : বিব্লিওগ্রাফি, পৃ. ২২; এস. আহমদ : ইনস্ক্রিপশন্স, পৃ. ৭১। সর গোমস্তা শব্দগুচ্ছটি এটাই নির্দেশ করে যে তাঁর অধীনে অন্যান্য অধস্তন হিসাবরক্ষক ছিলেন যারা একই কসবাহ্‌তে কাজ করতেন। কসবাহ্‌ সম্ভবত ছিল মহলের অংশ।

৯৯. জে. এ. এস. বি. ১৮৭০, পৃ. ২৮৪, ২৯০ এবং ২৯৪; ১৮৭৩, পৃ. ২৭২, ২৭৩, ২৮৬, ২৯৩-৯৪ এবং ২৯৬; ১৯০৯, পৃ. ২৬০; ই. আই. এম. ১৯১৫-১৬, পৃ. ১২-১৪; কানিংহাম : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১৪১। উল্লেখিত উপাধিটি এ সমস্ত সাময়িকীতে প্রকাশিত লিপিমালায় বারবার উল্লেখ করা হয়েছে; তুলনীয়, দানী : বিব্লিওগ্রাফি, পৃ. ৫৩, ৫৭, ৫৯ ইত্যাদি; এস. আহমদ : ইনস্ক্রিপশন্স, পৃ. ১৬০, ১৬৯ ইত্যাদি।

১০০. নিজামউদ্দীন : পূর্বোল্লিখিত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯২।

১০১. বারানী : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৪৫৪-৫৫।

১০২. ইয়াহিয়া বিন আহমদ : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৯৮। আদিতে অবশ্য ওয়াজীর পদটি মন্ত্রী অর্থে ব্যবহৃত হতো বলে মনে হয় না। এটা আল-ওয়াজীর অর্থাৎ বোঝা, আল-ওয়াজর অর্থাৎ আশ্রয় এবং আজর অর্থাৎ সমর্থন শব্দটি থেকেও এসে থাকতে পারে। এটা মনে হয় এ কারণেই যে মন্ত্রী রাজ্যের বোঝা বহন করেন, সুলতান মন্ত্রীর সাহায্য ও উপদেশের আশ্রয় পান এবং তাঁর সমর্থন সুলতানের অবস্থানকে দৃঢ় করে। দেখুন মাওয়ার্দী : আহকাম-উস-সুলতানিয়াহ্‌, কায়রো সংস্করণ, পৃ. ২২। বাংলার প্রশাসনে সম্ভবত সুলতানের সাহায্যকারী অর্থে প্রাদেশিক গভর্নর সম্পর্কে ওয়াজীর শব্দটি প্রয়োগ করা হতো।

১০৩. কৃষ্ণদাস কবিরাজ : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১০৬; কানিংহাম : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৯৯-১০০০; ই.

আই. এম. ১৯২৯-৩০, পৃ. ১২-১৩, প্লেট ৭ (খ); দানী : বিব্লিওগ্রাফি, পৃ. ৫৭; এস. আহমদ : ইনস্ক্রিপশন্স, পৃ. ১৯০-৯১।

১০৪. জে. এ. এস. বি. ১৮৭২, পৃ. ১০৬; কানিংহাম; পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৯৯-১০০। ই. আই. এম. ১৯২৯–৩০, পৃ. ১২–১৩, প্লেট-৭ (খ) দানী : বিব্লিওগ্রাফি, পৃ. ৫৭ : এস. আহমদ : ইনক্রিপশন্স পৃ. ১৯০–৯১।

১০৫. জে. এ. এস. বি. ১৮৭০, পৃ. ২৮৩-৮৪; ১৯০৯, পৃ. ২৬০; ই. আই. এম. ১৯১৫-১৬, পৃ. ১২-১৪; ত্রিবেণী লিপিগুলি দেখুন; দানী : বিব্লিওগ্রাফি, পৃ. ৫৩; এস. আহমদ : ইনস্ক্রিপশন্স, পৃ. ১৭৫ ও পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহ।

১০৬. জে. এ. এস. বি. ১৮৭২, পৃ. ৩৩৩-৩৪। ৯১৯ হিজরি/১৫১৩ সালের সোনারগাঁও লিপিটি দেখুন; দানী : বিব্লিওগ্রাফি, পৃ. ৫৯; এস. আহমদ : ইনস্ক্রিপশন্স, পৃ. ১৯২।

১০৭. জে. এ. এস. বি. ১৮৭০, পৃ. ২৮৩-৮৪; ১৯০৯, পৃ. ২৬০; ই. আই, এম. ১৯১৫-১৬, পৃ. ১২-১৪। হোসেন শাহের ত্রিবেণী লিপি দেখুন।

১০৮. পূর্বোল্লিখিত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৮২।

১০৯. উপরে উল্লিখিত হোসেন শাহের দেবীকোট লিপি থেকে দেখা যায় যে, রুকন খান ছিলেন মোজাফফরাবাদের গভর্নর। ২য় পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত সিলেট লিপি অনুসারে সেই একই ব্যক্তি ছিলেন কামরূ-কামতা এবং উড়িষ্যা-জাজনগরের গভর্নর। ফলে তার বদলির ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

১১০. পূর্বোল্লিখিত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৮৩।

১১১. জে. এ. এস. বি. ১৮৭৩, পৃ. ২৭২-৭৩; ই. আই. এম. ১৯৩৭-৩৮, পৃ. ৩৮, প্লেট ১২ (ক); দানী : বিব্লিওগ্রাফি, পৃ. ২৩; এস. আহমদ : ইনস্ক্রিপশন্স, পৃ. ৭৩। বারবকের দিনাজপুর লিপির প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে। অনুমান করা যেতে পারে যে বারবকের আমলের প্রশাসনিক ব্যবস্থাবলি পর্যালোচনাধীন আমলেও বজায় ছিল। নসরত শাহের ১৫২৬ সালের নবগ্রাম লিপিতে জঙ্গদারের উল্লেখ আছে।

১১২. বিপ্রদাস : মনসা-বিজয়, পৃ. ১৪৩।

১১৩. পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৫৪।

১১৪. বিজয় গুপ্ত : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৫৪-৫৬; বৃন্দাবন দাস : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৯৮, ১০০, ১০১, ২৬৬, ২৬৭, ২৭৫-৭৬, ২৭৭ এবং ৩৭৯; কৃষ্ণদাস কবিরাজ : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৬৪-৬৭।

১১৫. পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১০০।

১১৬. উপরে পৃ. ৯৪।

১১৭. এম. এ. চাঘতাই : "মুসলিম মনুমেন্টস অফ আহমদাবাদ থ্রু দেয়ার ইনস্ক্রিপশন্স", বুলেটিন অফ দি ডেকান কলেজ ইনস্টিটিউট, ১৯৪১-৪২, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১০৭-০৯, ১১১-১২, ১৩৩, ১৩৯, ১৪১-৪৩ ইত্যাদি, প্লেট ৪ (ক), ৪ (খ), ৫, ১৭, ২৩, ২৪; জে. এ. এস. পি. ১৯৫৮, পৃ. ২১০।

১১৮. চাঘতাই : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১২৮-৩০; ১৩৬ ও ১৩৮; প্লেট ১৪, ২০ (ক) এবং ২১।

১১৯. তারিখ-ই-মোবারকশাহী, পৃ. ১০৫ ও রিয়াজ, পৃ. ১২০।

১২০. চাঘতাই : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১২৯।

১২১. নিচে, ৪র্থ পরিচ্ছেদ, ২

১২২. সতীময়না ও লোরচন্দ্রাণী, পৃ. ৪৬; জে. এ. এস. বি. ১৯৫৮, পৃ. ২১১।

১২৩. ফেয়ার : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৭৮-৮০ এবং হার্ভে : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১৩৯-৪০।

১২৪. উপরে, পৃ. ৬৮ ও পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহ।

১২৫. পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৫৪-৫৭।

১২৬. পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ২৭৮।

১২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৭।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অর্থনৈতিক অবস্থা

পর্যালোচনাধীন আমলের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে ধারণা লাভ করা প্রয়োজনীয় কাজ। ভার্থেমা এবং বার্বোসা ষোড়শ শতকের প্রথম দিকে বাংলায় এসেছিলেন। জোয়াও দ্য ব্যারোস হোসেন শাহী বংশের পতনের অব্যবহিত পরেই তাঁর গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তাঁরা আমাদের জন্য দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে যথেষ্ট মূল্যবান বিবরণ রেখে গেছেন। এসব বিবরণ এবং বাংলা কাব্য, ফার্সি সাহিত্য, মুদ্রা এবং লিপি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উন্নয়নের যথেষ্ট ইঙ্গিত দেয় যা ছিল দেশের জীবনযাত্রার বৈশিষ্ট্য নির্দেশক। কৃষি, বাণিজ্য এবং শিল্প, প্রধানত এ তিনটি উৎস থেকে বাংলার সম্পদ আহরিত হতে পারত। বিভিন্ন অর্থনৈতিক শ্রেণীর বিবরণ দেওয়ার আগে আমাদের এসব উৎসের প্রত্যেকটির বিস্তারিত আলোচনা করা প্রয়োজন।

পরিসংখ্যানগত উপাত্তের অভাবে শহুরে ও গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর অনুপাত সম্পর্কে যথাযথ ধারণা করা অসম্ভব। মধ্যযুগের বাংলার সমাজ মূলত কৃষিভিত্তিক হওয়ায়, গ্রামে বসবাসকারী লোকের সংখ্যা নিশ্চিতভাবেই শহর ও নগরে বসবাসকারী লোকের চেয়ে অনেক বেশি ছিল। পর্যালোচনাধীন সময়কালে গ্রামীণ বসতিগুলি সমরূপ রীতি বা প্রকৃতির ছিল বলে মনে হয় না। কয়েকটিতে সংগঠিত জনগোষ্ঠী থেকে থাকলেও, অন্যগুলিতে বিক্ষিপ্ত জনগোষ্ঠী থাকার সম্ভাবনাই ছিল বেশি। মঙ্গল কাব্যগুলি থেকে প্রতীয়মান হয় যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, মুসলমান, তাঁতি এবং অন্যেরা[১] গ্রামে তাদের জন্য নির্ধারিত এলাকায় নিবিড়ভাবে গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে বাস করত। কিন্তু পূর্ব ও উত্তর বাংলার কিছু অংশে জনসংখ্যার বণ্টন কিছুটা ভিন্ন প্রকৃতির ছিল বলে মনে হয়। ফরিদপুর, ঢাকা এবং ময়মনসিংহ জেলার গ্রাম-এলাকায় এখনও জঙ্গল, মাঠ এবং চাষের জমির মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে বিচ্ছিন্ন বসতি রয়েছে। অতিরিক্ত জনসংখ্যা দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত বর্তমানকালেও গ্রামের বসতিগুলির অবস্থা যদি এরকম হয় তবে আমরা ধারণাই করতে পারি না যে গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী মধ্যযুগের সীমিত সংখ্যক মানুষ নিবিড়ভাবে শ্রেণীবদ্ধ হয়ে বাস করত। জমির লভ্যতা, লোকের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য প্রকৃতি এবং পূর্ব ও উত্তরবঙ্গে দৃষ্ট কোচ, মেছ এবং থারুদের মতো উপজাতীয়দের যাযাবর অভ্যাসের মতো কারণ দিয়ে বসতিগুলির বিক্ষিপ্ত প্রকৃতির ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে।[২]

গ্রামের বসতিগুলিতে বাসস্থান ছাড়াও সড়ক ও পায়ে চলা পথ, স্নানের ঘাটসহ পুকুর যা জনসাধারণের জল সরবরাহ করত, জঙ্গল যা চারণভূমির কাজ করত এবং খাল[৩] ছিল যা ছিল গ্রামের এক ধরনের জল-নিষ্কাশন ব্যবস্থা। আবাদি ও পতিত জমি ছিল।[৪]

জনসংখ্যার নিয়মিত ও মন্থর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শেষোক্ত শ্রেণীর জমিকে চাষের আওতায় আনা হতো।[৫] কোনো কোনো গ্রামে স্থানীয় বাজার বা হাট[৬] ছিল। মানুষ সেখানে জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্র বেচা-কেনার জন্য যেত। শ্রীনাথ আচার্যচূড়ামণির বিবাহ-তত্ত্বার্ণভ থেকে জানা যায় যে গ্রাম এলাকায় উর্বর জমি (উর্বরা-ভূমি), চারণক্ষেত্র (গো-চারণভূমি), ধর্মীয় বলিদানের জন্য স্থান (বেদিভূমি), বাজার (বিক্রয়স্থান), হ্রদ, অনুর্বর জমি (উষরভূমি), চৌমাথা (চতুষ্পথ) এবং শবদাহের স্থান (শ্মশান) ছিল।[৭] কাজেই গ্রামাঞ্চলের বসতিগুলিতে জমির বিন্যাস বহুভাবেই জনগণের প্রয়োজন অনুযায়ী ছিল।

এর অর্থনৈতিক কাঠামোর দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করলে বলা যায় যে, মধ্যযুগের বাংলার গ্রাম আজকের গ্রামের চেয়ে খুব বেশি ভিন্নতর ছিল না। এতে বহুসংখ্যক পরস্পর-নির্ভরশীল আর্থ-সামাজিক শ্রেণী ছিল যারা গ্রামাঞ্চলের গোটা জনগোষ্ঠীকে বাঁচিয়ে রাখতে জীবন ধারণ ও কাজ করত। কৃষকের ছুতার ও কামারের সাহায্যের প্রয়োজন হতো যারা চাষের জন্য লাঙ্গল ও লোহার যন্ত্রাদি সরবরাহ করত। সকল শ্রেণীর মানুষই কুমারের ওপর নির্ভরশীল ছিল যারা পরম্পরাগতভাবে রান্নাঘরের প্রয়োজন মিটাবার উপযোগী ও আকৃতির মাটির পাত্র তৈরি করত। একইভাবে অন্যান্য শ্রেণীর মানুষ ও গ্রামের অর্থনৈতিক কাঠামোর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিল।[৮] আর্থ-সামাজিক শ্রেণীগুলির বিশেষ বিশেষ জীবিকার ওপর স্থায়ী নির্ভরশীলতা এবং সমাজের অপরিবর্তনশীল ধারা গ্রামীণ জীবনে এক ধরনের ধারাবাহিকতার সৃষ্টি করেছিল যা ছিল বিশেষ বিশেষ কতকগুলি স্থির প্রকৃতির আচার, রীতিনীতি এবং প্রতিষ্ঠানের বিকাশের জন্য দায়ী। কেউ মধ্যযুগীয় বা প্রাচীন বাংলার হিন্দু সমাজে প্রচলিত ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও উৎসবকে বর্তমান কালের আচার-অনুষ্ঠান ও উৎসবাদির সঙ্গে তুলনা করার চেষ্টা করলে এগুলির মধ্যে মৌলিক ধারাবাহিকতা দেখে তিনি বিস্ময়ে হতবাক হবেন। গ্রামীণ বসতি ছিল বসবাসের মোটামুটি স্বয়ংসম্পূর্ণ একক। কৃষক তেমন কোনো অসুবিধার সম্মুখীন না হয়েই তার উদ্বৃত্ত ফসল স্থানীয় বাজারে নুন, তেল, কাপড় ও জীবনধারণের অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সঙ্গে বিনিময় করতে পারত। সুতরাং প্রধানত জমি ও এর ফসলের ওপর নির্ভরশীল হলেও গ্রামে সীমিত পরিমাণে ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল।

গ্রামীণ এলাকার তুলনায় শহর ও নগরগুলিতে জনগোষ্ঠীর কেন্দ্রীভূত হওয়া সম্ভবত এগুলিকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছিল। প্রশাসন ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে নিজেদের জড়িত করার উদ্দেশ্যে মানুষ সেখানে জড়ো হয়েছিল। রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক কারণ দিয়ে যাদের অস্তিত্ব ব্যাখ্যা করা যায় সেই গৌড়, পাণ্ডুয়া, সাতগাঁও, চট্টগ্রাম এবং সোনারগাঁও ছাড়াও বহু শহর ছিল।[৯] দেশের বিভিন্ন স্থানে সরকারি টাকশাল স্থাপনের কারণে এগুলির উদ্ভব হয়েছিল। হোসেন শাহী বংশের প্রতিষ্ঠাতা একডালায় রাজধানী স্থানান্তর করলেও পূর্ববর্তী মুসলমান শাসনামলের রাজধানী গৌড় ও পাণ্ডুয়ার গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছিল বলে মনে হয় না। রাজনৈতিক কেন্দ্ররূপে কাজ করা ছাড়াও এ দু'টি শহর গঙ্গা, ভাগীরথী, মহানন্দা এবং কালিন্দী নদীর গতিপথ ধরে দেশের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করেছিল। এগুলি রাজমহল পাহাড়ের তেলিয়াগড়ি ও সিক্রিগলি গিরিপথের মতো

কৌশলগত ভূ-ভাগের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রেখেছিল এবং বাংলার বাণিজ্যিক জীবনে যথেষ্ট অবদান রেখেছিল।

বর্তমানে ধ্বংসস্তূপে পরিণত গৌড়ের অবস্থান সযত্নে পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে বাণিজ্যিক শহরটির অবস্থান ছিল উত্তরাংশে এবং দুর্গটি ছিল শহরের দক্ষিণাংশে।[১০] গৌড়ের সমৃদ্ধি এবং লোকসংখ্যা বিদেশী পর্যটক এবং মানচিত্রকরদের দৃষ্টি এড়ায় নি। ১৫৪০ সালের আগে জোয়াও দ্য ব্যারোস মন্তব্য করেছেন,[১১] "রাস্তাগুলি প্রশস্ত ও সরল এবং পথচারীদের ছায়াদানের জন্য প্রধান সড়কগুলির দেয়াল ঘেঁষে সারিবদ্ধভাবে গাছ লাগানো হয়েছে। এর জনসংখ্যা এত বিশাল এবং রাস্তাগুলিতে জনতার চলাচলের এত ভিড় যে তারা একজন অপরজনকে পার হয়ে এগিয়ে যেতে পারে না। নগরীর এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে জমকালো এবং অত্যন্ত সুগঠিত হর্ম্যরাজি।" ১৬৪০ সালের আগে রচিত ফারিয়া ওয়াই সুজার বিবরণে "গঙ্গার তীরে প্রধান শহর গৌড়ের উল্লেখ আছে। এটা দৈর্ঘ্যে তিন লীগ, এতে ১২ লক্ষ পরিবার বাস করে এবং এটা সুরক্ষিত।"[১২] ১৬৪১ সালে গৌড় পরিদর্শনকারী ম্যানরিক ".. ৩ কোটি টাকা মূল্যের স্বর্ণমুদ্রা ও মূল্যবান পাথর ভর্তি তিনটি তামার পাত্রের আবিষ্কারের" কথা উল্লেখ করেছেন।[১৩] সমসাময়িক বিবরণগুলি শহরটির তিন লীগ[১৪] বা প্রায় নয় মাইল দৈর্ঘ্যের কথা উল্লেখ করলেও অষ্টাদশ শতাব্দীর ৩য় চতুর্থাংশে গৌড় পরিদর্শনকারী রেনেল বলছেন "সবচেয়ে বেশি যুক্তিগ্রাহ্য হিসেব গ্রহণ করলেও গৌড়ের আয়তন দৈর্ঘ্যে ১৫ মাইলের কম নয় (গঙ্গার পুরাতন নদী-তীর ধরে বিস্তৃত) এবং প্রস্থে ২ থেকে ৩ মাইল।[১৫] হোসেন শাহীদের একডালায় রাজধানী স্থানান্তরের কারণ ছিল সম্ভবত নগরীর পূর্বদিকে অবস্থিত চুটিয়া পুটিয়া বিলের নিয়মিত ব্যবধানে গৌড়ে বন্যা[১৬] এবং গঙ্গা নদীর গতিপথ পরিবর্তনের প্রকৃতি[১৭] যা রাজধানী এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা ও বাণিজ্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করছিল।

পাণ্ডুয়ার গুরুত্বের বহু কারণ ছিল। প্রথমত, চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে এটা ছিল রাজধানী-নগরী। দ্বিতীয়ত, এটা মহানন্দা এবং গঙ্গার এক পূর্ববর্তী তলদেশের সঙ্গমস্থলের কাছে অবস্থিত ছিল। তৃতীয়ত, উত্তরবঙ্গ ও বিহারের বিভিন্ন এলাকার দিকে যাওয়া বিভিন্ন নদী-পথ ও স্থল-পথের পাশে এটা অবস্থিত ছিল।[১৮] শেষত, এখানে ছিল নূর-কুতুব-ই-আলমের সমাধি যা এটাকে তীর্থস্থানের মর্যাদা দান করেছিল।[১৯] চৈনিক বিবরণগুলিতে পাণ্ডুয়ার জন-জীবনের প্রাচুর্য ও বিলাসিতার উল্লেখ আছে। তাঁদের একজন নিম্নলিখিত তথ্য দিয়েছেন : "নগর-প্রাকারগুলি খুবই জমকালো, বাজারগুলি সুবিন্যস্ত, দোকানগুলি সারিবদ্ধ, থামগুলি সুবিন্যস্তভাবে সারিবদ্ধ; এগুলি সবধরনের পণ্যে পূর্ণ। চুন-বালির গাঁথুনিযুক্ত সুলতানের প্রাসাদ সম্পূর্ণভাবে ইটের তৈরি। এতে যাবার সোপান শ্রেণী উঁচু ও প্রশস্ত। হলঘরগুলির ছাদ সমতল এবং এগুলির ভিতরের দিক চুনকাম করা। ভিতরের দরজাগুলি তিনগুণ পুরু এবং নয় প্যানেল বিশিষ্ট। দরবার কক্ষের থামগুলি পিতলের পাত দিয়ে ঢাকা। এগুলি খোদাই ও পালিশ করা ফুল ও জীবজন্তুর নকশা দ্বারা অলঙ্কৃত। এর ডান ও বাম দিকে লম্বা বারান্দা রয়েছে....।[২০] অন্য এক বিবরণে[২১] বলা হয়েছে যে "শহর ও শহরতলী ছিল বড় ও সুরুচিসম্পন্ন।" সন্দেহ নেই যে চৈনিক বিবরণগুলি রাজধানী

পাণ্ডুয়া শহরে, বিশেষত রাজা গণেশের বংশের শাসনামলে বিদ্যমান জীবনযাত্রা ও অবস্থার অতীত ইতিহাসে লেখ্য প্রমাণ সংরক্ষণ করেছে। কিন্তু এটা মনে করার কোনো কারণ নেই যে পরবর্তী ইলিয়াস শাহী সুলতানদের দ্বারা গৌড়ে রাজধানী স্থানান্তরের সঙ্গে সঙ্গেই বা কয়েক যুগের মধ্যেই শহরের সমৃদ্ধি সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল।[২২] গৌড়ের প্রায় ২০ মাইল উত্তর-পূর্বে পাণ্ডুয়ার বর্তমান অবস্থানে একটি চতুষ্কোণ ঢিবি আছে– এর ব্যাস ৫ মাইল।[২৩] প্রত্নতাত্ত্বিকভাবে ধারণা করা হয় যে এর অবিচ্ছিন্ন দুর্গ প্রাকার শ্রেণী মুসলমান আমলে নগরীকে বেষ্টন করে রেখেছিল।

পূর্বে বালিয়া নদী থেকে পশ্চিমে চিরামতী নদী পর্যন্ত বিস্তৃত দিনাজপুর জেলার একডালার[২৪] স্থান বিবরণ ও প্রত্নতত্ত্ব যথাযথভাবে পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, হোসেন শাহীদের রাজধানী মধ্যযুগীয় অন্যান্য নগরীর মতো নদীর সঙ্গে যোগাযোগ বিশিষ্ট একটি অবিচ্ছিন্ন পরিখা দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। এর ভৌগোলিক অবস্থান স্পষ্টভাবেই নির্দেশ করে যে, স্থল-পথে এখান থেকে দেবীকোট ও পাণ্ডুয়া যাবার রাস্তা ছিল।[২৫] একডালার অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে তেমন কিছুই জানা যায় না। চতুর্দশ শতাব্দীর শেষার্ধে ফিরূজ তুঘলকের আক্রমণের সময় এখানে উচ্চবিত্ত, ছাত্র, সুফি, সন্ন্যাসী, নবাগত এবং বিদেশী, এসব শ্রেণীর মানুষ বাস করতেন।[২৬] মূলত রাজধানী হলেও পার্শ্ববর্তী কৃষি এলাকা দ্বারা পুষ্ট হওয়ায় সম্ভবত এর কিছুটা বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডও থেকে থাকতে পারে।

কৌশলগত ও সামরিক কারণে বহু নগরীর সৃষ্টি হয়েছিল। দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তে মন্দারণ এবং চট্টগ্রামের ফেনী নদীর তীরে পরাগল খানের সদর দপ্তর সামরিক ফাঁড়ি বৈ অন্য কিছু নয়।

ব্যবসা-বাণিজ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে এসব শহর ও নগরের কোনো গুরুত্ব না থাকলেও নিঃসন্দেহে প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণ থেকে এদের যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল। এগুলির প্রত্যেকটিতে অন্তত একটি বাজার ছিল যা পার্শ্ববর্তী কৃষিভিত্তিক বসতিগুলির সরবরাহে চলত। এখানে বসবাসকারী অভিজাতবর্গ ও রাজকীয় পরিবারের সদস্যদের জীবনযাত্রার মানের চাহিদা অনুযায়ী কেতাদুরস্ত দোকান ও ক্রয়-কেন্দ্রও ছিল। এটাও অনুমান করা যেতে পারে এসব শ্রেণীর মানুষ তাঁদের জমিদারি থেকে পাওয়া খাজনা দিয়ে জীবন ধারণ করতেন এবং তাঁদের জীবন মূলত কৃষিনির্ভর ছিল। সুতরাং উপরে বর্ণিত নাগরিক বসতিগুলি সাতগাঁও, চট্টগ্রাম এবং সোনারগাঁওয়ের মতো বন্দর ও শহর থেকে ভিন্নতর ছিল। শেষোক্তগুলির ছিল প্রধানত বাণিজ্যিক গুরুত্ব।

২.

শহর ও নগরগুলি শিল্প-কেন্দ্র রূপে কাজ করছিল, তবে কৃষির সমৃদ্ধি একমাত্র গ্রামীণ এলাকাতেই সম্ভব ছিল যেখানে কৃষি ও পশুচারণের জন্য ভূমি পাওয়া যেত। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বারংবার রাখালের উল্লেখ এ ইঙ্গিত দান করে বলে মনে হয় যে তারা পতিত জমিতে পশুচারণ করত। এখানে অনুমান করা যায় যে জমিকে সাধারণত দু'ভাগে

ভাগ করা হতো, সিল এবং লাল বা অনাবাদী ও চাষযোগ্য ভূমি। অনাবাদী জমি বাদ দিয়ে সরকার মনে হয় শুধু চাষযোগ্য ভূমির ওপরই কর ধার্য করতেন। চণ্ডী-মঙ্গলে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে যে আকবরের রাজস্ব-কর্মচারীরা অনাবাদী জমিকে চাষযোগ্য রূপে নথিভুক্ত করে জনগণের ভোগান্তি বৃদ্ধি করেছিলেন।[২৭] এ থেকে স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে প্রাথমিক মোগল আমলে বাংলার জনগণের এক ধরনের অন্যায় করপ্রথা সম্পর্কে অভিযোগ করার যথেষ্ট কারণ ছিল। জমি মাপার জন্য হোসেন শাহীরা কি পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন সে সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না। এ বিষয়েও কবি কঙ্কণ আমাদের সাহায্য করতে পারেন। ১৫ কাঠায় এক বিঘা[২৮] মাপতেন এমন অত্যাচারী শিকদারের কাহিনী থেকে দেখা যায় যে সাধারণত ১৫ কাঠার চেয়ে বেশি জমিতে এক বিঘা হতো। সুতরাং আমরা মাপের একক হিসেবে কাঠা ও বিঘা পাই। কাঠা ছিল বিঘার প্রায় কুড়ি ভাগের এক ভাগ। এ ব্যবস্থা সমরূপে সমস্ত দেশে অনুসরণ করা হতো কিনা তা আমরা জানি না। কবি কঙ্কণ ষোড়শ শতাব্দীর শেষ চতুর্থাংশে তাঁর কাব্য রচনা করেছিলেন। কাজেই মনে হয় সে তাঁর উল্লিখিত মাপের এককগুলি সম্ভবত হোসেন শাহী আমলেও প্রচলিত ছিল, কারণ তিন চার দশকের মধ্যে মাপার পদ্ধতিতে কোনো মৌলিক পরিবর্তন হয়েছিল বলে মনে হয় না।

সপ্তদশ শতাব্দীর ত্রিপুরার রাজাদের তাম্রশাসনগুলিতে[২৯] ১:১৬ অনুপাতের সম্পর্কযুক্ত কানি এবং দ্রোণের মতো জমি মাপার বিশেষ একককে বিশেষ কতকগুলি নামের উল্লেখ রয়েছে যা বর্তমান কালেও প্রচলিত রয়েছে। এটা মনে হয় নিশ্চিত যে মাপার এসব একক দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার কোনো কোনো অংশে পূর্বতন আমলেও প্রচলিত ছিল এবং হোসেন শাহী সুলতানদের বিজিত ত্রিপুরা ও চট্টগ্রাম অঞ্চলেও এগুলির ধারাবাহিক ব্যবহার হয়ে থাকতে পারে। কানি ও দ্রোণের সমতুল মাপ সঠিকভাবে নির্ধারণ করা যায়। ১৮৩৩ সালে লিখতে গিয়ে প্রিন্সেপ দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় প্রচলিত জমির মাপের নিম্নলিখিত সারণি দিয়েছেন[৩০] :

৮ হাতি নল = ১২ ফুট

৪ কড়ির গণ্ডা = ২×৩ নল : ৯৬ বর্গগজ

কানি=২০ গণ্ডা=১২×১০জন = ১৯২০ বর্গগজ

দ্রোণ = ১৬ কানি = ৮০৭২০ বর্গগজ বা ৬.৩৫ একর।

এ সারণি থেকে দেখা যায় যে এক কানি ৩৯.৮৬৭৫ বা প্রায় ৪০ শতাংশের সমান। উপরের সারণি থেকে এটাও যথেষ্ট স্পষ্ট যে, আজকের মতো তখনকার দিনেও নল বা বাঁশ বাস্তবে মাপার কাজে ব্যবহৃত হতো। নোয়াখালি ও চট্টগ্রাম জেলার কোনো কোনো এলাকায় জমি মাপা হয় শাহী কানির হিসেবে।[৩১] এটা একটা বৃহত্তর একক এবং মুসলমান সুলতানরা এর প্রচলন করেছিলেন বলে মনে করা হয়। দেশের অন্যান্য অঞ্চলে জমির মাপের একক সম্পর্কে আমাদের কোনো যথাযথ ধারণা নেই। বাংলার অর্থনীতি

কৃষিভিত্তিক হওয়ায় খাদ্যশস্যসহ কৃষিজ পণ্যের মাপ, মনে হয়, জমির মাপের সঙ্গে জড়িত ছিল। নিচে উদ্ধৃত তিনটি সারণি[৩২] থেকে এ ধারণা জোরদার হয়। কুল্লুক ভট্ট, রঘুনন্দন এবং শব্দকল্পদ্রুমের সংকলক ওজনের নিম্নলিখিত পদ্ধতির উল্লেখ করেছেন :

৮ মুঠি = ১ কুঞ্চি

৮ কুঞ্চি = ১ পুষ্কল

৪ পুষ্কল = ১ আধক (আধা)

৪ আধক = ১ দ্রোণ

বহু দলিলপত্র থেকেই জানা যায় যে, বাঁকুড়া জেলাসহ বাংলার কিছু অংশে প্রচলিত জমির মাপ ছিল নিম্নরূপ :

৪ কাক বা কাকিনি (কানি) = ১ উয়ান

৫০ উয়ান = ১ আধি (আধা)

৪ আধি = ১ দ্রোণ

লক্ষ্মণ সেনের সুন্দরবন লিপিতে সম্ভবত উয়ান এককটির ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এ লিপি অনুসারে

১২ অঙ্গুলি (১২ আঙ্গুল প্রসারিত) = ১ হাত

৩২ হাত = ১ উনমান

যে ওজন প্রণালীমতো ১৬ আউন্সে ১ পাউন্ড হয় সে মাপে দিল্লি রতল বা মনের ওজন ২৮.৮ পাউন্ড বা আজকের ওজনের মানে প্রায় ১৪ সের।[৩৩] রতল তখন প্রচলিত ছিল বলে মনে হয় না এবং কবি কঙ্কণ বিশ্বাসযোগ্য হলে সের এবং আধা[৩৪] অন্তত পক্ষে ষোড়শ শতাব্দীর বাংলার কিছু অংশে প্রচলিত ছিল।

আলোচ্য আমলে বাংলায় প্রচলিত ভূমির ভোগদখল ব্যবস্থা সম্পর্কে আমাদের হাতে উপাদান অত্যন্ত সামান্য। ভূমি বহু শ্রেণীতে ভাগ করা যেত। পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে[৩৫] যেমন নির্দেশ করা হয়েছে জমি স্থানীয় ও পর্তুগিজ রাজস্ব-ইজারাদারদের মধ্যে ইজারা দেওয়া যেত। তারা আদায়কৃত অর্থের এক নির্দিষ্ট অংশ সরকারকে দিত। চৈতন্য-চরিতামৃত বিশ্বাসযোগ্য হলে এ ইজারাদারদের কেউ কেউ প্রাদেশিক গভর্নরের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে ছিল।[৩৬] সুলতানের আত্মীয়বর্গ এবং কৃতিত্বপূর্ণ কাজের স্বীকৃতি হিসেবে কর্মকর্তাদেরকে প্রদত্ত জমি মনে হয় নিষ্কর ছিল। দৌলত কাজী আমাদের জানাচ্ছেন যে, হোসেন শাহের একজন কর্মকর্তা ওয়াজীর হামিদ খানকে চট্টগ্রামে ২ শিক জমির ভোগ-দখল দেওয়া হয়েছিল।[৩৭] কথিত আছে যে সুলতান তাঁর জামাতা কুতুব-উল-আলেগীনকে সোনারগাঁওয়ে ভূ-সম্পত্তি দিয়েছিলেন। মূল সনদটি অনুদ্ধারণীয়ভাবে হারিয়ে গেছে বলে মনে হলেও ২৭শে রবি উস-সানী, ১০৫১ হিজরি/৫ই আগস্ট ১৬৪১ সালের শাহ সুজার

দলিলসহ[৩৮] বহু মোগল দলিলই কুতুবউল-আশেগীনের বংশধরদের সোনারগাঁও সরকারে ১৩৩ বিঘা আবাদি জমির দখলের দাবিকে নিশ্চিত করে। এ দলিলটি এ ভূ-সম্পত্তিকে "কর সরকারি ব্যয়, দক্ষ ও বাধ্যতামূলক শ্রম, শিকার, জমি ও বাগান থেকে বারবার ফসল উৎপাদন, চৌধুরীর জন্য শতকরা ২ হার, ... এর জন্য সালামী এবং অট্টালিকা, ... এবং কানুনগো, সামরিক গভর্নর এবং রাজস্ব সংগ্রাহকের শতকরা হার ইত্যাদির অজুহাতে" সরকারি হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত করে।[৩৯] আলোচ্য দলিলটি "ভূতপূর্ব ও বর্তমান গভর্নরদের প্রদত্ত সনদ অনুযায়ী"[৪০] তৈরি হওয়ায় এতে বর্ণিত শর্তাবলি ও অনাক্রম্যতাগুলিকে মূল ভূ-স্বামী কর্তৃক ভোগকৃত একই ধরনের সুবিধাবলির ধারাবাহিকতা বলে গ্রহণ করা যায়। এ সম্পত্তি নিষ্কর এবং এ থেকে লব্ধ রাজস্বের স্বত্বও এর সাথে ছিল মনে হলেও এটার স্বত্ব হস্তান্তর করা বা তাঁর পুত্র বা প্রত্যক্ষ উত্তরাধিকারীকে দান করার অধিকার সম্ভবত গ্রহীতার ছিল না। কুতুব-উল-আশেগীনের বংশধর সৈয়দ মোস্তফা তাঁর ভোগকৃত জমি তাঁর পুত্র সৈয়দ মহিউদ্দীনকে হস্তান্তর করতে ইচ্ছুক হলে শাহজাহানের সীলমোহর ও তুঘরা দ্বারা যথাযথভাবে অনুমোদিত হস্তান্তর লিপিবদ্ধ বা দলিলে রেজিস্ট্রি করার জন্য তাঁকে মোগল কর্তৃপক্ষের সামনে হাজির হতে হয়েছিল।[৪১] সে যাই হোক হোসেন শাহী আমলেও আলোচ্য এ সম্পত্তি হস্তান্তরের অযোগ্য ছিল কিনা সেটা আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়। এ ধরনের জমি ও ধর্মীয় উদ্দেশ্যে প্রদত্ত জমিগুলির মধ্যে পার্থক্য ছিল। শেষোক্তগুলি মনে হয় নিষ্কর ছিল এবং এগুলি সুলতানরা মসজিদ এবং অনুরূপ অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে দান করতেন।[৪২] হোসেন শাহের ৯১৮ হিজরি/১৫১২ সালের দেওকোট লিপিতে[৪৩] এ সকল "ধর্মীয় ভূমিদানের" নবায়নকে ধর্মীয় গুণের কাজরূপে বিবেচনা করা হয়েছে। মোল্লা ও জমিদাররা এসব ইচ্ছাপত্র করে প্রদত্ত সম্পত্তি প্রতারণা করতে পারত বিধায় "এ ধরনের প্রতারণা নিরোধকে গভর্নর ও কাজীদের আন্তরিক দায়িত্বরূপে" গণ্য করা হয়েছে।[৪৪] এ সবই নির্দেশ করে যে সরকার এসব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের কতকগুলির ওপর সরাসরি প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করতেন। অবশ্য এটা জোর দিয়ে বলা হচ্ছে না যে সম্পূর্ণ আবাদি জমি জুড়ে উপরে বর্ণিত স্বত্ব ছিল।

ইজারাদার বা জমিদারদের সঙ্গে প্রকৃত ভূমি-চাষীর সম্পর্কের বিষয়ে স্পষ্টভাবে কিছু জানা না গেলেও এটা মনে হয় মোটামুটি নিশ্চিত যে প্রথমোক্তরা তাঁদের এলাকায় খেয়ালখুশিমতো আচরণ করতে পারতেন। শাহ সুজার দলিল থেকে দেখা যায় যে "উল্লিখিত জমিগুলি এ ব্যবস্থাধীন রাখার এবং এতে কোনো ধরনের অদল-বদল বা পরিবর্তন না করার জন্য" রাজকীয় কর্মচারীদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।[৪৫] অন্তত পক্ষে কোনো কোনো এলাকায় রায়তকে জমি চাষের জন্য ব্যবহৃত লাঙ্গলের সংখ্যার ভিত্তিতে খাজনা দিতে হতো।[৪৬] আমরা আগেই ইঙ্গিত দিয়েছি যে প্রাক-মোগল গুজরাটেও একই ধরনের ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল।[৪৭] ভূমি-স্বত্ব সম্পর্কিত প্রাক-মুসলমান আমলের বাংলার কিছু লিপিতে হাল[৪৮] শব্দটির উপস্থিতি থেকে প্রাচীন বাংলায় এর অস্তিত্বের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। পূর্ব বাংলার কিছু অঞ্চলেও এটার প্রচলন অব্যাহত ছিল।[৪৯] একটা লাঙ্গল দিয়ে

কতটুকু জমি চাষ করা যেত তা নিরূপণ করা দুঃসাধ্য। সিলেটে জেলায় একটা হাল বা লাঙ্গল দিয়ে ১০½ বিঘা বা প্রায় ৩½ একর জমি চাষ করা যেত।[৫০] উত্তর বাংলার দিনাজপুর জেলা সম্পর্কে বুকানন হ্যামিল্টন বলছেন যে "এক হাল দিয়ে সাধারণত যে পরিমাণ চাষ করা যায় তা হচ্ছে ১০ বড় বিঘা, বা ১৫ কোলকাতা বিঘা বা ৫ একর।"[৫১] কাজেই কর নির্ধারণের একক হিসেবে হালের প্রকৃতি মনে হয় বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রকম ছিল।

সরকারি খাজনার হার বা হারসমূহ সম্পর্কে পরিষ্কারভাবে কিছু জানা যায় না। কিছুটা পূর্ববর্তী সময়ে বাংলায় আগত ইবনে বতুতা বলেছেন যে "নীল নদীর" তীরে বসবাসকারী গ্রামবাসীদের তাদের উৎপন্ন শস্যের অর্ধেক কর হিসেবে দিতে হতো। তাদের আরও কিছু অন্যান্য করও দিতে হতো।[৫২] প্রায় একই সময়ে ওয়াং-টা-ইউয়ান লিখেছেন যে মুসলমান শাসনাধীন বাংলায় রাজ্যের খাজনা ছিল উৎপন্ন ফসলের ১০ ভাগের ২ ভাগ বা এক-পঞ্চমাংশ।[৫৩] জমির উর্বরতা ও বিভিন্ন ঋতুতে উৎপাদিত ফসলের প্রকৃতির কারণে বিভিন্ন অঞ্চলে সমরূপ রাজস্ব-হার হওয়া ছিল অস্বাভাবিক। এটা মনে রাখলে রাজস্ব-হারের এ দৃশ্যমান অসঙ্গতির ব্যাখ্যা আমরা করতে পারি। সুতরাং প্রাক-মোগল ভারতে অর্ধেক থেকে এক-পঞ্চমাংশ পর্যন্ত বহু রাজস্ব-হার প্রচলিত ছিল।[৫৪] আকবরের আমলের ভারতেও রাজস্ব-হারের বিভিন্নতা ছিল। দেশের কোনো কোনো অঞ্চলে সম্রাটের নির্দিষ্টকৃত রাজস্ব-হার ছিল এক-তৃতীয়াংশ।[৫৫] হোসেন শাহী সুলতানদের শাসনামলে বাংলায় প্রচলিত সরকারি রাজস্ব-হার সম্পর্কে যা অনুমান করা যেতে পারে তা হচ্ছে এই যে সেটাও একই ধরনের স্থানীয় বিভিন্নতা দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ছিল।

চাষীদের রায়তিস্বত্ব সরকার কিভাবে স্বীকার করতেন তা জানা যায় না। মোগল ও প্রাক-মোগল বাংলায় সাধারণত চাষীদের পাট্টা দেওয়ার পদ্ধতি অনুসরণ করা হতো। কবি কঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গল এবং রামেশ্বর ভট্টাচার্যের শিবায়নে কাল্পনিক রায়তদের যথাক্রমে ইন্দ্র ও কালকেতুর কাছ থেকে পাট্টা গ্রহণকারী হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে।[৫৬] চাষীদের রায়তি-স্বত্বের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য হোসেন শাহীরাও নিশ্চয়ই এ ধরনের কিছু ব্যবস্থা করেছিলেন।

বাংলা মুখ্যত কৃষিপ্রধান দেশ হওয়ায় যুক্তিসঙ্গতভাবেই অনুমান করা যেতে পারে যে জনগোষ্ঠীর এক বিশাল অংশ ছিল কৃষক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। শূন্য-পুরাণে একজন হিন্দু দেবতাকে কৃষির পেশা গ্রহণকারীরূপে চিত্রিত করা হয়েছে।[৫৭] এ থেকে এ ইঙ্গিত পাওয়া যেতে পারে যে সম্ভ্রান্ত বংশীয়গণও পেশা হিসেবে কৃষিকে অপছন্দ করতেন না। পশ্চিম বাংলার মুসলমান কৃষক সম্প্রদায়ের বর্ণনা দিয়েছেন বিপ্রদাস। তিনি ইঙ্গিত করেছেন যে, কৃষকদের অর্থনৈতিক অবস্থান ছিল বিভিন্ন ধরনের। তাদের কিছুসংখ্যক এবং সম্ভবত এক বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ভূমি-দাস হলেও, শত শত শ্রমিক নিয়োগকারী বড় জোতদারদের দৃষ্টান্তও খুব বিরল নয়। প্রচুর-সংখ্যক কৃষি-শ্রমিক নিয়োগকারী ও বিরাট ভূ-সম্পত্তির মালিক হিন্দু জোতদার ছিল সচরাচর দৃষ্ট ও সাধারণ। ঐ আমলে হিন্দু জোতদারদের জীবনযাত্রা প্রণালী বর্তমান কালের জমিদারদের জীবনধারণের মানের সমতুল্য। ধনী জোতদার ও ভূমিহীন মজুরদের মাঝখানে আর এক শ্রেণীর কৃষিজীবী ছিল। তারা এসব

মজুরদের তদারকি করত এবং তারা ছিল প্রভাবশালী ও ক্ষমতাবান লোক।[৫৮] সমাজতাত্ত্বিকভাবে যে গো-পালক[৫৯] ছিল পশুচারণ পর্যায়ে, সে মনে হয় কৃষিজ পণ্য উৎপাদনকারীদের সঙ্গে জড়িত ছিল কারণ গরুর সাহায্য ছাড়া কৃষিকাজ ছিল অসম্ভব।

কৃষি এ দেশের অর্থনীতির মেরুদণ্ড হলেও নিশ্চিতভাবে এটা ছিল সেকেলে। তখন যেসব সরঞ্জাম ব্যবহার করা হতো সেগুলি আমাদের আমলের সরঞ্জামের চেয়ে ভিন্নতর ছিল না। এগুলির মধ্যে ছিল লাঙ্গল এবং গরু টানা জোয়াল, কাস্তে এবং অন্যান্য সরঞ্জাম।[৬০] চাষীদের প্রায়ই বৃষ্টির করুণার ওপর নির্ভর করতে হতো। যথাযথভাবে বিকশিত কোনো সেচ ব্যবস্থা ছিল না। চাষের জমিতে পানি আনার জন্য সম্ভবত খাল কাটা হতো। দরিদ্র চাষীরা ধনী প্রতিবেশী বা জমিদারদের কাছ থেকে বীজ ধার করত। সাধারণ লোকের ধারণা ছিল যে চাষীরা তাদের ঘরে লক্ষ্মীদেবীকে লালন করে তাদের পালন করছে।[৬১]

বাংলার লোক-প্রসিদ্ধ উর্বর বদ্বীপ অঞ্চলে বহু শস্য উৎপন্ন হতো। ধান রোপণের ছড়ানো, সারিবদ্ধভাবে রোপণ এবং মূল বীজ-তলা থেকে নতুন স্থানে চারা রোপণ, এ তিনটি পদ্ধতির মধ্যে শেষোক্তটিই সবসময় চাষীর জন্য সুবিধাজনক ছিল।[৬২] সাধারণত শ্রাবণ মাসে ধান রোপণ করা হতো এবং অগ্রহায়ণ মাসে ফসল কাটা সম্ভব হতো।[৬৩] সুতরাং শূন্য-পুরাণ বর্তমান কালে যাকে আমন ধান বলা হয় তা নির্দেশ করেছে। কিন্তু এটাই একমাত্র ধান ছিল না, কারণ আবুল ফজল আমাদের জানিয়েছেন যে "ফসলের কোনো ক্ষতি না করে একই জমিতে বছরে তিনবার ধান রোপণ করা ও কাটা হতো।" তিনি এক বিশেষ ধরনের ধানের উল্লেখ করেছেন পানির উচ্চতার ক্রমান্বয়িক বৃদ্ধির সঙ্গে যার বোঁটা বৃদ্ধি পেত যার ফলে পানি ফসলের কোনো ক্ষতি করতে পারত না।[৬৪] বিভিন্ন ধরনের ধানের নাম শূন্য-পুরাণ ও শিবায়নে উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাদের প্রদত্ত তালিকা সম্পূর্ণ বলে মনে হয়।[৬৫] মনে হয় যে এগুলি ছিল স্থানীয় নাম এবং ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এর নামও ভিন্নতর হতো। বস্তুত চাল ছিল বহু ধরনের। আবুল ফজল যখন বলেন যে, "প্রত্যেক ধরনের একটি করে চাল জমা করলে একটি বৃহৎ পাত্র ভরে যাবে" তখন তা বাংলা উৎসগুলি থেকে পাওয়া তথ্যকেই সমর্থন করে।[৬৬] অন্যান্য আরও কৃষিজাত উৎপন্ন দ্রব্য ছিল যার মধ্যে তুলা, আখ, আদা, মরিচ, হলুদ, সুপারি, মূলা এবং বিভিন্ন রকমের ডালের উল্লেখ করা যেতে পারে।[৬৭] বর্তমানে আমরা যে সব ফল দেখতে পাই তার অধিকাংশগুলিই তখনকার দিনেও পাওয়া যেত।[৬৮] বাংলার উৎপন্ন দ্রব্যের যে তালিকা মধ্যযুগে বাংলায় আগত চৈনিক ও ইউরোপীয় পর্যটকদের বিবরণে পাওয়া যায় সেটা এত দীর্ঘ যে এখানে তা পুনরুল্লেখ করা সম্ভব নয়।

কৃষিজীবীদের কিছু কিছু অসুবিধার সম্মুখীন হতে হতো যা মনে হয় ছিল অনতিক্রম্য। কখনও অনাবৃষ্টি হলে তাদের সর্বনাশ ছিল নিশ্চিত। যারা ক্ষুদ্র-ভূস্বামীদের এলাকায় বাস করত তাদের শেষোক্তদের করুণার ওপর নির্ভর করতে হতো। এ ধরনের অসুবিধাগুলি দূর করতে কৃষকদের সাহায্য করার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা নিতেন আমরা তা জানি না। কবি কঙ্কণকে বিশ্বাস করলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় কৃষক স্থানীয় জমিদারের কাছ

থেকে নানারকম সুবিধা ভোগ করত, যেমন পাট্টার নবায়ন, ভূমি কর মওকুফ এবং শস্যের অবাধ কেনা-বেচা যা সরকারি করমুক্ত করে দেওয়া হতে পারত।[৬৯]

৩.

বাংলার সামুদ্রিক বাণিজ্য ছিল সমৃদ্ধিশালী যা থেকে অনুমান করা যায় যে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বিকাশ লাভ করেছিল। এ সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। কৃষিজাত পণ্য এবং বহু সংখ্যক গৃহপালিত পশু নিশ্চয়ই স্থানীয় বাজারগুলিতে কেনা-বেচা হতো। এসব বাজারের ওপর বিদেশী বণিকদের সরাসরি কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল বলে মনে হয় না। যেখানে সাধারণ মানুষ তাদের পণ্য বিনিময় করতে আসত সে স্থানীয় বাজারসহ মহাজন, পোদ্দার এবং বণিকরা দেশীয় সাহিত্যে বারংবার উল্লিখিত হয়েছে।[৭০] এ আমলের ব্যাপক সামুদ্রিক বাণিজ্যের তুলনায় অন্তর্বাণিজ্যকে তুচ্ছ বলে মনে হয়। স্থানীয় ব্যবসায়ীরা সম্ভবত বিদেশী বণিকদের কাছে তৈরি পণ্য দ্রব্য সরবরাহ করতেন।

বার্বোসা উপকূলীয় অঞ্চলগুলি বিশালসংখ্যক মুসলমান অধিবাসী দ্বারা পূর্ণ দেখেছিলেন যারা স্পষ্টত ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত ছিল। 'বেঙ্গালা' নগরীর বৃহৎ আয়তন, সম্পদ এবং আবহাওয়ায় আকৃষ্ট হয়ে বহু আরবদেশীয় পারস্যবাসী, আবিসিনীয় এবং ভারতীয় বণিক সেখানে এসে হাজির হয়েছিলেন। "মক্কার কায়দায়" তাদের বড় বড় জাহাজ ছিল যার দ্বারা তারা বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করছিল। তারা এদেশের বহু পণ্যদ্রব্য "করমণ্ডল, মলক্কা, চমাত্রা, পীগু, ক্যামবায় এবং সীলাম" এ নিয়ে যেত।[৭১] ভার্থেমা "বাঙ্গেলা নগরীর" সবচেয়ে ধনী বণিক "এবং এর সূতি ও রেশমি কাপড়, যা "সারা তুরস্ক, সিরিয়া, পারস্য, আরব, ইথিওপিয়া এবং ভারতে যেত" তার উল্লেখ করেছেন।[৭২] বাংলার বাণিজ্যের মোট পরিমাণ সম্পর্কে বলতে গিয়ে জোয়াও দ্য ব্যারোস দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন যে, "তাঁর (গুজরাটের বাহাদুর শাহ) এবং নরসিংগার (বিজয়নগর) রাজার সম্মিলিতভাবে যা ছিল বেঙ্গালার রাজার একারই তা ছিল"।[৭৩] এভাবে বিদেশী পর্যটকরা পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে বাংলার সামুদ্রিক বাণিজ্যের গৌরবের প্রতি নির্দেশ করেছেন। এসব প্রতিবেদনের একটি সুস্পষ্ট সমর্থন আমরা পাই পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাংলায় আগত চৈনিক পর্যটক মা-হুয়ানের বিবরণে। তিনি মন্তব্য করেছেন "ধনীরা জাহাজ নির্মাণ করে সেগুলি দিয়ে বিদেশীদের সাথে ব্যবসা করে; বহুলোক বাণিজ্যে লিপ্ত রয়েছে...."।[৭৪] বিজয়গুপ্ত ও বিপ্রদাসের সহ প্রায় সব মনসা-মঙ্গলেই, বর্ণিত নায়কদের বহুপৃষ্ঠাব্যাপী বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডের বিবরণ রয়েছে। এসব কবিদের ব্যবহৃত কবিসুলভ কল্পনা ও কাল্পনিক অতিশয়োক্তি যথেষ্ট পরিমাণে বাদ দিলেও এটা প্রায় নিশ্চিত বলে মনে হয় যে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে বাংলা এক বাণিজ্যিক সংশ্রব বিস্তার করেছিল। রালফ ফিচের বর্ণনানুযায়ী সোনার গাঁয়ের সুতিবস্ত্র ও চাল ভারত, শ্রীলঙ্কা, পেগু, মলাক্কা, সুমাত্রা এবং অন্যান্য দেশে রপ্তানি করা হতো।[৭৫] মার্কো পলো ও ইবনে বতুতা মধ্যযুগীয় বাংলার বাণিজ্যিক অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি স্ব-চক্ষে দেখেছিলেন। আবার, কবিকঙ্কণ বলেছেন যে, বাংলার বণিকরা উৎকল ও করমণ্ডল উপকূল হয়ে শ্রীলঙ্কা

ও গুজরাটে গিয়েছিলেন এবং মগধ, মথুরা, বিজয়নগর এবং মারাঠা অঞ্চল তাদের অজানা ছিল না।[৭৬]

বিদেশী পর্যটকদের বিবরণগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে চাল, গম, সুতিবস্ত্র, রেশমিবস্ত্র এবং চিনি বাংলার রপ্তানিপণ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।[৭৭] বিদেশে এগুলি অবিশ্বাস্যরকম উচ্চমূল্যে বিক্রি হতো। ভাসকো-ডা-গামা বলেছেন "স্থানীয়ভাবে যে কাপড় ২২ শিলিং ৬ পেন্সে বিক্রি হয় কালিকটে তার মূল্য ৯০ শিলিং"।[৭৮] বার্বোসাও একই ধরনের মত ব্যক্ত করেছেন : "... এক কুইন্টাল চিনির দাম মালাবারে এক হাজার তিন শত রি, সর্বোৎকৃষ্ট একটি চৌতরের দাম ছয় শত রি, একটি সিনবফের দাম দুই ক্রুজদো এবং সর্বোৎকৃষ্ট এক খণ্ড বিটিলহর দাম তিনশত রি; ফলে যারা এগুলি ঐ স্থানে নিয়ে যেত তারা সেগুলি বিক্রি করে প্রচুর লাভ করত"।[৭৯] এখানে উল্লিখিত ওজন ও মুদ্রা পর্তুগিজ হওয়ায় সন্দেহ নেই যে বার্বোসা কর্তৃক উল্লিখিত পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করা দুঃসাধ্য। কিন্তু এ সম্পর্কে একটি মোটামুটি ধারণা লাভের চেষ্টা করা যেতে পারে। এক কুইন্টাল ছিল সাধারণত ১২৮ পাউন্ডের সমান।[৮০] ষোড়শ শতকে ইউল এক রির যে মূল্য আরোপ করেছেন সে মূল্যমান অনুযায়ী ক্রুজদো নামের এক ধরনের পর্তুগিজ মুদ্রা ছিল ৪২০ রির সমান যার মূল্য ৯ শিলিং।[৮১] রপ্তানিকৃত পণ্যগুলির মূল্য আধুনিক মুদ্রায় পরিবর্তন করে বর্তমান ওজনের মান অনুযায়ী সেগুলির বর্তমান মূল্য নির্ধারণ করা যেতে পারে। নিচের সারণিতে সেটা দেখানো হলো—

সারণি

পণ্যদ্রব্য	পর্তুগিজ ওজন বা মাপ	বর্তমান ওজন	পর্তুগিজ মূল্য	বর্তমান মূল্য
চিনি	১ কুইন্টাল	১২৮ পাউন্ড	১৩০০ রি	প্রায় ১ পাঃ ৮ শিঃ
চৈতর	২০ পর্তুগিজ গজ × ৩ বা ৪ পর্তুগিজ গজ		৬০০ রি	প্রায় ১৩ শিঃ
সিনবফ	"		২ ক্রুজদো বা ৮৪০ রি	প্রায় ১৮ শিঃ
বিটিলাহ	"		৩০০ রি	প্রায় ৬$\frac{১}{২}$ শিঃ

এ ছিল মালাবারে বিক্রিত বাংলার পণ্যের মূল্য যা নিশ্চিতভাবেই বাংলায় আরও কম ছিল। বাংলায় এ পণ্যগুলির মূল্য সম্পর্কে কোনো সঠিক ধারণা গঠন করা না গেলেও এক ধরনের অস্পষ্ট অনুমান করা সম্ভব। ভাসকো-ডা-গামার উক্তি থেকে দেখা যায় যে, যে কাপড় বাংলায় ২২ শিলিং এ বিক্রি হতো কালিকটে সেটার মূল্য ছিল ৯০ শিলিং। ফলে কালিকট ও বাংলায় এর মূল্যের অনুপাত ছিল প্রায় ৪:১। অন্যান্য পণ্য সম্পর্কেও এ

অনুপাত প্রযোজ্য ছিল কিনা তা আমরা জানি না।

বাংলার আমদানি পণ্যের মধ্যে আবুল ফজল লবণ, হীরা, পান্না, মুক্তা, বহুমূল্যবান পাথর এবং আকিক-এর উল্লেখ করেছেন।[৮২] এ তালিকা সেকালের মনসা-মঙ্গল কাব্যগুলিতে পাওয়া তালিকা থেকে খুব একটা ভিন্নতর নয়। পরবর্তী এক শাখায় আমরা দেখিয়েছি যে বাংলার শিল্পজাত দ্রব্যও ছিল যার কোনো কোনোটি নিশ্চয়ই বিদেশে রপ্তানি করা হতো।

বাংলার অর্থনৈতিক জীবনের এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল খোজা ও ক্রীতদাস ব্যবসা, বার্বোসা, ইবনে বতুতা এবং মার্কোপলো পরোক্ষভাবে যার উল্লেখ করেছেন।[৮৩] মুসলমান ব্যবসায়ীরা দেশীয় বালকদের ক্রয় করে তাদের খোজা করার পর উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের বিক্রি করত। কখনো কখনো তারা তাদেরকে তাদের নিজেদের হারেম ও ভূ-সম্পত্তির কাজে নিযুক্ত করতেন। এ ক্রীতদাসদের কেউ কেউ গভর্নর ও সেনাধ্যক্ষ রূপে মুসলমান সুলতানদের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কাজ করেছিলেন।[৮৪]

ভার্থেমার বিবরণের সঙ্গে বার্বোসার বিবরণ একসঙ্গে বিবেচনা করলে দেখা যায় যে তখনকার দিনে দু'টি প্রধান সমুদ্র পথ ছিল। এগুলির একটি ব্রহ্মদেশ, আরাকান, পেগু, আভা, শ্যাম, মলাক্কা, সুমাত্রা, সুন্দ, জাভা, মশলা দ্বীপপুঞ্জ, সেলিবিস, বোর্নিও এবং চম্পা হয়ে দক্ষিণ পূর্ব দিকে চীন পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।[৮৫] অন্য পথটি ছিল দক্ষিণ-পশ্চিমামুখী যা উড়িষ্যা, করমণ্ডল, শ্রীলঙ্কা এবং মালাবার উপকূল অতিক্রম করে পারস্য উপসাগর ও আরব সাগর হয়ে আরব ও আবিসিনিয়া যেত।[৮৬] চট্টগ্রাম দিয়ে বাংলায় প্রবেশ করে সমুদ্রগামী জাহাজগুলি মেঘনার গতিপথ ধরে সম্ভবত সোনারগাঁও পর্যন্ত যেতে পারত। ইবনে বতুতা এবং পঞ্চদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বাংলার সুলতানদের দরবারে আগত চৈনিক দূতরাও এ পথই অনুসরণ করেছিলেন।[৮৭] এ পথগুলি এটাই নির্দেশ করে যে বাংলার পণ্যাদি এসব পথিপার্শ্বস্থ দেশগুলিতে যেত। সুতরাং বাংলার পণ্যের বাজার ছিল আবিসিনিয়া থেকে চীন পর্যন্ত বিস্তৃত। যে সব স্থলপথে বাংলার পণ্য বাইরে যেতে পারত এ প্রসঙ্গে সে পথের তুলনামূলক গুরুত্বহীনতা যে কোনো ব্যক্তিরই নজরে পড়তে পারে। এখানে একটি ব্যাখ্যা সম্ভাব্য মনে হতে পারে। রাজনৈতিকভাবে বাংলা ছিল তার প্রতিবেশী দেশগুলি থেকে বিচ্ছিন্ন এবং তাদের সাথে বাংলার সম্পর্ক মোটেই বন্ধুত্বসুলভ ছিল না। সম্ভবত প্রতিবেশী শাসকদের শত্রুতা হোসেন শাহীদের সন্নিহিত এলাকার মধ্যদিয়ে কোনো স্থল-পথ খোলার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বস্তুত সামুদ্রিক বাণিজ্যই ছিল দেশের অর্থনৈতিক জীবনের মূল বৈশিষ্ট্য।

বাংলায় বহু বন্দর ও নগরী ছিল সেগুলি তার সামুদ্রিক বাণিজ্যকে বহুলাংশে সহজ করে ছিল। প্রাচীন তাম্রলিপ্তির স্থান দখল করেছিল সপ্তগ্রাম এবং এটা ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত নিরবিচ্ছিন্নভাবে এক অনুপম স্থান দখল করেছিল। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে এর সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। হোসেন শাহের সমসাময়িক কবি বিপ্রদাস সপ্তগ্রামের ধর্মীয় পবিত্রতা ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির বর্ণনা দিয়েছেন।[৮৮] চৈতন্য-ভাগবতের রচয়িতা বৃন্দাবন দাস প্রসঙ্গক্রমে সপ্তগ্রামের বণিক-সম্প্রদায়ের উল্লেখ করেছেন।[৮৯] রালফ

ফিচের বর্ণনা থেকে দেখা যায় যে ষোড়শ শতাব্দীর শেষ চতুর্থাংশ পর্যন্ত এ শহরে আরব বণিকরা আসত।[৯০] সীজার ফ্রেডারিক ১৫৬৭ সালে বাংলায় এসেছিলেন। তিনি বলছেন "সাতগাঁও বন্দরে প্রতি বছর ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশটি ছোট-বড় জাহাজ চাল, জমকালো বিভিন্ন ধরনের বস্ত্র, লাক্ষা, প্রচুর পরিমাণ চিনি, শুকনো হরীতকী, মরিচ, তিলের তেল ও অন্যান্য নানান ধরনের পণ্য বোঝাই করা হতো"।[৯১] বস্তুত তখনকার দিনে প্রাচীন সপ্তগ্রাম নগরী ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ নদী বন্দর। এর বাণিজ্যিক গুরুত্ব বিবেচনা করে পর্তুগিজরা একে ক্ষুদ্র পোতাশ্রয় নামে আখ্যায়িত করেছিল। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে সপ্তগ্রামের নিকটবর্তী নদীগর্ভ শুকিয়ে যায় যার ফলে জোয়াও দ্য ব্যারোস এ বন্দরকে "জাহাজের প্রবেশ ও প্রস্থানের জন্য তেমন সুবিধাজনক নয়" রূপে দেখতে পেয়েছিলেন।[৯২] সুতরাং হুগলী ক্রমান্বয়ে সাতগাঁওয়ের স্থান দখল করে নেয় এবং সেখানে পর্তুগিজরা আসতে শুরু করে। ইবনে বতুতা, মাহুয়ান এবং রালফফিচ সোনারগাঁওয়ে এসেছিলেন এবং এখান থেকে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে চাল এবং সুতিবস্ত্র রপ্তানি করা হতো। চট্টগ্রামের অধিকার নিয়ে বাংলা, ত্রিপুরা এবং আরাকানের শাসকদের মধ্যে বিবাদ থাকায় বাংলার বাণিজ্যিক জীবনে এর অবস্থান ছিল অনিশ্চিত। কিন্তু পর্তুগিজদের জন্য এর গুরুত্ব ছিল অনুপম। পরবর্তীকালে তারা এটাকে প্রধান পোতাশ্রয় নামে আখ্যায়িত করেছিল। চট্টগ্রাম ও সাতগাঁওয়ের লোভনীয় অবস্থান পর্তুগিজদের লোলুপ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। হোসেন শাহী আমলের শেষদিকে তারা এগুলির শুল্ক-ভবনগুলি নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করেছিল। জোয়াও দ্য ব্যারোসের মানচিত্রে সাতগাঁও, সোনারগাঁও ও চট্টগ্রামের অবস্থান স্পষ্টভাবে নির্দেশিত রয়েছে। ভনডেন ব্রুক ও রেনেলের মতো পরবর্তী মানচিত্রকরদের মানচিত্রে প্রাপ্ত শ্রীপুর সম্ভবত ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগেই বিখ্যাত বাণিজ্য-কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। বাংলার অর্থনৈতিক জীবনে উর্বর ও বিস্তীর্ণ পশ্চাদ্ভূমি সহ এসব সমৃদ্ধিশালী নগরীর ভূমিকা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। বিশ্বের দূরবর্তী অঞ্চলগুলির সঙ্গে এ নগরীগুলি বাংলার অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক যোগসূত্র বজায় রেখেছিল।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বাংলার সামুদ্রিক বাণিজ্য সম্পূর্ণভাবে স্থানীয় বণিকদের হস্তচ্যুত হয়ে যায় এবং এটা হয়ে পড়ে সম্পূর্ণভাবে আরব ও পারস্যদেশীয় বণিকদের নিয়ন্ত্রিত যারা পূর্ব সাগরের নৌ-পরিবহণের প্রায় সম্পূর্ণ একচেটিয়া অধিকার ভোগ করছিল। এসব বণিকরা বাংলা ও পারস্যপোসাগরীয় উপকূলীয় অঞ্চলের মধ্যে সামুদ্রিক যোগাযোগ রক্ষা করছিল এবং তারা এ দেশের পণ্য পূর্বদিকে চীন পর্যন্ত এবং আরবদেশ ও আবিসিনিয়ায়ও নিয়ে যেত। পরবর্তীকালে তারা পর্তুগিজ ও ইউরোপীয় অন্যান্য বণিকদের দ্বারা পরাভূত হয়। আরব ও পারস্যবাসীদের প্রধানত বাংলার নগরীগুলিতে দেখা যেত বার্বোসার এ উক্তি এ ইঙ্গিত দেয় যে তখন পর্যন্ত তারা পর্তুগিজদের দ্বারা স্থানচ্যুত হয় নি যাদের বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে গতিশীল হয়ে উঠেছিল। ১৫১৭ থেকে ১৫৩৮ সালের মধ্যবর্তী সময়কাল বাংলার সুলতানদের ও পর্তুগিজদের মধ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ সংঘাত দ্বারা চিহ্নিত। পর্তুগিজরা এ দেশে প্রতিষ্ঠালাভের জন্য অবিরাম চেষ্টা করছিল। ১৫৩৬ সাল এদেশের বাণিজ্যিক

ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এ বছর মার্টিম অ্যাফোন্সো দ্য মেলো তদানীন্তন সুলতান ৩য় গিয়াসউদ্দীন মাহমুদ শাহের কাছ থেকে চট্টগ্রাম ও সাতগাঁওয়ে কুঠি নির্মাণের এবং বন্দরের শুল্ক-ভবনগুলি নিয়ন্ত্রণের অনুমতি লাভ করেছিলেন। পর্তুগিজ বণিকরা জমিও পেয়েছিলেন যা শেষপর্যন্ত তাদের এদেশে কর আদায়ের সুবিধা দিয়েছিল।[৯৩] এভাবে হোসেন শাহী আমলের বাংলা সেই অনিবার্য ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার সূচনা করেছিল যা শেষ পর্যন্ত সামুদ্রিক বাণিজ্যে আরবদের প্রাধান্যের সমাপ্তি ঘটায় এবং ভারতে ইউরোপীয় বাণিজ্যিক জাতি হিসেবে পর্তুগিজদের বিকাশকে ত্বরান্বিত করে। আরবরা অবশ্য কর্মক্ষেত্র থেকে সম্পূর্ণভাবে অন্তর্হিত হয়ে যায়নি, পর্তুগিজ কর্মকাণ্ডও কোনো তাৎপর্যপূর্ণ গুরুত্ব ধারণ করে নি। পর্তুগিজ বসতিগুলির বিকাশ ঘটেছিল পরবর্তীকালে।

৪.

উপরে আলোচিত বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড থেকে এদেশের শিল্পের বিকাশ অনুমান করা যায়। বস্তুত বস্ত্র, চিনি, ধাতু-শিল্প, পাথর-খোদাই এবং জাহাজ নির্মাণের মতো শিল্পে বাংলা যথেষ্ট উন্নতি করেছিল।

বাংলায় তৈরি বস্ত্রের বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্য বিদেশী পর্যটকদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য যথেষ্ট ছিল। তাঁরা দেশে প্রচলিত বস্ত্র সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য সরবরাহ করেছেন। বার্বোসা পর্তুগিজ মহিলাদের শিরোভূষণ রূপে ব্যবহৃত এবং আরব ও পারস্যদেশীয়দের পাগড়ি হিসেবে ব্যবহৃত এস্ট্রাভান্টেজ এবং মাসোনা, দোগজা, চৌতর, সিনবফ ও বিটিলহার মতো বিভিন্ন রকমের সূক্ষ্ম বস্ত্র দেখেছিলেন। এ সব বস্ত্রখণ্ডের প্রতিটি ছিল প্রস্থে ৩ বা ৪ ও দৈর্ঘ্যে ২০ পর্তুগিজ গজ।[৯৪] এসব বস্ত্র শনাক্ত করা মুশকিল হলেও এখানে পরীক্ষামূলকভাবে ইঙ্গিত করা যেতে পারে যে এসব নাম দিয়ে যথাক্রমে সিরবন্দ, মলমল বা মসলিন, দুগজী কাপড়, চাদর, সিনাবন্দ এবং বুটিদারকে বুঝানো হয়েছে।[৯৫] ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দশকে বাংলা সম্পর্কে বিবরণদানকারী ভার্থেমা বৈরাম, মামোন, লিজতি, সিয়ানতর দোয়াজর এবং সিনবফের মতো বিভিন্ন ধরনের বস্ত্রের উল্লেখ করেছেন।[৯৬] এ নামগুলির অধিকাংশই বার্বোসা যা দেখেছিলেন, ধ্বনিতত্ত্বের দিক থেকে তার অনুরূপ। চৈনিক পরিব্রাজকরা পি-চিহ, মন-চেতি, শা-না-কিহ, হিন-পি-তুং-তা-লি, শা-তা-উর এবং মোহ-হি-মো-লে নামে পরিচিত বহুধরনের মিহি সুতিবস্ত্রের উল্লেখ করেছেন।[৯৭] অন্যান্য বিদেশী পর্যটকদের মধ্যে যারা প্রসঙ্গক্রমে মধ্যযুগের বাংলার সূতী বস্ত্রের উল্লেখ করেছেন তাদের মধ্যে মার্কোপলো, ইবনে বতুতা এবং সীজার ফ্রেডারিকের নাম উল্লেখযোগ্য।[৯৮] আবুল ফজল আমাদের জানাচ্ছেন যে, বারবকাবাদ সরকারে "গঙ্গাজল নামে মিহি কাপড়" তৈরি হতো এবং সোনারগাঁও সরকারে "প্রচুর পরিমাণে অত্যন্ত মিহি এক ধরনের মসলিন" তৈরি হতো।[৯৯] মনে হয় পাটের সুতা থেকেও অন্য একধরনের বস্ত্র-সামগ্রী তৈরি হতো। সেকালের বাংলা সাহিত্যে বারংবার উল্লিখিত পাটনেতা ও পাটের পাচরার[১০০] মতো শব্দগুলি ইঙ্গিত দেয় যে অন্যান্য ধরনের আরও অনেকগুলির মতো এ বস্ত্র-সামগ্রীগুলিও সম্ভবত পাট থেকে তৈরি করা হতো। আবুল ফজল

নির্ভরযোগ্য হলে[১০১] ঘোড়াঘাট সরকারে চট তৈরি হতো। পর্যালোচনাধীন সময়কালে রেশম শিল্পের যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছিল বলে মনে হয়। মাহুয়ান পঞ্চদশ শতাব্দীর বাংলার গুটিপোকা ও রেশমি বস্ত্রের উল্লেখ করেছেন।[১০২] ভার্থেমা রেশমি বস্ত্রকে এদেশের অন্যতম প্রধান রপ্তানিদ্রব্য হিসেবে উল্লেখ করেছেন।[১০৩] মনে হয় যে ঘোড়াঘাট সরকার তার রেশমি পণ্যের জন্য যথেষ্ট প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিল।[১০৪]

কাজেই এটা মোটামুটি নিশ্চিত যে বস্ত্র শিল্প-কেন্দ্র হিসেবে বাংলা যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। দেশের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে যে তূলা উৎপন্ন হতো[১০৫] সেগুলি দিয়ে সাধারণত স্থানীয় কারিগররা পণ্য-দ্রব্য তৈরি করত। স্থানীয় ও বিদেশী বণিকদের সঙ্গে এ কারিগরদের সম্পর্কের বিষয়ে কোনো কিছু স্পষ্টভাবে জানা যায় না। সাধারণত "পুরুষরা চর্কায় সুতা কেটে কাপড় বুনত।"[১০৬] কুটির শিল্পজাত দ্রব্য দেশে সমৃদ্ধিলাভ করেছিল এবং এগুলি শুধু স্থানীয় জনগণের প্রয়োজনই মিটাতো না, বরং বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে সেগুলি রপ্তানি করে স্থানীয় ব্যবসায়ীরা যথেষ্ট লাভও অর্জন করতে সক্ষম হতো।[১০৭]

চিনি উৎপাদনের প্রক্রিয়া মনে হয় দেশের সর্বত্র জানা ছিল। স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত আখ থেকে যে চিনি এখানে তৈরি হতো তা ছিল ধবধবে সাদা এবং উন্নতমানের। এটাকে দানা বাঁধানোর উপায় তারা জানত না; কাজেই "গুঁড়ো হিসেবেই তারা এটাকে ভালভাবে সেলাই করা কাঁচা চামড়ার মোড়কে ভরে" মালাবার এবং ক্যাম্বেসহ বিভিন্ন দেশে পাঠাত যেখানে এগুলি চড়া দামে বিক্রি হতো।[১০৮] দেশের অন্ততপক্ষে কিছু অঞ্চলে ধাতুশিল্প নিশ্চয়ই সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। আবুল ফজল বলছেন যে সরকার বাজুহাতে লোহার খনি ছিল।[১০৯] এ সব খনি কতটা কার্যকর ছিল আমরা তা না জানলেও এটা মোটামুটি নিশ্চিত বলে মনে হয় যে কামার ও স্বর্ণকাররা নিজেরাই এক একটি স্বতন্ত্র অর্থনৈতিক শ্রেণী গঠন করেছিল। কৃষিকাজে ব্যবহৃত সরঞ্জামাদি তৈরি এবং মেরামতের জন্য বাংলার কৃষিজীবীদের নিশ্চয়ই কামারের সাহায্যের প্রয়োজন ছিল। রঙিন জিনিসপত্র, উন্মুক্ত গোলাকার জলপাত্র, ইস্পাতের বন্দুক, বাটি, ছুরি এবং কাঁচির মতো জিনিস মাহুয়ান খোলা বাজারে বিক্রি হতে দেখেছিলেন।[১১০] বিদেশী বিবরণ ও বাংলা সাহিত্যে মহিলাদের পরিহিত বিভিন্ন রকমের সোনার অলঙ্কারের স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে।[১১১] ফিরিশতা বলেছেন যে বাংলার ধনী ব্যক্তিরা শুধু স্বর্ণপাত্র ব্যবহারই করতেন না। মাঝে মাঝে সামাজিক অনুষ্ঠানাদি উপলক্ষে এগুলি প্রদর্শন করাকে তাঁরা সম্মানজনক বলে মনে করতেন।[১১২] এ বিবরণের সুস্পষ্ট অতিরঞ্জনসমূহ বাদ দিলেও যুক্তিসঙ্গতভাবেই এ অনুমান করা চলে যে অলঙ্কারাদি তৈরি যথেষ্টসংখ্যক লোকের পেশা ছিল।

পাথরখোদাই শিল্প যথেষ্ট উৎকর্ষ লাভ করেছিল বলে মনে হয়। হোসেন শাহীদের অসংখ্য লিপির সুন্দর লিখনরীতি এবং সুচারু সম্পাদন থেকে ভাস্করদের শিল্পনৈপুণ্যের শিল্পিত রূপ প্রকাশ পায়। গৌড় ও পাণ্ডুয়ায় হোসেন শাহীদের ইমারতগুলিতে পাথরের ব্যবহার এবং সেগুলিতে পোড়ামাটির অলঙ্করণ[১২৩] নিঃসন্দেহে একদল ভাস্করের অস্তিত্বের সাক্ষ্য প্রদান করে। আলোচ্য আমলে ইটের তৈরি অসংখ্য ইমারত নিশ্চয়ই অনেক রাজমিস্ত্রির জন্য কাজ যুগিয়েছিল।

মাদুর ছিল আর একটি অপ্রধান স্থানীয় উৎপন্ন দ্রব্য যা মাঝে মাঝে বোনা "রেশমের" অনুরূপ মনে হতো।[১১৪] বাংলা সাহিত্যে প্রায়ই লোহিত পাটি বা লাল মাদুর ও শীতল-পাটি বা শীতল মাদুরের উল্লেখ দেখা যায়।[১১৫] গাছের বাকল থেকে তৈরি সাদা কাগজকে হরিণের চামড়ার মতো মসৃণ ও উজ্জ্বল দেখাত।[১১৬] মাদুর ও কাগজ তৈরি কোনো শিল্পের প্রকৃতি ও আকার ধারণ করেছিল কিনা তা আমরা জানি না।

জাহাজ-নির্মাণ, মনে হয়, একটি উল্লেখযোগ্য শিল্পে পরিণত হয়েছিল। বাংলায় সমুদ্রগামী জাহাজ তৈরি হতো।[১১৭] সরকার বাজুহার বিস্তীর্ণ অরণ্য থেকে "লম্বা ও পুরু কাঠ" পাওয়া যেত যা দিয়ে মাস্তুল তৈরি করা যেত।[১১৮]

সুতরাং এটা স্পষ্ট যে দেশের ব্যাপক বাণিজ্য অনেকাংশে আলোচ্য সময়কালে বাংলায় প্রস্তুত শিল্পজাত দ্রব্যের ওপর নির্ভরশীল ছিল।

৫.

সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে দ্রব্য-বিনিময় প্রথা ক্রমশ অপসৃত হয় এবং মুদ্রা এর স্থান দখল করে। মঙ্গল কাব্যগুলি বলছে যে এটা এদেশে সর্বজনীনভাবে প্রচলিত ছিল। এ মত যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয় না। মাহুয়ান বাংলায় তঙ্কা নামে আখ্যায়িত রূপার মুদ্রা এবং কড়ির ব্যাপক প্রচলন দেখেছিলেন। তিনি বলছেন, "বড় বড় সব বাণিজ্যিক লেনদেন এ মুদ্রার সাহায্যে করা হয়। কিন্তু অল্পমূল্যের জিনিস কেনার জন্য তারা বিদেশীদের কওলি নামে অভিহিত একরকম সামুদ্রিক খোলা ব্যবহার করে।"[১১৯] পঞ্চদশ শতাব্দীর বাংলার মুদ্রা সম্পর্কিত এ দ্ব্যর্থহীন উক্তির সরাসরি বিরোধিতার মুখে দেশীয় সাহিত্য থেকে পাওয়া তথ্য বিশ্বাস করা যায় না। মনে হয় কবিরা শুধুমাত্র দূর অতীতের স্মৃতিকে অনুকরণ করেছেন। বস্তুত হোসেন শাহী সুলতানদের বহুসংখ্যক টাকশাল শহরগুলি থেকে পাওয়া বিভিন্ন আকার ও ওজনের মুদ্রা উৎকীর্ণ করা হয়েছিল। সর্বনিম্ন মূল্যের মুদ্রার প্রতীক ছিল কড়ি যা অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রচলিত ছিল এবং উনবিংশ শতাব্দীর শেষপর্যন্ত গ্রামাঞ্চলে এর ব্যবহার অব্যাহত ছিল। জিনিসপত্রের দাম সস্তা থাকায় কড়ির ব্যবহার সহজেই ব্যাখ্যা করা যায়। জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি কেনার জন্য জনগণকে রূপার মুদ্রাও (যার মূল্য নিঃসন্দেহে অধিকতর ছিল) ব্যবহার করতে হতো না। দৈনন্দিন ব্যাপারে কড়ির ব্যবহার অত্যন্ত সুবিধাজনক হওয়ায় মুদ্রার ব্যবহার নিশ্চয়ই ছিল অত্যন্ত সীমিত। মাহুয়ান যেমন উল্লেখ করেছেন যে একমাত্র অভ্যন্তরীণ ও বহির্বাণিজ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত বড়-সড় লেন-দেনেই মুদ্রা ব্যবহার করা হতো।

কড়ির গণনায় এ রকম পদ্ধতি অনুসরণ করা হতো : চার কড়িতে এক গণ্ডা, পাঁচ গণ্ডায় এক বুড়ি, চার বুড়িতে এক পণ, ষোল পণে এক কাহন এবং দশ কাহনে এক টাকা। এ পদ্ধতি কেবলমাত্র আবুল ফজলের আইনে প্রদত্ত উড়িষ্যার বিবরণেই পাওয়া যায় না[১২০], বাংলার অপ্রচলিত পাটিগাণিতিক সারণিতেও এটা দেখতে পাওয়া যায়। দেশীয় সাহিত্য[১২১] প্রসঙ্গক্রমে এ পদ্ধতির উল্লেখ করেছে। আবুল ফজল ১৭২.৮ গ্রেন ওজনের টাকা অথবা সামান্য বেশি ওজনের আফগান মুদ্রার কথা উল্লেখ করেছেন সেটা অবশ্য

পরিষ্কার নয়। কড়িকে যে একটা,নির্দিষ্ট অনুপাতে রূপার মুদ্রার সাথে সমীকরণ করা হতো তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বাংলা কাব্যগুলিতে টাকা এবং আনার উল্লেখ রয়েছে।[১২২] শেষোক্তটির নিম্নমূল্যবিশিষ্ট কোনো ধাতব মুদ্রার আকারে অস্তিত্ব ছিল বলে মনে হয় না। খুব সম্ভবত এটা ছিল কড়িতে গোনা[১২৩] একটা একক যা দিয়ে একটা গোটা টাকাকে ষোলটি সমান ভগ্নাংশে ভাগ করা যেত। প্রাক-মোগল আমলে আধ-টাকা ও সিকি-টাকার মতো মুদ্রার দুষ্প্রাপ্যতা এবং এক আনা মুদ্রার সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি এ অনুমানকে জোরদার করে। আগেই যেমন নির্দেশ করা হয়েছে, মধ্যযুগের বাংলার মুদ্রা-ব্যবস্থায় কড়ির সচরাচর প্রচলন নিম্নমানের মুদ্রা উৎকীর্ণ করাকে অনাবশ্যক করে তুলেছিল।

হোসেন শাহী সুলতানরা বহু রূপার মুদ্রা এবং মাত্র কয়েকটি সোনার মুদ্রা উৎকীর্ণ করেছিলেন। তামার মুদ্রা ছিল সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত। প্রাকমোগল বাংলার এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত বহুসংখ্যক মুদ্রার মধ্যে আমরা বারবক শাহের রাজত্বকালের শুধু একটি মাত্র তামার মুদ্রা পেয়েছি। কড়ি তামার মুদ্রার প্রতিনিধিত্ব করায় মনে হয় সুলতানদের তামার মুদ্রা উৎকীর্ণ করার কোনো প্রয়োজনই ছিল না।

হোসেন শাহী আমলে আকস্মিকভাবে রূপার মুদ্রার সরবরাহের প্রাচুর্য দেখা দিয়েছিল। এ সব মুদ্রার বিভিন্নতার প্রাচুর্য দেখে কেউ অবাক হতে পারে যা মনে হয় আগের আমলে ছিল না। নিঃসন্দেহে এটা ইঙ্গিত দেয় যে এ আমলে বহির্বাণিজ্য যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছিল। হোসেন শাহী সুলতানদের তিন রকমের রূপার মুদ্রা আছে, যার গড় ওজন হচ্ছে যথাক্রমে ১৬০ গ্রেণ, ৮০ গ্রেণ এবং ৪০ গ্রেণ। সুতরাং প্রথম ও দ্বিতীয় ধরনের মুদ্রার ওজনের অনুপাত হচ্ছে ২ : ১ এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় ধরনের মুদ্রার ওজনের ক্ষেত্রে এটা সমানুপাতিক। প্রথম ও তৃতীয় ধরনের মুদ্রার ওজনের অনুপাত হচ্ছে ৪ : ১। প্রথম ধরনের বহুসংখ্যক মুদ্রা পাওয়া যায় যাদের ওজন ১৪৮ থেকে ১৭০ গ্রেনের মধ্যে।[১২৪] দ্বিতীয় ও তৃতীয় ধরনের মুদ্রার সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম।[১২৫] মনে হয় যে এ তিন ধরনের মুদ্রা ছিল যথাক্রমে পূর্ণ, অর্ধ এবং সিকি টাকার প্রতীক। এ ভগ্নাংশগুলি নসরত শাহের রাজত্বকালে ৯২৫ হিজরি/১৫১৯ সালে হোসেনাবাদ টাকশাল থেকে উৎকীর্ণ করা হয়েছিল যাকে পরীক্ষামূলকভাবে গৌড়রূপে শনাক্ত করা হয়েছে। কি বিবেচনা অর্ধ ও সিকি টাকা উৎকীর্ণ করতে সরকারি সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করেছিল তা স্পষ্টভাবে জানা যায় না। নসরতের পূর্বসূরিদের মধ্যে একমাত্র ইলিয়াস শাহ অর্ধ টাকার মুদ্রা উৎকীর্ণ করেছিলেন যাতে ফিরুজাবাদ টাকশাল শহরের নাম রয়েছে এবং এর ওজন ছিল ৮৩-৮৪ গ্রেণ।[১২৬] এ ওজন থেকে দেখা যায় যে আলোচ্য মুদ্রাগুলি এবং নসরত শাহের ভগ্নাংশ মুদ্রাগুলি ছিল ১৭২.৮ গ্রেণ মান-ভিত্তিক। প্রাক-মোগল আমলের গোটা সময়কালেই স্বল্প-মূল্যের বিভিন্ন মুদ্রা উত্তর ভারতে প্রায় অব্যাহতভাবে প্রচলিত ছিল। রাজধানী নগরী ফিরুজাবাদ বা পাণ্ডুয়ার জনসাধারণের আর্থিক লেন-দেনের সুবিধার উদ্দেশ্যে মনে হয় ইলিয়াস শাহ অর্ধটাকা মুদ্রাগুলি উৎকীর্ণ করতে দিল্লির সুলতানদের ভগ্নাংশ মুদ্রাগুলি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। নসরত শাহ এ রীতি পুনরায় প্রবর্তন করেন এবং মনে হয়, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল অনুরূপ। কিন্তু মুদ্রার ক্ষেত্রে এ পরীক্ষা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় যার ইঙ্গিত

সুলতানদের ভগ্নাংশমুদ্রার দুষ্প্রাপ্যতা থেকে পাওয়া যায়।[১২৭] ফিরূজাবাদ ও হোসেনাবাদের জনসাধারণ কড়ির সঙ্গে এত বেশি পরিচিত ছিল যে ক্ষুদ্র মূল্যমানের মুদ্রার প্রতি তাদের উদাসীনতার যথেষ্ট কারণ ছিল।

নিচের সারণিতে পর্যালোচনাধীন সময়কালে প্রত্যেক সুলতানের উৎকীর্ণ মুদ্রা বা মুদ্রাগুলির সর্বোচ্চ ওজন দেখানো হলো :[১২৮]

সুলতান	সর্বোচ্চ ওজন	তারিখ	টাকশাল
হোসেন	১৬৭ গ্রেণ	৮৯৯ হিজরি	খাজাঞ্চিখানা
নসরত	১৬৫ গ্রেণ	৯২৫ হিজরি	হোসেনাবাদ ও ফতেহাবাদ
ফিরূজ গিয়াসউদ্দীন	১৬৪ গ্রেণ	৯৩৯ হিজরি	হোসেনাবাদ
মাহমুদ	১৭০ গ্রেণ	৯৩৫ হিজরি	হোসেনাবাদ

উপরের সারণিতে উদ্ধৃত মুদ্রাগুলির গড় ওজন ইংল্যান্ডের মণিকারদের ওজন অনুযায়ী প্রায় ১৬৬ গ্রেণ হওয়ায় এগুলি দিল্লির লোদীদের অনুরূপ মুদ্রার চেয়ে অনেকাংশে ভিন্নতর। লোদীদের মুদ্রার মান-ওজন ছিল সাধারণত ১৪৫ গ্রেন।[১২৯]

বহির্বাণিজ্যের ফলে এদেশে সোনাও আসছিল। হোসেন শাহের রাজত্বকালের দু'টি সোনার মুদ্রা আবিষ্কৃত হলেও[১৩০] সম্পূর্ণ হোসেন শাহী-পূর্ব আমলের মুসলিম বাংলার সোনার মুদ্রা আমরা পেয়েছি মাত্র পাঁচটি।[১৩১] হোসেন শাহী এ দু'টি মুদ্রার ওজন যথাক্রমে ১৭৬.৪ গ্রেণ ও ১৫৯ গ্রেণ। সুতরাং এ মুদ্রা দু'টির গড় ওজন হচ্ছে প্রায় ১৬৭ গ্রেণ। আমাদের হাতে উপাদানের অপ্রতুলতার কারণে সোনার ও রূপার মূল্যের অনুপাত নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। হোসেন শাহের উত্তরাধিকারীদের একটি সোনার মুদ্রাও আবিষ্কৃত হয় নি। এ আমলে সোনার মুদ্রার যে দুষ্প্রাপ্যতা আমরা দেখতে পাই তার কারণ এখানে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। এ সম্পর্কে দু'টি ইঙ্গিত দেওয়া সম্ভব। বাংলা ও তার প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে যে যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করছিল তার কারণে সম্ভাব্য যে জরুরি অবস্থার উদ্ভব হতে পারত তার মোকাবেলা করার জন্য সম্ভবত পরবর্তী হোসেন শাহী সুলতানরা সোনার মুদ্রা খাজাঞ্চিখানায় জমা রাখছিলেন। আবার এমনও হতে পারে যে সোনার অতিরিক্ত মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছিল। অন্যকথায়, সোনার মুদ্রার অভিহিত মূল্য ছিল এর অন্তর্নিহিত মূল্যের চেয়ে কম যার ফলে লাভের আশায় জনগণ এটাকে গলিয়ে ফেলছিল। সে ক্ষেত্রে সোনার চেয়ে রূপা ছিল সস্তা এবং রূপার মুদ্রা যা ছিল নিকৃষ্ট মুদ্রার প্রতীক, সেটা উৎকৃষ্ট মুদ্রাকে বিতাড়িত করেছিল। কিন্তু গ্রেশামের সূত্র সন্তোষজনকভাবে বাংলার পরিস্থিতির ব্যাখ্যাদান করে বলে মনে হয় না। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, ঐ আমলে জিনিসপত্র ছিল অত্যন্ত সস্তা। ইবনে বতুতার বিবরণে আমরা এটা দেখতে পাই এবং বাংলায় প্রাপ্ত কিছু জিনিসের মূল্য লক্ষ্য করার সুযোগ তাঁর হয়েছিল।[১৩২] এ সস্তা মূল্যের কারণে জনসাধারণ নিম্নতম মূল্যের মুদ্রা হিসেবে ব্যবহৃত কড়ি দিয়ে তাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি কিনতে পারত। সোনার মুদ্রা কেন স্বল্প সংখ্যায় উৎকীর্ণ করা হয়েছিল এ থেকেই তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এগুলির ব্যবহার ছিল নিশ্চয়ই অত্যন্ত বিরল। এগুলি স্মারকের

কাজ করত বলে মনে হয় কারণ তাঁর বাংলার সিংহাসনে আরোহণের স্মৃতিরক্ষার্থে ও উড়িষ্যা ও কামরূপের রাজাদের বিরুদ্ধে বিজয় জ্ঞাত করার উদ্দেশ্যে আলাউদ্দীন হোসেন শাহ এ ধরনের মুদ্রা উৎকীর্ণ করেছিলেন।[১৩৩] কাজেই উপরে পরিলক্ষিত সোনার মুদ্রার সীমিত ব্যবহার বাংলায় সোনার দুষ্প্রাপ্যতার ইঙ্গিত বহন করে বলে মনে হয় না, কারণ বহির্বাণিজ্য থেকে নিশ্চিতরূপেই দেশে বেশকিছু পরিমাণ সোনা ও রূপা এসেছিল। আগেই যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, পর্যালোচনাধীন সময়কালের সোনা ও রূপার মুদ্রাগুলি ছিল ১৭২.৮ গ্রেণ ওজনের মানে তৈরি। ১৭২.৮ গ্রেন ছিল ১০০ রতির সমান যা থেকে এ নির্দেশ পাওয়া যায় যে মূল্যবান ধাতুর ওজন করার জন্য ধান, রতি এবং মাষার[১৩৪] ব্যবহার হতো।

৬.

এ আলোচনা শেষ করার আগে বাঙালি জনগোষ্ঠীর এক বৃহৎ অংশ যেসব আর্থ-সামাজিক শ্রেণী নিয়ে গঠিত ছিল তাদের উল্লেখ করা প্রয়োজন। আমরা আগেই দেখেছি যে সম্পদের উৎপাদনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত কৃষকদের কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে এবং বড় জোতদার ও ভূমিহীন মজুর এদেশে অনুপস্থিত ছিল না। তাঁতি এবং বিভিন্ন ধরনের বস্ত্রের উৎপাদকের সংখ্যাও ছিল অনেক। তাঁতিরা মনে হয় গ্রাম-বাংলার মুসলমান জনসংখ্যার এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল।[১৩৫] অর্থনৈতিকভাবে ধনী না হলেও তারা ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ। পেশাগতভাবে কৃষির সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক ছিল না। মনসা-মঙ্গলের মুসলমান তাঁতি সুবোধন মিষ্টি আলু ও কচু সহ তার প্রয়োজনীয় সমস্ত দ্রব্যাদি ক্রয় করত। এসব উদ্ভিজ্জ দ্রব্য ক্রয় দু'টি বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে। তাঁতি সম্প্রদায় এত বেশি শিল্পায়িত হয়ে পড়েছিল যে তাদের রান্নাঘরের প্রয়োজনীয় সাধারণ এসব শাক-সব্জিও উৎপাদন করার কষ্ট তারা স্বীকার করত না। দ্বিতীয়ত, নিজেরা এসব উৎপাদন না করে এগুলি বাজার থেকে কেনার মতো ধনী হয়তো তারা ছিল। স্ত্রীর জন্য সুবোধনের বিলাস-সামগ্রী ক্রয় তাঁতি সম্প্রদায়ের তুলনামূলক সমৃদ্ধিরই ইঙ্গিত বহন করে। বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে বাংলা তখন কাপড় রপ্তানি করায় সে আমলে তাদের সমৃদ্ধি বোধহয় স্বাভাবিক ছিল। তাঁতিদের কাজে সে সম্প্রদায়ের মহিলাদের সাহায্যের দরকার হতো না।[১৩৬] এখানে অনুমান করা যেতে পারে যে তাঁতিরা এতই স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল যে তারা গৃহস্থালীর ব্যবস্থাপনা থেকে তাদের মহিলাদের নিজেদের জীবনের অর্থনৈতিক-সংগ্রামে টেনে আনার প্রয়োজন অনুভব করে নি। কবি কঙ্কণের আমলে শানাকর[১৩৭] বা তাঁত প্রস্তুতকারক নামে অভিহিত এক শ্রেণীর লোক তাদের তাঁত সরবরাহ করত। এরা মনে হয় এক অপ্রধান অর্থনৈতিক গোষ্ঠী তৈরি করেছিল। আমরা আগেই ধাতব শিল্পের বিকাশ লক্ষ্য করেছি। এতে নিশ্চয়ই স্বর্ণকার ও কামারের মতো বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের শ্রম জড়িত ছিল। সমসাময়িক দেশীয় সাহিত্যে চিত্রিত স্থানীয় বণিকরা তখনও সমাজের উঁচু শ্রেণীতে ওঠে নি এবং তখন পর্যন্ত তারা ছিল নিম্নশ্রেণীর সদস্য। এটা অত্যন্ত সম্ভাব্য যে এসব লোকই শিল্প-দ্রব্য উৎপাদনকারী ও বিদেশী বণিকদের মধ্যে যোগসূত্র হিসেবে কাজ করত।

ব্রাহ্মণরা পেশা হিসেবে শিক্ষকতা গ্রহণ করত। বিপ্রদাসের সপ্তগ্রামের ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের বর্ণনা থেকে স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে এ সম্প্রদায় দেব-দেবীর পূজা, দর্শনশাস্ত্রে জ্ঞান-লাভ ও শিক্ষাদানে নিয়োজিত ছিল এবং দারিদ্র্য ও দুঃখ কখনও এ সম্প্রদায়ের সদস্যদের জীবন স্পর্শ করতে পারত না।[১৩৮] বস্তুত পর্যালোচনাধীন সময়কালের কিছুসংখ্যক ব্রাহ্মণের সম্ভবত যথেষ্ট অর্থ ও প্রভাব ছিল। কায়স্থরা ছিল সুপ্রসিদ্ধরূপে কারণিক শ্রেণীর লোক। এরা যে কত নিষ্ঠার সঙ্গে শাসক শ্রেণীর সেবা করত তার বর্ণনা কৃষ্ণদাস কবিরাজ দিয়েছেন।[১৩৯] বৈদ্যরা পরম্পরাগতভাবে তাদের চিকিৎসা পেশা অনুসরণ করত। হিন্দু জনগোষ্ঠীর এক উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল ব্রাহ্মণ, কায়স্থ এবং বৈদ্যদের নিয়ে গঠিত এবং সমাজের নিম্নশ্রেণী, আজকের মতো তখনও, চাষী, জেলে, কাঠুরে, কুমার, নাপিত, ছুতার, গোয়ালা, ওঝা (সাপুড়ে যারা সর্প-দংশনের চিকিৎসাও করত), ঘটক এবং জ্যোতিষীদের নিয়ে গঠিত ছিল।[১৪০] এসব শ্রেণী আদিতে অর্থনৈতিক ভিত্তিতে গড়ে উঠলেও পরে মনে হয় যে বর্ণের চরিত্র ধারণ করেছিল। ইতোমধ্যে সমাজে মোল্লা নামক মুসলমান যাজক শ্রেণীর উদ্ভব ঘটেছে। তাদের কাজ ছিল মুসলমানদের ধর্মীয়-সামাজিক অনুষ্ঠানাদি পরিচালনা ও মুরগি জবাই করা এবং তাবিজ দেয়া। ফলে তারা অন্তত ধর্মীয় গ্রন্থ ও আচারাদি সম্পর্কে গভীর জ্ঞান সম্পন্ন রূপে বিবেচিত হতো।[১৪১] ষোড়শ শতাব্দীর বাংলার অসংখ্য অর্থনৈতিক শ্রেণীগুলির এক সামগ্রিক বিবরণ কবিকঙ্কণ দিয়েছেন। কবি কর্তৃক ব্যবহৃত এদের নাম ও নামকরণের পদ্ধতি আগের আমলে অজানা থাকলেও এটা অত্যন্ত সম্ভাব্য যে এসব হিন্দু ও মুসলমান, উভয় শ্রেণীরই, কোনো কোনোটি হোসেন শাহী আমলেও বিদ্যমান ছিল। আমাদের উল্লিখিত বিভিন্ন পেশাগত শ্রেণী স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে বাঙালি সমাজ পূর্ণ অর্থনৈতিক মর্যাদায় বিকশিত হচ্ছিল।

দেশের জনসংখ্যাকে উৎপাদক ও ভোক্তাশ্রেণীতে বিভক্ত করা একটি প্রচলিত রীতি। কিন্তু এ শ্রেণীকরণ অবৈজ্ঞানিক কারণ উৎপাদকরাও ভোক্তা, এবং যাদের ভোক্তা বলা যায় তারাও অন্তত পরোক্ষভাবে সম্পদ-সৃষ্টিতে সাহায্য করতে পারে। আলোচ্য আমলের উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তাদের অবিমিশ্র ভোক্তা শ্রেণীভুক্ত হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। কিন্তু আমাদের ভুলে যাওয়া উচিৎ নয় যে দেশে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রেখে এবং দক্ষতার সঙ্গে প্রশাসন পরিচালনা করে এসব কর্মকর্তা সম্পদ-সৃষ্টির উপযোগী একটা পরিবেশ তৈরি করেছিলেন। নিজ নিজ অধিকার ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে ব্রাহ্মণ, শিক্ষক ও স্থানীয় ভূ-স্বামীরা সম্পদ ভোগ করছিলেন। প্রত্যক্ষ উৎপাদকের চেয়ে এদের অবদান কম গুরুত্বপূর্ণ হলেও সম্পদ-সৃষ্টিতে কিন্তু তাদের পরোক্ষ অবদান উপেক্ষণীয় নয়। সরকারি রাজপথ, অট্টালিকা, সেতু ইত্যাদি নির্মাণের জন্য প্রচুর সংখ্যক স্থপতি ও রাজমিস্ত্রি নিয়োগ করে এবং বহু কবি ও জ্ঞানী ব্যক্তির পৃষ্ঠপোষকতা করে সুলতান ও গভর্নররা সম্পদের বিতরণে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করেছিলেন। তবুও ভোক্তা হিসেবে সুলতান ও তাঁর অভিজাতবর্গের অবস্থান লঘুভার করার মতো কিছু নেই। ব্যক্তিগত কর্মচারি, গৃহভৃত্য ও রক্ষিতাদের জন্য সুলতান নিশ্চয়ই বহু অর্থ ব্যয় করতেন। তাঁর সুশোভন দরবার,

সম্মানসূচক যেসব পোশাক তিনি উপহার দিতেন এবং উপাধি ও সম্মান যা তিনি রাজ্যের অভিজাত ও সম্মানিত ব্যক্তিদের মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রদান করতেন, সেগুলিও একইভাবে বহু ব্যয়বহুল ছিল। যদিও আমাদের হাতের উপাদানগুলি অভিজাতদের জীবন যাত্রার মান সম্পর্কে কোনো পরিষ্কার ধারণা দেয় না তবুও এটা মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে যে তাঁদের বিলাসবহুল জীবন-চর্যায় দেশের সম্পদের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ ব্যয় হতো।

বার্বোসা উচ্চবিত্ত ও নিম্নবিত্ত শ্রেণীর জীবনযাত্রার বর্ণনা দিয়েছেন। কিন্তু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষের অবস্থা সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণভাবে নীরব থেকেছেন। এ নীরবতার অর্থ এই নয় যে সে শ্রেণীর অস্তিত্ব ছিল না। আকবরের আমলের ভারতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষের "তুলনামূলকভাবে গুরুত্বহীনতা" মোরল্যান্ড লক্ষ্য করেছেন। তিনি অবশ্য স্বীকার করেছেন যে সম্ভবত এ তত্ত্ব বাংলার ব্যাপারে প্রযোজ্য নয়।[১৪২] মনে হয় আমাদের আলোচ্য আমলে সুপ্রতিষ্ঠিত একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণী ছিল। উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ও ভূ-স্বামীদের নিয়ে গঠিত ছিল উচ্চ-শ্রেণী; নিম্নশ্রেণীর অন্তর্গত ছিল চাষী, তাঁতি এবং অন্যান্য অনুল্লেখ্য অর্থনৈতিক শ্রেণীর পেশাজীবী মানুষ। ভূ-স্বামীরা ছিলেন ভূ-সম্পত্তির অধিকারী অভিজাত শ্রেণীর, ফলে তাঁরা উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের থেকে স্বতন্ত্র ছিলেন। বণিকরা, যারা সম্পদ পুঞ্জীভূত করেছিলেন এবং ব্রাহ্মণ ও শিক্ষকদের নিয়ে গঠিত ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণী যাদের অবস্থা দুর্দশাগ্রস্ত ছিল বলে মনে হয় না। নিঃসন্দেহে এ অবাধ শ্রেণী বিভাজন করা হয়েছিল উপরোল্লেখিত শ্রেণীগুলির নিজ নিজ অর্থনৈতিক শক্তির ভিত্তিতে।

৭.

আলোচ্য সময়কালে বাংলার জনসাধারণের অর্থনৈতিক অবস্থা নির্ধারণ করা অত্যন্ত দুরূহ। বিদেশী পর্যটকরা মধ্যযুগের বাংলার জীবনযাত্রা প্রণালীর এক উজ্জ্বল বর্ণনা দিয়েছেন। চতুর্দশ শতাব্দীর চৈনিক পরিব্রাজক ওয়াং-তা-ইউয়ান প্রবল উৎসাহে মন্তব্য করেছেন, "এসব লোক তাদের শান্তি ও উন্নতির জন্য নিজেদের কাছে ঋণী, কারণ এর উৎস হচ্ছে কৃষির প্রতি তাদের গভীর অনুরক্তি যার ফলে আদিতে জঙ্গলাকীর্ণ ভূমিকে তারা অবিরাম পরিশ্রম করে চাষ ও বীজ বপনের জন্য পুনরুদ্ধার করেছে। স্বর্গের ঋতুগুলি মর্তের সম্পদ এ রাজ্যে ছড়িয়ে দিয়েছে। এর জনগণের ঐশ্বর্য ও সততা সম্ভবত চেন-চিয়াং এর (পালেম বং) জনগণকে ছাড়িয়ে যায় এবং চাও-ওয়ার (জাভার) জনগণের সমতুল্য।"[১৪৩] অন্য একটি চৈনিক বিবরণীতে রয়েছে নিচের পংক্তিগুলি : "বাংলা সম্পদশালী ও সভ্য। আমাদের দূতদের তারা সোনার গামলা, কোমরবন্ধ, সোরাহি এবং পান-পাত্র উপহার দিয়েছিলেন এবং আমাদের সহকারী দূতকে তারা দিয়েছিলেন রূপার তৈরি ঐ একই জিনিসগুলি। আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের তারা সোনার ঘণ্টা এবং সাদা শণ ও রেশমের তৈরি লম্বা আলখেল্লা দিয়েছিলেন। আমাদের সৈন্যরা পেয়েছিল রৌপ্য মুদ্রা। তারা ধনী না হলে এমন অপচয়কর এটা তারা করতে পারল কেমন করে"?[১৪৪] আবার বার্বোসা আমাদের জানিয়েছেন যে উচ্চবিত্ত শ্রেণীর জীবন সম্পদ ও বিলাসে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত।

এসব বিদেশী বিবরণের ওপর ভিত্তি করে কোনো স্থির সিদ্ধান্তে আসা নিরাপদ নয়, কারণ এগুলি অতিরঞ্জনমুক্ত বলে মনে হয় না। উপরন্তু, পর্যটকরা উচ্চবিত্ত শ্রেণীর মানুষের সান্নিধ্যে এসেছিলেন, সম্ভবত গ্রামে বসবাসকারী নিম্নতর শ্রেণীর সান্নিধ্যে তারা আসেন নি। উপরে উদ্ধৃত উক্তিগুলি থেকে যা অনুমান করা যায় তা হচ্ছে এই যে উচ্চতর শ্রেণীর মানুষ প্রাচুর্যপূর্ণ জীবন যাপন করতেন। "সম্ভ্রান্ত মুররা", যাদের জীবনধারার এক সজীব বর্ণনা বার্বোসা দিয়েছেন,[১৪৫] এবং স্থানীয় মজমুয়াদাররা যারা সরকারের অনুমতিক্রমে সংগৃহীত রাজস্বের এক বড় অংশ ভোগ করত, তারা নিশ্চিতভাবেই ছিলেন সমৃদ্ধিশালী। কাজেই ধনী ব্যক্তিরা তাদের স্বর্ণ-পাত্রগুলি প্রদর্শন করতেন– ফিরিশতার এ উক্তিতে কিছুটা সত্যতা থাকতেও পারে।

নিম্নতর শ্রেণীর জনগোষ্ঠীর অবস্থা সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসের উচ্চতর ধাপে অবস্থিত উচ্চবিত্ত শ্রেণীর অবস্থা থেকে নিশ্চিতভাবেই ভিন্নতর ছিল। চৈতন্য-ভাগবতে[১৪৬] যেমন বলা হয়েছে, ধানের দামের সামান্য উঠানামায় সাধারণ মানুষ উদ্বিগ্ন হতো কারণ এটা তাদের জীবনে প্রতিকূলভাবে বা অন্যভাবে প্রভাব ফেলতে পারত। বস্তুত তাদের ক্রয়-ক্ষমতা খুব বেশি ছিল বলে মনে হয় না। কাজেই বাংলায় জিনিসপত্রের দাম যথেষ্ট সস্তা হলেও সাধারণ মানুষ এটাকে উচ্চমূল্য বিবেচনা করে এ সম্পর্কে অসন্তোষ প্রকাশ করত—ইবনে বতুতার এ উক্তির সম্ভবত কিছুটা যৌক্তিকতা আছে।[১৪৭] মাঝে মাঝে যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিত তার দুঃখ-দুর্দশা সরকার কিভাবে লাঘব করতেন আমরা তা জানি না। জয়ানন্দ আমাদের জানিয়েছেন যে এক দুর্ভিক্ষের ফলে বহুসংখ্যক লোক দেশান্তরী হয়েছিল।[১৪৮] তবে এ দুর্যোগ এড়াতে মুসলমান সুলতান কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন তা তিনি আমাদের বলেন নি। বাংলা প্রাচুর্যের দেশ হলেও কৃষিজ উৎপন্ন দ্রব্যের প্রাপ্যতা ও সস্তামূল্য[১৪৯] সম্পর্কে বলা যায় যে বাংলার কৃষকরা কোনো ঈর্ষণীয় অবস্থান ভোগ করেছিল বলে মনে হয় না। সরকারি দাবি ছিল, অন্ততপক্ষে কোনো কোনো ক্ষেত্রে, উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক[১৫০] যা এত বেশি মনে হয় যে খুব সম্ভবত তা তাদের দুর্দশার কারণ হয়েছিল। দাস প্রথার প্রচলন কোনো কোনো শ্রেণীর লোকের মধ্যে দারিদ্র্যের উপস্থিতির ইঙ্গিত বহন করে। বার্বোসা আমাদের জানিয়েছেন যে "মুর ব্যবসায়ীরা" পিতা-মাতার কাছ থেকে অমুসলমান ছেলেদের কিনতে উত্তর ভারতে যেতেন[১৫১] যারা নিশ্চিতভাবেই ছিলেন দারিদ্র-পীড়িত। সমকালীন বাংলা সাহিত্যে দারিদ্র্যের চিত্র পাওয়া যায়। নবদ্বীপের এক ব্রাহ্মণ, বল্লভাচার্য এত দরিদ্র ছিলেন যে তাঁর কন্যার বিয়ের সময় তিনি কনেকে শুধুমাত্র পাঁচটি হরীতকী দিতে পেরেছিলেন। একই এলাকার অন্য একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ, শ্রীধরকে চৈতন্য চণ্ডী ও মনসার মতো নিম্নতর দেব-দেবীর পূজা করে জীবিকা নির্বাহের নির্দেশ দিয়েছিলেন।[১৫২] আবার, সারা বছর ফুল্লরার দারিদ্র্য-পীড়িত অবস্থার বর্ণনা কবি কঙ্কণের কাব্যের বেশকিছু অংশ জুড়ে রয়েছে।[১৫৩] সাধারণ মানুষের অবস্থার এ আভাস জনগোষ্ঠীর উচ্চতর ও নিম্নতর শ্রেণীর মধ্যে তীব্র বৈষম্যের নির্দেশ করে। জীবন ধারণের সীমিত প্রয়োজনীয় উপকরণের প্রকৃতি নিশ্চয়ই দারিদ্র্যের প্রভাবকে যথেষ্ট লাঘব করেছিল।

টীকা

১. বিজয় গুপ্ত : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৪ ও ৫৯-৬১।

২. মিনহাজ : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১৫২ ও ১৫৬।

৩. মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে রাস্তা, পুকুর, মাঠ এবং খাল বা ডোবার প্রায়ই উল্লেখ করা হয়েছে। বিপ্রদাস : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৫৮, ৬০, ৬৪ এবং ৬৬; শেখ ফয়জুল্লাহ্ : গোরক্ষ-বিজয়, পৃ. ৩৪; চূড়ামনিদাস : গৌরাঙ্গ-বিজয়, পৃ. ৭৯।

৪. কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম : পূর্বোল্লিখিত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২।

৫. বিশ্বভারতী অ্যানালস, ১৯৪৫, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৯।

৬. শেখ ফয়জুল্লাহ্ : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৪০।

৭. এস. সি. বন্দ্যোপাধ্যায় : স্মৃতিশাস্ত্রে বাঙ্গালী, পৃ. ৫৫।

৮. আধুনিক গ্রামের বৈশিষ্ট্যের জন্য তুলনীয়, কে. এম. আশরাফ : লাইফ অ্যান্ড কন্ডিশন্স অফ দি পিপল অফ হিন্দুস্তান, পৃ. ১৯৬ ও পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহ।

৯. এ সব শহরের নামের জন্য দেখুন, ৩য় পরিচ্ছেদ, পৃ. ১০৪।

১০. আবিদ আলী : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৪২, ৪০ এবং ৫৫; আরও দেখুন, প্লেট ২ যা গৌড়ের অবস্থান পরিকল্পনা নির্দেশ করে।

১১. প্রাগুক্ত উদ্ধৃত, পৃ. ৪৩।

১২. পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৪১৬-১৭।

১৩. আবিদ আলী : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৪৩।

১৪. ১৫৩৪ সালে গিয়াসউদ্দীন মাহমুদের দরবারে অ্যাফোলো দ্য মেলো কর্তৃক প্রেরিত পর্তুগিজ প্রতিনিধি শহরটিকে "সুরক্ষিত ও তিন লীগ দীর্ঘ" দখতে পেয়েছিলেন। স্ট্যাপলটনের টীকা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২; তুলনীয়, উপরে উদ্ধৃত ফারিয়া ওয়াই সুজা।

১৫. মেময়েরস অফ এ ম্যাপ অফ হিন্দুস্তান, পৃ. ৫১। গৌড়ের বর্তমান এলাকার বিভিন্ন অংশে সম্ভবত বিভিন্ন সময়ে জনবসতি গড়ে উঠেছিল। পূর্ববর্তী ও পরবর্তীকালের লেখকদের মধ্যে নগরীর আয়তন সম্পর্কে এ কারণেই পার্থক্য।

১৬. আইন, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৫; রিসালাত-উস-শুহাদা, জে. এ. এস. বি. ১৮৭৪, পৃ. ২২৬।

১৭. হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৪, টীকা ১।

১৮. আবিদ আলী : পূর্বোল্লিখিত, প্লেট ৫ যাতে পাণ্ডুয়ার অবস্থান পরিকল্পনা দেখানো হয়েছে; রেনেল : মেময়েরস অফ এ ম্যাপ.. পৃ. ৫৬।

১৯. সেলিম বলেছেন যে হোসেন শাহ্ প্রতি বছর একডালা থেকে পায়ে হেঁটে নূর-কুতুব-ই-আলমের মাজার জিয়ারত করতে পাণ্ডুয়ায় আসতেন; রিয়াজ, পৃ. ১৩৫।

২০. সিং চা শেং লান : ১৪৩৬ সালে ফিসিন কর্তৃক সংকলিত; পি. সি. বাগচী কর্তৃক অনূদিত, বিশ্বভারতী অ্যানালস, পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১২১। পাণ্ডুয়ার অনুরূপ বর্ণনার জন্য দেখুন, সি

ইয়াং চাও কুং টিয়েন লু, ১৫২০ সালে হুয়াং সিং সেং কর্তৃক সংকলিত, পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১২৪ ও ১২৬-২৭; এবং শু ইউ চৌ সেউ লু, ১৫৭৪ সালে ইয়েন সং কিয়েন কর্তৃক সংকলিত, পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১৩০ ও পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহ।

২১. সি. ইয়াং চাও কুং টিয়েন লু, পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১২৩।

২২. এম. এম. চক্রবর্তী : "নোটস অন দি জিওগ্রাফি অফ ওল্ড বেঙ্গল", জে. এ. এস. বি. ১৯০৮, পৃ. ২৮৫।

২৩. আবিদ আলী : পূর্বোল্লিখিত, প্লেট ৫ এবং পৃ. ৯৭; আরও দেখুন, প্লেট ৩, জে. এ. এস. বি. ১৯৩২।

২৪. ই. ভি. ওয়েস্টমাকট : "নোটস অন দি সাইট অফ ফোর্ট–একডালা ডিস্ট্রিক্ট অফ দিনাজপুর", জে. এ. এস. বি. ১৮৭৪, সংখ্যা ৪, পৃ. ২৪৪-৪৫; এইচ. ই. স্ট্যাপলটন : "নোট অন দি হিস্টোরিকাল অ্যান্ড আর্কিওলজিকাল রেজাল্টস অফ এ ট্যুর ইন দি ডিস্ট্রিক্টস অফ মালদা অ্যান্ড দিনাজপুর", জে. এ. এস. বি. এন. এস, ২৭, ১৯৩২, পৃ. ১৫৫-৬৪।

২৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫ এর মুখোমুখি প্লেট ৪।

২৬. বারানী : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৫৯০।

২৭. চণ্ডী-মঙ্গল, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২।

২৮. প্রাগুক্ত। আবুল ফজল বলেছেন যে এক বিঘাকে ২০ অংশে ভাগ করা যেত যার প্রত্যেকটি বিসওয়াহ্ রূপে পরিচিত। আইন, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৭।

২৯. কল্যাণ মাণিক্য, গোবিন্দ মাণিক্য এবং ধর্ম মাণিক্যের জারিকৃত তাম্র-শাসনের জন্য দেখুন, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ, ২য় খণ্ড, পৃ. ২২-২৩ এবয় ৩২-৩৪।

৩০. ইউসফুল টেবলস্, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯১।

৩১. প্রাগুক্ত।

৩২. নীহার রঞ্জন রায় : বাঙ্গালীর ইতিহাস, পৃ. ২২৭ এবং ২৩০-৩২।

৩৩. এন. কে. ভট্টশালী : কয়েন্স অ্যান্ড ক্রনোলজি, পৃ. ১৪৪।

৩৪. পূর্বোল্লিখিত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩; ২য় খণ্ড, পৃ. ৫১০। শব্দকল্পদ্রুম অনুসারে ১৬-২০ সের চালে এক আধা; নীহাররঞ্জন রায় : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ২২৮।

৩৫. উপরে পৃ. ১০১-১০২।

৩৬. উপরে, পৃ. ১০১।

৩৭. পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৯।

৩৮. এ দলিলের ফার্সি মূলপাঠ ও ইংরেজি অনুবাদের জন্য দেখুন, ভট্টশালীর তৈমুর কালেকশন, পৃ. X-XV, প্লেট ১টি ও ৬টি।

৩৯. প্রাগুক্ত, পৃ. XIII।

৪০. প্রাগুক্ত, পৃ. X, XIII ইত্যাদি।

৪১. প্রাগুক্ত, পৃ. X, প্লেট ১টি।

৪২. এ ধরনের ভূমিদানের মধ্যে আমরা নূর কুতুব-ই-আলমের মাজারের সঙ্গে সংযুক্ত পান্থশালার ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য হোসেন শাহ প্রদত্ত গ্রামগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারি; সেলিম : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১৩৫ ও নিজামউদ্দীন : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ২৭০।

৪৩. জে. এ. এস. বি. ১৮৭২, পৃ. ১০৬; কানিংহাম : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১০০ এবং ই. আই. এম. ১৯২৯-৩০, পৃ. ১২-১৩; এস. আহমদ : ইনস্ক্রিপশন্স, পৃ. ১৯০-৯১।

৪৪. নসরত শাহের সাতগাঁও লিপি দেখুন। জে. এ. এস. বি. ১৮৭০, পৃ. ২৯৭-৯৮; দানী : বিব্লিওগ্রাফি, পৃ. ৭২; এস. আহমদ : ইনস্ক্রিপশন্স, পৃ. ২২৫-২৬।

৪৫. পূর্বোল্লিখিত, পৃ. XIII।

৪৬. কবিকঙ্কণ : পূর্বোল্লিখিত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫৪, তুলনীয় "প্রতিটি লাঙ্গলের জন্য তুমি টাকা দেবে এবং কাউকে ভয় করবে না।"

৪৭. উপরে, ৩য় পরিচ্ছেদ, পৃ. ১০৯।

৪৮. হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৫৪।

৪৯. প্রাগুক্ত।

৫০. প্রাগুক্ত।

৫১. উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত।

৫২. ইবনে বতুতা : রেহলা, ইংরেজি অনুবাদ, পৃ. ২৪১। আরও দেখুন ভট্টশালীর কয়েন্স অ্যান্ড ক্রনোলজির পরিশিষ্টরূপে সংযুক্ত একই গ্রন্থে ইংরেজি অনুবাদ, পৃ. ১৪২।

৫৩. বিশ্বভারতী অ্যানালস, ১৯৪৫, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৯।

৫৪. আই. এইচ. কোরেশী : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১১৫, ১১৭ এবং ১১৮।

৫৫. মোরল্যান্ড : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৮৬-৮৭ এবং ইন্ডিয়া অ্যাট দি ডেথ অফ আকবর, পৃ. ৯৯ ও ১৩০-৩১।

৫৬. চণ্ডী-মঙ্গল, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫৪; শিবায়ন, পৃ. ৭০-৭১।

৫৭. শূণ্য-পুরাণ, পৃ. ১৮২-৯৪।

৫৮. বিপ্রদাস : মনসা-বিজয়, পৃ. ৬৩, ৬৬-৬৭; বিজয়গুপ্ত : পৃ. ১৫৫।

৫৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩-৫৫; বিপ্রদাস : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৬৩-৬৬।

৬০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩; শূন্য-পুরাণ, পৃ. ১৮৪।

৬১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৫; শিবায়ন, পৃ. ৬৮ ও ৭২-৭৩।

৬২. হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৫০।

৬৩. শূন্য-পুরাণ, পৃ. ১৮৬।

৬৪. আইন, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৪।

৬৫. শূন্য-পুরাণ, পৃ. ১৯১-৯৪; শিবায়ন, পৃ. ১১৩।

৬৬. আইন, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৪।

৬৭. বার্বোসা : পূর্বোল্লিখিত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৫; বিপ্রদাস : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১৪৯; বিজয়গুপ্ত : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১২৩, ১৩০ এবং ১৩২-৩৫।

৬৮. এসব ফলের মধ্যে ছিল আম, কমলা, লেবু এবং কলা; বার্বোসা : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১৪৭; কবিকঙ্কণ চণ্ডী : ২য় খণ্ড, পৃ. ৫১০, ৫১১ এবং ৫১৮।

৬৯. পূর্বোল্লিখিত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫৩-৫৪।

৭০. প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২, ১১৬-২১, ২৬৫, ২৭০, ২৭৪ ইত্যাদি।

৭১. বার্বোসা : পূর্বোল্লিখিত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৫-৪৫।

৭২. ভার্থেমা : দি ট্র্যাভেলস অফ লুডোডিকো ডি ভার্থেমা, পৃ.. ২২।

৭৩. ডা এশিয়া : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ২৪৬।

৭৪. দি অ্যাকাউন্ট অফ মাহুয়ান : জে. আর. এ. এস, ১৮৯৫, পৃ. ৫৩০।

৭৫. রালফ ফিচ : পুরকাস হিজ পিলগ্রিমস, ১০ম খণ্ড, পৃ. ১৮৫।

৭৬. কবিকঙ্কণ : পূর্বোল্লিখিত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২৪-৩০ এবং ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৬৩।

৭৭. বার্বোসা : পূর্বোল্লিখিত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৫-৪৭; ভাসকো-ডা-গামা : ক্যাম্পোস কর্তৃক উদ্ধৃত, পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ২৫; রালফ ফিচ : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১৮৫; ভার্থেমা : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ২১২।

৭৮. ক্যাম্পোস কর্তৃক উদ্ধৃত, পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ২৫।

৭৯. বার্বোসা : পূর্বোল্লিখিত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৬-৪৭; চৌতর, মিনবফ এবং বিটিল ছিল বিভিন্ন ধরনের কাপড়। এর প্রতি খণ্ড ছিল ২০ পর্তুগিজ লম্বা ও ৩ বা ৪ পর্তুগিজ গজ চওড়া; নিচে দেখুন।

৮০. ক্যাম্পোস : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ২৭, টীকা; বার্বোসা : পূর্বোল্লিখিত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫৭, টীকা ১।

৮১. প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৫, টীকা ১; ক্যাম্পোস : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৩৩, টীকা।

৮২. আইন, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৫।

৮৩. বার্বোসা : পূর্বোল্লিখিত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৭; রেহলা, পৃ. ২৩৫; দি বুক অফ সের মার্কোপোলো, ৩য় সংস্করণ, ২য় খণ্ড, পৃ. ১১৫।

৮৪. বার্বোসা : পূর্বোল্লিখিত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৭।

৮৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮-২১৫; ইবনে বতুতা : রেহলা, পৃ. ২৪১ এবং বার্বোসা : পূর্বোল্লিখিত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৫ বাংলার নদীগুলিতে চৈনিক পালের জাহাজ দেখেছিলেন। এটা মোটামুটি নিশ্চিত মনে হয় যে বাংলার সঙ্গে চীনের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। বস্তুত সে দেশের জাহাজগুলি মালয় দ্বীপপুঞ্জের প্রধান দ্বীপগুলি, ভারত, আরব এবং পারস্য উপসাগরে যেত; বার্বোসা : পূর্বোল্লিখিত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২১৪-২১৫ টীকা।

৮৬. প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১-১৪৫; ভার্থেমা : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ২১২।

৮৭. রেহলা, পৃ. ২৩৫ এবং ২৪১; কয়েন্স অ্যান্ড ক্রনোলজি, পৃ. ১৪৬-০৪৭; চাইনিজ অ্যাকাউন্টস : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১১৭, ১২০-২১, ১২৩।

৮৮. পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১৪২-৪৩।

৮৯. পূর্বোল্লিখিত, অন্ত্য, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩৮১।

৯০. পুরকাস হিজ পিলগ্রিমস, ১০ম খণ্ড, পৃ. ১৮২।

৯১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪।

৯২. ডা এশিয়া : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ২৪৪।

৯৩. উপরে, ২য় পরিচ্ছেদ, পৃ. ৭০-৭১; ডানশিয়া : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ২৪৬-৪৮; ফারিয়া ওয়াই সুজা : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ২২০, ৩১৪, ৪১৭-২০।

৯৪. পূর্বোল্লিখিত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৫-৪৭।

৯৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৫-৪৬; অনুবাদকের টীকাগুলি দেখুন।

৯৬. পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ২১২।

৯৭. মাহুয়ানস অ্যাকাউন্ট অফ বেঙ্গল; জে. আর. এ. এস. ১৮৯৫, পৃ. ৫৩১-৫৩২। এসব নামের পরিচয় নির্ণয়ের জন্য দেখুন জন বীমসের্স নোটস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯৯। বিশ্বভারতী অ্যানালস এ অনূদিত অন্যান্য চৈনিক বিবরণেও এ নামগুলি দেখা যায়, পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১১৯-২০, ১২৫-২৬ এবং ১৩২।

৯৮. দি বুক অফ সের মার্কোপোলো, ২য় খণ্ড, পৃ. ১১৫; রেহলা, পৃ. ২৩৫ এবং পুরকাস হিজ পিলগ্রিমস, ১০ম খণ্ড, পৃ. ১১৪।

৯৯. আইন, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৬।

১০০. বিপ্রদাস : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১১৫ এবং কৃত্তিবাসের রামায়ণ : ডি. সি. সেন কর্তৃক সম্পাদিত, পৃ. ৩।

১০১. আইন, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৬।

১০২. জে. আর. এ. এস. ১৮৯৫, পৃ. ৫৩২।

১০৩. পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ২১২।

১০৪. আইন, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৬।

১০৫. বার্বোসা : পূর্বোল্লিখিত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৫ এবং ভার্থেমা : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ২১২।

১০৬. বার্বোসা : পূর্বোল্লিখিত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৬; ভার্থেমা : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ২১৪।

১০৭. বার্বোসা : পৃ. ১৪৫-৪৭।

১০৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬; তুলনীয়, ভার্থেমা : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ২১২ এবং ইবনে বতুতা : রেহলা, পৃ. ২৩৫।

১০৯. আইন, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৬।

১১০. জে. আর. এ. এস. ১৮৯৫, পৃ. ৫৩২।

১১১. নিচে, ৯ম পরিচ্ছেদ; বিশ্বভারতী অ্যানালস এ চৈনিক বিবরণ, পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১২২, ১২৪ এবং ১৩২; বার্বোসা : পূর্বোল্লিখিত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৮।

১১২. পূর্বোল্লিখিত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩০১।

১১৩. নিচে, ৮ম পরিচ্ছেদ।

১১৪. আইন, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৪।

১১৫. কবিকঙ্কণ : পূর্বোল্লিখিত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫৯ এবং বিজয় গুপ্ত : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১২৩।

১১৬. মাহুয়ানের বিবরণ দেখুন, জে. আর. এ. এস. ১৮৯৫, পৃ. ৫৩২; আরও দেখুন, চাইনিজ অ্যাকাউন্টস, পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১২৬।

১১৭. মাহুয়ানের বিবরণ, পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৫৩০।

১১৮. আইন, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৬।

১১৯. মাহুয়ানস অ্যাকাউন্ট অফ বেঙ্গল : জে. আর. এ. এস. ১৮৯৫, পৃ. ৫৩০। ইয়িং ইয়াই শেরগলান ও সিং ইয়াং চাও টিয়েন লু এর মতো অন্যান্য চৈনিক উৎসেও এ তথ্য পাওয়া যায়। বিশ্বভারতী অ্যানালস এ অনূদিত, ১৯৪৫, ১ম খণ্ড; পৃ. ১১৭, ১২৩ এবং ১২৫।

১২০. পূর্বোল্লিখিত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৮-৩৯। সুতরাং এ হিসেবে এক টাকা ৪×৫×৪×১৬×১০ অথবা ১৪,৪০০ কড়ির সমান। উপরের এ হিসেবের সঙ্গে নিচের সারণির তুলনা করা যেতে পারে। এটাতে অবশ্য অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে ও উনবিংশ শতকের প্রথম ভাগে বাংলায় প্রচলিত একটু ভিন্নতর পদ্ধতি দেখতে পাওয়া যায়।

৪ কড়ি = ১ গণ্ডা

২০ গণ্ডা = ১ পণ

৫ পণ = ১ আনা

প্রিন্সেপ্স ইউজফুল টেবলস, পৃ. ১।

১২১. কবিকঙ্কণ : পূর্বোল্লিখিত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১৩ এবং ২য় খণ্ড, পৃ. ৫১০-১৩, টীকা; বিজয়গুপ্ত : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১৫৩।

১২২. কবিকঙ্কণ : পূর্বোল্লিখিত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২। আমাদের বলা হয়েছে যে আকবরের আমলে পোদ্দার (ফোতাহ্দার) এক টাকা থেকে ২$\frac{১}{২}$আনা কেটে রাখত এবং এক টাকা মূল্যের জিনিস ১০ আনায় বিক্রি হতো।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ধর্মীয় জীবন

ইসলাম, বৈষ্ণববাদ, তান্ত্রিকবাদ এবং মনসা, নাথ এবং ধর্ম-পূজা ছিল এ আমলের ধর্মীয় জীবনের সহজদৃষ্ট উপাদান। এ পরিচ্ছেদে এ ধর্মগুলির প্রত্যেকটির সাধারণ প্রকৃতি অনুধাবনের চেষ্টা করা হয়েছে। এ সব ধর্মীয় পদ্ধতির কোনো কোনোটির, বিশেষত অপ্রধান পদ্ধতিগুলির, মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলি হোসেন শাহী আমলের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সময়ে নিশ্চিতভাবে অপরিবর্তিত ছিল।

ইসলাম তার সরল ও একান্ত অনাড়ম্বর রূপ নিয়ে জনগণের জীবনধারাকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করেছিল বলে মনে হয় না। যদিও সাহিত্যিক ও লিপিগত উৎসগুলি ইঙ্গিত দেয় যে নিয়মিত নামাজ পড়া, রমজান মাসে নিষ্ঠার সঙ্গে রোজা রাখা, অন্যান্য ধর্মগ্রন্থসহ কোরানপাঠ, যাকাত দেওয়া এবং মক্কায় হজ্ব পালন করা ছিল সাধারণ রীতি।[১] সে আমলের দেশীয় সাহিত্যে মোল্লা ও কাজীকে তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও জীবন-ধারায় অত্যন্ত গোঁড়ারূপে চিত্রিত করা হয়েছে। মনে হয় যে সমসাময়িক উৎসগুলিতে স্পষ্টতই সুন্নী ইসলামের বিধি অনুসারে নিষ্ঠাবান জীবন যাপনের আদর্শের ওপর জোর দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সে সময়ের সাহিত্য একটু গভীরভাবে পড়লে দেখা যায় যে, ধর্মের গোঁড়া মতবাদের সঙ্গে সম্পর্কবিহীন একধরনের লোকজ ইসলাম প্রচলিত ছিল। সর্বসাধারণের আচরিত ইসলাম বিস্ময়কর প্রকৃতির প্রভাব থেকে মুক্ত ছিল বলে মনে হয় না। মঙ্গল কাব্যের রচয়িতারা আমাদের জানাচ্ছেন যে সাপের কামড়ের ভয়ে প্রভাবশালী কিছু মুসলমান সর্প-দেবী মনসার পূজা করতেন।[২] সম্ভবত এটা ছিল মুসলমানদের ওপর হিন্দু প্রভাবের ফল। নসরত শাহ কদম-রসুল বা নবীর পদচিহ্ন সংরক্ষণের জন্য একটি অট্টালিকা নির্মাণ করেছিলেন। কিন্তু নবীর পদচিহ্নকে ভক্তি করা গোঁড়া ইসলাম সমর্থন করে না। বৌদ্ধধর্মে এর উৎপত্তি হয়ে, মনে হয় এ ধরনের অচেতন পদার্থাদিতে অন্ধভক্তি হিন্দু, খ্রিস্টান এবং ইসলাম ধর্মেও ঢুকে পড়েছিল। ফলে বুদ্ধ ও বিষ্ণুর পদচিহ্ন আছে যথাক্রমে বোধগয়া ও গয়াতে, এবং যিশুখ্রিস্ট ও মোহাম্মদের পদচিহ্ন রয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে। পরবর্তী পরিচ্ছেদে আমরা দেখিয়েছি যে কিভাবে সে আমলের মুসলমান অতীন্দ্রিয়বাদীরা তান্ত্রিক ও যোগ-সম্পর্কিত বিভিন্ন ধরনের ধারণা ও রীতি ইসলামে নিয়ে এসেছিলেন। সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে আদ্য-শক্তি বা আদিম দেবীর মিলনে সৈয়দ সুলতান বিশ্বাস করতেন-এটা ঘটাতে হতো প্রকৃতির শরীরে[৩]—যে নীতি কোনোমতেই ইসলামের একেশ্বরবাদের ধারণার সঙ্গে সুসঙ্গত নয়। মধ্যযুগীয় বাংলার অতীন্দ্রিয়বাদী ধর্মপদ্ধতিগুলিতে প্রাপ্ত আদি-দেব বা আদ্য-শক্তির ধারণা, মনে হয়, ছিল সাংখ্য ধারণার

পুরুষ (অপরিবর্তনীয় বিশুদ্ধ সচেতনতানীতি) এবং প্রকৃতির (আদিম সৃষ্টি সংক্রান্ত বস্তু) পরিমার্জিত রূপ—যাদের সৃষ্টিতত্ত্বের বিবর্তনের মূলসত্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়।[৪] বাংলায় সে অতীন্দ্রিয়বাদী ধর্মমতের বিকাশ ঘটেছিল সৈয়দ সুলতান সম্ভবত তার প্রভাবে আদিম মানব ও আদিম মানবীর মতবাদ গ্রহণ করেছিলেন।[৫] সত্যপীরের পূজা প্রচলনের জন্য হোসেন শাহ দায়ী ছিলেন[৬] এ লোকপ্রিয় কাহিনী অগ্রাহ্য করলেও এটা মনে হয় নিশ্চিত যে আলোচ্য আমলে পীরপূজার বিকাশ লক্ষ্য করা গিয়েছিল। বাঙালি কবিরা আমাদের বলেছেন যে গোঁড়া মুসলমানরা নিয়মিতভাবে মুসলমান দরবেশদের দরগাহে শ্রদ্ধা নিবেদন করতেন।[৭] সাধারণভাবে মানুষের কাছে সুফিবাদ নামে পরিচিত ইসলামি অতীন্দ্রিয়বাদ মধ্যযুগের বাংলার সমাজকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। বহু শতাব্দী ধরে বাংলায় আগত সুফি সম্প্রদায়গুলির কোনো কোনোটি আলোচ্য সময়কালের জনগণের জীবনকে প্রভাবিত করেছিল বলে মনে হয়। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে দেহরক্ষাকারী চিশতিয়া সুফি নূর কুতুব-ই আলম জনগণের উচ্চ-শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। সেলিমের মতানুসারে হোসেন ভক্তিভরে পাণ্ডুয়ায় তাঁর মাজার জিয়ারত করতেন। তিনি বিভিন্ন সময়ে মাজার জিয়ারতে আগত লোকদের জন্য নির্মিত পান্থশালার ব্যয়নির্বাহের জন্য প্রচুর অর্থও ব্যয় করতেন।[৮] তাঁর পুত্র নসরত শাহ সাদুল্লাহ্পুরে আখি সিরাজউদ্দীনের সমাধিসৌধ নির্মাণ করেছিলেন।[৯] এ আমলের ধর্মীয়জীবনের সঙ্গে কিছুটা জড়িত দু'জন চিশতিয়া সুফি হচ্ছেন নূর-কুতুব-ই আলমের প্রধান শিষ্য শেখ হুসামউদ্দীন মানিকপুরী[১০] এবং হুসামউদ্দীনর শিষ্য রাজী হামিদ শাহ। তারা যথাক্রমে ১৪৭৭ এবং ১৪৯৫ সালে মৃত্যুবরণ করেছিলেন।[১১] সিকান্দর লোদীর হাতে পরাজিত হওয়ার পর [১২] হোসেন শাহ শর্কির সঙ্গী কুতবন কহলগাঁওয়ে অবস্থানকালে ১৫০৩ সালে মৃগাবতী নামে একটি কাল্পনিক কাব্য রচনা করেছিলেন। এটাকে ব্রহ্মার সঙ্গে অনুসন্ধানকারীর মিলনের ব্যাখ্যার প্রতীকী রচনা বলে মনে হয়।[১৩] তিনি বলছেন যে তিনি ছিলেন শেখ বুরহানের শিষ্য।[১৪] মোহাম্মদ গাউসীর মতানুসারে শেখ বুরহান ছিলেন শাত্তারীয়া সুফি।[১৫] পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলায় প্রবর্তিত মদারীয়া সম্প্রদায় আলোচ্য সময়কালেও বর্তমান ছিল বলে মনে হয়। শূন্যপুরাণ প্রসঙ্গক্রমে মদারীয়া ধ্বনি দমমদার-এর (মদারের নিশ্বাস) উল্লেখ করেছে।[১৬] কবিকঙ্কণ[১৭] ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধের ভ্রাম্যমাণ কলন্দরদের বর্ণনা দিয়েছেন। মাওলানা শাহ দৌলাহ্ (১৫১৯) রাজশাহীর বাঘাকে তাঁর কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। বাংলার ঐ অঞ্চলের বহু প্রজন্মের পীরদের তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা।[১৮] ৯১১ হি/ ১৫০৫ ও ৯১২ হি/ ১৫০৬ সালের হোসেন শাহের দু'টি লিপিতে[১৯] কোনিয়ার দরবেশ শেখ জালাল মজাররদ বিন মোহাম্মদ তুর্কিস্তানীর উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি কিছুটা পূর্ববর্তী সময়ে জীবিত ছিলেন।[২০] এ আমলের মানুষের শ্রদ্ধাভাজন অপর একজন পীর ছিলেন ইসমাঈল গাজী যাকে বারবক শাহের হুকুমে ১৪৭৪ সালে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল।[২১] হোসেন শাহের মন্দারণ লিপিতে ১৪৯৪-৯৫ সালে তাঁর সম্মানে একটি তোরণ নির্মাণের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।[২২] সম্ভবত ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে খ্যাতি অর্জনকারী গোরক্ষ-বিজয়ের কবি শেখ ফয়জুল্লাহ্ আমাদের জানাচ্ছেন

যে তিনি কান্তাদুয়ারের পীর ইসমাঈল গাজীর কৃতিত্ব বর্ণনা করে গাজী-বিজয় নামে এক কাব্য রচনা করেছিলেন।[২৩] মধ্যযুগের বাংলার জনগণ মুসলমান সুফি ও দরবেশদের কতটা শ্রদ্ধা করতেন, এ সব থেকে সেটা বুঝা যায়। এদের মধ্যে কোনো কোনো সুফি যোগশাস্ত্রীয় ও তান্ত্রিক দর্শনকে ইসলামি অতীন্দ্রিয়বাদের উপযোগী করে একটা সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের সূত্রপাত করেছিলেন বলে ধারণা করা হয়।[২৪] আলোচ্য সময়কালে শিয়া সম্প্রদায়ের প্রভাব বেশ বৃদ্ধি পেয়েছিল বলে মনে হয়। এখানে উল্লেখ করা উচিত যে আমাদের হাতে যে উপাদান রয়েছে তা সন্দেহাতীতভাবে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছার জন্য যথেষ্ট নয়। সাইফুদ্দীন আবুল মোজাফফর ফিরূজ শাহের (১৪৮৭-১৪৯০) একটি লিপিতে মোহাম্মদ, আলী, ফাতিমা, হাসান এবং হোসেনের নামোল্লেখ রয়েছে, কিন্তু এতে ইসলামের প্রথম তিনজন খলিফার নাম স্থান পায় নি।[২৫] ফলে মনে হয় যে লিপিটি কোনো কাজ শুরু করার আগে পঞ্জতন-ই পাক বা পাঁচজন পূত-চরিত্র ব্যক্তির সাহায্য কামনা করায় শিয়ারীতির প্রতি নির্দেশ করে। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমদিকে সময়কাল নির্ধারিত অপর একটি লিপিতে[২৬] যে পাঁচটি বিশেষণ রয়েছে সেগুলি মনে হয় পাঁচ সংখ্যার সঙ্গে জড়িত উপরোল্লিখিত শিয়ারীতির অনুকরণ। নাম পাঁচটি হচ্ছে ইয়াবুদ্দুহ্, ইয়া ফাত্তাহ (উন্মোচনকারী) ইয়া আল্লাহ্, ইয়া কুদ্দুস (পবিত্রজন) এবং ইয়া সুব্বুহ্ (প্রশংসার যোগ্য)। আরবি ও ফার্সি অভিধানে বুদ্দুহ্ শব্দটির অনুপস্থিতি লক্ষণীয়। দ্বাদশ শতাব্দীর পরে এ শব্দটি তাবিজ লেখা সংক্রান্ত পাণ্ডুলিপিতে দেখতে পাওয়া যায়। দুতি তার ম্যাজি এ রেলিজিওন এ বলেছেন যে পেটের ব্যথা এবং এ ধরনের অন্যান্য রোগের চিকিৎসা হিসেবে ম্যাজিয় দর্শনে এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়।[২৭] আপাতদৃষ্টিতে যুক্তিসঙ্গত একটা ব্যাখ্যা এখানে দেওয়া যেতে পারে। ইসলাম পারস্যে ম্যাজিয়বাদের সংস্পর্শে আসে—সেখানে ম্যাগো-জরথুস্ত্রবাদের প্রভাবে কইসিনিয়া এবং হাশিমিয়াসহ বহু অপ্রধান শিয়া সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটেছিল। কথিত আছে যে প্রথম ফাতেমীয় শাসক উবায়দুল্লাহ আল-মাহদী এবং শিয়াদের ধর্মীয়-রাজনৈতিক প্রচারকর্ম-পরিকল্পনার প্রধান ব্যক্তিত্ব আব্দুল্লাহ্ ইবনে মায়মুন ছিলেন ম্যাজিয়দের বংশধর। খোরাসানের মুসলমান শক্তিকে প্রতিহতকারী অষ্টম শতাব্দীতে মোকান্না কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রাওয়ান্দীরা ছিল ইন্দো-ম্যাজিয় সম্প্রদায়ভুক্ত।[২৮] এসব পরিস্থিতিতে মধ্যযুগের ইসলাম সম্ভবত ম্যাজিয় ভাবধারা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। এটাও খুবই সম্ভব যে শিয়া মতবাদের মাধ্যমেই ম্যাজিয় শব্দ বুদ্দুহ ক্রমান্বয়ে ইসলামে প্রবেশ করেছিল। এভাবে বৌদ্ধদের দ্বারা ম্যাজিয়বাদের পুষ্টির ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ইন্দো-বৌদ্ধ শব্দ বুদ্ধ যার অর্থ হচ্ছে 'জ্ঞানী', মনে হয় আল্লাহর অতীন্দ্রিয়বাদী নাম হিসেবে কালক্রমে ইসলামে আত্মস্থ হয়ে যায়। ম্যাজিয়বাদ ও শিয়াবাদের মধ্যে নিশ্চয়ই একধরনের আপোস-মীমাংসা হয়ে গিয়েছিল যার ফলে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ফার্সি পাণ্ডুলিপিতে এ শব্দটি দেখতে পাওয়া যায়। উল্লিখিত বাংলার লিপির বুদ্দুহ্ শব্দটি যদি ম্যাজিয় মূলের হয়ে থাকে তবে এর উপস্থিতিকে এদেশে শিয়া প্রভাবের ইঙ্গিত বলে বিবেচনা করা যেতে পারে।

লিপিতে প্রাপ্ত সাক্ষ্যগুলি মনে হয় সাহিত্যিক উৎসগুলি দ্বারা পরোক্ষভাবে সমর্থিত।

মনসার বিরুদ্ধে যে মুসলমান বীররা যুদ্ধ করে ব্যর্থ হয়েছিলেন তাঁদের নাম হাসান ও হোসেন যাঁরা হচ্ছেন শ্রদ্ধাভাজন শিয়া ইমাম এবং মুসলমানদের এ স্থানের নামও যে হোসেনহাটি[২৯] সেটাও তাৎপর্যপূর্ণ। পশ্চিম বাংলার মুসলমান বসতির বর্ণনা দিতে গিয়ে মুকুন্দরাম সেখানে কোনো মসজিদের উল্লেখ করেন নি, কিন্তু হাসানহাটিকে তিনি মুসলমানদের উপাসনার স্থানরূপে উল্লেখ করেছেন।[৩০] এর কারণ নির্দেশ করা সম্ভবত দুরূহ নয়। পারস্য উপসাগর এবং ইরাক, উভয়ের সঙ্গেই বাংলার সরাসরি সামুদ্রিক-বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল—এ দু'টোই ছিল শিয়া-প্রধান এলাকা। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমদিকে বাংলা ভ্রমণে আগত পর্তুগিজ পর্যটক বার্বোসা 'বেঙ্গালা' নগরীতে বেশকিছু পারস্যদেশীয় বণিক দেখতে পেয়েছিলেন।[৩১] বাংলা ও পারস্যের মধ্যে সামুদ্রিক যোগাযোগ বৃদ্ধি ও ক্ষয়িষ্ণু ও অত্যাচারী সাভাবীদের অধীনে সামাজিক ও রাজনৈতিক নিরাপত্তার অভাববোধের কারণে বহুসংখ্যক পারস্যবাসীর বাংলায় দেশান্তরী হওয়ায় সপ্তদশ শতাব্দীতে বাংলায় শিয়ামতবাদের বিকাশ-প্রক্রিয়া তরান্বিত হয়েছিল।[৩২]

সুফিবাদ তার চমৎকার গূঢ় নীতি ও রীতি নিয়ে মুসলমান জনগণের শুধু এক অংশকে প্রভাবিত করেছিল বলে মনে হয়, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে শিয়া মতবাদের তখনও প্রতিষ্ঠা হয় নি। কাজেই সাধারণ মুসলমান, যাকে বলা যায় লোকজ ইসলাম, সেটাই অনুসরণ করত।

২.

চৈতন্য বৈষ্ণব ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা নন। এটা তাঁর আগে বহু শতাব্দী ধরে বাংলার ধর্মীয় জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে ছিল। সেন রাজারা ছিলেন বৈষ্ণববাদ ঘেঁষা এবং সম্ভবত তাঁরা জয়দেবের[৩৩] গীত-গোবিন্দে লোক প্রিয়কৃত রাধা-কৃষ্ণ ভক্তির বিকাশের উপযোগী একটা পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন। রাধা-কৃষ্ণ ভক্তিকে চৈতন্যের অনুসারীরা তাদের অন্যতম ধর্মীয় অনুপ্রেরণারূপে বিবেচনা করেন। চণ্ডীদাসের শ্রী কৃষ্ণ-কীর্তন, তাঁর সুরেলা পদাবলী এবং মিথিলার বিদ্যাপতির[৩৪] পদাবলীতে বাংলায় লোকপ্রিয় বৈষ্ণববাদের ধারা প্রকাশ পায়। পর্যালোচনাধীন সময়কালে চৈতন্য এটাকে একটা বাস্তবরূপ দান করেন যা তখন পর্যন্ত এর ছিল না।

চৈতন্য ১৪৮৬ সালে নবদ্বীপের এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মনে হয় সংস্কৃত বিদ্যালয়ে তাঁর প্রাথমিক শিক্ষালাভ ঘটেছিল। শৈশবে তাঁর পিতার মৃত্যু হলে সংসারের সমস্ত দায়িত্ব তাঁর কাঁধে এসে পড়ে। পূর্ব বাংলায় ভ্রমণকালে তাঁর অনুপস্থিতিতে দুর্ঘটনায় মারা যান তাঁর স্ত্রী লক্ষ্মী, পরে তিনি বিষ্ণুপ্রিয়া নামে এক ব্রাহ্মণ মেয়েকে বিয়ে করেন—এ হচ্ছে তাঁর জীবনের প্রথমদিকের কিছু ঘটনা। তাঁর জীবনে যে মহাপরিবর্তন এসেছিল তার কারণ হিসেবে সাধারণত তাঁর প্রায় ২২ বছর বয়সে পিতার শ্রাদ্ধ সম্পাদন উপলক্ষে গয়া গমনকে নির্দেশ করা হয়। এ বিখ্যাত স্থানেই ঈশ্বরপুরী নামে এক আধ্যাত্মিক সন্ন্যাসী তাঁকে কৃষ্ণমন্ত্র দিয়েছিলেন। তাঁর সাহচর্য এবং গয়ার পবিত্র পরিবেশ একসাথে মিলে তাঁর মনে তখন পর্যন্ত সুপ্ত প্রবল ধর্মীয় চেতনাকে জাগিয়ে

তুলে। পুরীর কাছ থেকে ফিরে এসে তিনি কৃষ্ণপ্রেমে পরিপূর্ণভাবে সিক্ত এক নতুন জীবন শুরু করেন। আবেগপূর্ণ সঙ্গীত-নৃত্য এবং অতীন্দ্রিয় ভাববিহ্বল অবস্থা ছিল এ নতুন জীবনের বৈশিষ্ট্য। অতি শীঘ্রই নিত্যানন্দ, অদ্বৈত এবং অন্যান্যরা তাঁর সঙ্গে যোগ দেন এবং তাঁরা তাঁকে ভগবদ্ভক্তির মূর্তপ্রতীক বলে গণ্য করেন। কীর্তন নামে অভিহিত সঙ্গীতধর্মীয় উপাসনা প্রকাশ্যে এত করা হতো যে নবদ্বীপের একদল গোঁড়া ব্রাহ্মণ এর বিরোধিতা করেছিলেন। ১৫১০ সালে কাটওয়ার কেশব ভারতীর কাছে সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষা গ্রহণের পর চৈতন্য ধর্মযাত্রায় বেরিয়ে পড়েন এবং দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের বহু অংশ ভ্রমণ করেন। এ ভ্রমণকালে তিনি স্বল্পসময়ের জন্য বৃন্দাবনও পরিদর্শন করেছিলেন। চৈতন্যবাদের ইতিহাস ও দর্শনের জন্য রূপ, সনাতন এবং উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্রের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পরমান্দদায়ক আবেগে নেচে গেয়ে জীবনের বাকি ১৮ বছর তিনি পুরীতেই কাটান। ১৫৩৩ সালে তিনি দেহত্যাগ করেন।[৩৫]

বৈষ্ণববাদের ইতিহাসের সঙ্গে চৈতন্যের নাম ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হয়ে পড়লেও তিনি এ সম্প্রদায়ের জন্য কোনো ধর্মতাত্ত্বিক বা দার্শনিক তত্ত্ব তৈরি করেছিলেন বলে মনে হয় না। সম্ভবত শিক্ষাষ্টক বা আটটি শিক্ষা ছাড়া তিনি কোনো ধর্মীয় গ্রন্থও রচনা করেন নি। এটা অনুবাদ করলে এরকম দাঁড়ায় "শ্রীকৃষ্ণের নামকীর্তন জয়ী হোক যা মনের দর্পণকে স্বচ্ছ করে, জীবনের মহা-দাবানলকে নিভিয়ে দেয়, মঙ্গলের শ্বেতপদ্মের রশ্মি ছড়িয়ে দেয়, জ্ঞানের জীবনকে বাঁচিয়ে রাখে যা হচ্ছে অমৃততুল্য, সুখের সাগরকে প্রসারিত করে, প্রতি পদে পূর্ণ শান্তির স্বাদ গ্রহণ করায় এবং সম্পূর্ণ আত্মাকে অবগাহন করায়। এ নামের বিভিন্ন অবয়ব তুমি সৃষ্টি করেছিলে এবং তাতে তুমি তোমার সর্বশক্তি আরোপ করেছ; নিয়মিতভাবে সেটা স্মরণ করার কোনো সময় নেই। হে ভগবান, এমনই তোমার কৃপা, কিন্তু আমি এতই হতভাগ্য যে এ জীবনে এরজন্য কোনো প্রেম আমার মধ্যে জন্মে নি। নিজেকে তৃণের চেয়ে তুচ্ছ বিবেচনা করে একজনের হরির নাম জপ করা উচিত, তাকে হতে হবে গাছের চেয়ে বেশি ধৈর্যশীল, মর্যাদা-জ্ঞানশূন্য, কিন্তু যথাযোগ্য স্থানে শ্রদ্ধা প্রদর্শনে প্রস্তুত। হে নন্দের পুত্র, আমি তোমার দাস, জীবন সমুদ্রের বিক্ষুব্ধ জলে পড়েছি। কাজেই দয়া করে আমাকে তোমার চরণ-পদ্মের ধূলির তুল্য গণ্য কর। তোমার নাম জপের সময় কখন আমার চোখে অবিরামধারায় জল ঝরবে, অদম্য শব্দে আমার কণ্ঠরুদ্ধ হবে এবং আমার দেহ আনন্দে পূর্ণ হবে? ধন নয়, কুটুম্বিতা নয়, সুন্দরী নারী নয়, উত্তম কাব্য-প্রতিভাও আমি চাই না, হে ভগবান। আমার নিঃস্বার্থ ভক্তিকে তোমার দিকে প্রবাহিত কর—সর্বজীবনে তুমিই আমার ঈশ্বর। গোবিন্দের সঙ্গে বিচ্ছেদের ফলে এক মুহূর্ত হয়েছে একযুগ, চোখ হয়েছে মুষলধারে বৃষ্টির মতো এবং সারাবিশ্ব হয়ে পড়েছে শূন্য। সে আমাকে আলিঙ্গন করুক অথবা তার পদসেবায় নিয়োজিত আমার সত্তাকে অবজ্ঞাভরে পদদলিত করুক অথবা তাকে না দেখায় আমার মনে দারুণ দুঃখ হানুক। সেই দুষ্ট ছেলেটা যা খুশি করুক। সে ছাড়া আর কেউই আমার হৃদয়েশ্বর নয়।"[৩৬] অনুভূতির গভীরতা ও বৈষ্ণবীয় নম্রতা এবং দেবতার ইচ্ছার কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের প্রতি ভক্তের মনোভাব নির্দেশকারী বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত চৈতন্যের সরল ভক্তিবাদ প্রকাশ করা

ছাড়া কবিতার এ চরণগুলি কোনো ধর্মতাত্ত্বিক অর্থ বহন করে বলে মনে হয় না। অবশ্য কেউ কেউ শেষ চরণে চৈত্‌ন্যের অবলম্বিত রাগানুরাগ পদ্ধতির উপাসনার মতবাদ দেখতে পারেন। সুতরাং প্রবল আবেগে কৃষ্ণপ্রেম হচ্ছে চৈতন্যের ধর্মের মূলনীতি।

বাংলায় চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণববাদের ইতিহাস দু'টি স্বতন্ত্র ধর্মীয় রীতি দ্বারা চিহ্নিত। এর একটি বিকাশ লাভ করেছিল বৃন্দাবনে, অন্যটি নবদ্বীপে। বৃন্দাবন রীতির প্রতিনিধিত্ব করেছেন ছয়জন গোস্বামী। কথিত আছে যে এদের কাউকে কাউকে চৈতন্য বৈষ্ণবদের উপদেশাবলি ও ধর্মমতগুলিকে প্রণালীবদ্ধ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।[৩৭] সংস্কৃতে রচিত তাঁদের বৃহৎ গ্রন্থাবলীতে কৃষ্ণ-পূজার বিস্তারিত দর্শন, ধর্মমত ও নীতিবিদ্যা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এগুলির সঙ্গে বাংলার বৈষ্ণবরা সপ্তদশ শতাব্দীর আগে পরিচিত ছিল না। তাদের ধর্মমত এবং রসশাস্ত্র "ইচ্ছাকৃত পরবর্তী বিকাশের ব্যাপার হওয়ায়[৩৮] আমাদের আলোচনার আওতায় আসে না। চৈতন্যের জীবনের অতীন্দ্রিয়বাদী বিহ্বল আবিষ্ট পরমানন্দিত অবস্থা দেবতার সঙ্গীতময় উপাসনা এবং রহস্যময় ঘটনাবলি ছিল তাঁর নবদ্বীপের প্রত্যক্ষ ও তাৎকালিক অনুসারীদের প্রধান সংশ্লিষ্ট বিষয়। বৈষ্ণববাদের ধর্মমত বা শ্রীচৈতন্যের শিক্ষাবলি ব্যাখ্যা করার দিকে তেমন মনোযোগ না দিয়ে তারা বেশ কিছু সংখ্যক জীবনীগ্রন্থ রচনা করে তাদের সরল ভক্তিমূলক ধর্মবিশ্বাসকে প্রকাশ করেছেন। নবদ্বীপচক্রের বৈষ্ণবদের ধর্মীয় ধারণা মুরারিগুপ্ত, কবিকর্ণপুর, বৃন্দাবনদাস, লোচনদাস এবং জয়ানন্দের রচনাবলিতে সংরক্ষিত রয়েছে। একই সময়ে বৃন্দাবনে কি ঘটছিল সে সম্পর্কে কোনো অভিজ্ঞতা তাঁরা প্রকাশ করেন নি। এ অবস্থা এটাই ইঙ্গিত দেয় যে বৃন্দাবনের গোস্বামীদের কাছ থেকে তারা সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ছিলেন।

চৈতন্য তাঁর নবদ্বীপের ভক্তদের কাছে ছিলেন এক জীবিত বাস্তবতা। তাঁকে পরমতত্ত্ব বা চরম সত্যরূপে গণ্য করা হতো, ফলে তিনি হয়ে পড়েন প্রত্যক্ষ পূজ্য বস্তু। উপাসনার সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তুরূপে[৩৯] মুরারিগুপ্ত তাঁর মহাপ্রকাশ ও মহাভিষেকের (মহা প্রকাশ ও মহান পবিত্রকরণ) এক যথেষ্ট দীর্ঘ বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি চতুর্বাহু বিষ্ণু[৪০], চৈতন্যের প্রতি যথাযোগ্য শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছেন, ভাগবতরূপে তাঁকে চিহ্নিত[৪১] এবং কলিযুগে অবতার রূপে গণ্য করেছেন।[৪২] কবি কর্ণপুর তাঁকে দ্বিবাহু, চতুর্বাহু ও ষড়বাহুর আকারে চিত্রিত করেছেন এবং তিনি বিশ্বাস করেন যে মানুষকে দুঃখ থেকে রক্ষা করা এবং হরিকে ভগবদ্ভক্তির রীতি শিক্ষা দেওয়ার জন্য মর্তে তাঁর আগমন ঘটেছিল।[৪৩] আবেগপ্রবণ উপাসনা বা রাগানুরাগ ভক্তি এবং শাস্ত্রীয় বিধি নিয়ন্ত্রিত উপাসনা বা বৈধি ভক্তির মধ্যে তিনি একটা স্পষ্ট পার্থক্য করেছেন এবং শেষোক্তটির চেয়ে প্রথমোক্তটিকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন।[৪৪] মুরারি এবং কবিকর্ণপূর দু'জনই মনে করেন যে অদ্বৈতবাদের খণ্ডন ছিল তাঁর মর্তে আগমনের অন্যতম উদ্দেশ্য [৪৫]। সম্ভবত এর কারণ ছিল এই যে এতে ভক্ত ও দেবতার মধ্যে পার্থক্যকারী দ্বৈতবাদী ভক্তিধারণার কোনো স্থান ছিল না। বৃন্দাবনদাস বিনা আপত্তিতে চৈতন্যের দেবত্ব এবং কৃষ্ণরূপে শনাক্তকরণ[৪৬] মেনে নিয়েছেন। চৈতন্যকে নাগর বা প্রিয়তম এবং তাঁর ভক্তদের নাগরী বা চৈতন্য-প্রেমিকা বলে গণ্য করে লোচনদাস[৪৭] ও অন্যদের বর্ণিত মতবাদ কৃষ্ণদাস বাতিল করে দিয়েছেন। এ মতবাদের

সমর্থকরা চৈতন্যের নবদ্বীপের জীবনকে কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলার প্রতিরূপ হিসেবে বিবেচনা করেছেন। সমকালীন কিছুসংখ্যক পদ-রচয়িতা মনে হয় তাঁকে রাধা ও কৃষ্ণ উভয়ের অবতার বিবেচনা করে চৈতন্যের উপর রাধাভাব আরোপ করেছেন।

সে সময়ের বৈষ্ণব সাহিত্যে আমরা অবতারবাদের একটি সুসম্বদ্ধ তত্ত্ব দেখতে পাই। বৃন্দাবন দাস অবতারদের এক দীর্ঘ তালিকা দিয়েছেন : মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃ-সিংহ, বাসন, পরশুরাম, রাম, হলধর, বুদ্ধ, কল্কী, ধন্বন্তরী, হংস, নারদ, ব্যাস, কৃষ্ণ এবং চৈতন্য। এরা ভাগবতরূপে চিহ্নিত। এরা সবাই একই বাস্তবতার প্রকাশ বলে বিবেচিত যারা আবার যথাক্রমে সাদা, লাল, কাল, এবং হলুদ আকারে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলিযুগে মর্তে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।[৪৮] বৃন্দাবনদাসের তত্ত্ব মনে হয় মুরারিগুপ্তের চৈতন্য-চরিতামৃত এবং জয়দেবের গীত-গোবিন্দে প্রাপ্ত অবতারবাদের তত্ত্ব দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। মুরারির মতানুসারে শুক্ল, যজ্ঞ, পৃথু এবং চৈতন্য যথাক্রমে চার যুগের অবতার এবং কার্যাবতাররা হচ্ছেন মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, ভার্গব, রামকৃষ্ণ, বুদ্ধ এবং কল্কী।[৪৯] এখানে এটা লক্ষ্য করা কৌতূহলোদ্দীপক যে বৃন্দাবনদাসের তালিকার প্রথম দশজন অবতার ঠিক একই ক্রমানুসারে গীত-গোবিন্দের দশাবতার স্তোত্রে (দশ অবতারের প্রশংসায় স্তবগান) দেখা যায়।[৫০] এটাকে সামান্য পরিবর্তিত আকারে মুরারিগুপ্ত গ্রহণ করেছেন। পর্যালোচনাধীন সময়কালে বৈষ্ণব কবিরা এতে চৈতন্যের জন্য একটা স্থান লাভের জন্য মনে হয় অবতারদের গতানুগতিক তালিকা মেনে নিয়েছিলেন।

গৌরগনোদ্দেশদীপিকায় কবিকর্ণপুর পঞ্চতত্ত্ব মতবাদে দেবতাদের বহুত্বের কথা স্বীকার করেছেন।[৫১] এ মতবাদ উপাসনার পাঁচ বস্তু হিসেবে চৈতন্য, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, গদাধর এবং শ্রীবাসকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। এ মতবাদের সমর্থকরা দেবতাদের ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিন্যাস কল্পনা করেছিলেন কারণ তাঁরা চৈতন্যকে মহাপ্রভু এবং নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতকে প্রভুরূপে গণ্য করতে ইচ্ছুক। বৃন্দাবনদাস যখন চৈতন্য-ভাগবত রচনা করেছিলেন প্রায় সেই একই সময়ে নবদ্বীপের বৈষ্ণবরা সম্ভবত বহু দলে বিভক্ত ছিলেন। প্রত্যেকটি দলই অদ্বৈত, নিত্যানন্দ এবং গদাধরের মতো চৈতন্যের প্রত্যক্ষ অনুসারীদের এক এক জনের সঙ্গে নিজেদেরকে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত করেছিলেন।[৫২] ষোড়শ শতাব্দীর নবদ্বীপের বৈষ্ণবদের রচনায় আমরা যে ধর্মীয় ধারণা আকস্মিকভাবে দেখতে পাই তা থেকে মনে হয় এ ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে নবদ্বীপ-রীতির নিজের কোনো সুবিন্যস্ত দার্শনিক তত্ত্ব ছিল না।

নবদ্বীপ রীতির আসল প্রকৃতি যাই হোকনা কেন, মধ্য যুগের বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতির ওপর চৈতন্যবাদের প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। আবেগপ্রবণ উপাসনাপদ্ধতির উপর চৈতন্য গুরুত্ব দিয়েছিলেন এবং এটা বৈষ্ণববাদকে অতিরিক্ত আকর্ষণ দান করেছিল এবং একে শুধু বাংলা ও উড়িষ্যায়ই নয়, সম্ভবত ভারতের অন্যান্য কিছু অঞ্চলেও বহুল পরিচিতি করে তুলেছিল। এটা একটা ঐশ্বর্যশালী বাংলা ও সংস্কৃত সাহিত্যের সৃষ্টি করেছিল[৫৩] যাকে সামাজিক-ধর্মীয় তথ্যের ভাণ্ডাররূপে গণ্য করা যেতে পারে। চৈতন্য বর্ণপ্রথা লোপ না করলেও[৫৪] তিনি তার আবেগপ্রধান ধর্মকে বর্ণ ধর্ম নির্বিশেষে সকল লোকের জন্য উন্মুক্ত

করে দিয়েছিলেন।[৫৫] এ সর্বজনীন মনোভাব ছিল গোঁড়া ব্রাহ্মণ্যবাদের মূলনীতির প্রবলভাবে বিপরীতধর্মী। এটা তখনকার দিনে একটা গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক বিপ্লবের পর্যায়েই পড়ে।

চৈতন্যবাদের উদ্ভব ও বিকাশ এবং এর ফলস্বরূপ বাঙালি জনগোষ্ঠীর এ গুরুত্বপূর্ণ অংশের মানসিক উদারতার পিছনে কি কি কারণ কাজ করেছিল তা নির্ধারণ করা মুশকিল। এ আন্দোলনের বিস্তীর্ণ সমাজতাত্ত্বিক পটভূমির পরিপ্রেক্ষিতে একে বুঝা প্রয়োজন। এ পটভূমি সম্পর্কে সমকালীন সাহিত্যে প্রচুর তথ্য পাওয়া যায়। মনসা, চণ্ডী এবং ধর্মের মতো স্থানীয় পূজা-পদ্ধতিগুলি গোঁড়া ব্রাহ্মণদের শ্রেণীবিন্যাসের প্রত্যক্ষভাবে বিরোধিতা করেছিল বলে মনে হয়।[৫৬] এ ব্রাহ্মণরা প্রাচীন ও মধ্যযুগের আইনগত ও ধর্মবিষয়ক গ্রন্থাদিতে উপস্থাপিত প্রাচীন ও কঠোর সামাজিক-ধর্মীয় বিধিগুলির পুন:প্রবর্তন করে নিজেদেরকে স্থানীয় প্রভাব থেকে দূরে রাখতে চেয়েছিলেন।[৫৭] ব্রাহ্মণদের আত্মকেন্দ্রিক ও পরিতৃপ্ত মনোভাব নিশ্চয়ই তাঁদের উঁচুশ্রেণী ও সমাজের নিম্নতর শ্রেণীর মধ্যে প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় বাধার সৃষ্টি করে ছিল। রাজনৈতিকভাবে মুসলমানদের কর্তৃত্বাধীন বাংলার হিন্দুরা ক্রমশ মুসলমান ধারণা ও রীতির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়ছিল। অন্যত্র আমরা এ ইঙ্গিত দিয়েছি যে স্থানীয় কিছু পূজা-পদ্ধতি এবং তাদের দর্শন-পদ্ধতির অন্তর্নিহিত অতীন্দ্রিয়বাদী ধারণার প্রতি ইসলাম ছিল সহানুভূতিশীল ও আপোস-মনোভাবাপন্ন। এ পরিস্থিতিতে ইসলামে ধর্মান্তরিতদের সংখ্যা নিশ্চয়ই বৃদ্ধি পেয়েছিল। ব্রাহ্মণদের তর্ক দ্বারা লাভের মৌলিক মানসিক শক্তির প্রকাশ ঘটেছিল নব্যন্যায় নামে অভিহিত জ্ঞানের এক অত্যন্ত দুর্বোধ্য শাখার চর্চায়। এটা বিশুদ্ধ বুদ্ধিবাদের এক উষর পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল বলে মনে হয় যার বিরুদ্ধে বৈষ্ণবরা প্রবল প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিল।[৫৮] চৈতন্য ও তাঁর অনুসারীরা কেন জ্ঞানের চেয়ে ভক্তির পথ বেশি পছন্দ করেছিলেন এ থেকে তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।[৫৯] চৈতন্যের জন্মের প্রাক্কালে নবদ্বীপের সামাজিক-ধর্মীয় অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বৃন্দাবনদাস আক্ষেপ করে বলেছেন যে লোকেরা চণ্ডী, মনসা এবং বাশুরীর মতো শাক্ত-তান্ত্রিক দেবীদের পূজা করত এবং এমন কি যারা গীতা এবং ভাগবত-এর মতো ধর্মগ্রন্থ পড়তেন তারাও কৃষ্ণ বা বিষ্ণুর উপাসনার প্রতি কোনো গুরুত্ব আরোপ করতেন না।[৬০] সমকালীন লেখকরা বিশ্বাস করতেন যে ভক্তি পূজার পূর্ণ প্রতিষ্ঠার জন্যই চৈতন্য মর্তে নেমে এসেছিলেন।[৬১] চৈতন্য আন্দোলনের উদ্ভবের প্রাক্কালে বাংলার সামাজিক-ধর্মীয় অবস্থা বিবেচনা করে এটা মনে করা যেতে পারে যে বাংলার হিন্দুসমাজের কিছু পরস্পরবিরোধী অংশের মধ্যে বিদ্যমান বিরোধ দূর করার উদ্দেশ্যে কিছু সামাজিক প্রয়োজনে সাড়া দিয়ে সম্ভবত এর উদ্ভব হয়েছিল।

৩.

বাংলার ধর্মীয় জীবনে বৌদ্ধধর্ম তখন আর কোনো প্রধান শক্তি ছিল না যদিও সে আমলের বিভিন্ন খ্যাত-অখ্যাত ধর্মবিশ্বাসের অতীন্দ্রিয়বাদী দর্শনে হয়তো এর প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। সমসাময়িক সাহিত্যে বৌদ্ধদের উল্লেখ পাওয়া যায় এবং এরাই সম্ভবত চৈতন্যের

অনুসারীদের নিন্দার লক্ষ্যবস্তু ছিলেন। কবিকর্ণপুর তাঁর চৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটকের ২য় অঙ্কে বৌদ্ধ, তান্ত্রিক, মায়াবাদী, জৈন, কাপালিক এবং পাশুপতদের প্রভাবের জন্য আক্ষেপ করেছেন এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যের কাছে বৌদ্ধদের পরাজিত হয়ে বৈষ্ণবদের কৃষ্ণের সঙ্গীতময় পূজা পদ্ধতির রীতি গ্রহণ করার বর্ণনা দিয়েছেন।[৬২] বৃন্দাবনদাস এতদূর পর্যন্ত বলেছেন যে তাঁর প্রভুনিত্যানন্দ আকস্মিক ক্রোধের বশে বৌদ্ধদের পদাঘাত করেছিলেন।[৬৩] এসব শুধু বৌদ্ধদের প্রতি বৈষ্ণবদের শত্রুতার ইঙ্গিতই দেয় না, সম্ভবত এগুলি মধ্যযুগের বাংলায় বৌদ্ধধর্মের ক্ষয়িষ্ণু অবস্থাও নির্দেশ করে। কিন্তু আলোচ্য আমলে হিন্দুদের সাংস্কৃতিক জীবনে বৌদ্ধধর্ম তার প্রভাব ফেলতে ব্যর্থ হয় নি। রায়মুকুট বৃহস্পতির সংস্কৃত রচনাবলিতে বৌদ্ধ প্রভাব প্রকাশ পায়[৬৪] এবং সমকালীন প্রামাণ্য বৈষ্ণব রচনাবলিতে বুদ্ধকে বিষ্ণুর অবতাররূপে গণ্য করা হয়েছে। বৈষ্ণব রচনাবলিতে পরিলক্ষিত পরস্পরবিরোধী ধর্মীয় মতবাদের সমন্বয়ের প্রবণতা ছিল সম্ভবত পরম্পরাগত প্রকৃতির, কারণ এ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল জয়দেবের আমলে।[৬৫]

চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগে সময়কাল নির্ধারিত অনিশ্চিত সাভার লিপির প্রারম্ভে উপস্থিত বৌদ্ধমন্ত্রাদি উচ্চারণপূর্বক মিনতিপূর্ণ আহ্বান,[৬৬] শ্রী অমিতাভ নামে একজন সদ্বৌদ্ধ-করণ-কায়স্থ-ঠাকুর কর্তৃক বেনু গ্রামে ১৪৩৬ সালে মহাযান গ্রন্থ বোধিচর্যাবতার এর অনুলিপি প্রস্তুত[৬৭], এবং চণ্ডীদাস কর্তৃক বুদ্ধের ত্রি-মূর্তি অবতারের[৬৮] উল্লেখ, যা সম্ভবত বৌদ্ধধর্মের 'ত্রি-রত্নের' স্মৃতি জাগায়—এগুলি হচ্ছে কতকগুলি খাপছাড়া উপাদান যা আমাদের মুসলমান আমলের বাংলায় প্রচলিত বৌদ্ধধর্মের আসল প্রকৃতি সম্পর্কে কোনো সঠিক ধারণা গঠন করতে সাহায্য করে না। মন্ত্রায়ণ, বজ্রায়ণ, কালচক্রায়ণ এবং সহজয়ান[৬৯] পর্যায় অতিক্রম করে বৌদ্ধধর্ম ক্রমশ যৌগিক রহস্যমূলক প্রথার উপর গুরুত্ব আরোপ করছিল যা ছিল প্রকৃতিগতভাবে তান্ত্রিক দর্শনে প্রাপ্ত রীতির অনুরূপ। তান্ত্রিক দর্শন শতাব্দীর কালপরিক্রমণে বৌদ্ধধর্মকে আত্মস্থ করে নিয়েছিল বলে মনে হয়। বাংলায় মুসলমান শাসন শুরুর কিছুকাল পরে অঙ্গীভূত করার এ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়েছিল। বৌদ্ধধর্মের যা কিছু বাকি রইল তা নিশ্চিতরূপে এর তান্ত্রিকরূপ যা আমরা দেখতে পাই চর্যাগীতিতে। অনিবার্য ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় রূপান্তর লাভ করে চৈতন্যোত্তরকালে এটা সহজিয়া বৈষ্ণববাদ[৭০] নামে পরিচিত হয়েছিল।

চৈতন্য-ভাগবতে নিত্যানন্দের দীর্ঘ ভ্রমণ এবং ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের বিবরণ পাওয়া যায়।[৭১] নিত্যানন্দ আদিতে ছিলেন অবধূত সম্প্রদায়ের সদস্য যা ছিল সম্ভবত তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের শাখা। উল্লিখিত গ্রন্থ এ সম্প্রদায়ের গুপ্তরীতিসমূহ ও অভ্যন্তরীণ মতবাদগুলি সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট চিত্র আমাদের দান না করায় এটা মূল বৌদ্ধধর্মের কাছে কতটা ঋণী বা তান্ত্রিকবাদ বা শৈবধর্মের কাছে কতটা ঋণী তা নির্ধারণ করা মুশকিল। এটা মনে হয় যথেষ্ট নিশ্চিত যে এ সম্প্রদায়ের অনুসারীরা অবধূতি স্নায়ুর উপর গুরুত্ব আরোপ করত যেটিকে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের সুষুম্নারূপে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং যা হঠযৌগিক দৈহিক অনুশীলনে এক অপরিহার্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।[৭২] চর্যাগীতিতে প্রায়ই অবধূতিকার উল্লেখ পাওয়া যায় যা বৌদ্ধ সহজিয়াদের যৌগিক তপশ্চর্যার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যরূপে

জড়িত। অবধূতি স্নায়ুকে বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে : যা দুঃখের পাপকে সহজে শেষ করে, যা শুরু না থাকা অস্তিত্বের চিন্তা-সৃষ্টিকে ধ্বংস করে এবং এটা উজ্জ্বল প্রকৃতি যা সব পাপ ধ্বংস করে।[৭৩] বৌদ্ধ সহজিয়ারা বিশ্বাস করত যে সহজ বা সর্বোচ্চ অভীষ্ট লাভ হচ্ছে প্রজ্ঞা ও উপায়ের অদ্বৈত মিলন অবস্থা, যা হচ্ছে সর্বোচ্চ অভীষ্টের নারী ও পুরুষ রূপ। এটা অর্জন করা যায় দক্ষিণ ও বাম স্নায়ু নিয়ন্ত্রণ করে এবং নারী শক্তি চণ্ডালী বা অবধূতিকাকে মধ্যস্নায়ু অবধূতির মাধ্যমে উপরের দিকে গুরুমস্তিষ্ক অঞ্চলের দিকে প্রেরণ করে।[৭৪] মধ্যস্নায়ু অবধূতিকা বা একই নামের নারী-শক্তির নাম থেকে, যার প্রতিরূপ হিন্দুতন্ত্রে কুন্ডলিনী শক্তি নামে অভিহিত[৭৫] সম্ভবত অবধূত সম্প্রদায়ের নামকরণ করা হয়েছে। এ সম্প্রদায় মনে হয় প্রাথমিক বৌদ্ধ সহজিয়া দর্শনের, যা তান্ত্রিক ধরনের বৌদ্ধধর্মের প্রতিনিধিত্ব করে, কিছু পার্থক্যসূচক বৈশিষ্ট্য ধরে রেখেছিল। মনে হয় যে এ সম্প্রদায়ের অনুসারীরা দৈহিক অনুশীলনের পশ্চাদগামী পদ্ধতি অবলম্বন করেছিল যা ছিল মধ্যযুগের বাংলার প্রায় সকল অখ্যাত ধর্মপদ্ধতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।[৭৬]

৪.

পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর বাংলার ধর্মীয় জীবনে ধর্মপূজা মনে হয় একটি নিয়মিত স্থান দখল করেছিল। এ পূজাপদ্ধতির সামান্য প্রামাণিক সাক্ষ্য বিপ্রদাসের মনসা-বিজয়ে পাওয়া যায়। শিবের অনুপস্থিতিতে শ্বেতধর্ম তার গৃহে গেলে গঙ্গা কিভাবে তার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সাদা হয়ে গিয়েছিল তার বর্ণনা বিপ্রদাস দিয়েছেন। ফিরে এসে তখন সাদা বিছানায় উপবিষ্ট গঙ্গার সর্বস্বসাদা দৃশ্য দেখে শিব দারুণ অভিভূত হয়েছিলেন এবং তাঁর অনুপস্থিতিকালে কি ঘটেছিল তা জানতে পারেন। বস্তুত ধর্মকে দেখার জন্য বার বছর ধরে শিব বল্লুকা নদীর তীরে কঠিন প্রায়শ্চিত্ত করছিলেন। সর্বোচ্চ অভীষ্ট ধর্ম কর্তৃক অনুগৃহীত গঙ্গাকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু, লক্ষ্মী এবং ইন্দ্রসহ বেশ কিছু দেব-দেবী এসেছিলেন।[৭৭] এটা কল্প-কাহিনীধর্মী হলেও এ কাহিনী মনে হয় ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব-হিন্দু এ ত্রিমূর্তির চেয়ে ধর্মের শ্রেষ্ঠত্বকে গুরুত্বদান করে যা ধর্মপূজার অনুষ্ঠানাদি সম্পর্কিত শাস্ত্রীয় গ্রন্থের একটা বেশ বড় বৈশিষ্ট্য।[৭৮] এটা বিশ্বাস করা হয় যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির পর ধর্ম শিবকে সৃষ্টির দায়িত্ব দান করেন[৭৯], এ ধারণা হচ্ছে ধর্মবাদী পৌরাণিক কাহিনীর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি সম্পর্কে ধারণার প্রতিধ্বনি।[৮০] ধর্মবাদীদের প্রথাগত ধারণা অনুসরণ করে বিপ্রদাস ধর্মকে একজন গৌরবর্ণ দেবতারূপে চিত্রিত করেছেন, ধর্ম সাদা ছাতা ব্যবহার করেন, পৌরাণিক প্যাঁচা উলুকের পিঠে চড়ে ঘুরেন এবং হাতে একটি ছড়ি ও জলপাত্র বহন করেন।[৮১] ধর্মের সঙ্গে মনসার পরোক্ষ সম্পর্ক সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কবি বলেছেন যে ধর্ম শিবকে কালিদহের কমলবন থেকে মনসাকে খুঁজে বের করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।[৮২]

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ধর্মপূজাকে বৌদ্ধধর্মের প্রশাখারূপে বিবেচনা করেছেন [৮৩]—এ তত্ত্ব বর্তমানে অস্বীকৃত।[৮৪] সুকুমার সেন মনে করেন যে ধর্ম হচ্ছে "প্রধানত ডোম ও অন্যান্য যোদ্ধা-উপজাতির যুদ্ধ-দেবতা।" তিনি যুক্তি দেখিয়েছেন যে, এ ধর্মবিশ্বাস অত্যন্ত আদিম এবং সম্ভবত অস্ট্রিক মূলোদ্ভূত যা বৈদিক সূর্যদেবতা বরুণ, ইরানি সূর্যদেবতা, পৌরাণিক

অবতার কল্কী, কচ্ছপ অবতার ও অন্যদের বিমূর্তনসহ বিভিন্ন ধরনের আর্য ও অনার্য উপাদান আত্মভূত করেছিল। তিনি আরও যুক্তি দেখান যে, ধর্মকে যে সাদা ছাগল উৎসর্গ করা হয় সেটা পৌরাণিক কাহিনীর নবীন বালকের প্রতিকল্প এবং এ কাহিনীর সঙ্গে জড়িত রাজা হরিশচন্দ্রের পুত্র রোহিতাশ্বের পরিবর্তে অজিগর্ত নামক ব্রাহ্মণের শুনহশেপকে বলিদানের ঐত্রেয়ী ব্রাহ্মণের গল্পটি সম্ভবত অস্ট্রিক মূলোদ্ভূত একটি উপাখ্যান যা প্রাক-বৌদ্ধ যুগে ব্রাহ্মণ সাহিত্যে ঢুকে পড়েছিল।[৮৫]

৫.

মনে হয় বাংলায় প্রচলিত গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয়-দার্শনিক প্রণালীগুলির মধ্যে নাথবাদ ছিল একটি। গোরক্ষনাথ ও মৎসেন্দ্রনাথের জনপ্রিয় কাহিনীর একটি কাব্য রূপ গোরক্ষ-বিজয়ে রয়েছে যা নিশ্চয়ই সে যুগের লোকের মধ্যে বহুল প্রচলিত ছিল। মৃগাবতীর কবি কুতবন পুঁতির মালা, জটপাকানো লম্বা চুল, ঘুর্ণমান চাকা, আংটি, জপমালা, লাঠি, মাটির পাত্র, পায়ে বাঁধা কাঠের কুঁদা, হার, চামড়া, তার গোবর-ভস্ম, ত্রিশূল, বীণা ও থলি দ্বারা জমকালোভাবে সজ্জিত গোরক্ষপন্থী সন্ন্যাসীদের ঘুড়ে বেড়ানোর বর্ণনা দিয়েছেন।[৮৬] দাবিস্তানের লেখক মুহসীন ফনী গোরক্ষনাথের আচার-ব্যবহার, প্রথা এবং ধর্মীয় রীতির এক ভীষণ অদ্ভুত বিবরণ দিয়েছেন।[৮৭] এ পূজা-পদ্ধতি যে শুধু বাংলায় নয়, বিহার, উত্তর ও উত্তর পশ্চিম ভারত এবং মারাঠা অঞ্চলেও প্রচলিত ছিল সাহিত্যিক প্রমাণাদি থেকে তা দেখতে পাওয়া যায়।[৮৮]

শৈব-তান্ত্রিক পূজা-পদ্ধতির অনুসারীরা অমরত্ব অর্জনকে তাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য বলে বিবেচনা করত। তারা বিশ্বাস করত যে যৌগিক-তান্ত্রিক নিয়মানুবর্তিতার কিছু পদ্ধতি গ্রহণের দ্বারা বিশ্রামের মৌলিকসত্য শিব এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যবস্তু সম্বন্ধীয় অভিব্যক্তির মৌলিক সত্য শক্তির মধ্যে এক মিলন অবস্থা আনয়ন করে পরিণত দেহে মুক্তি অর্জন করা সম্ভব। তদানুসারে তারা নাথপন্থীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দ্রষ্টব্য স্নায়ু ও ষড়-বৃত্তের এক তত্ত্বের বিকাশ ঘটিয়েছিল যাতে সে মেরুদণ্ডের শেষভাগে অবস্থিত মূলাধারচক্রে সুপ্ত কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করে একে উপরের দিকে গতিসম্পন্ন করতে পারে এবং শেষপর্যন্ত একে মস্তকের সহস্রারে শিবের সঙ্গে যুক্ত করতে পারে।[৮৯] দৈহিক ও মনস্তাত্ত্বিক এ পশ্চাদগামী অনুশীলনের প্রক্রিয়ার সঙ্গে সোহংমন্ত্র আবৃত্তি (বা সে-ই আমি এ স্ত্রোত্র) এবং হৃদপিণ্ডে অবস্থিত অনাহত-চক্র থেকে নির্গত অনাহতনাদ উৎপাদনও জড়িত ছিল।[৯০] নাথ ও ধর্মপূজা পদ্ধতিতে প্রাপ্ত শূন্যতা বা অসারতার ধারণা সম্ভবত অস্ট্রিক মূলোদ্ভূত—অস্ট্রিক জাতিভুক্ত পলিনেশীয় জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় বিশ্বাসে এর উপস্থিতি এ ইঙ্গিতকে জোরদার করে। বৌদ্ধধর্মে প্রাপ্ত শূন্যতার ধারণা সম্ভবত তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের উপর ধর্মপূজাপদ্ধতির প্রভাবের ইঙ্গিত দান করে।[৯১]

৬.

অন্যান্য পূজাপদ্ধতির মধ্যে মনসা ও চণ্ডীর পূজা-পদ্ধতি ছিল বিখ্যাত। অন্যত্র আমরা মনসার লৌকিক উপাখ্যান সম্পর্কিত দেশীয় সাহিত্যের আলোচনা করেছি [৯২] এবং সর্প-

দেবীর পূজার সঙ্গে জড়িত অনুষ্ঠানাদি ও কুসংস্করাচ্ছন্ন ধর্মীয় বিশ্বাসের কথা উল্লেখ করেছি।[৯৩]-এ পূজা-পদ্ধতি সংমিশ্র প্রকৃতির বলে মনে হয় কারণ এতে বেশকিছু বৈদিক, পৌরাণিক ও অনার্য উপাদান রয়েছে।[৯৪] আমরা ইতোমধ্যেই ইঙ্গিত দিয়েছি যে, এ পূজা-পদ্ধতির সঙ্গে ধর্মপূজা জড়িত ছিল[৯৫] ঋগ্বেদের সমযামী-সূক্তে এ ইঙ্গিতের সমর্থন পাওয়া যায় যা ধর্ম ও কেতকার (মনসা) মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্কের নির্দেশ করে।[৯৬]

চৈতন্য-ভাগবতে চণ্ডীদেবীর পূজার পুনঃ পুনঃ উল্লেখ আছে।[৯৭] এ দেবীর কীর্তি বর্ণনা করে ষোড়শ শতাব্দীর শেষদিকে মুকুন্দরাম এক দীর্ঘ কাব্য রচনা করেছিলেন।[৯৮] বাংলার ইতিহাসের সামান্য পূর্ববর্তী আমলের ইতিহাসে আমরা দেখি যে দনুজমর্দন ও মহেন্দ্র এ ধর্মে তাঁদের বিশ্বাস ঘোষণা করেছিলেন। তাঁরা নিজেদের শ্রীচণ্ডীচরণ পরায়ণ বা চণ্ডীর পদভক্তরূপে অভিহিত করেছিলেন।[৯৯]

স্মরণাতীতকাল থেকে বেঁচে থাকা শৈবধর্ম পর্যালোচনাধীন সময়কালে মনে হয় বেশ ক্ষয়িষ্ণু হয়ে পড়েছিল। সমসাময়িক সাহিত্য যেমন নির্দেশ করে[১০০], এটাকে শুধু প্রতিরোধই করা হয়নি, মনসা ও চণ্ডীর শাক্ত-তান্ত্রিক পূজাপদ্ধতি একে সম্ভবত ম্লান করে দিয়েছিল। আলোচ্য সময়কালে শৈব সম্প্রদায়ের এক শাখা, পাশুপতদের[১০১] বৈষ্ণবরা সম্ভবত ঘৃণার চোখে দেখত। [১০২] এ পরিস্থিতিতে শৈবধর্ম ক্রমশ শান্ত ও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ছিল এবং পৌরাণিক শিব একজন সাধারণ বাঙ্গালি কৃষিজীবিতে রূপান্তরিত হয়েছিলেন।[১০৩]

মনে হয় ব্রাহ্মণ্যবাদ এক সংকটজনক অস্তিত্বের অবস্থায় দিন কাটাচ্ছিল। ব্রাহ্মণ্যবাদের আনুষ্ঠানিক পবিত্রতার বিধিনিষেধগুলি প্রয়োগের উদ্দেশ্যে—যাতে এটা নিম্নশ্রেণী বা বিদেশী যাজকীয় ধারণার প্রভাবাধীন না হয়ে পড়ে, ব্রাহ্মণরা স্মৃতি বা ধর্মের বাহ্য অনুষ্ঠানের অনুশাসন সম্পর্কে বেশ কিছু গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এ গ্রন্থটির পরবর্তী কিছু পরিচ্ছেদে [১০৪] এ বিষয়টি আলোচিত হওয়ায় এর বিস্তৃততর আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন।

বাংলার হিন্দু সমাজে তান্ত্রিকতার বেশ প্রভাব পড়েছিল। সমসাময়িক সাহিত্য তান্ত্রিক ধারণা ও রীতির উল্লেখে ভরপুর। বিপ্রদাস চণ্ডীকে একজন ভ্রষ্টা নারীরূপে [১০৫] চিত্রিত করার চেষ্টা করেছেন যাকে নৈতিকভাবে অধ:পতিত ব্যক্তিরা তাঁর বেদিতে মাংস ও মদ অর্ঘ্য দিয়ে পূজা করত।[১০৬] নিচের পংক্তিগুলিতে বৃন্দাবনদাস মনে হয় তান্ত্রিক রীতির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন; "মন্ত্রপাঠ করে তারা রাতে পাঁচজন মেয়েকে নিয়ে আসে। এর আনুসঙ্গিক রূপে বিভিন্ন ধরনের জিনিসও আসে। এর মধ্যে রয়েছে খাদ্যসামগ্রী, সুগন্ধী মালা ও নানান ধরনের বস্ত্র। খাদ্য গ্রহণের পর তারা বিভিন্নভাবে মেয়েগুলিকে ভোগ করে" ।[১০৭] রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিকে তান্ত্রিক প্রভাব আত্মভূত করতে হয়েছিল। তান্ত্রিক দীক্ষা গ্রহণের অনুকূল সময় সম্পর্কে রঘুনন্দন বেশ দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। তাঁর মতানুসারে দীক্ষার জন্য চৈত্র, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, ভাদ্র এবং পৌষমাস অশুভ এবং বৈশাখ, শ্রাবণ, আশ্বিন, কার্তিক, মার্গশীর্ষ মাঘ এবং ফাল্গুন মাস শুভ। তিনি সপ্তাহের বিশেষ দিনগুলি, বিভিন্ন ক্ষুদ্রতারকাপঞ্জির প্রভাব এবং গুরুর স্বভাবের কথাও বলেছেন।

এগুলি সবই তান্ত্রিক দীক্ষার সময় বিবেচনা করতে হতো।[১০৮] সুতরাং মনে হয় যে তান্ত্রিক প্রভাব ব্রাহ্মণ্য ধর্মীয় রীতি ও বিশ্বাসকে পরিপুক্ত করেছিল।

পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ তান্ত্রিক গ্রন্থে তান্ত্রিক ধর্মীয় অনুষ্ঠান রীতি ও দর্শনের বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। বিখ্যাত গ্রন্থতন্ত্রসারে তান্ত্রিক মতবাদ ব্যাখ্যাকারী কৃষ্ণানন্দ আগম বাগীশকে চৈতন্যের সমসাময়িক বলে মনে করা হয়। অন্য একটি তান্ত্রিক গ্রন্থ, সর্বোল্লাসমন্ত্র[১০৯] পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্ধে রচিত বলে কথিত। আত্মার প্রকৃতি, পরমাত্মা, কর্মবাদ, ভক্ত ও স্রষ্টার মধ্যে আধ্যাত্মিক সম্পর্ক, পরমজ্ঞানের উৎস ও অন্যান্য বহু দার্শনিক জটিল প্রশ্ন ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত অন্যান্য গ্রন্থাবলিসহ এ দু'টি গ্রন্থের বিষয়বস্তু। উচ্চ আদর্শ ধারণকারী এ সব ধর্মমত বেদান্ত ও প্রাচীন তন্ত্রদ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। পূজায় মদের গ্রহণযোগ্যতার প্রশ্নে তান্ত্রিক পূজারীরা পশ্বাচার ও কুলাচার নামে অভিহিত দু'টি বিরোধী দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। 'পূজায় মদ পরিত্যাগ করা ছাড়াও পশ্বাচারীরা সাধারণত বহু শতাব্দীর পরিক্রমায় পরিবর্তন ও তান্ত্রিক প্রভাবে রূপান্তরিত বৈদিক ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও জীবনের নিয়ামবলির প্রতি অনুগত ছিল। অন্যদিকে কুলাচারীরা একধরনের অতীন্দ্রিয়বাদী সংস্কৃতির বিকাশ ঘটিয়েছিল। যার মধ্যে কুখ্যাত পাঁচটি 'ম' (পঞ্চ মকার) মদ, নারী, মাংস, মাছ এবং ভাজা খাদ্যশস্য ছিল সবিশেষ সুস্পষ্ট"। গুরু, দীক্ষা এবং মন্ত্র বা স্তোত্রকে তান্ত্রিক পূজার প্রথম তিন অপরিহার্যবস্তুরূপে বিবেচনা করা হতো। ধর্মের বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান ছিল একটি বিশেষ লক্ষ্যে অর্থাৎ মৃত্যুর পর স্রষ্টার সঙ্গে মিলন। ভক্তদের অতীন্দ্রিয়-যৌগিক শতচক্র ভেদ অনুশীলন করতে হতো যা জাগতিক বন্ধন থেকে তার মুক্তি ঘটাত বলে বলা হতো। যৌগিক শারীরবৃত্তের সঙ্গে সম্পর্কিত অন্তরের উপাসনা ও পঞ্চম-কার এর সঙ্গে জড়িত স্ত্রীজাতির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাসহ বাহ্যিক পূজায় কুলাচার তান্ত্রিক অতীন্দ্রিয়বাদী সংস্কৃতির সমাপ্তি ঘটত। এর বিকাশকালে পশ্বাচার মনে হয় কুলাচার দ্বারা প্রবলভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। সে সময়ের সাহিত্য যত্নসহকারে পাঠ করলে দেখা যায় যে বৈষ্ণব ও তান্ত্রিকদের মধ্যে সম্পর্ক ছিল যথেষ্ট অবন্ধুসুলভ।

উপরে আমরা বিভিন্ন ধর্মপদ্ধতির সাধারণ প্রকৃতি সম্পর্কে একটি ধারণা দিয়েছি। এসব পদ্ধতির গঠনে সহায়ক উপাদানগুলি প্রায়ই পারস্পরিকভাবে জড়িত বলে মনে হয় যার ফলে তাদের পৃথক করা অসম্ভব। এটা এসব ধর্মের মধ্যে দীর্ঘকালীন যোগাযোগের ইঙ্গিতবহ যদিও এদের মধ্যে বৈসাদৃশ্যও রয়েছে।

টীকা

১. ৯১১হিজরি ১৫০৫ সালের সোনারগাঁওয়ের বাবা সালিহ লিপিতে মক্কা ও মদীনায় তীর্থযাত্রার স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। জে. এ. এস. বি ১৮৭৩, পৃ. ২৮৩। সালাত (নামাজ) ও যাকাতের (দরিদ্র-কর) উল্লেখের জন্য ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকের অন্য একটি লিপি দেখুন, আই, এইচ. কিউ, ১৯৫০, পৃ. ১৮৩। হিন্দু কবিদের আঁকা মুসলমানদের গোঁড়া ধর্মীয় জীবনধারার

জন্য দেখুন বিপ্রদাস: পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৬৭-৬৮ এবং ১৪৩; কবিকঙ্কণ চণ্ডী: ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫৯-৬০।

২. এ সব উৎসে হাসান ও হোসেন নামে দুই ভাই এর মনসা পূজার বর্ণনা রয়েছে; বিপ্রদাস: পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৮৪-৮৬; বিজয় গুপ্ত: পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৫৪-৬১।

৩. ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

৪. এস. বি. দাসগুপ্ত : অবসকিউর রিলিজিয়াস কাল্টস, পৃ. ৩২৮ ও পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহ।

৫. ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

৬. সম্ভবত অষ্টাদশ শতাব্দীর একজন বাঙ্গালি কবি, আরিফ, তাঁর লালমনের কেচ্ছাতে (লালমনের গল্প) বলছেন, "হোসেন শাহ লালমন নামক সুন্দরী মহিলাকে নিয়ে যান ....। রাত্রি শেষে তাঁর বাসনা তৃপ্ত হলে তিনি সোওয়া লক্ষ টাকার মিষ্টি সত্যপীরকে উৎসর্গ করেন। মক্কায় অবস্থানকারী সত্যপীর এটা জানতে পারেন। তাঁর আশীর্বাদে হোসেন মোগান শহরে বাদশাহ হন;" এস. পি. পি, ১৩১০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৪৭ এ উদ্ধৃত। ঐতিহাসিকতার দিক থেকে অবিশ্বাস্য এসব উপাদানের ভিত্তিতেই সম্ভবত দীনেশ চন্দ্র সেন (হিস্ট্রি অফ বেঙ্গলী ল্যাংগুয়েজ অ্যান্ড লিটারেচার, পৃ. ৭৯৭) এবং তাঁকে অনুসরণ করে অন্যান্য আরও কয়েকজন পণ্ডিত বাংলায় সত্যপীরের প্রবর্তনের সঙ্গে হোসেন শাহের নামও জড়িয়েছেন। সমসাময়িক বা বিশ্বাসযোগ্য কোনো উৎসে এ যুক্তির সমর্থন পাওয়া যায় না। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এ ধর্মমত নিয়ে বহু কাব্য রচিত হয়েছিল যদিও এ ধর্মমতের উদ্ভব আরও আগের কালেও হয়ে থাকতে পারে। সত্যপীর সম্পর্কে সর্বপ্রথম কাব্য রচনা করেছিলেন শেখ ফয়জুল্লাহ যিনি মনে হয় খিষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে বেঁচেছিলেন।

৭. বিপ্রদাস : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৬৭, কবিকঙ্কণ চণ্ডী; ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬১।

৮. রিয়াজ, পৃ. ১৩৫।

৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮।

১০. আইন, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪১২।

১১. এনামুল হক : বঙ্গে সুফি প্রভাব, পৃ. ১২৩-২৪।

১২. উপরে, ২য় পরিচ্ছেদ, পৃ. ৩৭।

১৩. নিচে, সপ্তম পরিচ্ছেদ।

১৪. মৃগাবতী : অধ্যাপক আসকারী কর্তৃক জে. বি. আর এস. ১৯৫৫, ডিসেম্বর, পৃ. ৪৫৬ তে উদ্ধৃত; শেখ বুধন জগ মাঞ্ঝাপীর-নানুন লৈত সুধ হোয়ে শরীর। "শেখ বুধন জগতে এক খাঁটি পীর। কেউ তাঁর নাম উচ্চারণ করলে তার শরীর পবিত্র হয়ে যায়।"

১৫. গুলজার-ই আবরার, এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল-এ সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপি, ফোলিও ৯৮; আরও দেখুন, কারেন্ট স্টাডিজ, ১৯৫৫, পৃ. ২৩, এ উদ্ধৃত আব্দুল হকের তাজকিরাহ।

১৬. পূর্বোল্লিখিত, পৃ.. ২৩৪; আরও দেখুন ঐ গ্রন্থে এম. শহীদুল্লাহর ভূমিকা, পৃ. ৩৭।

১৭. পূর্বোল্লিখিত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬১।

১৮. বঙ্গে সুফি প্রভাব, পৃ. ১৪৩।

১৯. জে. এ. এস. বি, ১৮৭৩, পৃ. ২৯৩, এবং ১৯২২, পৃ. ৪১৩, প্লেট ৯।

২০. গুলজার-ই-আবরার, ফোলিও ৪১, জে. এ. এস. পি. ১৯৫৭, পৃ. ৬৫ এবং ৬৭তে উদ্ধৃত। প্রাগুক্ত গ্রন্থে তাঁকে ৭০৩ হিজরি ১৩০৩ সালে মুসলমানদের প্রথম সিলেট বিজয়ের সঙ্গে জড়িত করা হয়েছে। হোসেন শাহের সিলেট লিপি দেখুন, জে. এ. এস. বি. ১৯২২, প্লেট ৯, পৃ. ৪১৩।

২১. পরিশিষ্ট গ।

২২. জে. এ. এস. বি. ১৯১৭, পৃ. ১৩৪।

২৩. ফয়জুল্লাহ্‌র সত্যপীর, এনামুল হক কর্তৃক উদ্ধৃত : মুসলিম বাঙ্গালা সাহিত্য, পৃ. ৮৯। পীর মোহাম্মদ শাত্তারী বাংলায় ইসমাইলের কার্যাবলি বর্ণনা করে রিসালাত-উশ-শুহাদা লিখেছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীর একজন বাঙ্গালি কবি সীতারাম দাস, শ্রদ্ধাভরে তাঁর নাম উল্লেখ করেছেন; পরিশিষ্ট-গ।

২৪. ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, ২য় অংশ।

২৫. জে. এ. এস. বি. ১৮৭৪, পৃ. ৩০০।

২৬. আই. এইচ কিউ, ১৯৫০, পৃ. ১৭৩-৮৩।

২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬। ব্লখম্যান মনে করেন যে বুদ্দুহ্‌ শব্দটি আল্লাহ্‌র অতীন্দ্রিয়বাদী নাম; জে. এ. এস. বি. ১৮৭১, পৃ. ২৫৬। আরও দেখুন, জে. এ. এস বি. ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৮১ তে আমার সমালোচনা।

২৮. আমীর আলী : দি স্পিরিট অফ ইসলাম, পৃ. ৩২৫, ৩২৭, ৩৩০ এবং ৩৪৩।

২৯. বিজয় গুপ্ত : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৫৪-৬১; বিপ্রদাস : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৬৩-৮৬।

৩০. কবিকঙ্কণ চণ্ডী : ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫৮।

৩১. পূর্বোল্লিখিত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৯।

৩২. হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, ২য় খণ্ড, পৃ. ২২৪।

৩৩. জয়দেব ছিলেন লক্ষণ সেনের সভাকবিদের একজন। তাঁর রাজত্বকালেই বখতিয়ার খলজি বাংলা আক্রমণ করেছিলেন (ত্রয়োদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে)। গীতধর্মী মাধুর্য, আলঙ্কারিক আড়ম্বর এবং চিত্র-বিধৃত সৌন্দর্যের জন্য যথেষ্ট প্রসিদ্ধ জয়দেবের গীত-গোবিন্দের বিষয়বস্তু হচ্ছে রাধা কৃষ্ণের প্রেম-লীলার কাহিনী। এর বহু সংস্করণ ভারতে প্রকাশিত হয়েছে। স্যার উইলিয়াম জোন্স এর ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন, কালেক্টেড ওয়ার্কস, লন্ডন, ১৮০৭। ইন্ডিয়ান সং অফ সংস এ লন্ডন, ১৮৭৫, এডউইন আর্নল্ড এর ছন্দোবদ্ধ ইংরেজি অনুবাদ করেছেন।

৩৪. সম্ভবত পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন; দেখুন সুকুমার সেন : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮০।

৩৫. বেশ কিছু সংস্কৃত ও বাংলা জীবনীমূলক গ্রন্থে চৈতন্যের জীবনীর উপাদান ছড়িয়ে রয়েছে। অন্যত্র আমরা মুরারি গুপ্তের চৈতন্য-চরিতামৃত, কবিকর্ণপূরের চৈতন্য-চরিতামৃত এবং তাঁর চৈতন্য-চন্দ্রোদয়-নাটকের মতো সংস্কৃতে চৈতন্যের জীবনীগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছি, নিচে, ৭ম পরিচ্ছেদ, অংশ ৩ (গ)। চৈতন্যের জীবন সম্পর্কে বাংলায় রচিত কাব্যগুলি হচ্ছে বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য-ভাগবত, লোচনদাসের চৈতন্য-মঙ্গল, জয়ানন্দের চৈতন্য-মঙ্গল, কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য-চরিতামৃত এবং গোবিন্দদাসের কড়চা। এগুলি আমরা এ গ্রন্থে ব্যবহার করেছি এবং গ্রন্থপঞ্জিতে এগুলির প্রকাশনার তারিখ ও স্থান উল্লেখ করেছি। শ্রী চৈতন্য-চরিতের উপাদানে বি. বি. মজুমদার চৈতন্যের জীবনীর জন্য উপাদানগুলির এক সমালোচনামূলক বিবরণ দিয়েছেন। চৈতন্যের জীবনীর জন্য আরও দেখুন, এম. টি, কেনেডী ; দি চৈতন্য মুভমেন্ট, পৃ. ১৩-৫১; এস কে. দে; পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৫১-৭৬; ডি. সি. সেন : চৈতন্য অ্যান্ড হিজ এইজ, পৃ. ৯৯-২৬৫ ইত্যাদি।

৩৬. কৃষ্ণদাস কবিরাজ : পূর্বোল্লিখিত, অন্ত্য, ২০, পৃ. ৩৫৮-৬০; পদ্যাবলী, নং ২২, ৩১, ৩২, ৭১, ৯৩, ৯৪, ৩২৪ এবং ৩৩৭ ; তুলনীয়, কেনেডি : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৯০-৯১।

৩৭. বৃন্দাবনে পরবর্তীকালে এ সম্প্রদায়ের বিকাশ এবং রূপ, সনাতন, জীব, গোপাল ভট্ট এবং রঘুনাথ দাসের মতো গোস্বামীদের রচনাবলির জন্য দেখুন, এস. কে. দে : পূর্বোল্লিখিত, ৩য়–ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

৩৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯।

৩৯. চৈতন্য-চরিতামৃত, এস, কে, দের পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থের ৪২৬ পৃষ্টায় উদ্ধৃতাংশ।

৪০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৬।

৪১. প্রাগুক্ত, পৃ, ৪২৬।

৪২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯।

৪৩. চৈতন্য-চরিতামৃত, ষষ্ঠ, ১২২ এবং ৭ম ১৯, সপ্তদশ, ৭; চৈতন্য-চন্দ্রোদয় : এস. কে. দের পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থের ১৭৫ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃতাংশ।

৪৪. প্রাগুক্ত।

৪৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৫ ও ৪২৬।

৪৬. পূর্বোল্লিখিত, আদি, ১ম, পৃ. ৬, ২য় ১০, ১৪ ইত্যাদি; মধ্য, ২য়, পৃ. ১৩৩; তৃতীয়, পৃ. ১৪২ ইত্যাদি।

৪৭. চৈতন্য মঙ্গল , আদি, পৃ. ৩, ৫২; মধ্য, পৃ. ৭ এবং পরিশিষ্টে পদাবলী, পৃ. ৮, ৯, ১১, ১২, ইত্যাদি।

৪৮. চৈতন্য-ভাগবত, আদি, ২য়, পৃ. ১৫।

৪৯. *এস. কে. দে : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১৭৪ এ উদ্ধৃতাংশ।*

৫০. গীতগোবিন্দ, সর্গ ১, ৫-১৪।

৫১. কবিকর্ণপুর এ মতবাদ স্বরূপ দামোদর থেকে উদ্ভূত বলে মত প্রকাশ করেছেন; বি. বি. মজুমদার : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৫০ ও ৬১৭।

৫২. পূর্বোল্লিখিত, মধ্য, ৩য়, পৃ. ১৪৬-৪৭, দশম, পৃ. ১৯২-৯৩, ত্রয়োদশ, পৃ. ২০৯; এস. কে. দে: পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৩৮, টীকা।

৫৩. চৈতন্যবাদ নিয়ে বাংলা ও সংস্কৃত রচনাবলির জন্য দেখুন উপরে পৃ. ১৭৩, টীকা ৩৫ এবং নিচে, ৭ম পরিচ্ছেদ, ৩য় অংশ (গ)। বৃন্দাবনের গোস্বামীদের রচিত ধর্মীয়-দার্শনিক সাহিত্য চৈতন্য-আন্দোলনেরই প্রত্যক্ষ ফসল।

৫৪. কেনেডি : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৫৭ এবং ১১৮-১৯।

৫৫. রূপ, সনাতন এবং নিত্যানন্দের সামাজিক মর্যাদা ছিল অনিশ্চিত। রঘুনাথদাস ও মুরারি গুপ্ত ছিলেন যথাক্রমে কায়স্থ ও বৈদ্যশ্রেণীর। তাঁরা চৈতন্যের ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে এসেছিলেন এবং বৈষ্ণবধর্মের জন্য মূল্যবান অবদান রেখেছিলেন; কৃষ্ণদাস কবিরাজ : পূর্বোল্লিখিত, অন্ত্য, ৪র্থ, পৃ. ২৮২-৮৮। এ জীবনীকার বলেছেন যে "কৃষ্ণের উপাসনায় বর্ণ এবং বংশ মূল্যহীন"; প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৩।

৫৬. নিচে, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ, অংশ ৪ এবং ৭ম পরিচ্ছেদ, অংশ ১ (ক)।

৫৭. নিচে, ৭ম পরিচ্ছেদ, অংশ ৩ (ক); ৯ম পরিচ্ছেদ, অংশ ২।

৫৮. নৈয়ায়িকদের প্রতি বৈষ্ণবদের প্রতিক্রিয়ার জন্য দেখুন, বৃন্দাবনদাস; পূর্বোল্লিখিত, আদি, ৬ষ্ঠ, পৃ. ৩৬।

৫৯. পূর্বোল্লিখিত, আদি, ৬ষ্ঠ, পৃ. ৩৬ এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ: পূর্বোল্লিখিত আদি, সপ্তদশ, পৃ. ৬২-৬৩।

৬০. বৃন্দাবন দাস : পূর্বোল্লিখিত, আদি, ২য়, পৃ. ১২-১৪।

৬১. প্রাগুক্ত, আদি, ২য়, পৃ. ১৪ও ১৫; কৃষ্ণদাস কবিরাজ : পূর্বোল্লিখিত, আদি, সপ্তদশ, পৃ. ৫২। এ বিষয়ে কবিকর্ণপূরের মতামতের জন্য দেখুন, উপরে, পৃ. ১৬২।

৬২. চৈতন্য-চরিতামৃত, মধ্য, ৯ম, পৃ. ১২৫।

৬৩. চৈতন্য-ভাগবত, আদি, সপ্তম, পৃ. ৫৪।

৬৪. এ বিষয়ে আলোচনার জন্য দেখুন, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী : 'রায়মুকুট বৃহস্পতি", এস. পি. পি. ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৩-৬৪।

৬৫. উপরে পৃ. ১৬২-৬৬।

৬৬. ঢাকা রিভিউ, ১৯২০, পৃ. ১১৩-১৪; ডি.সি. সেন : বৃহৎবঙ্গ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭৭-৭৮।

৬৭. সুকুমার সেন : প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী, পৃ. ৩০-৩১।

৬৮. চণ্ডীদাসের পদাবলী, নীলরতন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, পৃ. ১৮।

৬৯. বৌদ্ধধর্মের এসব পর্যায়ের প্রত্যেকটির বিচিত্র বৈশিষ্ট্যের জন্য দেখুন, এস. বি. দাসগুপ্ত : অবসকিউর রিলিজিয়াস কাল্টস, পৃ. ৯ ও পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহ ; হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪১৯-২২; নীহাররঞ্জন রায় : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৬৩৬-৩৯।

৭০. সহজিয়ারা প্রেমের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। তারা কৃষ্ণ ও রাধাকে পরব্রহ্মের পুরুষ ও নারী রূপ হিসেবে গণ্য করে এবং তারা মনে করে যে মানব-মানবীর মিলনের মাধ্যমে সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক অভীষ্ট লাভ করা সম্ভব। এস. বি. দাসগুপ্ত : অবসকিউর রিলিজিয়াস কাল্টস, পৃ. ১২০ ও পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহ; আরও দেখুন, মনীন্দ্রমোহন বসু; পোষ্ট-চৈতন্য সহজিয়া কাল্ট। এ সম্প্রদায়ের সাহিত্য সপ্তদশ, অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর এবং মনে হয় যে এর মতবাদগুলি চৈতন্যের মৃত্যুর বহু পরে সূত্রবদ্ধ করা হয়েছিল।

৭১. পূর্বোল্লিখিত, আদি, অষ্টম, মধ্য, ৩য় ও ৪র্থ এবং একাদশ ও দ্বাদশ। নিম্নবর্ণের হিন্দুদের যে তিনি বৈষ্ণব ধর্মে প্রবেশানুমতি দিয়েছিলেন এ থেকেই বর্ণপ্রথাকে তিনি যে কত হাল্কাভাবে নিয়েছিলেন তা স্পষ্ট হয়ে উঠে; প্রাগুক্ত, অন্ত্য, ৫ম, পৃ. ৩৮১ ও ৩৮৩।

৭২. নিচে, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ। আরও দেখুন, এ পরিচ্ছেদের ৫ম অংশ।

৭৩. হাজার বছরের পুরাণ বাংলা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা (চর্যাচর্যবিনিশ্চয়), হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক সম্পাদিত ; ২ নং গান ও ৪ নং দোহা সম্পর্কে টীকা, পৃ. ৬ ও ৯।

৭৪. এস. বি. দাসগুপ্ত : অবসকিউর রিলিজিয়াস কাল্টস, পৃ. ৯৫-১০০।

৭৫. নিচে. ষষ্ট পরিচ্ছেদ, ২য় অংশ; আরও দেখুন, এ পরিচ্ছেদের ৫ম অংশ।

৭৬. নিচে, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

৭৭. পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৬-৮।

৭৮. শূন্যপুরাণ, পৃ. ৪০-৪২, ১৬৮ এবং ১৭৯; ধর্ম পূজা-বিধান, পৃ. ৮৯, শ্লোক নং ১৪০ ও পৃ. ২১৫।

৭৯. মনসা-বিজয়, পৃ. ৭।

৮০. শূন্য-পুরাণ, পৃ. ৪০-৪২।

৮১. পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৬। ধর্মের অনুরূপ বর্ণনার জন্য দেখুন, রূপরাম: ধর্ম-মঙ্গল, ১ম খণ্ড, পৃ. ২, ১৩, ১৮ ইত্যাদি; শূন্য-পুরাণ, পৃ. ৮ ও পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহ ; ধর্ম-পূজা-বিধান, পৃ. ৮১, ৮৭ ইত্যাদি।

৮২. মনসা-বিজয়, পৃ. ৭। মনসার সঙ্গে ধর্মের সম্পর্কের জন্য দেখুন এ পরিচ্ছেদের ষষ্ঠ অংশ।

৮৩. "ডিসকভারি অফ দি রেমন্যান্টস অফ বুড্ডিজম ইন বেঙ্গল," পি. এ. এস. বি. ১৮৯৪, পৃ. ১৩৫; "বুড্ডিজম ইন বেঙ্গল সিন্স দি মোহামেডান কংকয়েস্ট", জে. এ. এস. বি. ১৮৯৫, খণ্ড ৬৪, ১ম অংশ, সংখ্যা ১, পৃ. ৫৫-৬১, এবং শ্রীধর মঙ্গল ; এ ডিস্টিঙ্কট ইকো অফ ললিত-বিস্তার", জে. এ. এস বি. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫-৬৮।

৮৪. কে. পি. ব্যানার্জি : "ধর্ম ওয়ারশিপ", জে. এ. এস. বি. ১৯৪২, ৮ম, পৃ. ১৩১-৩২, এবং সুকুমার সেন : "ইজদি কাল্ট অফ ধর্ম এ লিভিং রেলিক অফ বুড্ডিজম ইন বেঙ্গল!" বি. সি. ল ভল্যুম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৭০-৭২।

৮৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬৯, ৬৭২-৭৩; রূপরামের ধর্মমঙ্গলের ভূমিকা দেখুন, ২য় সংস্করণ, পৃ. ৩-১৮; আরও দেখুন, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় : "বুড্ডিষ্ট সারভাইভালস ইন বেঙ্গল", বি.সি.ল. ভল্যাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৮।

৮৬. মৃগাবতী থেকে উদ্ধৃতাংশ, পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৪৭৫।

৮৭. দেবিস্তিন-ই মজাহিব, পৃ. ১৪১-৪৫।

৮৮. কল্যাণী মল্লিক : নাথ সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধনা প্রণালী, পৃ. ১১-২৪, আরও দেখুন, একই লেখিকার; নাথপন্থ, পৃ. ১৪-১৯।

৮৯. স্নায়ু এবং ষড়-বৃত্ত সম্পর্কিত যৌগিক তত্ত্বের বিস্তৃততর ব্যাখ্যা এবং যৌগিক অনুশীলনের পশ্চাদ্‌গামী প্রক্রিয়ার জন্য দেখুন, নিচে, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ, ২য় অংশ; দেখুন, এস. বি. দাসগুপ্ত : অবসকিউর রিলিজিয়াস কাল্টস, পৃ. ২২৯ ও পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহ; কল্যাণী মল্লিক : নাথ সম্প্রদায়ের ইতিহাস ইত্যাদি, পৃ. ৩৯৫-৯৮, ৪৩৩-৩৫ ইত্যাদি; নাথপন্থ, পৃ. ২১-২৪, ২৭-২৯ ইত্যাদি।

৯০. কল্যাণী মল্লিক : নাথ সম্প্রদায়ের ইতিহাস, পৃ. ৪৫৯-৬০, ৪৭৯ ইত্যাদি। নাথপন্থ, পৃ. ৩১।

৯১. সুকুমার সেনের প্রবন্ধ, বি. সি. ল ভল্যুম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৬৯ ও ৬৭১; কল্যাণী মল্লিক . নাথ সম্প্রদায়ের ইতিহাস, পৃ. ৩৪০-৬১।

৯২. নিচে, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ, ১ম অংশ, (ক)।

৯৩. নিচে, ৯ম পরিচ্ছেদ।

৯৪. সুকুমার সেন : মনসা-বিজয়ের ভূমিকা, ৬ষ্ঠ, ৩৬-৪২।

৯৫. উপরে, এ পরিচ্ছেদের ৪র্থ অংশ।

৯৬. সুকুমার সেন : রূপরামের ধর্মমঙ্গলের ভূমিকা, পৃ. ১।

৯৭. পূর্বোল্লিখিত, আদি, ২য় পরিচ্ছেদ, পৃ. ১১; ৪র্থ পরিচ্ছেদ, পৃ. ২৪; মধ্য, ১৩শ পরিচ্ছেদ, পৃ. ২১০; অন্ত্য, ৪র্থ পরিচ্ছেদ, পৃ. ৩৬২ এবং ৫ম পরিচ্ছেদ, পৃ. ৩৮৪।

৯৮. নিচে, ৭ম পরিচ্ছেদ, ১ম অংশ (ক)।

৯৯. এ রাজাদের ১৩৩৯ শকাব্দ/১৪১৭ খ্রিস্টাব্দ এবং ১৩৪০ শকাব্দ/১৪১৮ খ্রিস্টাব্দের বহু মুদ্রায় এ শব্দ-সমষ্টি দেখতে পাওয়া যায়; দেখুন, এন. কে. ভট্টশালী : কয়েন্স অ্যান্ড ক্রনোলজি, পৃ. ১১৮-২২ এবং প্লেট-৮।

১০০. নিচে, ৭ম পরিচ্ছেদ, ১ (ক)।

১০১. হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০৫।

১০২. উপরে এ পরিচ্ছেদের ৩য় অংশ।

১০৩. শিবের কৃষি পেশা গ্রহণ সম্পর্কে শূন্যপুরাণে একটি অংশ রয়েছে (পৃ. ১৮২-৯৪)। পরবর্তীকালে রামেশ্বর চক্রবর্তী এ বিষয়টির আরও বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। সে সময়ে শিবের একজন সাধারণ কৃষিজীবীতে রূপান্তরের প্রক্রিয়া সম্ভবত সম্পূর্ণ হয়েছিল। দেখুন পৃ. ৬৮-৭৫।

১০৪. নিচে, ৭ম পরিচ্ছেদ এবং ৯ম পরিচ্ছেদ।

১০৫. পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১০-১১।

১০৬. চৈতন্য-ভাগবত, অন্ত্য, ৫ম, পৃ. ৩৮৪।

১০৭. রঘুনন্দনস ইনডেটেডনেস টু হিজ প্রেডেসেসরস, জে. এস. এস. বি. ১৯৫৩, খণ্ড ১৯, নং ২, পৃ. ১৭৫-৭৬ এ ভবতোষ ভট্টাচার্য প্রদত্ত মলমাস-তত্ত্ব অ্যান্ড দীক্ষা-তত্ত্ব থেকে উদ্ধৃতাংশ।

১০৯. তপনকুমার রায় চৌধুরী : বেঙ্গল আন্ডার আকবর অ্যান্ড জাহাঙ্গীর, পৃ. ২৩৭। এ অনুচ্ছেদের অবশিষ্টাংশ এ গ্রন্থ থেকে সারাংশকৃত, পৃ. ১২৫-৩৬।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মীয় ব্যবস্থা

কিছু কিছু সামাজিক-ধর্মীয় শক্তি যে হোসেন শাহী শাসনামলে বাংলার জন-জীবনে সক্রিয় ছিল তা আমরা ইতোমধ্যেই লক্ষ্য করেছি। বস্তুত এ আমল বাঙালি সমাজের ক্রমবিবর্তনের এক গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ের সাক্ষী। দেশের সামাজিক জীবনে ইসলাম এক গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হওয়ায় পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে আলোচিত কিছু স্থানীয় রীতির সঙ্গে এর সম্পর্ক নিরূপণ করা প্রয়োজন।

সমস্ত প্রাক-মোগল আমল ধরেই ইসলামের সঙ্গে ব্রাহ্মণ্যবাদের একটা অনিরূপিত বিরোধ ছিল বলে মনে হয়। বৌদ্ধধর্মের অবনতি এবং তার ফলস্বরূপ তান্ত্রিকবাদে এর রূপান্তরের ফলে নিজেদের অধিকার বলপূর্বক বজায় রাখতে ইসলাম ও ব্রাহ্মণ্যবাদের মধ্যে একটির জন্য ক্ষেত্র উন্মুক্ত হয়ে পড়ে। এ প্রতিযোগিতায় অবশ্য ইসলামের একটি সহজাত সুবিধা ছিল। রাজনৈতিক সুবিধা ভোগ করা ছাড়াও ব্রাহ্মণ্যবাদের বর্ণপ্রথার বিপরীতে বাঙালিদের কাছে ইসলামের উদারনীতির একটা স্বাভাবিক সামাজিক আকর্ষণ ছিল। তারা কিছু রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সুবিধা লাভের আশায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছিল। বার্বোসা স্পষ্টভাবেই বলেছেন যে শাসকশ্রেণীর কাছ থেকে আনুকূল্য পাবার উদ্দেশ্যে হিন্দুরা নিয়মিতভাবে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছিল।[১] সুতরাং ইসলাম মনে হয় জনগোষ্ঠীর এক বিরাট অংশের কাছে শুধু সামাজিক-ধর্মীয় সাম্যের সুবিদিত আদর্শই তুলে ধরে নি, তাৎক্ষণিক পার্থিব লাভের উজ্জ্বল সম্ভাবনাও তুলে ধরেছিল। এ অবস্থায় ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরণ নিশ্চয়ই অত্যন্ত অনিবার্য হয়ে পড়েছিল। বাংলায় বৈষ্ণব ধর্মের প্রসারের পর ইসলামের এই সামাজিক আকর্ষণ নিশ্চিতভাবেই বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছিল। বৈষ্ণবধর্ম ব্রাহ্মণ্যবাদের যন্ত্রণা অপসারণ করে দেশে হিন্দুধর্মকে রক্ষা করেছিল। ফলে ব্রাহ্মণ্যবাদকে যে সব অত্যন্ত শক্তিশালী বিরোধী শক্তির মোকাবিলা করতে হয়েছিল ইসলাম ছিল তাদের অন্যতম, বস্তুত মনে হয় যে ব্রাহ্মণ্যবাদ ও ইসলামের মধ্যে সম্পর্ক ছিল সংস্পর্শ ও সংঘাতের, হোসেন শাহী আমলে সাময়িক আপোসে যার সমাপ্তি ঘটে।

প্রাক-মুসলমান আমলে ব্রাহ্মণরা একচেটিয়া সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ভোগ করেছিল। মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠা এর মূলে প্রচণ্ড আঘাত হানে। তারা আর দেশের রাজনৈতিক প্রভু রইল না। স্বভাবতই তাদের সামাজিক গুরুত্ব বহুল পরিমাণে কমে যায়। এ সময়েই বেশকিছু ব্রাহ্মণ-বিরোধী শক্তি বাংলায় সক্রিয় হয়ে ওঠে। আমরা অন্যত্র দেখিয়েছি যে মনসা, চণ্ডী এবং ধর্মের স্থানীয় পূজা-পদ্ধতিগুলি বহুলাংশে ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরোধিতা করেছিল। এ গুলির সঙ্গে ইসলামের আবির্ভাব যুক্ত হয়ে একটা অদ্ভুত

পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল। ব্রাহ্মণরা তাদের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করে এর বিরুদ্ধে তাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিল। ন্যায়ের নবদ্বীপ চিন্তাধারা প্রতিষ্ঠা, রঘুনন্দন ও তার সমসাময়িক ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক বেশকিছু স্মৃতি গ্রন্থ রচনা এবং হোসেন শাহী ও তার অব্যবহিত পরবর্তী আমলে রচিত সংস্কৃত গ্রন্থাবলিতে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে সর্বোকৃষ্ট সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবিতকরণ ছিল এর দৃষ্টান্ত। মুসলমান শাসক শ্রেণীর প্রতি জনগোষ্ঠীর ব্রাহ্মণ্যপন্থী অংশের মনোভাব মোটেই বন্ধুভাবাপন্ন ছিল না বলে মনে হয়। সেনদের সঙ্গে সঙ্গেই হিন্দু রাজনৈতিক শক্তির পতন ঘটে; পঞ্চদশ শতাব্দীতে রাজা গণেশ কর্তৃক স্বল্পকালীন স্থায়ী রাজবংশ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এর পুনরুত্থানের প্রচেষ্টাও সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়ে যায়। রাজা গণেশের ক্ষমতালাভ সামাজিক পটভূমি-বিচ্ছিন্ন কোনো আকস্মিক রাজনৈতিক ঘটনা ছিল বলে মনে হয় না। এটাকে এ দেশে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠার সময় থেকে সক্রিয় এক শক্তির বহিঃপ্রকাশ হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। কুলজী সাহিত্যে বলা হয়েছে যে বরেন্দ্রের ব্রাহ্মণরা রাজা গণেশের সাফল্যে যথেষ্ট অবদান রেখেছিল।[২] এ বক্তব্যের কোনো প্রত্যক্ষ সমর্থন আমাদের কাছে না থাকলেও এটাকে তাৎক্ষণিকভাবে অগ্রাহ্যও করা যায় না।

বাংলার ইতিহাসে রাজা গণেশ ও তাঁর উত্তরাধিকারীদের আমল ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির আকস্মিক পুনরুজ্জীবন দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত।[৩] সম্পূর্ণভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতা বঞ্চিত ব্রাহ্মণরা নিশ্চয়ই প্রাক-মোগল আমলের শেষের দিকের মুসলমান শাসকদের প্রতি বিদ্বেষের মনোভাব পোষণ করেছিলেন। বৃন্দাবনদাস আমাদের জানাচ্ছেন যে নবদ্বীপবাসীরা বিশ্বাস করত যে গৌড়ের সিংহাসন ব্রাহ্মণরা দখল করবে–জয়ানন্দের চৈতন্য-মঙ্গলেও এ একই ধারণার প্রতিধ্বনি শোনা যায়।[৪] যুক্তিসঙ্গতভাবে ব্যাখ্যা করলে এটার অর্থ দাঁড়ায় এই যে ব্রাহ্মণরা মুসলমান শাসনের সঙ্গে তাদের বিরোধ মিটিয়ে ফেলার অবস্থায় ছিল না। এ ধরনের এক শ্রেণীর লোকের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন হওয়া মুসলমান শাসকদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। মনে হয় এ থেকে ব্রাহ্মণদের সঙ্গে মুসলমান শাসকের বিরোধের ব্যাখ্যা পাওয়া যায় যার বিস্তারিত বর্ণনা জয়ানন্দ দিয়েছেন। নবদ্বীপের ব্রাহ্মণদের ওপর মুসলমান সুলতানের অত্যাচারের যে বর্ণনা কবি দিয়েছেন তা ব্রাহ্মণদের প্রতি সুলতানের মনোভাবের নির্দেশক। এটা সত্য যে বহু ব্রাহ্মণ হোসেন শাহ ও তাঁর উত্তরাধিকারীদের অধীনে চাকুরি করছিলেন। রূপ, সনাতন, জগাই এবং মাধাই এর দৃষ্টান্ত। মুসলমান শাসক শ্রেণীর সঙ্গে ব্রাহ্মণ্যবাদের এই আপোস ছিল সম্পূর্ণ বাহ্যিক, কারণ প্রতিক্রিয়ার স্পৃহা সমাজের অন্তরালে কাজ করছিল। চৈতন্যের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে রূপ ও সনাতন তাঁকে বলেছিল যে গো-হত্যা ও ব্রাহ্মণদের ঘৃণা করা যার কাছে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক সেই মুসলমান শাসকের সঙ্গে মেলামেশার কারণে তারা তাদের মানসিক পবিত্রতা হারিয়ে ফেলেছে।[৫] প্রশাসনিক কাজ পরিচালনার জন্য মুসলমান শাসক শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের সাহায্যের প্রয়োজন ছিল। ব্রাহ্মণরাও জীবিকা উপার্জনের উদ্দেশ্যে এর সংস্পর্শে এসেছিল। কাজেই এই দুই শ্রেণীর যোগাযোগ ঘটেছিল নেহাৎ প্রয়োজনের তাগিদে বাধ্য হয়ে, এটা পারস্পরিক বোঝাপড়ার ফলে ঘটে নি। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে অবশ্য ব্রাহ্মণরা

একচেটিয়া অধিকার ভোগ করেনি কারণ মুসলমান সুলতানরা বহু কায়স্থকেও নিযুক্ত করেছিলেন।[৫] দেশীয় কবিদের মধ্যে অধিকাংশই মনে হয় ছিলেন কায়স্থ পরিবারের। বিজয়গুপ্ত, যশোরাজ খান, শ্রীকর নন্দী এবং কবীন্দ্র পরমেশ্বর, এরা সবাই ছিলেন কায়স্থ। বাংলা সাহিত্যের বিকাশে সহায়তা করে মুসলমান সুলতানরা পরোক্ষভাবে কায়স্থ শ্রেণীকে সাহায্য করেছিলেন। এটা প্রায় ন্যায্যভাবে প্রমাণিত যে হোসেন শাহী সুলতানদের আমলে কায়স্থরা ছিল দেশের ভূম্যাধিকারী অভিজাত সম্প্রদায়। আমরা দেখিয়েছি যে লস্কর রামচন্দ্র খান ও হিরণ্য মজুমদারের দক্ষিণ পশ্চিম বাংলায় বেশ লাভজনক ভূসম্পত্তি ছিল। ষোড়শ শতাব্দীর প্রায় শেষপ্রান্তে আবুল ফজল লিখেছেন যে বাংলার বিভিন্ন সরকারের সমৃদ্ধিশালী জমিদারদের অনেকেই ছিলেন কায়স্থ।[৬] কায়স্থ এই জমিদার শ্রেণীর বিকাশের পিছনে সম্ভবত মুসলমান শাসকদের প্রত্যক্ষ সমর্থন ছিল। বাংলায় ব্রাহ্মণ্য প্রভাব বিনষ্ট করার উদ্দেশ্যে তাঁরা কায়স্থ কবি ও জমিদারদের সমর্থন করেছিলেন কিনা তা স্পষ্টভাবে জানা যায় না; কিন্তু কায়স্থ বুদ্ধিজীবী ও জমিদারদের বিকাশ নিশ্চিতভাবেই দেশে ব্রাহ্মণ্য প্রভাব ক্ষুণ্ন করেছিল।

ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রতি শাসকগোষ্ঠীর আদৌ কোনো সহানুভূতি ছিল বলে মনে হয় না। পরবর্তী পরিচ্ছেদে আলোচিত সংস্কৃত কবি ও সাহিত্যিকদের অধিকাংশেরই হোসেন শাহী দরবারের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক ছিল না। বাংলা গ্রন্থগুলি মুসলমান সুলতানদের উল্লেখে ভরপুর থাকলেও নবদ্বীপ ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় রচিত সংস্কৃত গ্রন্থগুলিতে গৌড়ের শাসকদের নামোল্লেখের কোনো প্রকৃত কারণ নেই। এটা এ ইঙ্গিত বহন করে যে সে আমলের মুসলমান শাসকদের কাছ থেকে সংস্কৃত সাহিত্য কোনো পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে নি।[৭] এভাবে সংস্কৃতকে পিছনে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল এবং বাংলা শাসক শ্রেণীর স্বীকৃতি লাভ করেছিল। চৈনিক পরিব্রাজক মাহুয়ান উল্লেখ করেছেন যে পঞ্চদশ শতাব্দীর বাংলায় বাংলা ও ফার্সি প্রচলিত ছিল।[৮] সম্ভবত জনগণের মধ্যে এর গ্রহণযোগ্যতা না থাকায় তিনি সংস্কৃত সম্পর্কে কিছু বলেন নি। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস থেকে যে সাক্ষ্যই সংগ্রহ করা যাক না কেন এটা যুক্তিসঙ্গতভাবেই অনুমান করা চলে যে হোসেন শাহী শাসকরা বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করে জনগণের সংস্কৃতিকে সুস্পষ্ট রূপ নিতে সাহায্য করেছিলেন। জনগোষ্ঠীর বৃহত্তর অ-ব্রাহ্মণ্য শ্রেণীর সংস্কৃতির উদ্ভব ও বিকাশ নিশ্চিতভাবেই ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রভাবকে রোধ করেছিল। তাছাড়া এও জানা যায় যে বিকাশমান বৈষ্ণবধর্মের প্রতি হোসেন শাহ ছিলেন সহিষ্ণু।[৯] এটা মনে হয় এ ইঙ্গিত দেয় যে শ্রীচৈতন্যের উদারপন্থী বৈষ্ণব ধর্মকে নীরবে সমর্থন করে হোসেন শাহ গোঁড়া ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির অগ্রগতি রোধ করতে চেয়েছিলেন। বস্তুত সমসাময়িক বা প্রায় সমসাময়িক রচনাবলি স্পষ্টভাবে বলছে যে নবদ্বীপের ব্রাহ্মণরা অন্ততপক্ষে শুরুতে চৈতন্যের আন্দোলনের বিরোধী ছিলেন।[১০] সুতরাং হোসেন শাহের চৈতন্যবাদের নীরব স্বীকৃতি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

মুসলমান শাসন স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর রাজনীতির ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণদের বাস্তব কিছু আশা করার রইল না। তাদের করার মধ্যে শুধু রইল সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড অবলম্বন

করে তাদের বুদ্ধিবৃত্তিগত শ্রেষ্ঠত্বকে জোরালোভাবে প্রকাশ করা। সমকালীন নবদ্বীপে জীবনযাত্রা কেন প্রচণ্ড বুদ্ধিবৃত্তিগত কর্মকান্ড দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়েছিল মনে হয় এ থেকে তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। তর্কবিদ্যা, ব্যাকরণ এবং স্মৃতির মতো জ্ঞানের নীরস ও জটিল শাখাগুলি তখন সহজেই তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। ব্রাহ্মণ্যসমাজে ইসলামি ভাব ও রীতির অনুপ্রবেশের একটি নিয়মিত প্রক্রিয়া সম্ভবত চলছিল। সে কালের ব্রাহ্মণদের ওপর ইসলামের প্রভাবে জয়ানন্দ খেদ প্রকাশ করেছেন। এ কবির মতানুসারে, মুসলমানদের রীতি অনুসারে ব্রাহ্মণরা দাড়ি রাখত, মৌজা পরত, ছড়ি বহন করত, বন্দুক চালাত এবং মসনভী আবৃত্তি করত।[১১] তারা নিশ্চয়ই অনুপ্রবেশের এ প্রক্রিয়াকে রোধ করার চেষ্টা করেছিল নিজেদের গোঁড়া, সামাজিক ও বিধিসম্মত ব্যবস্থাকে আটসাঁট করে তারা এ উদ্দেশ্য সাধন করতে পারত। মনে হয় ব্রাহ্মণদের এ সামাজিক প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে রঘুনন্দন তাঁর গ্রন্থাবলি রচনা করেছিলেন। এরফলে মনে হয়েছিল এই যে এটা শুধু মুসলমানদের কাছ থেকে ব্রাহ্মণদের বিচ্ছিন্ন করেনি, এটা হিন্দু জনগোষ্ঠীর অন্যসব নিম্নশ্রেণীর কাছ থেকেও তাদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছিল। এভাবে ব্রাহ্মণরা নিজেদের চারপাশে তৈরি প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রের দেওয়াল ঘেরা আত্মকেন্দ্রিক এক জীবন যাপন করতে চেয়েছিল। এর নিজস্ব সীমাবদ্ধতার মাঝে ব্রাহ্মণ্যবাদ বুদ্ধিবৃত্তিগত কর্মকাণ্ড অব্যাহত রেখেছিল। এ ব্রাহ্মণ্য গোঁড়া সংস্কৃতির কেন্দ্র ছিল নবদ্বীপ যা গঙ্গা নদীর মাধ্যমে বিহার ও উত্তর ভারতের আর্য-সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। এখানেই রঘুনাথ শিরোমনি নব্যন্যায় চিন্তাধারা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং রঘুনন্দন তার বিখ্যাত গ্রন্থগুলি রচনা করেছিলেন। শ্রীচৈতন্যের শক্তিসম্পন্ন বৈষ্ণবধর্মের পুনরুত্থানের মাধ্যমে নবদ্বীপ নগরী হিন্দু সংস্কৃতির পুনর্জন্ম দেখেছিল। বাংলার দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চল তুলনামূলকভাবে এ সংস্কৃতির প্রভাবমুক্ত ছিল বলে মনে হয়। এ সব অঞ্চলে কেন মনসা ও নাথের স্থানীয় ধর্মীয় পদ্ধতি প্রবল হয়েছিল এ থেকে তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এ দুই ধর্মীয় পদ্ধতির অনুসারীদের আজও দক্ষিণ ও পূর্ব বাংলায় দেখতে পাওয়া যায়। মাঝে মাঝে ব্রাহ্মণেরা এ অঞ্চলে অভিবাসন করলেও স্থানীয় ধর্মীয় পদ্ধতির জনপ্রিয়তার কারণে তাদের প্রভাব ছিল নিশ্চিতরূপেই অত্যন্ত সীমিত।

কিন্তু মুসলমান এবং নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ অনিবার্য হওয়ায় ব্রাহ্মণদের পক্ষে দীর্ঘদিন তাদের বিচ্ছিন্ন অবস্থান বজায় রাখা সম্ভব হয় নি। শেষপর্যন্ত এ পরিস্থিতির সঙ্গে তাদের সামাজিক বিন্যাসকে খাপ খাইয়ে নিতে হয়েছিল। মনে হয়, সামঞ্জস্য সাধনের এ প্রক্রিয়ার ইঙ্গিত কুলজি সাহিত্যে দেওয়া হয়েছে যার বিশুদ্ধতা সম্পর্কে প্রায়ই সন্দেহ প্রকাশ করা হয়ে থাকে।[১২] একই উৎস বলছে যে বাংলার ব্রাহ্মণদের কুলীন প্রথা দেশের রাজনৈতিক প্রভু হওয়া মুসলমানদের সংস্পর্শে আসার ফলে প্রায়ই ক্ষতিগ্রস্ত হতো। এটা ব্রাহ্মণ্য সমাজে গুরুতর জটিলতার সৃষ্টি করে। যারা মুসলমানদের সংস্পর্শে আসত তাদের নিজেদের সম্প্রদায়ের মধ্যে পতিত ও নিচু হিসেবে গণ্য করা হতো। ফলে তারা এ সংকটপূর্ণ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিল। দত্তখাষা নামে এক ব্রাহ্মণের সভাপতিত্বে জাতিমালা কাছারি নামে একটি সামাজিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা

করা হয়েছিল। তিনি সম্ভবত নাসিরউদ্দীন মাহমুদের (মৃত্যু ১৪৫৯ খ্রিস্টাব্দ) একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন। তিনি ৫৭ তম সমীকরণ বা সামাজিক সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন। অনুমান করা যায় যে কুলীন ব্রাহ্মণদের সমস্যার সমাধান করা ছিল এর উদ্দেশ্য। পরবর্তী এক সময়ে অবশ্য উদয়াচার্য ভাদুড়ী বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের বহু পটি বা শ্রেণীতে ভাগ করেছিলেন। ১৪৮০/৮১ সালে দেবীবর মেল ব্যবস্থার প্রচলন করেন। কথিত আছে যে তিনি রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের ৩৬ টি মেলে বিভক্ত করেছিলেন। এগুলির নাম হচ্ছে বল্লভী, সুরাই, চট্টরাঘবী, ভৈরবঘটকী, সাধাই, চান্দাই, বিজয়-পণ্ডিতী, শতানন্দখানি, মালাধরখানি, কাকুস্থি, চন্দ্রাপতি, বিদ্যাধরী, পরমানন্দা মিশ্রী, চয়ী, ফুলিয়া, খড়দহ, দেহটা, বাঙ্গালা, বলি, নড়িয়া, পণ্ডিতরত্নী, আচম্বিতা, আচার্যশেখরী, চায়ী, পরিহাল, শুঙ্গসর্বানন্দী, প্রমোদিনী, হরিমজুমদারী, ইত্যাদি।[১৩]

বাঙালি কুলীনপ্রথার ইতিহাসে দেবীবরের মেল ব্যবস্থা এক নতুন অধ্যায়ের সংযোজন করেছিল বলে মনে হয়। যে সব ব্রাহ্মণ বিভিন্ন দোষ বা ত্রুটির শিকার হয়েছিল তারা এখন তাদের সামাজিক মর্যাদা ফিরে পেতে পারত। এ তথ্য যদি সত্য হয়, তাহলে বলতেই হবে যে ব্রাহ্মণ্যসমাজের বিবর্তনে দেবীবরের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সে কালের কঠোর বর্ণবাদের দিনে দেবীবর ছিলেন প্রগতিশীল এক সমাজসংস্কারক। সক্রিয় শক্তিগুলি অনুধাবন করে তিনি কুলীন সমাজকে পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির উপযোগী করে তুলতে চেয়েছিলেন। ব্রাহ্মণ্যশ্রেণীর লোকের বিশুদ্ধতা রক্ষা করা ছিল তার উদ্দেশ্য। সম্ভবত আসন্ন বিপদ থেকে কুলীন প্রথাকে রক্ষা করা ছিল এর উদ্দেশ্য।

উপরে বর্ণিত বিভিন্ন মেলের ইতিহাস থেকে স্পষ্টই দেখা যায় ব্রাহ্মণদের যবন-দোষ দুষ্ট হওয়ার ফলেই এদের অধিকাংশের সৃষ্টি হয়েছিল। ভৈরবঘটকী, দেহটা এবং হরিমজুমদারী মেল এর দৃষ্টান্ত।[১৪] বলা হয়ে থাকে যে পীরালি ব্রাহ্মণ এবং শেরখানি ও শ্রীমন্তখানি মেলও এই একই শ্রেণীভুক্ত।[১৫] এসব শ্রেণীতে তালিকাভুক্ত ব্রাহ্মণদের মুসলমানদের সঙ্গে তাদের সংস্পর্শের কারণে সামাজিক মর্যাদাচ্যুতরূপে বিবেচনা করা হতো। এটা কুলীন প্রথার নিরাপত্তার জন্য এক মারাত্মক হুমকি হয়ে দেখা দেয়। যবন-দোষ ছাড়াও একজন কুলীন ব্রাহ্মণকে স্পর্শ করতে পারত এমন অন্যান্য ত্রুটিও ছিল। নিঃসন্তান হওয়া, বেশ্যা-গমন, নিজের স্বজন বা সম্প্রদায়ের মধ্যে বিয়ে করা, ভ্রষ্টা বা বিকলাঙ্গ মেয়ে বিয়ে করা, ব্রাহ্মণ-হত্যা, ব্যাভিচার বা অবিবাহিত অবস্থায় যৌন-সংসর্গ ছিল এর অন্তর্ভুক্ত।[১৬] দেবীবর ব্রাহ্মণদের কুলীন প্রথাকে বিভিন্ন ত্রুটিযুক্ত হওয়ায় গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত এবং গোটা সমাজ কাঠামোকে ধ্বংসের কিনারায় দেখতে পেয়েছিলেন। কুলীন প্রথার বিশুদ্ধতাকে রক্ষা করার জন্য তিনি একে পুনর্গঠিত করেছিলেন। নুলো পঞ্চানন দেবীবর ও শ্রীচৈতন্যের উদার মতবাদ পছন্দ করেন নি।[১৭] তিনি এর নৈষ্ঠিক ছাঁচ ধরে রাখার জন্য প্রাচীন সমাজ-বিন্যাস পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছিলেন। মনে হয় যে সমাজে গোঁড়ামি ও উদারনীতির মধ্যে একটা বিরোধ চলছিল। আমরা যদি কুলজি সাহিত্যের বিবরণের যথার্থতাকে সন্দেহও করি তবু এ থেকে প্রকাশিত সাধারণ সামাজিক প্রবণতাগুলিকে অবজ্ঞা করা যায় না। আমাদের পরিলক্ষিত স্থানীয় ও

বিদেশী শক্তিগুলির সঙ্গে ব্রাহ্মণ্যবাদের এ যোগাযোগ, বিরোধ আপোসের প্রক্রিয়া কুলজি সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে।[১৮] উপরন্তু, মনে হয় যে বাংলার জনজীবনে ইসলামের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় প্রভাব ব্রাহ্মণদের মধ্যে এক সামাজিক অস্থিরতার সৃষ্টি করেছিল। ভিতর থেকে তাদের নিজেদের সমাজকে পুনর্গঠনের চেষ্টা করে তারা এ পরিস্থিতির প্রতি তাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিল।

২.

ইসলাম ও ব্রাহ্মণ্যবাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক বিরোধের স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া গেলেও ইসলামি ধর্মের অতীন্দ্রিয়বাদী দিকের প্রতিনিধিত্বকারী সুফিবাদ মনে হয় দেশীয় সংস্কৃতির অদ্ভুত প্রকৃতির সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে রচিত শেখ জাহিদের আদ্য পরিচয়ে এবং ষোড়শ শতাব্দীর বাঙালি কবি সৈয়দ সুলতানের[১৯] প্রায় সব গ্রন্থেই এ সমন্বয়ের প্রবণতা প্রকাশ পায়। সুফিবাদের এই উদার প্রভাব জ্ঞান-প্রদীপ ও জ্ঞান-চৌতীশার মতো গ্রন্থে লক্ষ্য করা যায়, ইসলামি অতীন্দ্রিয়বাদ ও ভারতীয় যোগদর্শনের এক কৌতূহলোদ্দীপক সমন্বয় ছিল যে গুলির বৈশিষ্ট্য।

মুসলিম বাংলা সাহিত্যে সৃষ্টিতত্ত্বের যে সব মতবাদ পাওয়া যায় তাতে যথেষ্ট ভিন্নজাতীয় উপাদান রয়েছে যেগুলি পূর্বতন কালের দেশীয় ও বিদেশী দার্শনিক পদ্ধতি থেকে এসেছে। শূন্য-পুরাণের সঙ্গে মূলত কোনো পার্থক্য না থাকায় গোরক্ষ-বিজয়ের[২০] বিশ্বের উৎপত্তি সম্বন্ধে মতবাদ অনুসারে সমগ্র সৃষ্টি হচ্ছে মহাজাগতিক পুরুষ ও নারী মৌলিক উপাদানের মিলনের ফল। কিন্তু শেখ জাহিদের আদ্য পরিচয়ে প্রাপ্ত সৃষ্টিতত্ত্বে কিছু বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় যা সযত্ন বিবেচনার দাবিদার। কবি বলেছেন[২১] : শুরুতে কিছুই ছিল না—পানিও না, মাটিও না; অসীম শূন্যমণ্ডলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও নিজেকে প্রকাশ করে নি। জগৎ ছিল না, স্বর্গও ছিল না, আকাশ, সূর্য, চন্দ্র কিছুই ছিল না। তারা, মেঘ, পাহাড়, নদী, মহাসাগর, বনও ছিল না। তখন ছিল শুধু ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে থাকা অন্ধকার। এবং তখন ছিলেন আল্লাহ্। তিনি নিজের অসীম নিঃসঙ্গতায় অবসাদগ্রস্ত হয়ে এ বিশাল শূন্যতার অবসান ঘটাতে এবং বিভিন্নরূপে নিজেকে প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে প্রাণী সৃষ্টির কথা চিন্তা করেন। তাঁর ভালবাসা বা ভাবাবেগ (রতি) থেকে তিনি নিজের এক প্রতিমূর্তি সৃষ্টি করে বিশাল সমুদ্রে তা স্থাপন করেন। তাঁর হুঙ্কার বা হাইতোলা থেকে জন্মলাভকারী তাঁর বন্ধুর সঙ্গে আলাপকালে তাঁর মন আনন্দে ভরে উঠে। তখন তার আনন্দ থেকে আসে আদিম জলরাশি, তাঁর কথা থেকে আসে বায়ু এবং ক্রোধ থেকে আগুন। তিনি তাঁর বন্ধুর শরীর থেকে ধূলি নিয়ে সাগরে নিক্ষেপ করেন যার ফলে পৃথিবী ঢেউয়ের ওপর নিজেকে বিস্তার করতে শুরু করে। প্রকৃতির চারটি উপাদান (স্পষ্টত মাটি, জল, আগুন ও বাতাস) সৃষ্টি হয়। আল্লাহর ওঙ্কার থেকে ভয়াবহ সবকিছু সৃষ্টি হয়। আল্লাহ জীবন্ত ত্রয়ীও সৃষ্টি করেন এবং তাদের বিভিন্ন ধরনের কাজে নিযুক্ত করেন। তাঁর সৃষ্ট দেবতা ও দানবরা নিজেদের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধে লিপ্ত হয়। হিংস্র জন্তু ও দানবেরা টিকে থাকে কিন্তু তারা স্রষ্টাকে ভুলে

যায়। আল্লাহ দানবদের ধ্বংস করেন। ফলে পৃথিবীতে আর কেউ রইল না। সৃষ্টির ওপর প্রভুত্ব করার উদ্দেশ্যে তখন তিনি মানুষ সৃষ্টির কথা চিন্তা করেন......।

উপরোক্ত সৃষ্টিক্রম কোনো কোনো বিষয়ে শূন্য-পুরাণে বর্ণিত সৃষ্টিতত্ত্বের অনুরূপ।[২২] দু'টি বিবরণই আদিম নেতিবাচকতত্ত্বের বর্ণনা দিয়ে শুরু করা হয়েছে এবং ত্রয়ীর সৃষ্টির উল্লেখ করেছে। শূন্যপুরাণে আমরা দেখতে পাই যে পরমেশ্বর নিরঞ্জনকে সৃষ্টি করেন যিনি পর্যায়ক্রমে উল্লুক পাখি, রাজহাঁস, কচ্ছপ এবং মহাজাগতিক সাপ বাসুকিকে সৃষ্টি করেন। বাসুকির মাথায় তাঁর নখের ধূলিবস্তু রেখে তিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেন। কিন্তু উপরে উদ্ধৃত মুসলিম বিবরণ অনুসারে আল্লাহ তাঁর বন্ধুর শরীরের ধূলি থেকে পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলেন। ধর্ম পূজা-পদ্ধতির গ্রন্থগুলিতে বাসুকি কর্তৃক নিরঞ্জনকে সৃষ্টি সম্পর্কে নির্দেশদানের চিত্র আঁকা হয়েছে। তবে মুসলমান কবি দেখিয়েছেন যে বন্ধুর সঙ্গে আল্লাহর আলাপ থেকেই সৃষ্টির প্রতি তাঁর আগ্রহ জন্মে। কাজেই শেখ জাহিদের সৃষ্টিতত্ত্বের সাধারণ বর্ণনা ও নাথপন্থী ও ধর্মবাদীদের সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কিত মতবাদের মধ্যে মনোযোগ আকর্ষণকারী সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায় যা এ ইঙ্গিত দেয় যে কবি তাদের ধর্মীয়বিশ্বাস দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং তিনি সেগুলির সঙ্গে বেশকিছু সুফি ধারণার সংযুক্তি ঘটিয়েছেন। মধ্যযুগীয় বাংলার নাথ ও ধর্মবাদী সাহিত্যে আমরা সৃষ্টিতত্ত্বের যে ছাঁচ লক্ষ্য করি তা গোটা এশিয়াতে প্রবল ছিল। এভাবে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াতে আমরা দেখতে পাই অস্ট্রিক মূলোদ্ভূত পলিনেশীয়দের[২৩] পরম্পরাগত সৃষ্টিতত্ত্বের ধারণা এবং আহোম সৃষ্টিতত্ত্ব[২৪] যা আমাদের ইন্দো-চৈনিকদের তাই শাখার অন্তর্ভুক্ত পৌত্তলিক লোকদের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে তথ্য দান করে। খ্রিষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীর এক গ্রন্থে প্রাপ্ত ব্যাবিলনীয় পোয়েম অফ দি ক্রিয়েশন[২৫] পশ্চিম এশিয়ার প্রতিনিধিত্ব করছে। কিন্তু এটা সম্ভবত প্রায় ২৫০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দের অনেক প্রাচীনতর গ্রন্থ থেকে এসেছে। ঋগ্বেদের নাসদীয়-সুক্ত[২৬] থেকে আমরা যা জানতে পাই তাকে ব্যাবিলনীয় পোয়েমের ভারতীয় প্রতিরূপ বলা যেতে পারে। মনে হয় যে অনার্য লোকদের (সম্ভবত অস্ট্রিক) কাছ থেকে আর্যরা সৃষ্টিতত্ত্বের ধারণা গ্রহণ করেছিল[২৭] কারণ আগেই যেমন লক্ষ্য করা গেছে যে এসব ধারণা নিশ্চিতভাবেই পূর্ববর্তী কালের ভারত ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার আদিম অধিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল।

সাধারণভাবে বলা যায় অন্তত বাহ্যত প্রতীয়মান হয় যে, শেখ জাহিদের সৃষ্টিতত্ত্ব হচ্ছে ইহুদি-ইসলামি এবং অস্ট্রো-ভারতীয় ধারণার সংমিশ্রণ।[২৮] গ্রিক-মিশরীয়, ব্যাবিলনীয়, ভারতীয়, চৈনিক এবং দক্ষিণ পূর্ব এশীয় সাহিত্যে সৃষ্টির যে সব তত্ত্ব পাওয়া যায় সে গুলি এ অর্থে দেবতাদের জন্মতত্ত্ব ও কুলজিবিষয়ক যে সেগুলিতে দেবতাদের সৃষ্টি প্রাধান্য পেয়েছে, যাতে মানুষ, প্রসঙ্গক্রমে উল্লিখিত হলেও, তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। হিব্রু ধর্মগ্রন্থের সময়কালে এলে আমরা সৃষ্টিতত্ত্বে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন লক্ষ্য করি। ঈশ্বর তখন আর কোনো বিশেষ উপজাতির দেবতা নন, তিনি হচ্ছেন সর্বজনীন ঈশ্বর যিনি সকল মানুষকে সৃষ্টি ও রক্ষা করতে সক্ষম। দ্বিতীয়ত, মানব সৃষ্টির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে যদিও সৃষ্টির পরিকল্পনায় জীব ও উদ্ভিদ জগৎ ও প্রাকৃতিক উপাদানগুলিকেও অন্তর্ভুক্ত করা

হয়েছে।[২৯] ইসলাম ও দু'টি বৈশিষ্ট্যের অংশীদার। ইহুদিদের সৃষ্টিকর্তার মতো ইসলামের একেশ্বরবাদী ধারণার আল্লাহ সর্বশক্তিমান ও সর্বজনীন। সৃষ্টি সম্পর্কে কোরানে পৃথক কোনো খণ্ড না থাকলেও কোরানে বিশ্বশাসন করার জন্য মানুষকে কাদামাটি থেকে সৃষ্টি করা এবং তার মধ্যে ঐশ্বরিক আত্মা সঞ্চারিত করার উল্লেখ রয়েছে বহুবার।[৩০] শেখ জাহিদের সৃষ্টিতত্ত্বে সৃষ্ট বস্তুর উপর মানুষের শ্রেষ্ঠত্বে কোরানের বা ইহুদি-ইসলামি ধারণার প্রতিধ্বনি শোনা যায়। কবি বলছেন : [৩১] আল্লাহ মানুষকে সমস্ত জীবজগতের রাজা করতে এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ভিতর পৃথিবীকে শ্রীমন্ডিত করতে চেয়েছিলেন। মানুষ যাতে অবিরত তাঁর আরাধনা করতে পারে সেজন্য তিনি মানুষকে জ্ঞানী করেছিলেন। অন্য যে সব জিনিস তিনি সৃষ্টি করেছিলেন সেগুলি তাকে তুষ্ট করে নি। সেজন্যই তিনি মানুষ সৃষ্টি করেন ..

বিশ্বের উৎপত্তি সম্পর্কিত বিবেচনাধীন তত্ত্বে কিছু সুফি উপাদান সহজে শনাক্ত করা যায় বলে মনে হয়। বলা হয়েছে যে প্রথম সৃষ্ট সত্তা ছিল 'আল্লাহর প্রতিচ্ছায়া' বা আল্লাহর বন্ধু "যিনি নাসতে বিদ্যতে ভাব:" অর্থাৎ কারণ থেকেই কার্যের উৎপত্তি হয় এর সৃষ্টিতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। এই 'আল্লাহর প্রতিচ্ছবি' সম্ভবত ইবন-উল-আরাবীর পদ্ধতির পূর্ণাঙ্গ মানুষের দূর-প্রতিধ্বনি : "পূর্ণাঙ্গ মানুষ (আল-ইনসান আল কামিল) আল্লাহর প্রতিচ্ছবি ও প্রকৃতির মূল আদর্শরূপে একইসঙ্গে ঐশ্বরিক অনুগ্রহের মধ্যস্থতাকারী ও যার দ্বারা জগৎ প্রাণবন্ত ও পুষ্ট হয় সেই মহাজাগতিক নীতি। এবং অবশ্যই বিশেষ উৎকর্ষবলে পূর্ণাঙ্গ মানুষ হচ্ছেন মোহাম্মদ"।[৩২] আমাদের আরও বলা হয়েছে যে আল্লাহর প্রতিচ্ছবি সৃষ্টি করা হয়েছিল আল্লাহর ভালবাসা থেকে—জ্ঞান-প্রদীপ, যোগ-কালন্দর, জ্ঞান-সাগর এবং আগম এর মতো অন্যান্য সুফি রচনাবলিতেও যার পরিচিত প্রতিধ্বনি শোনা যায়।[৩৩]

মানবদেহের গুরুত্ব হচ্ছে শেখ জাহিদের কাব্যের একমাত্র বিষয়বস্তু। মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব নির্দেশ করার উদ্দেশ্যেই একটি সৃষ্টিতত্ত্ব যোগ করা হয়েছে, যে মানুষের উপস্থিতি ছাড়া আল্লাহর সৃষ্টি যে শুধু অসম্পূর্ণ থেকে যেত তাই নয়, তা হতো অর্থহীন। সৈয়দ সুলতানের যোগতান্ত্রিক ধারণার বিস্তৃত ব্যাখ্যার অধিকাংশই আলোচ্য কাব্যে আগেই করা হয়েছে বিধায় এর বিষয়বস্তুর বিশদ আলোচনা করা প্রয়োজন। মানবদেহ বর্ণনা করতে গিয়ে শেখ জাহিদ একে বিশ্বের সকল বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এক ক্ষুদ্র বিশ্বরূপে বিবেচনা করেছেন। তিনি বলেন : আমি শরীরে মাটি, বায়ু, আগুন এবং স্বর্গ, পৃথিবী এবং তলদেশের জগতের অবস্থান নির্দেশ করব। আমি সূর্য, চন্দ্র এবং আকাশের নক্ষত্রদের মানবদেহে তাদের প্রতিরূপের সঙ্গে তুলনা করব। নদী, ছোট নদী, গঙ্গা এবং ভাগীরথী সর্বদাই মানবদেহে প্রবাহমান.....দেহ হচ্ছে চতুর্যুগ সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলির আবাসস্থল, এতে চতুর্বেদ এবং চারটি ধর্মগ্রন্থ (সম্ভবত ওল্ড টেস্টামেন্ট, সামস নিউ টেস্টামেন্ট এবং কোরান) রয়েছে ....এতে পর্বতচূড়া, বনভূমি, এবং জীবজন্তু রয়েছে।[৩৪]

নিচে যেমন নির্দেশ করা হবে বৌদ্ধ-সহজিয়া, বৈষ্ণব সহজিয়া এবং নাথবাদ সহ সকল যৌগিক-তান্ত্রিক পদ্ধতিতেই দৈহিক গঠন-প্রণালী প্রাধান্য পেয়েছে। দেহের ওপর

কেন এত গুরুত্ব দেওয়া হবে সে সম্পর্কে শেখ জাহিদ স্পষ্ট না হলেও যুক্তিসঙ্গতভাবেই অনুমান করা যেতে পারে যে দৈহিক অনুশীলন বা কায়াসাধনা ও যোগ-তন্ত্র বা যোগের নীতি হচ্ছে তাঁর লক্ষ্য যা তিনি প্রায়ই তাঁর কাব্যের প্রারম্ভিক অংশে বর্ণনা করেছেন। এ দৈহিক অনুশীলন যে ছিল পশ্চাদগামী প্রকৃতির নিচের পংক্তিগুলিতে তার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে : "ব্রহ্মা বলেছেন যে গাছের শিকড় কাঁপছে। কিন্তু মানুষের শিকড় হচ্ছে বিপরীত ধরনের।" ব্যক্ত ও ধারণা আমাদের উপনিষদের ডুমুর গাছের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় যার শিকড় উর্ধ্বমুখী এবং ডালপালা নিম্নমুখী।[৩৫] কবি সোমরসেরও উল্লেখ করেছেন যা সাধারণভাবে নাথবাদীদের অবলম্বিত খেচরি মুদ্রার সাহায্যে অমৃতপানের প্রক্রিয়ার প্রতি নির্দেশ করে। বহুস্থানে তিনি গোরক্ষনাথের নামোল্লেখ করেছেন। সুতরাং আলোচ্য কাব্যটিতে নাথবাদের প্রভাব দেখতে পাওয়া যায় যা ছিল মধ্যযুগের ধর্মীয় পারিপার্শ্বিক নাথবাদের অবস্থার এক শক্তিশালী উপাদান।

সুফি-যৌগিক বাংলা সাহিত্যে মানবদেহের ওপর প্রচণ্ড গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। একে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এক ক্ষুদ্র বিশ্বরূপে প্রায়ই বর্ণনা করা হয়েছে । সুফিরা বিশ্বাস করেন যে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে লভ্য গুণাবলির সমষ্টি দেহে রয়েছে।[৩৬] একে চতুর্বেদ, নবগ্রহ, রাশিচক্রের বিভিন্ন চিহ্ন, সপ্তস্বর্গ, সপ্ত নারকীয় অঞ্চল এবং বহু অতীন্দ্রিয়বাদীক্ষেত্রের আবাসস্থলরূপে বিবেচনা করা হয়।[৩৭] আলোচ্য সাহিত্যকর্মে দৈহিক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যবস্তু যেমন নারীর গর্ভধারণ ও গর্ভপাত, মাতৃগর্ভে শিশুর দেহের গঠন, যৌনসহবাস, বীর্যসংরক্ষণ এবং বিভিন্ন সময়ে নারীদের বিভিন্ন অংশে যৌন অনুভূতির অবস্থান, ইত্যাদি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।[৩৮]

দেহের অসীম গুরুত্বের কারণে বাঙ্গালি সুফিদের উপস্থাপিত যৌগিক-সুফিদের অপরিহার্য নীতিগুলি অবস্থান নির্দেশ করা হয়েছে দেহ-তন্ত্রে। তান্ত্রিক ও যৌগিক গ্রন্থগুলিতে প্রাপ্ত ষড়-চক্র বা স্নায়ুজালের ধারণা অনুসরণ করে এসব সুফি ছয়টি চক্রের অস্তিত্বের ধারণা পোষণ করেছেন। এগুলি হচ্ছে আধার-চক্র বা মেরুদণ্ডের শেষ যা প্রভাত-রবির মতো উজ্জ্বল, স্বাধিষ্ঠান-চক্র বা ত্রিকাস্থিসংক্রান্ত জাল, মনিপুর-চক্র বা ভারজাল, অনাহত-চক্র বা বার পাপড়ি বিশিষ্ট এবং সোনালি রং এর জীবনের আবাসস্থল, বিশুদ্ধ-চক্র বা বাগযন্ত্র সম্বন্ধীয় ও গলবিলসংক্রান্ত স্নায়ু জাল যার ষোলটি পাপড়ি আছে এবং এটি চন্দ্রের মতো উজ্জ্বল এবং দুই পাপড়ি বিশিষ্ট আজ্ঞা-চক্র যার ওপর সহস্রপাপড়ি বিশিষ্ট পদ্ম রয়েছে—এটা হচ্ছে আদ্য-শক্তি বা আদিম দেবীর আবাসস্থল।[৩৯]

যৌগিক-সুফি মনস্তাত্ত্বিক—শরীরতাত্ত্বিক প্রক্রিয়ায় স্নায়ুগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নিচের পংক্তিগুলিতে সৈয়দ সুলতান স্নায়ু সম্পর্কে একটি তত্ত্ব তুলে ধরেছেন: "ইঙ্গলা ও পিঙ্গলা মেরুদন্ডের দু'পাশ দিয়ে চলা দু'টি স্নায়ু। এগুলি দেখতে গাছের দু'পাশে ঝুলন্ত লতার মতো। ডানদিকের স্নায়ু ইঙ্গলাকে সুর্যের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে এবং বামদিকের পিঙ্গলা স্নায়ু চাঁদ-সদৃশ। ইঙ্গলা হচ্ছে গঙ্গার ধারা এবং পিঙ্গলা যমুনার। দেবতা ও অপদেবতার মধ্যে প্রবাহিত স্নায়ুর নাম সুষম্না। যে বিন্দুতে এ তিনটির মিলন ঘটে তাকে জ্ঞানী ব্যক্তিরা তিনটি পবিত্র নদীর সঙ্গমস্থল রূপে গণ্য করে"।[৪০] এ

গুলির কোনো কোনোটির কর্মের সামান্য উল্লেখসহ আমরা গান্ধারী কুহু, হস্তীজিহ্বা, অলম্বুষা, শঙ্খিনী এবং অন্যান্য স্নায়ুর বর্ণনাও পাই।[৪১]

বলা হয়েছে যে অসংখ্য আসন বা বসার ভঙ্গিমা রয়েছে। যার মধ্যে পদ্মাসন যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। এ ভঙ্গিমায় সুফি তাঁর বাম পা ডান পা'র ওপর রেখে বসেন, তাঁর হাত দু'টি থাকে পায়ের ওপর, তাঁর চিবুক বুক স্পর্শ করে এবং তাঁর মনোসংযোগ থাকে নাকের ওপর।[৪২] যৌগিক ও অন্যান্য গ্রন্থাবলিতে ব্যাখ্যাকৃত অন্যান্য ভঙ্গিমাকে বাদ দিয়ে পদ্মাসনকে গ্রহণ করে সৈয়দ সুলতান দৈহিক অনুশীলন প্রক্রিয়াকে সহজবোধ্য করার চেষ্টা করেছেন।

উল্লিখিত যৌগিক-সুফি সাহিত্যে শ্বাস-প্রশ্বাস-নিয়ন্ত্রণ একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। এ প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে গিয়ে কবি বলেছেন, "মধ্য স্নায়ু সুষুম্না হচ্ছে সকল স্নায়ুর মধ্যে সেরা। এটাই হচ্ছে পথ যার মাধ্যমে আদিম দেবীর উপাসনা করা যায় ...ডান নাসারন্ধ্র বন্ধ রেখে বাম নাসারন্ধ্র দিয়ে বায়ু গ্রহণ কর, এ প্রক্রিয়া সূঁচের মধ্যে এক খণ্ড সূতা ঢুকানোর অনুরূপ...বাতাস যখন দেহের মধ্যে প্রবেশ করবে তখন এক অদ্ভুত শব্দ বের হবে। যখন তুমি শব্দ শুনবে তখন তোমার মনস্থির হয়ে যাবে...তোমাকে সে শব্দের মধ্যে আলো খুঁজে বের করতে হবে যাতে তোমার মন নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে। এ হচ্ছে প্রভুর কাছে যাওয়ার পথ"।[৪৩] যৌগিক এসব পন্থার বিস্তারিত কোনো বর্ণনা না থাকলেও আমরা প্রায়ই পুরক (বাম নাসারন্ধ্র দিয়ে শ্বাসগ্রহণ), কুম্ভক (শ্বাস ধারণ), ধ্যান (স্থির মনোসংযোগ), মুদ্রা (ভঙ্গিমা) এবং সমাধির (উৎফুল্লজনক একাগ্রতা) উল্লেখ পাই।[৪৪]

দেহসম্পর্কিত বিভিন্ন ধারণা ও অনুশীলনকে সুফিরা এক বিশেষ লক্ষ্যে পৌঁছার পথ হিসেবে ব্যবহার করেছেন সে সম্পর্কে বাংলার সুফি সাহিত্যে স্পষ্ট নির্দেশ আছে। শ্বাস গ্রহণ ও শ্বাসত্যাগ এবং কোনো কোনো বিশেষ অংশের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা সহ বিভিন্ন শারীরিক ভঙ্গি অবলম্বন করে সুফিরা যে শুধু দৈহিক পূর্ণতা ও রোগের হাত থেকে মুক্তিই লাভ করতে পারেন এমন নয়, তাঁরা অমরত্বও লাভ করতে সক্ষম হন।[৪৫] আগেই যেমন লক্ষ্য করা হয়েছে দৈহিক এ অনুশীলন হচ্ছে 'প্রভুর কাছে যাওয়ার পথ।'

ভারতীয় দর্শনের যৌগিক ও তান্ত্রিক পদ্ধতিগুলি শরীরবৃত্তসম্বন্ধীয় স্নায়ুগুলির বিকাশ দ্বারা বৈশিষ্ট্যমন্ডিত। ইঙ্গলা, পিঙ্গলা এবং সুষুম্না সহ স্নায়ুতন্ত্র, ষড়চক্র বা মনোবিজ্ঞানের চক্র এবং মেরুদণ্ডের সর্বনিম্নস্থানে অবস্থানকারী এক নারী শক্তি এর অন্তর্ভুক্ত। এটা কুণ্ডলী পাকানো অবস্থায় থাকে বলে এটাকে কুন্ডলিনী শক্তি বলা হয়। জাগ্রত হলে এটা চক্রগুলিকে সক্রিয় করে তুলতে পারে। সুষুম্না-কান্ড হচ্ছে সুষুম্না স্নায়ুর বাসস্থল যা মূলাধারচক্র বা উল্লম্ব মেরুদণ্ডের তলস্থিত এলাকা থেকে মস্তিষ্ক এলাকায় অবস্থিত সহস্রার পর্যন্ত বিস্তৃত। অন্য পাঁচটি চক্র হচ্ছে পুরুষাঙ্গের মূলে অবস্থিত স্বধিষ্ঠান, নাভি অঞ্চলে মনিপুর, হৃদপিন্ডে অনাহত, মেরুদন্ডের সঙ্গে সংযুক্ত মস্তিষ্কাংশের মিলনস্থলে বিশুদ্ধ এবং দুই ভ্রুর মাঝখানে আজ্ঞা। প্রধান স্নায়ু সুষম্নার ডানে আছে পিঙ্গলা এবং বামে রয়েছে ইঙ্গলা। যোগ সাহিত্যে এ তিনটি স্নায়ু যথাক্রমে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীরূপে পরিচিত

এদের সঙ্গমস্থলকে বলা হয় ত্রিবেণী বা এই তিনটি নদীর সঙ্গমস্থল। ইঙ্গলা ও পিঙ্গলা যথাক্রমে সূর্য ও চন্দ্ররূপেও পরিচিত।[৪৬] নৈতিক প্রস্তুতির পদ্ধতি হিসেবে আটটি যোগাঙ্গের মধ্যে যাম (সংযম) ও নিয়ম (ধর্মকর্ম), আসন (দৈহিক ভঙ্গি), প্রাণায়াম (শ্বাস-নিয়ন্ত্রণ) এবং প্রত্যাহার (স্বাভাবিক বাহ্যিক কাজ থেকে ইন্দ্রিয়কে প্রত্যাহার) হচ্ছে পাপস্খালনের প্রস্তুতিমূলক পর্যায়। ধ্যান (অবিচল মনোযোগ) এবং ধারণা (গভীর চিন্তা) হচ্ছে আলোকিতকরণ পর্যায়। সমাধি (একাগ্রতা) হচ্ছে মিলন-পর্যায়।[৪৭] তান্ত্রিক ও যৌগিক দর্শনের দৈহিক ও মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়াগুলির লক্ষ্য হচ্ছে কুণ্ডলিনী শক্তিকে সর্বোচ্চ এলাকা সহস্রার শিবের সঙ্গে মিলিত করার উদ্দেশ্যে একে জাগ্রত করে উর্ধ্বমুখে প্রবাহিত করা। শিব নিশ্চল অমর পরম পুরুষ এবং শক্তি পরিবর্তনের মূল হওয়ায় শিব ও শক্তির মিলন পরিবর্তন ও কর্মশীলতার প্রক্রিয়ার সাময়িক স্থগিতকরণ ও দৈহিক মনস্তাত্ত্বিক পশ্চাদগামী পদ্ধতির মাধ্যমে অপরিবর্তনশীল অমরত্ব লাভের প্রতি নির্দেশ করে। এ অনুশীলন উর্ধ্বমুখীন প্রকৃতির হওয়ায় এটা সাধারণত উল্টা সাধন বা পশ্চাদৃগামী অনুশীলনরূপে পরিচিত। তান্ত্রিকবাদ, বৌদ্ধ সহজিয়া, বৈষ্ণববাদ, নাথবাদ এবং বাউল সম্প্রদায় সহ প্রায় সকল অতীন্দ্রিয়বাদী ধর্মপদ্ধতিই এটা অবলম্বন করে। পশ্চাদৃগামী সাধারণ বীজ উপনিষদ, ভাগবত গীতা এবং বেদান্তে দেখতে পাওয়া যায়।[৪৮]

উপরে বিশ্লেষিত বাংলা সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত ধারণাও অনুশীলনগুলির সঙ্গে এসব যৌগিক ও তান্ত্রিক ধারণা ও অনুশীলনের তুলনা করলে স্পষ্টরূপে দেখা যায় যে মুসলমান অতীন্দ্রিয়বাদীরা এগুলি দেশীয় যোগ ও তন্ত্র দর্শন পদ্ধতি থেকে গ্রহণ করেছিল। জ্ঞান-প্রদীপ যোগ-তান্ত্রিক পশ্চাদগামী অনুশীলনের ইঙ্গিতে পরিপূর্ণ। সুষুম্না স্নায়ুকে আদিম দেবীর আরাধনার পথ হিসেবে গণ্য করা ছাড়াও সৈয়দ সুলতান প্রভুকে সহরার এলাকায় অধিষ্ঠিত করেছেন।[৪৯] সুতরাং মনে হয় যে তিনি আগে থেকেই দু'য়ের মিলন স্বীকার করে নিয়েছিলেন যা আমরা ইতোমধ্যেই যেমন দেখেছি, মধ্যযুগের বাংলার যৌগিক-তান্ত্রিক পূজা পদ্ধতির অনুসারীদের চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল। এক জায়গায় তিনি বলছেন, "ত্রিবেণীঘাটে কেউ স্নান করলে কোটি জন্মের পাপও তার কোনো ক্ষতি করতে পারে না"।[৫০] গঙ্গা (পিঙ্গলা) ও যুমনার (ইঙ্গলা) গতিধারা বন্ধ করে তাদের সরস্বতীর (সুষুম্না) উর্ধ্বমুখী গতিপ্রবাহের দিকে ফিরিয়ে দিয়ে এ তিন নদীর সঙ্গমস্থলেই যৌগিক ও তান্ত্রিক আধ্যাত্মবাদীরা তাদের মানসিক ও দৈহিক নিয়ন্ত্রণের বশবর্তিত্ব শুরু করে।[৫১] সুতরাং এটা খুবই সম্ভাব্য যে বাংলার কিছুসংখ্যক সুফি এ পশ্চাদগামী আধ্যাত্মিক নিয়মানুবর্তিতা গ্রহণ করেছিলেন।

বাংলার সুফিবাদের যৌগিক ও তান্ত্রিক মতবাদগুলির সম্ভাব্য উৎস বিবেচনা করার আগে আমরা পর্যালোচনাধীন অতীন্দ্রিয়বাদী সাহিত্যে প্রকাশিত কিছু সুফি উপাদান বিবেচনা করার চেষ্টা করতে পারি। শরিয়তের (ইসলামি শাস্ত্রীয় আইন) মঞ্জিল গুলি (অবস্থা) তরিকৎ (পথ), হর্কিকৎ (বাস্তবতা) এবং মরিফৎকে (রহস্য সম্পর্কে জ্ঞান) যথাক্রমে মকামাৎ বা সুফিবাদের নাসুৎ (মানবতা) মলকুৎ (ক্ষেত্র) জবরুৎ (সর্বশক্তিমানতা) এবং লাহুৎ (দেবত্ব) পর্যায়রূপে শনাক্ত করার পর এর প্রতি পর্যায়ে একজন সুফির করণীয়

ধর্মীয় কর্তব্য সৈয়দ সুলতান নির্দেশ করেছেন। শরিয়তের মঞ্জিলের জন্য রয়েছে নামাজ, রোজা, হজ, পরার্থপর গুণাবলির অনুশীলন এবং দৈহিক পবিত্রতা। প্রতিটি পর্যায়ই প্রস্তুতিমূলক হওয়ায় শরিয়তের পর্যায়ে যে শিষ্য সন্তোষজনকভাবে তার কর্তব্য সমাধা করেছে সে তরিকৎ বা সুফি কর্মপন্থার পরবর্তী উচ্চতর পর্যায়ে পৌঁছাতে পারে যেখানে তার যৌন-ইচ্ছা, ক্রোধ, লোভ এবং প্রবঞ্চনাকে দমন করা উচিত। হকিকৎ বা বাস্তবতার পর্যায়ে তাকে ক্ষুধা, তৃষ্ণা এবং আলস্য দমন করতে হবে এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারী হতে হবে। মরিফৎ বা রহস্যজনক জ্ঞানের পর্যায়ে পৌছে সে নিজেকে জানার অবস্থায় উপনীত হয়।[৫২]

বাংলার সুফিদের প্রায়োল্লিখিত চার মাকামাৎকে আবু নাসর উস-সরাজ[৫৩] এবং আলী বিন উসমান-উল-জুল্লাবী আল-হুজউইরী[৫৪] কর্তৃক বিস্তৃতভাবে আলোচিত মকামাৎ বা একজন সুফি কর্তৃক অর্জিত গুণাবলি থেকে পৃথকভাবে বিবেচনা করতে হবে। মাকামাৎ এর বর্ণনা দিতে গিয়ে হুজউইরী বলছেন, "বিরতিস্থান (মকাম) যে কোনো ব্যক্তির আল্লাহর পথে অবস্থান এবং সে কারণে তার কর্তব্য পালনকে বুঝায়। এভাবে প্রথম অবস্থান হচ্ছে অনুশোচনা (তওবাৎ), এর পরে আসে পরিবর্তন (ইনাবৎ) তারপর ত্যাগ (জুহদ) তারপর আল্লাহর ওপর বিশ্বাস (তওয়াক্কুল) ইত্যাদি ঃ কারও অনুশোচনা ছাড়া পরিবর্তন বা পরিবর্তন ছাড়া ত্যাগ বা ত্যাগ ছাড়া আল্লাহর ওপর বিশ্বাসের ভান করা অনুমতিযোগ্য নয়"।[৫৫] মকাম (বিরতিস্থান) এবং হালের (অবস্থা) মধ্যে একটা মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। হুজউইরী আরও বলেছেন, পক্ষান্তরে অবস্থা (হাল) হচ্ছে এমন কিছু যা আল্লাহর কাছ থেকে মানুষের হৃদয়ে নেমে আসে, এটা যখন আসে তখন নিজের চেষ্টায় তাকে বাধা দেওয়ার বা এটা যখন চলে যায় তখন তাকে আকর্ষণ করার শক্তি তার থাকে না। তদানুসারে অবস্থান শব্দটির অর্থ হচ্ছে অনুসন্ধানকারীর পথ এবং প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে তার অগ্রগতি, তার গুণের অনুপাতে আল্লাহর কাছে তার মর্যাদা। অবস্থা শব্দটি আল্লাহ তাঁর ভক্তের হৃদয়ে যে অনুগ্রহ ও কৃপা দান করেন তাকে বুঝায় এবং শেষোক্তের কোনো কৃচ্ছ্রসাধনের সঙ্গে এটা সম্পর্কিত নয়। "অবস্থান" হচ্ছে কর্মের শ্রেণীভুক্ত "অবস্থা" হচ্ছে উপহারের শ্রেণীভুক্ত। কাজেই যে ব্যক্তির "অবস্থান" রয়েছে সে নিজের আত্ম-সংযম দ্বারা সমর্থিত। অন্যদিকে যে ব্যক্তির আছে "অবস্থা" সে নিজের কাছে মৃত এবং আল্লাহ তার মধ্যে যে অবস্থার সৃষ্টি করেন তার দ্বারা সমর্থিত।"[৫৬] উপরে বর্ণিত নীতিগুলি মেনে নেওয়া ছাড়াও পরবর্তী সুফিরা বিশ্বাস করেন যে একজন সুফির আত্মার ক্রমারোহণ নাসুৎ মলাকুৎ, জবরুৎ এবং লাহুৎ এর চারটি মাকামাৎ এর সঙ্গে সম্পর্কিত। নাসুৎ হচ্ছে মানবতার স্বাভাবিক অবস্থা যা প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যে রয়েছে। মলাকুৎ হচ্ছে দেবদূতদের সুন্দর ও কোমলদেহধারীদের পবিত্র অবস্থা যেখান থেকে একজন সুফি তাঁর আধ্যাত্মিক যাত্রা শুরু করেন। এখানে তিনি নিজেকে ঐশ্বরিক চিন্তায় মগ্ন করে এবং সকল কাজ ও কুচিন্তা ত্যাগ করে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেন। জবরুৎ এর অবস্থায় সুফি ঐশ্বরিক শক্তি হৃদয়ঙ্গম ও অর্জন করেন। লাহুৎ অবস্থা হচ্ছে সর্বেশ্বরবাদী যেখানে সুফি নিজেকে আল্লাহর প্রকৃতিতে দেখতে পান, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবকিছুই যার অন্তর্ভুক্ত। এ চারটি অবস্থা আবার

যথাক্রমে শরিয়ত, তরিকৎ, মারিফাৎ এবং হকিকৎ এর অনুরূপ।[৫৭] রূপকার্থে বলা যায় যে রহস্যজ্ঞান বা মারিফৎ এবং সত্য বা হকিকৎ এর উচ্চতর আধ্যাত্মিক স্তরে পৌঁছার আগে অর্জিত গুণাবলি ও অতীন্দ্রিয়বাদী অবস্থার সমন্বয়ে গঠিত এক দীর্ঘ পথ বা তরিকৎ সুফি অতিক্রম করেন। সেখানে তিনি তার নিজের ও পরমসত্তার মধ্যে কোনো পার্থক্য অনুভব করেন না। "রহস্য সম্পর্কে জ্ঞান হচ্ছে আল্লাহর মাধ্যমে হৃদয়ের প্রাণশক্তি, এবং স্রষ্টা ছাড়া অন্য সবকিছু থেকে নিজের মনের একান্ত চিন্তাকে ফিরানো"।[৫৮] বুদ্ধিবৃদ্ধিগত ও প্রথাগত জ্ঞান থেকে স্বতন্ত্র মারিফাৎ বা রহস্য-জ্ঞানকে "ঐশ্বরিক অদ্বিতীয়ত্বের গুণাবলি সম্পর্কিত জ্ঞান রূপে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে। এটা দরবেশদের বৈশিষ্ট্য যারা আল্লাহকে হৃদয় দিয়ে দেখতে পান"। এটা মোহাবিষ্ট অবস্থায় লাভ করা যায়।[৫৯] সুফি দর্শনে হকিকৎ বা সত্য শব্দটি "রহিতকরণহীন এক বাস্তবতাকে নির্দেশ করে যা আদমের সময় থেকে পৃথিবীর বিলুপ্তি পর্যন্ত একইরকম শক্তিমান থাকে" এবং এটা "একজন মানুষের আল্লাহর সঙ্গে মিলনের স্থানে বাস করা এবং নিষ্কাশনের (তানজীহ্) স্থানে তার হৃদয়ের অবস্থানকেও" বুঝায়।[৬০] তাঁর দার্শনিক পদ্ধতিতে এসব সুফি উপাদান অন্তর্ভুক্ত করা ছাড়াও সৈয়দ সুলতান চিরন্তন শূন্যতায় যে স্রষ্টা বাস করেন তিনিই পরম সত্তা এবং কার্যকারণ সম্পর্কের অন্তর্নিহিত মূল—এ সর্বেশ্বরবাদী মতবাদে বিশ্বাসী।[৬১] সররাজ ও হুজউইরীর মতো সুফিরা বিশ্বাস করেন যে আলী যথেষ্ট অতীন্দ্রিয়জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন।[৬২] জ্ঞান-প্রদীপে তাঁকে মোহাম্মদের কাছ থেকে গূঢ় জ্ঞান লাভকারীরূপে চিত্রিত করা হয়েছে।[৬৩] মোহাম্মদকে সুফিরা নিখুঁত মানব বা ইনসান-উল-কামিল[৬৪] রূপে অভিহিত করেন এবং তিনি অতীন্দ্রিয়বাদ সম্পর্কে জ্ঞান দানে সক্ষম। সৈয়দ সুলতান এতদূর পর্যন্তও গিয়েছেন যে তিনি শুধু সৃষ্টির সঙ্গেই নয়, স্রষ্টার সঙ্গেও নবীকে শনাক্ত করেছেন।[৬৫] এটা সম্ভবত সর্বেশ্বরবাদের ইঙ্গিত যা পর্যালোচনাধীন দার্শনিক পদ্ধতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে।

বাংলার সুফিরা যোগ ও তান্ত্রিক সংস্কৃতিতে পরিপৃক্ত এক পরিবেশে বাস ও চলাফেরা করতেন। সম্ভবত নাথ পূজাপদ্ধতির প্রভাবে এ সংস্কৃতিকে তাঁরা নিজেদের ধর্মীয়-দার্শনিক পদ্ধতির সঙ্গে একীভূত করে নিয়েছিলেন। আগেই যেমন নির্দেশ করা হয়েছে, ষড়-বৃত্তের মর্মভেদের ধারণাগুলি,স্নায়ু-তত্ত্ব শিবের সঙ্গে শক্তির মিলনের লক্ষ্যে পরিচালিত প্রয়োগসিদ্ধ পশ্চাদ্‌গামী অনুশীলন এবং অমৃতের সংরক্ষণ ছিল নাথবাদের কয়েকটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। নাথ-গ্রন্থ গোরক্ষ-বিজয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ কথোপকথনের আকারে—[৬৬] এটা একটা প্রথাগত আদর্শরীতি যা জ্ঞান-প্রদীপ ও জ্ঞান-সাগরেও অনুসরণ করা হয়েছে। নিজগুরু মীননাথকে দুর্বোধ্য জ্ঞান দান করার সময় গোরক্ষনাথ ত্রিশটি অতীন্দ্রিয়বাদী বিষয় আলোচনা করেছেন।[৬৭] সৈয়দ সুলতান মনে করেন যে মেরুদণ্ডে ত্রিশটি গ্রন্থি রয়েছে যেগুলির অনুধাবন একজন সুফির জন্য বিভিন্ন মাত্রার আধ্যাত্মিক সাফল্য আনয়ন করে।[৬৮] গোরক্ষ-বিজয়ে মৃত্যু নিকটবর্তী হওয়ার বহু লক্ষণ বর্ণনা করা হয়েছে[৬৯] যার অনেকগুলির উল্লেখ জ্ঞান-প্রদীপেও রয়েছে। অনৈতিহাসিক প্রকৃতির হলেও চুরাশিজন সিদ্ধের কাহিনী নাথ দর্শনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।[৭০] সৈয়দ

সুলতান অস্পষ্টভাবে একজন সুফির চুরাশিবার শ্বাস ত্যাগ করার কথা উল্লেখ করেছেন।[৭১] গোরক্ষনাথের কীর্তি বর্ণনাকারী বিখ্যাত গোরক্ষ-বিজয়ের রচনা প্রায়ই শেখ ফয়জুল্লাহ্ নামক একজন মুসলমান কবির ওপর আরোপ করা হয়ে থাকে এবং এ ঘটনা থেকেই মধ্যযুগীয় বাংলার নাথবাদের সঙ্গে মুসলমানদের সংস্পর্শের প্রমাণ পাওয়া যায়। নাথ পরিভাষায় ক্ষেমা (আক্ষরিক অর্থে নিরাপত্তা, নিশ্বয়তা বা প্রশান্তি) নামে অভিহিত বিভিন্ন ধরনের নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিকে দেহের বিভিন্ন কেন্দ্রে স্থাপিত একজন সতর্ক প্রহরীরূপে বর্ণনা করা হয়েছে যাতে ক্ষয় বা পরিবর্তন দেহের সম্পদ হরণ করতে না পারে।[৭২] ক্ষেমার কাজ বর্ণনা করতে গিয়ে সৈয়দ সুলতান একে শ্রেষ্ঠ সত্তা ও ধর্মরূপে শনাক্ত করেছেন। তিনি মনে করেন যে এটা নশ্বরতারোধ করতে পারে।[৭৩] শঙ্খিনী বক্রনালী সহস্রার থেকে তালব্য পর্যন্ত বিস্তৃত এবং এর মুখ হচ্ছে সোমরস বা অমৃত যাওয়ার পথ। নাথবাদে এটা দেহের দশম দ্বাররূপে আখ্যায়িত যা বন্ধ করে একজন মানুষ অমৃত সংরক্ষণ ও পান করতে পারে।[৭৪]

জ্ঞান-প্রদীপে দশম দ্বারও বক্র অংশ সংবলিত একটি স্নায়ুরূপে বর্ণনাকৃত শঙ্খিনীর উল্লেখ আছে। মনে করা হয় যে এ সম্পর্কে জ্ঞান মৃত্যুভয় দূর করে।[৭৫] সুফি যাতে এটা গ্রহণ করতে পারেন সেজন্য অমৃত সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে জিহ্বাকে পিছন দিকে উপরের শূন্যগর্ভের দিকে ঘুরিয়ে মুসলমান কবি অমৃত পানের প্রক্রিয়ার বর্ণনা করেছেন।[৭৬] এ গ্রন্থে আমরা প্রায়ই নাথদের অজপাজপ, হংসনাদ এবং শূন্যতার ধারণা দেখতে পাই।[৭৭] সুতরাং বাংলার সুফি সাহিত্যে এতগুলি নাথ উপাদানের উপস্থিতি এ ইঙ্গিতই দান করে যে কিছুসংখ্যক সুফির মধ্যে প্রচলিত তান্ত্রিক ও যোগ ধারণাগুলির অধিকাংশই নাথবাদের পথ ধরে এসেছিল।

আলোচ্য সময়কালের সুফিদের পশ্চাদ্গামী শারীরিক ও আধ্যাত্মিক অনুশীলন গ্রহণ করার সম্ভবত প্রকৃত কারণ ছিল এবং এটা তাদের পদ্ধতির জন্য একেবারে অপরিচিত ছিল না। নাসুৎ বা মানব জীবনের নিম্নতম পর্যায় থেকে লাহুৎ বা দৈবত্বের উচ্চতম অবস্থায় অতীন্দ্রিয়বাদী ভ্রমণে একটি উর্ধ্বগামী প্রক্রিয়া জড়িত। বিমূর্ত অর্থে সর্বোৎকৃষ্ট অবস্থা অর্জনের উদ্দেশ্যে ভক্ত এ পশ্চাদ্গামী অনুশীলনের মাধ্যমে সাধারণত তার নিম্নগামী প্রবণতাগুলিকে উর্ধ্বগতিসম্পন্ন করার চেষ্টা করে। নিকলসন যেমন বলেছেন, "ফলে প্রকাশের বলয় থেকে অপ্রকাশিত অস্তিত্বের দিকে আত্মার মিলনের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে পরম সত্তার উর্ধ্বমুখে চলনের সূত্রপাত ঘটে।"[৭৮] উত্তর ভারতের নকশ্বন্দী সুফিরা মানবদেহে অবস্থিত ছয়টি লতীফ বা ঐশ্বরিক আলোক-কেন্দ্রের এক তত্ত্বের বিকাশ ঘটিয়েছেন। এগুলি হচ্ছে কলব বা হৃদয়, রুহ বা আত্মা, সিরর বা গোপন হৃদয়, খাফী বা গোপন আত্মা, এবং নফস বা দুষ্ট অহং। লতাইফের তত্ত্বকে যোগদর্শনের ষড়বৃত্ত তত্ত্বের অনুকরণ বলে মনে হয়।[৭৯] কাদিরী সুফিরা এ লতাইফের তালিকায় আরও কয়েকটি নাম সংযোজন করেছেন। এ গুলি হচ্ছে মাথায় অবস্থিত বৃত্তাকার মন বা দিল মুদওয়ারী, দিল নিলফারী বা দুই কুঁচকির মধ্যাংশে অবস্থিত নীলপদ্মের মন, দিল মনওয়ারী বা বামস্তনের নিচে অবস্থিত মোচাকৃতি মন, এবং দিলঅম্বরী বা ডান স্তনের নিচে স্বচ্ছ-হলুদাভ বাদামি

মন। বিশ্বাস করা হয় যে সুফি যখন জিকির করেন তখন বিভিন্ন ধরনের ঐশ্বরিক আলো এসব কেন্দ্রে নেমে আসে।[৮০]

সুতরাং এটা সুপ্রতিষ্ঠিত যে, উত্তর ভারতের কিছুসংখ্যক সুফি কিছু অতীন্দ্রিয়বাদী ধারণার বিকাশ ঘটিয়েছিলেন যা ছিল ভারতীয় যোগ দর্শনে পাওয়া ধারণার অনুরূপ। ভারতীয় ও ইরানি সুফিবাদ ছিল সমন্বয়কারী আন্দোলন যা খ্রিস্টান, নব্য-প্লেটোনিক, বৌদ্ধ ও বেদান্ত দর্শনের মতো বিভিন্ন উৎস থেকে প্রচুর উপাদান আত্মস্থ করেছে, এ কথা মনে রাখলে বাংলার কিছুসংখ্যক সুফি দ্বারা বিকশিত ধর্মীয়-দার্শনিক পদ্ধতিতে যোগও তান্ত্রিক ধারণার উপস্থিতি সন্তোষজনকভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।[৮১] বাংলাতেও এটা স্থানীয় দার্শনিক মতবাদ ও অতীন্দ্রিয়বাদী রীতির সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছিল।

উপরে আলোচিত জটিল ধরনের যোগ-তান্ত্রিক সুফিবাদের প্রচলন পরবর্তীকালেও বাংলায় অব্যাহত ছিল। সপ্তদশ শতকের রচনারূপে বিবেচিত যোগ-কালন্দর[৮২] (সৈয়দ মর্তুজার) এবং আলী রিজার জ্ঞান-সাগরে[৮৩], জ্ঞান-প্রদীপে প্রাপ্ত প্রায় সবকিছুই রক্ষিত রয়েছে। এ দু'টি গ্রন্থ বাংলার সুফি সর্বেশ্বরবাদে ক্রমে ক্রমে যে সব পরিবর্তন আসছিল সে সম্পর্কে আমাদের একটা স্পষ্ট ধারণা দান করে। আলী রিজা উনিশ শতকের প্রথম ভাগে জীবিত ছিলেন বলে মনে করা হয়।

মৃত্যুর চিহ্নাদি,দেহের প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহ, সুফিদের জীবন-চরিতে মুর্শিদ বা আধ্যাত্মিক গুরুর স্থান এবং সূর্য ও চন্দ্রের মতো আলোর উৎস এবং যার উপরে ধ্যানের সময় সুফিকে তার মন নিবিষ্ট করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সে জল[৮৪] সম্পর্কে আলোচনা করা ছাড়াও যোগ-কালন্দরের রচয়িতা নাসুৎ, মলকুৎ, জবরুৎ এবং লাহুৎ এর মকামগুলির বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। তিনি এগুলিকে শুধু শরিয়ত, তরিকত, হকিকৎ এবং মরিফতের মঞ্জিলরূপেই চিহ্নিত করেননি, তিনি এগুলিকে যথাক্রমে মূলাধার, মনিপুর, আজ্ঞা এবং অনাহত চক্রের সঙ্গেও অভিন্ন বলে গণ্য করেছেন। তিনি এসব এলাকার প্রত্যেকটিতে একজন স্বর্গীয় দূতের অবস্থান নির্দেশ করেছেন এবং এগুলিকে গ্রীষ্ম, হেমন্ত, বসন্ত ও বর্ষার পরবর্তী সময় বা শরৎ ঋতুর বাসস্থানরূপে বিবেচনা করেছেন।[৮৫] এসব মকামের প্রত্যেকটির জন্য নির্দেশিত ধর্মীয় কর্তব্যগুলি সৈয়দ সুলতান বর্ণিত কর্তব্যগুলি থেকে মোটেই স্বতন্ত্র নয়। সুফিরীতি অনুসরণ করে যোগ-কালন্দরের লেখক দিলমুদওয়ারী, দিলসনওয়ারী, দিল অম্বরী এবং দিল নিলুফরী—এ চার ধরনের উল্লেখ করেছেন।[৮৬] সুফিদের নিখুঁত মানুষ, মোহম্মদকে লাহুৎ মনের মকামে স্থাপন করা হয়েছে যেখানে একজন সুফি তার আলোর (নূর) সান্নিধ্যে আসতে পারেন।[৮৭]

আলোচ্য সুফি গ্রন্থটিতে বহু নাথ-যোগ উপাদান রয়েছে। চক্র বা বৃত্তগুলির কয়েকটির উল্লেখ করা ছাড়াও কবি একজন সুফিকে নাথবাদের অজপাজপ পালন করতে নির্দেশ দিয়েছেন। অনাহত শব্দের উল্লেখ করেছেন এবং হাজার পাপড়ির পদ্মকে তিনি প্রভুর আবাসস্থলরূপে বিবেচনা করেছেন যাঁর সঙ্গে ত্রিবেণী বা তিনটি নদীর সঙ্গমস্থলে প্রাথমিক যোগাযোগ স্থাপন করা যেতে পারে।[৮৮] এ গ্রন্থে পদ্মাসন, ময়ূরাসন, গর্ভাসন এবং যোগাসনের মতো ভঙ্গির বর্ণনা রয়েছে[৮৯] যা হঠযোগ প্রদীপিকা ও গোরক্ষ সংহিতার

মতো যোগ গ্রন্থগুলিতেও বর্ণিত হয়েছে।[৯০] সাধারণভাবে নাথ প্রভাব প্রকাশ করা ছাড়াও যোগকালন্দরে হিন্দু তন্ত্র ও উপনিষদের কিছু উপাদান রয়েছে। বলা হয়েছে যে চার চক্ররূপে চিহ্নিত নাসুৎ, মলকুৎ, জবরুৎ এবং লাহুৎ এবং চার মকামে যথাক্রমে আগুন, বায়ু, জল ও মাটি এ চারটি উপাদানের প্রাবল্য রয়েছে।[৯১] দেহের বিভিন্ন স্থানে নাথপন্থীদের বিমূর্ত প্রহরী বা ক্ষেমাকে স্থাপন করার পরিবর্তে তিনি নাসুৎ বা মূলাধারে আজরাইল ফিরিশতা মলকুৎ বা মনিপুরে ইস্রাফিল, জবরু বা আজ্ঞায় মিকাইল এবং লাহুৎ বা অনাহতে জিব্রাইলের অবস্থান নির্দেশ করেছেন। এ চারজন ফিরিশতার চেহারা হচ্ছে যথাক্রমে বাঘ, সাপ, হাতি ও ময়ূরের মতো। এদের পরিধানে রয়েছে লাল, সবুজ, সাদা ও হলুদ বস্ত্র এবং এরা প্রত্যেকেই একই রঙ্গের ঘোড়ার পিঠে উপবিষ্ট।[৯২] হিন্দু তন্ত্রে মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মনিপুর, অনাহত এবং বিশুদ্ধ—এ পাঁচটি চক্র যথাক্রমে মাটি, জল, আগুন, বায়ু এবং নির্মল আকাশ-এ উপাদানগুলিকে বুঝায় যা পঞ্চ দেবতা, যথা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশান এবং মহাদেব কর্তৃক পরিচালিত। প্রথম তিনজন দেবতার বর্ণ হচ্ছে লাল, নীল এবং সিঁদুরে, শেষোক্ত দু'জন দেবতা সাদা।[৯৩] উপরে বর্ণিত সুফিদের রং এর ছক তান্ত্রিকদের ছকের অনুরূপ। বিভিন্ন মকাম বা চক্রে বাসকারী ফিরিশতাদের হিন্দু তন্ত্রের দেবতাদের ইসলামি প্রতিরূপ বলে মনে হয়। আবার, একজন সুফির অন্যতম আধ্যাত্মিক সিদ্ধিরূপে[৯৪] গণ্য জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলন হচ্ছে উপনিষদের ধারণা। উপনিষদে এ দু'টিকে একই গাছে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কে বসবাসকারী দু'টি পাখিরূপে চিত্রিত করা হয়েছে। জীবাত্মা বা সচেতন আত্মা দৈহিক ও পার্থিব অভিজ্ঞতার মিষ্টি ফল আস্বাদন করতে পারে যা পরমাত্মা বা অখিলাত্মা অতিযত্নে পরিহার করেন।[৯৫] সুতরাং যোগ-কালন্দরে সুফিবাদের যে চিত্র পাওয়া যায় তা সংমিশ্র প্রকৃতির বলে মনে হয়।

আলী রিজার জ্ঞান-সাগরে বহু নাথ বা যোগ-তান্ত্রিক ধারণা রয়েছে। ষড়চক্র সম্পর্কে কবি বলেছেন; "দেহের ভিতরে ছয়টি বৃত্তধারী ছয়টি পদ্মফুল রয়েছে যা ষড়ঋতু এবং ছয়রাগ বা সঙ্গীতের স্বরগ্রামের বিশ্রামস্থল"।[৯৬] তিনি অজপাজপ, হংসনাদ এবং শ্বাস নিয়ন্ত্রণের যোগ পদ্ধতিরও উল্লেখ করেছেন।[৯৭] আলী রিজা কর্তৃক উপস্থাপিত অতীন্দ্রিয়বাদী তত্ত্বে পশ্চাদৃগামী শারীরিক অনুশীলন একটি নিয়মিত স্থান লাভ করেছে। কবি বলেছেন যে ভালবাসার পথ পশ্চাদৃগামী। এর বিপরীত প্রক্রিয়া সম্পর্কে যার জ্ঞান নেই সে প্রকৃত জীবন উপভোগ করতে পারে না। এখানে সম্মুখগামী হচ্ছে পশ্চাদগামী এবং পশ্চাদগামী হচ্ছে সম্মুখগামী। বিশ্ব-প্রক্রিয়া বৈপরীত্যনীতির সঙ্গে সম্পর্কিত। আধ্যাত্মিকতার পথ আল্লাহ্ গোপন রেখেছেন এবং অলীক পথ রেখেছেন খোলা। এ কারণেই মানুষ ও পরীরা এ জগতে জন্মের পর সুখের অলীক পথ অনুসরণ করে। পশ্চাদগামী পথে চলে মানুষ আধ্যাত্মিক সাফল্য অর্জন করতে পারে।[৯৮] শূন্য বা শূন্যতার ধারণা বাংলা সাহিত্যে প্রাপ্ত সুফি দর্শনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। সৈয়দ সুলতান বলেছেন যে অদৃশ্য শূন্যতা সম্পর্কে ধ্যান আমাদের চরমসত্তার প্রকৃতি সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি দিতে পারে।[৯৯] জ্ঞান-সাগরে এর স্পষ্ট প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় যেখানে বলা হয়েছে যে শূন্যতার প্রতিমূর্তি কঠোর সংযমী তাপস শূন্যতার নাম জপ করেন এবং শূন্যতার সাহায্যে

আধ্যাত্মিক সিদ্ধি অর্জন করেন। তিনি শূন্যতার সঙ্গে প্রেম-বিলাস উপভোগ করেন যা শূন্যতায় অবস্থান করে এবং যার প্রধান কাজগুলি শূন্যতার অনুরূপ। শূন্যতা পরম সত্তাকে ধারণ করে এবং আমাদের প্রকৃত সত্তা সম্পর্কে জ্ঞান দান করে। যোগ-ধ্যান হচ্ছে পরমসত্তা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের আনুষঙ্গিক উপকরণ।[১০০] শূন্যতা ও সুন্দরদেহ অভিন্ন। সৌন্দর্যের অবয়বের কোনো আকৃতি নেই। শূন্যতার সাগর আধ্যাত্মবাদীর কাছে সৌন্দর্যের সাগরকে উদঘাটন করে যেখানে সে সাফল্য লাভ করে।[১০১] আমরা ইতোমধ্যেই দেখেছি যে শূন্যতার এ ধারণা অতি প্রাচীন এবং এটা সম্ভবত ছিল কোল বা অস্ট্রিক মূলোদ্ভূত। পরবর্তীকালে হিন্দুরাও এতে কিছু কিছু সংযোজন করেছে। এ ধারণাটাকে ধর্মবাদ-বিশ্বাস, নাথবাদ ও তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিল।[১০২] স্থানীয় এসব ধর্মবিশ্বাসের সংস্পর্শে আসার কারণে মনে হয় বাংলার দেশজ সুফিবাদ এ ধারণাকে আত্মস্থ করেছিল। যোগ-কালন্দরের রচয়িতার মতো আলী রিজাও জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।[১০৩] আগেই যেমন নির্দেশ করা হয়েছে যে এটা হচ্ছে উপনিষদের ধারণা।[১০৪] এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে আলীরিজা পরকীয়া প্রেমের মতবাদ গ্রহণ করতে দ্বিধাবোধ করেন নি। তিনি বলছেন, "স্বকীয়া বা আইনসঙ্গতভাবে বিবাহিত স্ত্রীর সঙ্গে প্রেম কোনো গভীর প্রেম নয়; কিন্তু পরকীয়া বা অপরের রমণীর প্রতি ভালবাসা প্রেমিক হৃদয়ের উপযোগী"।[১০৫] এ প্রসঙ্গে স্বকীয়া ও পরকীয়া মতবাদ ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। পরকীয়ার আক্ষরিক অর্থহচ্ছে 'অন্যের অধিকারে থাকা', সুতরাং পরকীয়া নামে অভিহিত সংস্কৃতিক......অর্থ হচ্ছে নিজের বিবাহিত স্ত্রী ছাড়া অন্য নারীদের সান্নিধ্যে, বিশেষত স্বামী জীবিত আছেন এমন রমণীর সঙ্গে অতীন্দ্রিয়বাদী রীতি পালন করা"।[১০৬] স্বকীয়া শব্দটি "নারীর প্রতি প্রযোজ্য হলে একজন আইনসঙ্গতভাবে বিবাহিত নারীকে বুঝায় যিনি তাঁর স্বামীর ইচ্ছাপূরণে সদাপ্রস্তুত এবং যার জন্য তার রয়েছে শর্তহীন ভালবাসা"।[১০৭] "পরকীয়া মতবাদকে" সঙ্গতরূপে মূল ভিত্তিরূপে গণ্য করা যায় যার ওপর সহজিয়াদের আধ্যাত্মিক অনুশীলনের ইমারত গড়ে উঠেছে।[১০৮] এই সহজিয়ারা ছিল বাংলায় চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণববাদের একটি শাখা। সুফি দর্শনে এই পরকীয়া উপাদানকে চৈতন্যোত্তর সংযোজন বলে মনে হয়।

এসব স্থানীয় ধারণার সঙ্গে আলী রিজা ইসলামি অতীন্দ্রিয়বাদে প্রাপ্ত বহু সর্বেশ্বরবাদী ধারণা যোগ করেছেন। তাঁর সৃষ্টিতত্ত্বে ঈশ্বর প্রেম প্রাধান্য পেয়েছে। তিনি বলছেন, "ঈশ্বর ভালবাসা ছাড়া সৃষ্টি হয়েছে এমন একটি অণুও নেই। ভালবাসার বশেই ঈশ্বর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। ভালবাসার সাগর হচ্ছে সব বস্তুর উৎপত্তিস্থল। ভালবাসার জোরেই প্রাণীকূল বেঁচে থাকে; ভালবাসা না পেলে সেও মরে যায়।[১০৯] প্রাণীকূল তাঁরই অভিব্যক্তি। এ ধারণার সঙ্গে নিচের পঙ্ক্তিগুলিতে সুফি কবি জামি যে ধারণা প্রকাশ করেছেন তার সুসঙ্গতি রয়েছে :

> যদিও তিনি নিজ সত্তার মধ্যে নিজের বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলিকে
> নিখুঁত সম্পূর্ণতারূপে দেখতে পেয়েছিলেন,

তবুও তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করলেন যে অন্য আয়নায়
তাঁকে সেগুলি দেখানো হোক,
এবং তাঁর চিরন্তন বৈশিষ্ট্যাবলির প্রত্যেকটি সেই হেতু
বিভিন্ন আকারে প্রকাশিত হোক।
সুতরাং তিনি সৃষ্টি করলেন সময় ও স্থানের তাজা মাঠ
এবং জগতের জীবনদায়িনী বাগান,
যাতে প্রতিটি শাখা, পত্র এবং ফল তাঁর প্রতিটি
উৎকৃষ্টরূপ প্রদর্শন করতে পারে।[১১০]

হাল্লাজ বিশ্বাস করতেন যে নিঃসঙ্গ অবস্থায় আল্লাহ নিজেকে উপলব্ধি করতে পারতেন না যার ফলে নতুন সৃষ্টি আদমে মূর্ত ঐশ্বরিক প্রতিচ্ছবি তাঁকে সৃষ্টি করতে হয়েছিল।[১১১] এই সর্বেশ্বরবাদী নীতি গ্রহণ করলেও আলী রিজা সর্বোৎকৃষ্ট মানব মোহাম্মদকে আদমের স্থলাভিষিক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন যে খোদা প্রথমে ছিলেন নিঃসঙ্গ। তাঁর ভালবাসা থেকে তিনি দ্বৈতকে সৃষ্টি করেন যার নাম তিনি দিয়েছিলেন মোহাম্মদ। এ দুই হচ্ছে আদি আশিক ও মাশুকের প্রতিনিধিত্বকারী। একাকীত্বে কেউই ভালবাসা উপভোগ করতে পারে না; কাজেই দু'জনের প্রয়োজন রয়েছে [১১২] কবি এই মতও পোষণ করেন যে নবী মোহাম্মদ আলীকে অতীন্দ্রিয়বাদী জ্ঞান দান করেছিলেন।[১১৩] সুতরাং আলী রিজার সুফি দর্শন হচ্ছে বহু অসদৃশ ধারণার মিশ্রণ।

বাংলায় মুসলমান শাসনের শুরু থেকে মুসলমান মানসের সঙ্গে যোগ ও তান্ত্রিক অতীন্দ্রিয়বাদের যোগাযোগ ছিল বলে মনে হয়। কথিত আছে যে ভারতে ইসলামের প্রসারের কথা শুনে আধ্যাত্মিক সমস্যাবলি আলোচনা করা যায় এমন একজন মুসলমান পণ্ডিত ব্যক্তির সন্ধানে কামরূপের ভোজর ব্রাহ্মণ নামে একজন যোগী আলী মর্দান খলজীর রাজত্বকালে (১২১০-১২১৩ খ্রিস্টাব্দ) লক্ষ্ণৌতি এসেছিলেন। কাজী রুকনউদ্দীন সমরকন্দীর সঙ্গে যোগীর পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। কিছুটা আলোচনার পর যোগী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং পরে ফতওয়া জারি করার অধিকার অর্জন করেন। কথিত আছে যে তিনি তাঁর গ্রন্থ অমৃত কুণ্ড কাজীকে উৎসর্গ করেছিলেন যেটা কাজী আরবি ও ফার্সিতে অনুবাদ করেছিলেন।[১১৪] পরবর্তীকালে মুসলমান সুফিরা এ গ্রন্থ বারবার অনুবাদ করেছিলেন বলে মনে হয়– এ ঘটনা এ জাতীয় গ্রন্থের প্রতি মুসলমানদের শুধুমাত্র পণ্ডিতসুলভ আগ্রহের অতিরিক্ত কিছুও সম্ভবত নির্দেশ করে। ষোড়শ শতকের ভারতীয় একজন সুফি, মোহাম্মদ গউস গোয়ালিয়রীর একজন শিষ্য বহর-উল-হায়াত বা জীবন-সাগর নামে এ গ্রন্থ ফার্সিতে অনুবাদ করেছিলেন। সপ্তদশ শতকের গোড়ার দিকে এটাকে চিত্র শোভিত করা হয়েছিল।[১১৫]

অমৃতকুণ্ডের আরবি সংস্করণে ক্ষুদ্রজগৎরূপে বিবেচিত দেহ, হৃদয়ের প্রকৃতি ও আকৃতি, যোগ-ভঙ্গি, আত্মার প্রকৃতি শুক্র-সংরক্ষণ, কল্পনার মনোবৃত্তি, শ্বাস-প্রশ্বাসের কার্যাবলি, মত্যুর আগমনের চিহ্নাদি, সেগুলিকে দূর করার উপায় এবং বিভিন্ন দেবী কর্তৃক পরিচালিত আধ্যাত্মিক এলাকাগুলির বিবরণ রয়েছে।[১১৬]

এ গ্রন্থের বিস্তারিত বর্ণনায় না গিয়ে আমরা এর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য দেখার চেষ্টা করতে পারি। এর একটি স্তোত্রে মীন বা মৎসেন্দ্রনাথ ও গোরক্ষনাথের নাম রয়েছে।[১১৭] এরা নাথপন্থীদের ইতিহাস লৌকিক উপাখ্যান ও ধর্মের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। এ গ্রন্থের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে মানুষের ডান নাসারন্ধ্রকে সূর্য এবং বাম নাসারন্ধ্রকে চন্দ্ররূপে অভিহিত করা হয়েছে।[১১৮] এটাকে নাথ-যোগ তন্ত্রের সূর্য ও চন্দ্রের প্রতিনিধিত্বকারী যথাক্রমে পিঙ্গলা ও ইঙ্গলা স্নায়ুর প্রতিধ্বনি বলে মনে হয়।[১১৯] গ্রন্থের প্রারম্ভিক অংশে জনৈক অম্বুয়ানাথের উল্লেখ রয়েছে, যার সাহায্যের ওপর অমৃতকুণ্ডের অনুবাদকে নির্ভর করতে হয়েছিল।[১২০] নামটি 'নাথ' দিয়ে শেষ হওয়ায় এ ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে তিনি নাথ পূজাপদ্ধতির অনুসারী ছিলেন। আরবি হাউজ-উল-হায়াত এবং ফার্সি বহর-উল-হায়াতে বেশ কয়েকটি আসনের বর্ণনা থাকলেও[১২১] উভয় সংস্করণেই বলা হয়েছে যে এসব যোগভঙ্গির মোট সংখ্যা হচ্ছে চুরাশি[১২২]–নাথ পৌরাণিক কাহিনীতে এ সংখ্যাটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ। বহর-উল-হায়াতের চিত্রশোভিত পাণ্ডুলিপিতে পদ্মাসন, সিংহাসন, খেচর মুদ্রা ও সভাসন সহ ২১টি আসনের চিত্র ও বর্ণনা রয়েছে।[১২৩] যোগ অনুশীলন সম্পর্কিত কোনো কোনো গ্রন্থে এগুলির যথোচিত সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে।[১২৪] অমৃতকুন্ডের আরবি অনুবাদের নিচের উদ্ধৃতাংশটি পশ্চাদগামী শারীরিক অনুশীলনের ইঙ্গিত দান করে বলে মনে হয় : "দেহ হচ্ছে উল্টানো গাছের মতো। ইচ্ছা করলে এর অর্থের ক্ষতি না করে একে তুমি উল্টাতে পার। এর অর্থ যখন উল্টো হয় তখন এটা হয় সোজা। তখন এটা আকৃতিতে উল্টানো ও অর্থে সোজা হয়"।[১২৫] এ ধারণা উপনিষদের ধারণার অনুরূপ বলে মনে হয়। এ জগৎকে একটি অন্তহীন ডুমুর গাছ হিসেবে বিবেচনা করা হয় যার মূল রয়েছে উপরের দিকে এবং শাখা-প্রশাখা নিচের দিকে। এ গাছের মূলকে শুভ্র আলো, সত্তা এবং অমৃতরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। মানুষ এর মাঝে আশ্রয় লাভ করে। কেউ এটাকে পেরিয়ে যেতে পারে না।[১২৬] অমৃতকুণ্ডে উল্লিখিত মৃত্যুচিহ্নের কয়েকটি গোরক্ষ-বিজয়েও দেখতে পাওয়া যায়।[১২৭] এর যোগ ধারণা ও রীতিগুলিসহ নাথবাদের আলোচনা কালে দবিস্তান-উল-সব্বাহিব এর লেখক মুহসিন ফণী প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করেছেন যে অমৃতকুন্ড হচ্ছে গোরক্ষনাথের অনুসারীদের ধর্মগ্রন্থ।[১২৮] কাজেই এটা মোটামুটি নিশ্চিত মনে হয় যে নাথবাদীদের দ্বারা এটা যদি নাও লিখিত হয়ে থাকে, তারা এটা ব্যবহার করেছিল।

পর্যালোচনাধীন সময়কালে বাংলায় সুফি দর্শনে সম্ভবত অবিরাম বিকাশ ঘটেছিল। এ বিকাশকালে মুসলমানদের ধর্মীয় দার্শনিক মানসিকতায় পরিবর্তনের এক দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যোগ ও তান্ত্রিক ধারণাগুলি তাদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল। দেশীয় উৎসগুলি থেকে ধারণার অনুকরণ ইচ্ছাকৃত ছিল বলে মনে হয় না। সৈয়দ সুলতানের অতীন্দ্রিয়বাদী দর্শনের সঙ্গে নাথবাদের অসাধারণ সাদৃশ্য রয়েছে। যোগ-কালন্দর এবং জ্ঞান-সাগরের রচয়িতা, যাদের যুক্তিসঙ্গতভাবেই তাঁর আধ্যাত্মিক উত্তরসূরি বিবেচনা করা যেতে পারে, তাঁর অতীন্দ্রিয়বাদী ধারণার সঙ্গে তাঁর দর্শনের তাৎপর্যের পরিবর্তন না ঘটিয়ে কিছু সহজিয়া ও উপনিষদের ধারণার সংযুক্তি ঘটিয়েছেন। এসব মুসলমান অতীন্দ্রিয়বাদীদের ওপর

দেশীয় ধারণাবলির প্রভাবের ওপর গুরুত্ব আরোপ করতে গিয়ে তাঁদের রচনাবলিতে সুফিদের সর্বেশ্বরবাদী ধারণার উপস্থিতিকে উপেক্ষা করা উচিৎ হবে না।

নবীবংশ এবং ওফাতে-রসুলের[১২৯] মতো সৈয়দ সুলতানের অন্যান্য রচনা এ সমন্বয়সাধনের প্রবণতা দেখা যায়। এগুলিতে কবি ইতিহাসকে পৌরাণিক কাহিনীর সঙ্গে সংযুক্ত করেছেন। ইসলামে স্বীকৃত নবীদের বিবরণ দিতে গিয়ে তিনি চতুর্বেদকে দৈব-বাণীমালারূপে গণ্য করেছেন। একজন অবতারের সঙ্গে একজন নবীর (যিনি দৈববাণী লাভ করেছেন) কোনো পার্থক্য তিনি দেখতে পান না বলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এবং কৃষ্ণ, হিন্দু পৌরাণিক কাহিনীর এসব দেবতা ইসলামের নবী মোহাম্মদকে তিনি ভগবানের অবতাররূপে গণ্য করেছেন। তিনি বলেছেন যে এ চারজন হিন্দু দেবতাকে যথাক্রমে ঋক, সাম, যজু এবং অথর্ববেদ—এ চারটি ঐশ্বরিক ধর্মগ্রন্থ দেওয়া হয়েছিল। এ চারজন দেবতা কালক্রমে অপ্রচলিত হয়ে পড়েন; যার ফলে আদম, সিস, নূহ, ইব্রাহীম, মুসা, দাউদ, সুলায়মান, ঈসা এবং মোহাম্মদ তৌহিদ বা একেশ্বরবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে ক্রমান্বয়ে ধরায় আবির্ভূত হন। তিনি এ ধারণার ওপর গুরুত্ব আরোপ করার চেষ্টা করেছেন যে রসুল মোহাম্মদের আগমন চতুর্বেদে ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছিল।[১৩০] একজন হিন্দু কবির মতো তিনি রাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলার প্রাণবন্ত বর্ণনা দিয়েছেন।[১৩১] রাধার সঙ্গে কৃষ্ণের মিলনের দৃশ্য বর্ণনাকারী তাঁর বৈষ্ণব কবিতার একটি[১৩২] মনে হয় ভাবপ্রবণ আত্মার সঙ্গে পরমেশ্বরের মিলনের নির্দেশ করে। ফলে গোটা কাব্যটাই হচ্ছে প্রতীকী।

এভাবে সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের যে প্রচেষ্টা সৈয়দ সুলতান করেছেন তা ঐ সময়ে মুসলমানরা যে ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক অবস্থায় বাস করছিল তার ফল বলে নির্দেশ করা যেতে পারে। তিনি আমাদের বলছেন যে, স্থানীয় কল্প-কাহিনীর সঙ্গে পরিচিত কিন্তু ইসলামি ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞ বাঙালি মুসলমানদের জন্য তিনি ইসলামি বিষয়ে লিখছিলেন।[১৩৩]

তিনি সম্ভবত এ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন যে, হিন্দু উপাদানের সঙ্গে ইসলামি ধারণার সংযুক্তি ঘটালে তা স্থানীয় মুসলমানদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। মুসলমানরা হিন্দু পৌরাণিক কাহিনী আগেই জানত। এ মনস্তত্ত্ব থেকে মনেহয় অবতারবাদ এবং শত-চক্রের যোগ -তান্ত্রিক ধারণাকে তাঁর ধর্মীয় দর্শনের অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে গ্রহণের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

৩.

শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত শক্তিশালী ধর্মীয় আন্দোলন বৈষ্ণববাদ কিছুদিনের জন্য বাংলার জীবন ধারার সবকিছুকে গ্রাস করে নিয়েছিল। এখানে ইসলামের সঙ্গে এর সম্পর্ক আলোচনা করা প্রয়োজন। ইসলামও তখন এদেশে দ্রুত প্রসার লাভ করছিল। বৈষ্ণববাদের ভাবপ্রবণ দর্শনের ওপর ইসলামি অতীন্দ্রিয়বাদের প্রভাবের মূল্যায়নের চেষ্টা করা হয়েছে। হাল (হর্ষজনক অবস্থা), জিকর (আল্লাহর নামজপ) এবং সিমাকে (সঙ্গীতানুষ্ঠানের জন্য সুফিদের সমাবেশ) গৌড়ীয় বৈষ্ণববাদের দশা, কৃষ্ণনাম ও কীর্তনের সম্ভাব্য প্রতিরূপ

হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।[১৩৪] আবার বৈষ্ণববাদের জোরালো সর্বেশ্বরবাদী একেশ্বরবাদ, স্বর্গীয় প্রেমের ওপর এর গুরুত্ব আরোপ এবং বর্ণ প্রথার প্রতি এর মনোভাব—এ সবকিছুই সুফি প্রভাবের ওপর আরোপ করা হয়েছে।[১৩৫] কিন্তু এগুলি এই দুই দার্শনিক পদ্ধতির মধ্যে কোনো কার্যকারণ সম্পর্ক নির্দেশ করে অথবা এগুলি ছিল দৈব-সাদৃশ্য-তা নির্ণয় করা অত্যন্ত দুঃসাধ্য। এসব কারণেই কিছু পণ্ডিত এ দু'টির মধ্যে পার্থক্যগুলি তুলে ধরে এবং সে কালের বৈষ্ণব সাহিত্যের ওপর বৌদ্ধ, জৈন, তান্ত্রিকবাদ ও শিব-পূজাপদ্ধতির প্রভাবের প্রতি ইঙ্গিত করে বৈষ্ণববাদের ওপর সুফি প্রভাবের তত্ত্বকে অপ্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন।[১৩৬]

এ সমাপ্তিহীন বিতর্কের মধ্যে প্রবেশ না করে আমরা বিষয়টির ওপর আলোকপাত করার জন্য অন্য কয়েকটি সুনির্দিষ্ট তথ্য উল্লেখ করতে পারি। চৈতন্যের জীবনীগুলি মনোযোগ দিয়ে পড়লে দেখা যায় যে, তিনি তেমন দীর্ঘ সময়ের জন্য কোনো সুফির সঙ্গে বাস করেন নি। ইসলামি বা সুফি কোনো সাহিত্যের সঙ্গেও তাঁর পরিচয় ঘটে নি। এক গোঁড়া ব্রাহ্মণ-পরিবারে তাঁর জন্ম হয়েছিল এবং ইসলামি ধারণা বা রীতির সঙ্গে এপরিবারের কোনো যোগাযোগ ছিল বলে মনে হয় না। শ্রীচৈতন্যের অধিকাংশ জীবনীতেই দেখা যায় যে, তাঁর পিতামাতার জীবন ছিল ধর্মীয় কঠোরতার দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত, যেখানে ইসলামি প্রভাব পড়ার কোনো সুযোগই ছিল না। এটা সত্য যে বাংলার জীবনধারা ছিল সুফি প্রভাবে পরিপূর্ণ। কিন্তু নবদ্বীপে এর প্রভাব কতটুকু পড়েছিল তা নিঃসন্দেহে এক বিতর্কিত বিষয়। বস্তুতপক্ষে শ্রীচৈতন্যের জন্মস্থান, নবদ্বীপ, তখনও সংস্কৃত শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে নিজের অবস্থান বজায় রেখেছিল। ভাগবত-পুরাণ মনে হয় চৈতন্যকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। এতে কীর্তন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে।[১৩৭] দাক্ষিণাত্যের অলভর সন্ন্যাসীরাও কীর্তন পরিবেশন করত। আবার গান ও নাচের রীতি জালাল-উদ্দীন রুমীর মওলয়ী সুফি সম্প্রদায়ের মধ্যেও প্রচলিত ছিল।[১৩৮] কিন্তু এ সম্প্রদায় মধ্যযুগীয় বাংলায় প্রসার লাভ করতে পেরেছিল বলে মনে হয় না। সুতরাং বৈষ্ণবদের কীর্তনের ওপর মওলয়ী সুফিদের সীমার প্রভাবকে স্বতঃসিদ্ধ বিষয়রূপে বিবেচনা করা অন্যায় বলে মনে হয়। সুফিদের হাল গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের কীর্তনকে প্রভাবিত করেছিল সম্ভবত এ মতবাদও একইরকম অসমর্থনীয় কারণ কোনো কোনো ভারতীয় সন্ন্যাসীও তাঁদের ধর্মীয় অভিজ্ঞতার সময় পরমানন্দদায়ক অবস্থা লাভ করতেন। কথিত আছে যে তাঁর মনের ওপর কৃষ্ণের ধর্মের প্রভাবে মানবেন্দ্রপুরী মাঝে মাঝে মূর্ছা যেতেন।[১৩৯] ভগবানের নাম-জপ বাংলার বৈষ্ণবদের কাছে নতুন কিছু ছিল না। ভাগবতে ভগবানের ভক্তিপূর্ণনাম জপের উল্লেখ আছে।[১৪০] কাজেই বৈষ্ণবদের কৃষ্ণনামরূপে অভিহিত ধর্মীয় রীতির ওপর সুফিদের জিকির এর কোনো প্রভাব ছিল বলে মনে হয় না। প্রাক-চৈতন্য আমলের বৈষ্ণববাদেও প্রেমের উপাদান বিদ্যমান ছিল। ভাগবতে ভগবানকে অত্যন্ত প্রিয়জন রূপে গণ্য করা হয়েছে।[১৪১] উপনিষদে সর্বেশ্বরবাদের ধারণা এত বেশি দেখা যায় যে এদের সুফিবাদে খোঁজার কোনো কারণ আমাদের নেই। সুফিবাদ ও বৈষ্ণববাদের মধ্যে বৈসাদৃশ্যগুলির মধ্যে সুফিবাদে ভগবান ও ভক্তের মধ্যে

নারী মধ্যস্থতাকারীর অনুপস্থিতি একটি। এ মধ্যস্থতাকারী প্রতিনিধি বৈষ্ণববাদে ব্যতিক্রমহীনভাবে বর্তমান। মনে হয় না যে একেশ্বরবাদ বৈষ্ণববাদের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য ছিল, যদিও সুফি ধর্মবিশ্বাসের এটা ছিল মূল ভিত্তি। বৈষ্ণবরা দেবতাদের ক্রমাধিকার তন্ত্রের ধারণা পোষণ করে সেখানে কৃষ্ণের অবস্থান প্রথম ও প্রধান।[১৪২] কেউ কেউ মনে করতে পারেন যে বর্ণপ্রথার প্রতি চৈতন্যের মনোভাব সম্ভবত ইসলামি সামাজিক রীতি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। এটা সত্য যে তাঁর ধর্মীয় আবেগ-প্রবণতা বর্ণপ্রথার কঠোরতার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেনি; কিন্তু তিনি এটাকে উচ্ছেদ করার চেষ্টা করেছিলেন বলে মনে হয় না। হিন্দুদের বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে তিনি পরস্পরের সঙ্গে অন্নগ্রহণ ও বৈবাহিক সম্পর্ক প্রচলনেরও চেষ্টা করেন নি। কাজেই শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণববাদের ওপর সুফিদের প্রভাবের বিষয়টি এখনও গবেষণা-যোগ্য।

এটাও বলা হয়েছে যে বহু মুসলমানকে নিজ ধর্মে ধর্মান্তরিত করে শ্রীচৈতন্য ইচ্ছাকৃতভাবে ইসলামের অগ্রগতি রোধ করেছিলেন।[১৪৩] এ প্রসঙ্গে দৃষ্টান্ত হিসেবে হরিদাস, বিজুলি খান এবং উড়িষ্যা সীমান্তে বাসকারী মুসলমান কর্মকর্তার দৃষ্টান্তগুলি তুলে ধরা হয়। কিন্তু এ কথা ভুলে যাওয়া উচিৎ নয় যে অধিকাংশ বৈষ্ণব গ্রন্থাবলি রচনা করেছিলেন শ্রীচৈতন্যের অনুসারী বা ভক্তবৃন্দ। বেশকিছুসংখ্যক মুসলমানের ধর্মান্তরণের জন্য তাঁরা নিশ্চয়ই তাঁদের প্রভুকে কৃতিত্ব দিয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে মনোযোগের সঙ্গে বৈষ্ণব গ্রন্থাবলি পরীক্ষা করলে স্পষ্টভাবেই দেখা যায় যে শ্রীচৈতন্যের কৃতিত্ব বহুলাংশে বড় করে দেখানো হয়েছে। মহাপ্রভুর অনুসারীরা চৈতন্য কর্তৃক প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্ম ইসলামের মতো একটি শক্তিশালী ধর্মকেও গ্রাস করেছিল এটা দেখাবার প্রলোভন সংবরণ করতে পারে নি। কিন্তু সে সময় মুসলমানরাই যখন দেশের রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন তখন বৃহৎ সংখ্যার মুসলমানদের ধর্মান্তরিত হওয়া সম্ভবপর ছিল না। চৈতন্যচরিতামৃত ও চৈতন্য-ভাগবতের মতো রচনাবলিতে বলা হয়েছে যে চৈতন্যের কীর্তন কিছুসংখ্যক মুসলমানের মনে এত গভীর প্রভাব ফেলেছিল যে বৈষ্ণবদের নাচ-গান করতে দেখলে তারা হরির নাম উচ্চারণ করত।[১৪৪] যুক্তিগ্রাহ্যভাবে ব্যাখ্যা করলে এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, বৈষ্ণবদের সঙ্গীতানুষ্ঠান কিছুসংখ্যক মুসলমানের মনে আবেগের সঞ্চার করত এবং তারা সাময়িকভাবে হরিনাম উচ্চারণ করত। এটা বিশ্বাসই করা যায় না যে এসব মুসলমান চিরতরে ইসলাম ত্যাগ করে বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করেছিল। এ প্রসঙ্গে আমরা শ্রীনিবাসের ঘরে কর্মে নিযুক্ত মুসলমান দর্জির বিষয়টি উল্লেখ করতে পারি। কীর্তনের দৃশ্য দেখে সে প্রায় পাগল হয়ে গিয়েছিল।[১৪৫] কিন্তু এটাকে সাময়িক মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা বলেই মনে হয় যার সম্ভবত কোনো স্থায়ী স্থিতিকাল ছিল না। তার ধর্মান্তরিতকরণ সহ হরিদাসের জীবন বৃত্তান্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন। অদ্বৈত-প্রকাশ, প্রেম-বিলাস এবং ভক্তি-রত্নাকরের চেয়ে আগে রচিত চৈতন্য-চরিতামৃত এবং চৈতন্যভাগবতের কোথাও উল্লেখ নেই যে জন্মগতভাবে তিনি মুসলমান ছিলেন ও পরে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। যবনের কলঙ্ক তার নামের সঙ্গে কিভাবে যুক্ত হয়েছিল তা পরিষ্কারভাবে জানা যায় না। এটা খুবই সম্ভাব্য যে জন্মগতভাবে হিন্দু হরিদাস মুসলমানের কাছে লালিত

পালিত হয়েছিলেন এবং মুসলমান পরিবারের সঙ্গে তাঁর জড়িত থাকার জন্য যবন রূপে পরিচিত হয়েছিলেন। বস্তুতপক্ষে ঈশান নাগরের অদ্বৈত-প্রকাশে এ ইঙ্গিতই দেওয়া হয়েছে।[১৪৬] হরিদাসের বৈষ্ণবধর্মে ধর্মান্তরিতকরণ এবং একজন মুসলমানের বৈষ্ণব ধর্মে ধর্মান্তরিতকরণ অভিন্ন বলে মনে হয় না। অভিযোগ করা হয়ে থাকে যে হরিদাস বহু মুসলমানকে ধর্মান্তরিত করেছিলেন।[১৪৭] কিন্তু চৈতন্য-চরিতামৃত ও চৈতন্য-ভাগবতের মতো আর আগে লেখা এবং অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য গ্রন্থাবলি হরিদাসের কৃতিত্ব সম্পর্কে যথেষ্ট বিস্তারিত বর্ণনা দিলেও এ ঘটনা সম্পর্কে নীরব। পরে উল্লিখিত গ্রন্থটি তাঁকে সংস্কারমুক্ত ও উদার মনোভাবসম্পন্ন একজন মহান সাধু রূপে চিত্রিত করেছে। এমনকি মুসলমান কাজীদের হাতে নিষ্ঠুরভাবে নিপীড়িত হয়েও তিনি বলছেন; "আমার সন্তানেরা, শোন, সব মানুষের খোদাই এক এবং অভিন্ন। হিন্দু ও মুসলমানরা শুধু তাঁর নামের তারতম্য করে। কোরান ও পুরাণের লক্ষ্য এক পরমেশ্বর। এক নিখুঁত, অবিভাজ্য, অশেষ, চিরন্তন সত্তা সবার হৃদয় পূর্ণ করে আছে।"[১৪৮] যে হরিদাসের এত উদার ও সর্বেশ্বরবাদী ধারণা ছিল তিনি মুসলমানদের বৈষ্ণবধর্মে ধর্মান্তরিত করেছিলেন সেটা যথেষ্ট অসম্ভব বলেই মনে হয়। বিজুলি খান এবং উড়িষ্যা সীমান্তের কর্মকর্তার ধর্মান্তরিতকরণের পূর্বোল্লিখিত উপাখ্যান চৈতন্য-চরিতামৃতে পাওয়া যায়,[১৪৯] তবে কৃষ্ণদাস কবিরাজের পূর্ববর্তী বৃন্দাবনদাস ও অন্যকোনো লেখক এর কোনো উল্লেখই করেন নি। শ্রীচৈতন্যের জীবনের সঙ্গে জড়িত বহু ঘটনা সম্পর্কে তাঁর তথ্যের উৎস উল্লেখ করলেও, এসব কাহিনীর উৎস সম্পর্কে কৃষ্ণদাস কবিরাজ নীরব। এসব অসুবিধার কারণে উদ্দীপনাময় বৈষ্ণবকবি কৃষ্ণদাস বিজুলি খান ও উড়িষ্যা সীমান্তের কর্মকর্তার ধর্মান্তরিতকরণের যে কাহিনী বর্ণনা করেছেন, সেগুলি বিশ্বাস করা মোটেই নিরাপদ নয়। কিছুসংখ্যক মুসলমান বৈষ্ণবধর্মে ধর্মান্তরিত হয়ে থাকলেও তাদের সংখ্যা নিশ্চয়ই ছিল সীমিত। এখন সেকালের সাহিত্যে বর্ণিত মুসলমান ও বৈষ্ণবদের মধ্যে বিরোধের কি ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে?[১৫০] বৈষ্ণবদের পরিবেশিত হরি-সংকীর্তন মনে হয় ছিল নবদ্বীপে প্রচলিত এক নতুন রীতি এবং এটা জনগণের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। গোড়াতে এর বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণদের প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছিল।[১৫১] স্থানীয় হিন্দুরা যখন স্থানীয় মুসলমান কর্মকর্তার সাহায্য নিয়ে এটাকে দমন করতে চেয়েছিল[১৫২] তখন শেষোক্ত ব্যক্তিকে শুধু তাদের সন্তুষ্ট করার জন্যই নয়, শহরে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্যও তাদের অনুরোধ মেনে নিতে হয়েছিল। কীর্তনের বিরোধিতা করা হলে বৈষ্ণবরা প্রচণ্ড ধর্মোন্মত্ততার মেজাজে কাজীকে আক্রমণ করেছিল এবং তার ঘর পুড়িয়ে দিয়েছিল।[১৫৩] মুসলমান ও বৈষ্ণবদের মধ্যে বিরোধ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে এতে কোনো আদর্শগত বা ধর্মীয় বিষয় জড়িত ছিল না। এতে কোনো ধর্মীয় আমেজ থাকলেও তা ছিল শুধু এই কারণে যে পরিস্থিতির মোকাবেলা যে কর্মকর্তাকে করতে হয়েছিল তিনি ছিলেন মুসলমান, যদিও বৈষ্ণবদের প্রতি তাঁর কোনো বিরূপ মনোভাব ছিল বলে মনে হয় না। এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে সকল সম্প্রদায় ও বর্ণের মানুষকে বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণের মাধ্যমে শ্রীচৈতন্য ইসলামের উদারশক্তিকে বাধা দিয়েছিলেন। অন্যথায় হিন্দু সমাজের নিম্নশ্রেণীর যে সকল

লোককে চৈতন্য ধর্মান্তরিত করেছিলেন তারা হয়তো ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করত। এভাবে বৈষ্ণবধর্ম ইসলামের হাত থেকে হিন্দুধর্মকে রক্ষা করেছিল।

এটা সত্য যে, চৈতন্য এমন কিছু সামাজিক-ধর্মীয় শক্তিকে অবমুক্ত করেছিলেন যেগুলি মনে হয়, এদেশে ইসলামের প্রভাবকে বিপন্ন করেছিল। উপরে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, ইসলামের প্রতি শ্রীচৈতন্যের মনোভাব বোধহয় বিরূপ ছিল না, কিংবা তাঁর আন্দোলনকে এর বিরুদ্ধে পরিচালনা করার কোনো অকৃত্রিম ইচ্ছাও তাঁর ছিল বলে মনে হয় না। কিন্তু চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণববাদ ধর্মান্তরণে উৎসাহী আগ্রাসী এক ধর্মীয় সম্প্রদায়ে পরিণত হয় এবং মনে হয় যে, এদের মধ্যে ইসলামের প্রতি অবজ্ঞাসূচক মনোভাব বেড়ে উঠে। চৈতন্যোত্তর যুগে সমৃদ্ধিলাভকারী কৃষ্ণদাস কবিরাজ, জয়ানন্দ এবং ঈশান নাগর –এদের সকলের রচনাতেই ইসলামের প্রতি বৈরিতা ও বিরোধিতার চেতনা প্রকাশ পায়। ইসলাম সম্পর্কে কৃষ্ণদাস কবিরাজ যা বলেছেন আমরা এখানে তা উদ্ধৃত করতে পারি; "তাদের কৃত পাপের জন্য গো-হতাকারীদের নিশ্চয়ই চিরন্তন নরকের অগ্নি ভোগ করতে হবে। তোমাদের (মুসলমানদের) শাস্ত্রের রচয়িতা বিপথে চালিত হয়েছেন,কারণ তিনি এসব নীতি (গো-হত্যা ও অন্যান্য) ব্যাখ্যা করেছেন যে গুলির সার তিনি জানেন না......। এ শাস্ত্র আধুনিক হওয়ায় এটা যুক্তির পরীক্ষায় টিকতে পারে না।"[১৫৪] চৈতন্যের জীবদ্দশায় ইসলামের প্রতি বৈষ্ণবদের এ ধরনের তিক্ততা কদাচিৎ দেখা যেতে পারত। একই গ্রন্থে তিনি বলেছেন যে অধঃপতনের যে খাদে তারা পতিত হয়েছিল তা থেকে তাদের উদ্ধার করার জন্য তিনি মুসলমানদের ধমান্তরিত করছেন।[১৫৫] ঈশান নাগরের অদ্বৈত-প্রকাশেও একই ধরনের ধারণা প্রকাশ করা হয়েছে। একটিমাত্র গ্রন্থাংশ উদ্ধৃত করা হচ্ছে : "মুসলমানদের শাস্ত্র যুক্তি-বিরোধী। যারা সে শাস্ত্র মেনে চলে তারা যবনরূপে পরিচিত। সর্বত্র বিদ্যমান পরমেশ্বরের কোনো আরম্ভ নেই। তাঁর দেহ ছয়টি গুণে পরিপূর্ণ খাঁটি এবং স্বত্বময় (বা দয়ার গুণাধিকারী)। যে শাস্ত্রের অধ্যয়ন তাঁকে কোমল ও বিমূর্তরূপে গণ্য করে তা মায়া ও মোহকে বৃদ্ধি করার পথে চালিত করে।[১৫৬] চৈতন্যোত্তরকালে রচিত গ্রন্থাবলি থেকে অনুরূপ গ্রন্থাংশ উদ্ধৃত করা নিষ্ফল হবে। এটা বলাই যথেষ্ট যে, সেকালের সকল বৈষ্ণব কবিই হিন্দুসমাজের উপর ইসলামের প্রভাব নিয়ে খেদ ব্যক্ত করেছেন।

চৈতন্যোত্তর কালের বৈষ্ণবদের বৈরী মনোভাবের বিভিন্ন কারণ দেখানো যেতে পারে। ইতোমধ্যেই হোসেন শাহী আমলের অবসান ঘটেছিল এবং দেশে মোগল শাসন প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল। হোসেন শাহী শাসন জনগোষ্ঠীর জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটিয়েছিল। হিন্দু এবং বৈষ্ণবরাও এ থেকে বাদ পড়ে নি এবং মনে হয় তারা শাসকগোষ্ঠীর কাছ থেকে যথেষ্ট ধর্মীয় সহিষ্ণুতা পেয়েছিল। কিন্তু মোগল শাসনামলে সম্ভবত এ ব্যাপারে এক দুঃখজনক বৈপরীত্য দেখা গিয়েছিল, কারণ এর সঙ্গে জনগণের কোনো সম্পর্ক ছিল না। এ থেকেই কেন প্রেম-বিলাসের একটি অংশে মুসলমান শাসনকে সকল নষ্টের মূল রূপে গণ্য করা হয় তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।[১৫৭] দেশে ইসলাম অত্যন্ত দ্রুত প্রসার লাভ করছিল এবং হিন্দুসম্প্রদায় থেকে বহু লোককে ইসলাম

ধর্মাবলম্বী করে ফেলছিল। হিন্দুসমাজের উপর মুসলমান প্রভাব বেশ প্রত্যক্ষ হয়ে উঠছিল। বাংলার জীবনযাত্রার ওপর বহুরকমের প্রভাবসংবলিত বিদেশী শাসন ও ধর্মমত আর সহনীয় থাকে নি। এসব কিছুই, মনে হয়, ইসলামের বিরুদ্ধে এক শক্তিশালী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল।

৪.

ধর্মপূজাপদ্ধতিতে মনে হয় ইসলামের প্রতি এক অক্রিয় সহানুভূতির বিকাশ ঘটেছিল। সেকালে এটা যে ব্রাহ্মণ্য অত্যাচার ভোগ করেছিল তার ফলে সম্ভবত এটা ঘটেছিল। এটা প্রায়ই মনে করা হয় যে, ধর্মপূজা পদ্ধতির ওপর স্পষ্টত বোধগম্য ইসলামি প্রভাব রয়েছে।[১৫৮] শুধুমাত্র সীমিত অর্থেই এ ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে। ইসলামের নিরাকার আল্লাহর ধারণা কোনোমতেই ধর্মবাদী মতবাদের শূন্যবাদের অনুরূপ নয়। শূন্যবাদ মূলত নেতিবাচক, কিন্তু ইসলামের আল্লাহর ধারণা যথেষ্ট ইতিবাচক। একেশ্বরবাদ ইসলামের মুখ্য বিষয়। কিন্তু ধর্ম পূজাপদ্ধতিতে এটা তা নয়, কারণ ধর্মমতবাদ হিন্দু বহু ঈশ্বরবাদের বিভিন্ন দেবদেবীকে স্বীকার করে, শূন্য-পুরাণের সৃষ্টি-পত্তনে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এবং আদ্যাশক্তি বা পার্বতীকে যথাযোগ্য স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।[১৫৯] কাজেই ইসলামি ধর্মতত্ত্ব বাংলার ধর্মবাদীদের প্রভাবিত করেছিল বলে মনে হয় না। ধর্মপূজাপদ্ধতির অনুসারীদের ওপর মুসলমানদের কোনো প্রভাব থেকে থাকলে সেগুলি মনে হয় ছিল তাদের অভ্যাস ও রীতির ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ যার কয়েকটি সম্ভবত মুসলমান রীতির সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। মুসলমান রীতি অনুযায়ী গরু জবাই এবং পশ্চিম দিকের প্রতি শ্রদ্ধা ধর্ম-পূজা-বিধানে লক্ষ্য করা যায়। মাঝে মাঝে ধর্ম মতবাদীরা গৌড়ের সুলতানকে বিমূর্তধর্মরূপে গণ্য করেছে।[১৬০] কোনো কোনো মুসলমান কবি তাঁদের রচনায় ধর্মমতবাদীদের পরিভাষা ব্যবহার করেছেন। এভাবে ইসলামের নিরাকার আল্লাহ্ ও ধর্মমতবাদীদের নিরঞ্জন অভিন্ন হয়ে পড়েছেন।[১৬১] এসবই সামাজিক ক্ষেত্রে মুসলমান ও ধর্মমতবাদের অনুসারীদের মধ্যে একটা বোঝাপড়ার ইঙ্গিত দেয় যে সম্পর্কে কোনো বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় না। ব্রাহ্মণদের কাছে তারা যে বৈরীসুলভ ব্যবহার পেয়েছিলেন সে কারণে মনে হয় শেষোক্তরা মুসলমানদের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন হয়েছিল।

তারা যে ব্রাহ্মণ্য শ্রেণীর হাতে নিগৃহীত হয়েছিল নিচে শূন্য-পুরাণের উদ্ধৃতাংশ থেকে তার সমর্থন পাওয়া যায় : জাজপুরে ষোলশত বৈদিক ব্রাহ্মণ রয়েছেন যারা বাস্তবে অত্যাচারী ব্যক্তি এবং বৈদিক ব্রাহ্মণ নন। তারা দক্ষিণার খোঁজে বের হন (ব্রাহ্মণদেরকে প্রদত্ত বলি সম্বন্ধীয় পারিশ্রমিক); এটা না পেলে তারা অভিশাপ দিয়ে লোকের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয় ......। স্বধর্মীদের বিরুদ্ধে একত্রিত হয়ে এসব ক্ষমতাশালী ব্যক্তি তাদের উৎপীড়ন করে। বেদের শ্লোক আবৃত্তি করতে করতে তারা আগুনের মতো ছুটে বেড়ায় এবং মানুষের মনে ভীতির উদ্রেক করে। দারুণ হতাশায় মানুষ সাহায্যের জন্য ধর্মের কাছে প্রার্থনা করে। এভাবে জনগণের ওপর বহু অন্যায় করে ব্রাহ্মণরা সৃষ্টিকে ধ্বংস করে। স্বর্গবাসী ধর্ম দুঃখ পেয়ে মায়ার অন্ধকারে নিজেকে পরিবৃত করেন"।[১৬২] এরপর

যবনের ছদ্মবেশে ধর্ম কিভাবে জাজপুর আক্রমণ করে ব্রাহ্মণদের ধ্বংস করেছিলেন কবি সে বর্ণনা দিয়েছেন।[১৬৩] কাল্পনিক অংশ বাদ দিলে এ কাহিনী থেকে ব্রাহ্মণদের হাতে ধর্মমতবাদের অনুসারীরা কত নির্দয়ভাবে অত্যাচারিত হয়েছিলেন তা দেখতে পাওয়া যায়। বহুদিন পরেও অত্যাচারের ভয়ে মানিক গাঙ্গুলী ধর্মমতবাদ সম্পর্কে কবিতা লিখতে দ্বিধাবোধ করেছিলেন।[১৬৪] সম্ভবত ব্রাহ্মণ্যবাদের পুনরুত্থানের ফলে ধর্মমতবাদের অনুসারীদের অবিরাম আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাতে হয়েছিল এবং আত্মরক্ষার জন্য কিছু সতকর্তামূলক ব্যবস্থাও তারা গ্রহণ করেছিল। ধর্মের উপাসনা করার জন্য কেউ মন্দিরে যখনই যেত পুরোহিত তাকে কিছু বুদ্ধির প্রশ্ন করতেন। প্রশ্নগুলি ছিল এরকম "আমার হাত ও পা লোহার মতো শক্ত হোক। আমার শত্রু নরকে যাক, তোমার নিবাস কোথায়? কোন দেবতার পূজা কর তুমি ? তুমি কোন কোন বেদ পড়? (তোমার হাতের তামার বালা কোথায় পেয়েছ তুমি? তামার উৎস আমাকে জানাও"।[১৬৫] এ প্রশ্নগুলির জবাব ছিল নিম্নরূপ: আমি ভল্লুকা নদীর তীরে বাস করি। আমি নিরাকার ভগবানের ভক্ত, ধ্যান করি শূন্য-মূর্তির এবং আদর্শ ভগবানের উপাসনা করি। আমি পশ্চিমমুখী হয়ে প্রার্থনা করি এবং পঞ্চম বেদ পড়ি। এ তামা বিশ্বকর্মা তৈরি করেছেন"।[১৬৬] তাঁর প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিয়ে ভক্ত ধর্ম-পুরোহিতকে সন্তুষ্ট করতে পারলে পুরোহিত তাকে সহজেই ধর্মমতবাদের অনুসারী হিসেবে গ্রহণ করতেন। কাজেই আমরা দেখি যে সম্ভবত ব্রাহ্মণ্যবাদের উৎপীড়নে ধর্মবাদীদের নিজেদের জন্য এক অস্পষ্ট অস্তিত্ব মেনে নিতে হয়েছিল। এ পরিস্থিতিতে যে তারা মুসলমানদের সাহায্য নিতে চেয়েছিল সেটা খুবই স্বাভাবিক। যখন তারা দেখল যে মুসলমানরা জাজপুর আক্রমণ করেছে তখন তারা এটাকে ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে ধর্মের ক্রোধের বহির্প্রকাশ হিসেবেই গণ্য করেছে। মুসলমানদের আগমন তাদেরকে স্বস্তির অনুভূতি দিয়েছিল বলে মনে হয়। ফলে ধর্মবাদীদের ইসলামের নবী এবং ধর্মীয় ব্যক্তিদের মৌন স্বীকৃতিদানের যথেষ্ট কারণ ছিল। শূন্য-পুরাণে মোহাম্মদ, আদম, হাওয়া এবং ফাতিমাকে যথাক্রমে ব্রহ্মা, শিব, চণ্ডী এবং পদ্মাবতীরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং সাবলীলভাবে ইসলামি পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে।[১৬৭] ধর্মবাদের পূজা-অনুষ্ঠানাদি সম্পর্কিত গ্রন্থ ধর্ম-পূজা-বিধানে কালিমা জাল্লালা শীর্ষক একটি অংশ রয়েছে যাতে মুসলমানদের উড়িষ্যা আক্রমণের বর্ণনা করা ছাড়াও (এটা শূন্য-পুরাণেও বর্ণনা করা হয়েছে) একজন মুসলমান খোন্দকারকে ধর্ম ঠাকুর রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে যার ওপর হিন্দু-মুসলমান বিরোধের নিস্পত্তির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তাকে মুসলমান বেশধারী, মুসলমান রীতিনীতি মেনে চলা এবং মুসলমানদের সবরকম খাদ্যই গ্রহণকারী একজন মুসলমান বিচারকরূপে চিত্রিত করা হয়েছে। কালিমা জাল্লালা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে তদানীন্তন মুসলমান সমাজের প্রতি ধর্মবাদীদের কোনো বিরাগ ছিল না। ধর্মবাদীদের এ মনোভাবের প্রতি মুসলমানদের মনোভাব কি ছিল তা পরিষ্কারভাবে জানা যায় না। কিন্তু মধ্যযুগের বাংলার মুসলমান কবিদের কেউ কেউ যে নির্দ্বিধায় ধর্মবাদী শব্দাবলি ব্যবহার করেছেন এ তথ্য মুসলমানদের ওপর ধর্মবাদী প্রভাবের নির্দেশক।

৫.

আমরা ইঙ্গিত দিয়েছি যে, শৈবধর্ম এবং মনসা, চণ্ডী এবং ধর্মের মতো স্থানীয় পূজা পদ্ধতিগুলির মধ্যে বহু শতাব্দী যাবৎ বিরাজমান বিরোধ শেষপর্যন্ত ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির সঙ্গে স্থানীয় যাজকীয় ধারণার সমন্বয়ে শেষ হয়। এরফলে হিন্দু-দেবতা মণ্ডলের কার্যক্ষেত্রের পরিধি আরও প্রসারিত হয়।[১৬৯] উপরে আমরা যা আলোচনা করেছি তা থেকে বুঝা যায় যে পর্যালোচনাধীন সময়কালে ইসলাম ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের মধ্যে বিরোধের পাশাপাশি বিভিন্ন ধর্মের পরস্পরের সঙ্গে মিশে যাবার একটা প্রক্রিয়াও চলছিল। হিন্দু যোগ দর্শনই যে শুধু ইসলামকে প্রভাবিত করেছিল তাই নয়, ষড়চক্রভেদের তান্ত্রিক শরীরবৃত্ত বা দেহের দুর্বোধ্য ষড়বৃত্তকে ভেদ করার দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে যোগ-তান্ত্রিক ধারণায় পরিপূর্ণ এক পরিবেশে ইসলামি অতীন্দ্রিয়বাদ বিকাশ লাভ করায় তার পক্ষে এ ধরনের একরাশ স্থানীয় ধারণার প্রভাব থেকে মুক্ত থাকা ছিল অসম্ভব। ইসলাম শুধু ধর্মবাদের প্রতিই সহানুভূতিশীল ছিল না, সম্ভবত নাথ ধর্মের প্রতিও তার সহানুভূতি ছিল এবং মুসলমানরা সেকালে এ ধর্ম সম্পর্কে গান গাইত এবং কবিতা রচনা করত।

নাথবাদের একটি বিখ্যাত গ্রন্থ গোরক্ষ-বিজয়ের রচনা যে ফয়জুল্লাহ্ নামে একজন মুসলমানের প্রতি প্রায়ই আরোপ করা হয় এ তথ্য থেকে তার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি ও স্থানীয় হিন্দুধর্মের মধ্যে যে বিশাল ব্যবধান ছিল তা নিশ্চয়ই হিন্দুসমাজের স্বাভাবিক বিকাশকে ব্যাহত করেছিল। বিদেশী শাসন প্রতিষ্ঠার পর মনে হয় সামাজিক-ধর্মীয় শক্তিগুলির পুনর্বিন্যাস ঘটেছিল। মুসলমান শাসকরা মনে হয় দেশীয় ভাষার পৃষ্ঠপোষকতা করে জনগণের সংস্কৃতিকে পুরোভাগে নিয়ে এসেছিলেন। যে সব স্থানীয় দেব-দেবী অন্তরালে চলে গিয়েছিল, দেশীয় সাহিত্যের মাধ্যমে তারা এখন তাদের প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল।[১৭০] ব্রাহ্মণ্য শ্রেণীর লোকদের আত্মকেন্দ্রিক স্বভাব ও এই স্থানীয় সংস্কৃতির প্রতি তাদের সরাসরি বিরোধিতার ফলে ধর্মবাদী, বৌদ্ধ, নাথপন্থী এবং অন্যান্য তথাকথিত অনার্য জনগোষ্ঠী নিশ্চয়ই মুসলমানদের কাছে নিরাপত্তা চেয়েছিল। উপরে উদ্ধৃত নিরঞ্জনের উষ্মাতে মনে হয় সেটারই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। গোঁড়া সুন্নী ইসলাম এসব স্থানীয় ধারণাকে স্বীকৃতি দিয়েছিল বলে মনে হয় না। কিন্তু উদার সুফিবাদ কর্তৃক প্রতিনিধিত্বকারী এর অতীন্দ্রিয়বাদী দিক স্থানীয় যাজকীয় শক্তিগুলির সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে দ্বিধা করে নি। এ কারণেই সৈয়দ সুলতান, আলী রিজা এবং ফয়জুল্লাহর মতো অতীন্দ্রিয়বাদী কবিদের রচনায় যোগ-তান্ত্রিক দর্শনের প্রভাব দেখা যায়। বস্তুতপক্ষে স্থানীয় এসব অতীন্দ্রিয়বাদী ধারণাগুলির সঙ্গে বাংলার সুফিবাদের প্রচুর সাদৃশ্য ছিল।

উপরে যেমন লক্ষ্য করা গেছে তা থেকে মনে হয় হিন্দু সমাজে যে সব বিরোধীশক্তি বিবদমান ছিল শ্রীচৈতন্যের আন্দোলন সেগুলির সমন্বয় সাধন করেছিল আর তা করতে গিয়ে মনে হয় ইসলামের এ আন্দোলন প্রসারও যথেষ্ট ক্ষুণ্ন করেছিল।

টীকা

১. পূর্বোল্লিখিত ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৮।

২. নগেন্দ্রনাথ বসু : বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ১ম অংশ, ব্রাহ্মণ কাণ্ড, পৃ. ১৯৪ এবং ৩য় খণ্ড, পিরালী ব্রাহ্মণ বিবরণ, পৃ. ৬৪-৬৫।

৩. জালালউদ্দীন মোহাম্মদ শাহের দরবারে কর্মরত বৃহস্পতি মিশ্র সুলতানের কাছ থেকে কবিচক্রবর্তী, রাজপণ্ডিত, পণ্ডিত-সার্বভৌম, কবি-পণ্ডিত-চূড়ামণি, মহাচার্য এবং রায়মুকুট-এর মতো বহু সম্মানসূচক উপাধি লাভ করেছিলেন; সুকুমার সেন: মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালি, পৃ. ১০। এই কুলীন ব্রাহ্মণ রচিত গ্রন্থাবলির জন্য নিচে, ৭ম পরিচ্ছেদ দেখুন। বৃহস্পতি তাঁর কিছু গ্রন্থে রাজা গণেশ ও তাঁর ধর্মান্তরিত পুত্র জালালউদ্দীনের নাম উল্লেখ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে, এ আমলে লব্ধরূপে প্রতীয়মান ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির অগ্রগতি সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া সম্ভব হতো না। জালালউদ্দীনের দরবারে বৃহস্পতি এক গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন ছিলেন। তাঁর পুত্ররা এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ মনে হয় রাজ-কার্যাদি নিয়ন্ত্রণ করতেন এবং শাসকদের কাছ থেকে বিভিন্ন সুবিধা ভোগ করেছিলেন; আর. সি. হাজরা কর্তৃক উদ্ধৃত স্মৃতি রত্নাহার দেখুন; আই.এইচ. কিউ, ১৯৪৭, পৃ. ৪৭; আরও দেখুন পদচন্দ্রিকা থেকে উদ্ধৃতাংশ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৪।

৪. ২য় পরিচ্ছেদ, পৃ. ৫৫-৫৬।

৫. কৃষ্ণদাস কবিরাজ : পূর্বোল্লিখিত, মধ্য ১ম পৃ. ৭৬।

৬. আইন, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৩ ও ১৪৫।

৭. এ গ্রন্থের ৭ম পরিচ্ছেদে বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে।

৮. জে. আর. এ. এস. ১৮৯৫, পৃ. ৫৩০; বিশ্বভারতী অ্যানালস, ১৯৪৫, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭৭।

৯. ২য় পরিচ্ছেদ, পৃ. ৫৬।

১০. চৈতন্য-ভাগবত, আদি, চতুর্দশ পৃ. ১০৭।

১১. পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১৩৯।

১২. সম্ভবত নগেন্দ্রনাথ বসু হচ্ছেন প্রথম লেখক যিনি মধ্যযুগের বাংলার সামাজিক ইতিহাস পুনর্গঠনে কুলজি সাহিত্যের উপাদানগুলিকে সম্পূর্ণভাবে ব্যবহার করেছেন। বহুখণ্ডে রচিত তাঁর বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস শীর্ষক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ বিভিন্ন কুলজি মূলগ্রন্থের বিষয়বস্তুগুলি সংরক্ষণ করেছে। এ সব গ্রন্থ সহজ-প্রাপ্য বা সহজ—অভিগম্য নয়। এ গ্রন্থের কিছু জাজ্বল্যমান ত্রুটি রয়েছে কারণ গ্রন্থকার প্রদত্ত মধ্যযুগের হিন্দু সমাজে বর্ণ ও সম্প্রদায়ের উদ্ভব ও বিকাশের বিবরণ সুব্যবস্থিত নয়, সমাজতাত্ত্বিক সমস্যাগুলির প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিও বিজ্ঞান সম্মত নয়। নিজেদের মতের স্বপক্ষে কোনো যুক্তি না দেখিয়েই বাংলার বহু পণ্ডিত ব্যক্তি কুলজি গ্রন্থাবলির ঐতিহাসিক প্রামাণিকতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। আর. সি. মজুমদার এ সমস্যাটি নিয়ে বেশ দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। তিনি

মনে করেন যে সাধারণভাবে কুলজি গ্রন্থাবলি ঐতিহাসিকভাবে নির্ভরযোগ্য নয়। এ সাহিত্যের তাঁর উল্লিখিত ত্রুটিগুলির এখানে সারসংক্ষেপ করা যেতে পারে : (ক) কথিত আছে যে আদিশূর কনৌজ থেকে পাঁচজন ব্রাহ্মণকে এনেছিলেন। ঐতিহাসিকভাবে ত্রুটিযুক্ত এ কাহিনীকে কেন্দ্র করে সমগ্র কুলজি সাহিত্য গড়ে উঠেছে; (খ) নুলো পঞ্চাননের গোষ্ঠীকথা, বাচস্পতি মিশ্রের কুলরাম, ধনঞ্জয়ের কুলপ্রদীপ, এদু মিশ্রের মেল পর্যায়গণনা, বারেন্দ্র কুলপঞ্জি, কুলার্লর্ণভ, কারিকা, হরিমিশ্রের নির্দোষ কুলপঞ্জিকা ও কারিকাসহ অধিকাংশ কুলজি গ্রন্থ তুলনামূলকভাবে আধুনিক হওয়ায় এগুলি প্রাচীন হিন্দু সমাজ সম্পর্কে আমাদের নিখুঁত তথ্য দিতে পারে না এবং (গ) কুলজি মূলগ্রন্থে ইচ্ছাকৃত প্রক্ষেপণ, পরিবর্তন ও বর্জন রয়েছে। কুলজি সাহিত্য সম্পর্কে আর. সি. মজুমদারের মতামতের জন্য দেখুন, হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬২৩-২৪, পরিশিষ্ট ১; ভারতবর্ষ, ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ, কার্তিক ফাল্গুন সংখ্যা। অধিকাংশ কুলজি গ্রন্থই রচিত হয়েছিল মুসলমান আমলে। মহাবংশাবলী যে ১৪০৭ শকাব্দ/১৪৮৫-৮৬ সালে রচিত হয়েছিল তা ঐ গ্রন্থে প্রাপ্ত পুস্তকের নাম, প্রকাশস্থল ও প্রকাশের তারিখ সংবলিত শেষপৃষ্ঠা থেকে জানা যায়; দেখুন মহাবংশাবলী, এন. এন. বসু কর্তৃক উদ্ধৃত : বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড, ১ম অংশ, পৃ. ২০২। নুলো পঞ্চাননের গোষ্ঠীকথা এবং বাচস্পতি মিশ্রের কুলরাম ষোড়শ বা সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত হয়েছিল বলে মনে হয়। এগুলি সহ উপরোল্লিখিত অন্যান্য কুলজি গ্রন্থ নিশ্চিতভাবেই সে সময়ের হিন্দু সমাজের বিবরণ দিয়েছিল। এ সাহিত্যে প্রদত্ত বিবরণ সমাজের তৎকালীন অবস্থার অনুরূপ নাও হতে পারে; কিন্তু মনে হয় যে এটা যে যুগে রচিত হয়েছিল সে যুগের বিভিন্ন প্রবণতাকে হৃদয়ঙ্গম করতে আমাদের সাহায্য করে। আর. সি. মজুমদার ও এন. আর, রায় যারা কুলজি সাহিত্যকে নির্ভরযোগ্য মনে করেন না তারাও এটা উল্লেখ করেছেন যে এটা যে যুগে রচিত হয়েছিল সে যুগের চেতনাকে নিশ্চয়ই প্রতিফলিত করে ; দেখুন হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৩২ ও ৬৩৩ এবং বাঙ্গালির ইতিহাস, পৃ. ২৬৩ ও ২৬৫। এ অংশে উদ্ধৃত কুলজি গ্রন্থাবলি থেকে স্পষ্টভাবে দেখা যায় যে কুলীন ব্রাহ্মণদের উপর ইসলামের প্রভাব পড়েছিল এবং তাঁরা নিজেদের সমাজ-ব্যবস্থাকে পুনর্গঠিত করে এ প্রক্রিয়ার প্রতি প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিল।

১৩. বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস : ব্রাহ্মণকাণ্ড, ১ম খণ্ড, ১ম অংশ, পৃ. ১৯২-২০২।

১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৫ ও ২১০।

১৫. এ সব মেলের ইতিহাসের জন্য দেখুন, এন. এন. বসু : পূর্বোল্লিখিত, ১ম খণ্ড, ১ম অংশ, পৃ. ২৬০, ৩য় খণ্ড, পীরালি ব্রাহ্মণ বিবরণ, পৃ. ১৫২-১৬০।

১৬. এন. এন. বসু : পূর্বোল্লিখিত, ১ম খণ্ড, ১ম অংশ, পৃ. ২০৪।

১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭০।

১৮. সপ্তম পরিচ্ছেদের প্রাসঙ্গিক অংশগুলি দেখুন।

১৯. ই. হক : মুসলিম বাঙ্গালা সাহিত্য, পৃ. ১৪৪-৪৫।

২০. পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১২৩-২৬।

২১. নিম্নে যা বলা হয়েছে তা শেখ জাহিদের সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে কাব্যের অবাধ অনুবাদ; ই. হকের সংগ্রহে সম্পাদিত ডি. আর. এস. পাণ্ডুলিপি; তুলনীয় মূলপাঠের জন্য পরিশিষ্ট ৬ দেখুন।

২২. শূন্য-পুরাণ : সৃষ্টি পত্তন, পৃ. ১-৪২।

২৩. সুকুমার সেন : রূপরামের ধর্মমঙ্গলের ভূমিকা, পৃ. ৩।

২৪. জি. এ. গ্রীয়ারসন: "অ্যান আহোম কসমোগনি, উইথ এ ট্রানশ্লেশন অ্যান্ড এ ভোকাবুলারি অফ দি আহোম ল্যাংগুয়েজ," জে, আর এ. এস. ১৯০৪, পৃ. ১৮১ ও পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহ। আহোম সৃষ্টিতত্ত্বের মহাজাগতিক কাঁকড়া ও মহাজাগতিক সাপ, ফাতুঅ-চং ও খুন-থিও-খম হচ্ছে শূন্য-পুরাণের সৃষ্টি-পত্তনের প্রভু নিরঞ্জন, কচ্ছপ ও বাসুকির প্রতিরূপ। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৮ ও পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহ।

২৫. আর. জি. কলিংউড : দি আইডিয়া অফ হিস্ট্রি, পৃ. ১৫-১৬।

২৬. এস. বি. দাশগুপ্ত কর্তৃক উদ্ধৃত : অবসকিউর রিলিজিয়াস কাল্টস, পৃ. ৩২৪।

২৭. সুকুমার সেন : রূপরামের ধর্মমঙ্গলের ভূমিকা, পৃ. ৩ এবং পঞ্চানন মণ্ডল কর্তৃক সম্পাদিত গোরক্ষ-বিজয়ের ভূমিকা।

২৮. একই ধরনের সমন্বয় প্রবণতা কবীরের সৃষ্টিতত্ত্বে (তারাচাঁদ কর্তৃক উদ্ধৃত ; ইনফ্লুয়েন্স অফ ইসলাম অন ইন্ডিয়ান কালচার, পৃ. ১৫৫-৫৭) এবং মালিক মোহাম্মদ জয়সীর সৃষ্টিতত্ত্বে দেখা যায়, মালিক মোহাম্মদ জয়সী সৃষ্টির পরিকল্পনায় মোহাম্মদকে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিয়েছেন। পদ্মাবতী : শিরেফ কর্তৃক অনূদিত, পৃ. ১ ও পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহ।

২৯. স্পষ্টতই ওল্ড টেস্টামেন্টের বুক অফ জেনোসিসের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

৩০. কোরান : ১৪ : ৩২-৩৪ ; ১৬ : ১০-১৯; ৩১: ২০; ৩২: ৯ এবং ৪৫:১২-১৩।

৩১. আদ্য পরিচয়ের ডি. আর. এস. পাণ্ডুলিপি থেকে শব্দান্তরে অর্থ প্রকাশিত; তুলনীয়, মূলপাঠের জন্য পরিশিষ্ট ঙ।

৩২. আর. এ. নিকলসন : লেগেসি অফ ইসলাম এ "মিষ্টিসিজম", পৃ. ২২৪-২৫।

৩৩. জ্ঞান-সাগর, পৃ. ২৪-২৫; মধ্যযুগের কাব্য-সংগ্রহ, আহমদ শরীফ কর্তৃক সম্পাদিত, পৃ. ২০৭-২০৯।

৩৪. আদ্য পরিচয়, পূর্বোল্লিখিত।

৩৫. নিচে দেখুন।

৩৬. সৈয়দ সুলতান : জ্ঞান-প্রদীপ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পাণ্ডুলিপি, ফোলিও ৯ খ। বাংলা মূল পাঠের জন্য দেখুন পরিশিষ্ট ঙ।

৩৭. প্রাগুক্ত, ৩খ, ৮খ, ৯ ক, ৯ খ ইত্যাদি ফোলিওসমূহ।

৩৮. প্রাগুক্ত, ৬ খ-৮ ক, ১২ খ ইত্যাদি ফোলিওসমূহ।

৩৯. প্রাগুক্ত, ৯ক এবং ১০ক-১০খ ফোলিওসমূহ।

৪০. প্রাগুক্ত, ফোলিও ১০ক। অনুরূপ বাংলা মূলপাঠের জন্য দেখুন পরিশিষ্ট ঙ।

৪১. প্রাগুক্ত, ৯ খ- ১০ক ফোলিও। মূলপাঠের জন্য দেখুন পরিশিষ্ট ঙ।

৪২. প্রাগুক্ত, ফোলিও ৯খ। সৈয়দ সুলতান পদ্মাসনের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা হথযোগ প্রদীপিকায় (অনুবাদ : শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার, ১ম পরিচ্ছেদ, শ্লোক ৪৬, পৃ. ২০) প্রাপ্ত বর্ণনা থেকে সামান্য ভিন্নতর।

৪৩. জ্ঞান-প্রদীপ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পাণ্ডুলিপি, ফোলিও ১০ ক; তুলনীয়, মূলপাঠের জন্য পরিশিষ্ট ঙ।

৪৪. প্রাগুক্ত, ১১ক, ১২ক, ১২খ ইত্যাদি ফোলিওসমূহ।

৪৫. প্রাগুক্ত, ফোলিও ৪খ ও ১২ ক।

৪৬. হথযোগ প্রদীপিকায় বিভিন্ন স্নায়ু ,চক্র এবং কুণ্ডলিনী শক্তির উল্লেখ প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায়, পূর্বোল্লিখিত, ১ম, ২য় এবং ৪র্থ পরিচ্ছেদ; কপিলাশ্রমিয় পাতঞ্জল যোগদর্শন, হরিহরানন্দ আরণ্য, ধর্মমেঘ আরণ্য এবং রায় জে. জি. বাহাদুর কর্তৃক সম্পাদিত ও বাংলায় অনূদিত, ৪র্থ সংস্করণ, পৃ. ২০৩-২০৪; সুখময় ভট্টাচার্য : তন্ত্রপরিচয়, পৃ. ৪৬-৪৯; এস. বি. দাশগুপ্ত : অবসকিউর রিলিজিয়াস কাল্টস, পৃ. ৯১. টীকা ১, উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য : বাংলার বাউল ও বাউল গান, পৃ. ৪৩৮-৪৮; এস রাধাকৃষ্ণণ : পূর্বোল্লিখিত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৫২, টীকা ১।

৪৭. প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৫৭।

৪৮. এস. বি. দাসগুপ্ত : অবসকিউর রিলিজিয়াস কাল্টস, পৃ. ৯২ ও পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহ, পৃ. ৯৮, ২২৯-৩৩ ইত্যাদি; এবং ভারতীয় সাধনার ঐক্য, পৃ. ৪-৫২; সুখময় ভট্টাচার্য : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৪৯।

৪৯. জ্ঞান-প্রদীপ, ফোলিও ১০ খ।

৫০. প্রাগুক্ত, ফোলিও ১০ক ; তুলনীয় মূলপাঠের জন্য দেখুন পরিশিষ্ট ঙ।

৫১. এস. বি. দাসগুপ্ত : ভারতীয় সাধনার ঐক্য, পৃ. ৪৯।

৫২. ফোলিও ১ক-১খ।

৫৩. কিতাব-উল-লুসা-ফিৎ-তাসাউফ : নিকলসন কর্তৃক সম্পাদিত। অতীন্দ্রিয়বাদী পথে চলার সময় একজন সুফিকে অনুশোচনা, সংযম, আত্ম-অস্বীকৃতি, দারিদ্র্য, ধৈর্য, আল্লাহর উপর বিশ্বাস ও সন্তুষ্টির প্রতিটি মকামৎ পার হতে হবে. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩-৫৪।

৫৪. কাশফ-উল-মাহজুর, নিকলসন কর্তৃক অনুবাদ, পৃ. ১৮০-৮২ এবং ৩৭০-৭১।

৫৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮১।

৫৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮১। এ অবস্থাগুলি বা অহওয়াল হচ্ছে গভীর চিন্তা, খোদার নৈকট্য, প্রেম ভীতি, আশা, আকাঙ্ক্ষা, ঘনিষ্ঠতা, প্রশান্তি, পবিত্র বিষয়ে ধ্যান এবং নিশ্চয়তা, কিতাব-উল-লুমা, পৃ. ৫৫-৭২।

৫৭. জন. এ. সোবহান : সুফিজম, ইটস সেইন্টস অ্যান্ড শ্রাইন্স, অ্যান ইনট্রোডাকশন টু দি স্টাডি অফ সুফিজম উইথ স্পেশাল রেফারেন্স টু ইন্ডিয়া, পৃ. ৭৫; শিকদার ইকবাল আলী শাহ : ইসলামিক সুফিজম, পৃ. ২৯৪।

৫৮. হুজউইরী : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ২৬৭।

৫৯. আর. এ. নিকলসন : লেগেসি অফ ইসলামে, "মিষ্টিসিজম", পৃ. ২১৪ ও ২১৫। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য, দেখুন নিকলসন : দি মিষ্টিকস অফ ইসলাম, ৩য় পরিচ্ছেদ, পৃ. ৬৮-১০১।

৬০. হুজউইরী : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৩৮৩ ও ৩৮৪।

৬১. পূর্বোল্লিখিত, ফোলিও ৬ ক।

৬২. কিতাব-উল লুমা. পৃ. ১২৯ এবং কাশ্‌ফ-উল-মাহজুব, পৃ. ৭৪ ও ২৬৯।

৬৩. সম্পূর্ণ বইটি আলী ও মোহাম্মদের মধ্যে সংলাপের আকারে। আলী অতীন্দ্রিয়জ্ঞান সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করছেন এবং মোহাম্মদ সেগুলির উত্তর দিচ্ছেন।

৬৪. আর. এ. নিকলসন : 'মিস্টিসিজম", পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ২২৫।

৬৫. মোহাম্মদকে উদ্দেশ্য করে আলী বলছেন : "তুমিই সৃষ্টি, তুমিই স্রষ্টা এবং তুমিই সত্য"পূর্বোল্লিখিত, ফোলিও ৬ খ, পরিশিষ্ট ঙ। একইরকম ধারণা পুস্তকের আরও বহু অংশে পাওয়া যায় যেগুলি উদ্ধৃত করার কোনো প্রয়োজন এখানে নেই।

৬৬. গোরক্ষ-বিজয়, পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১৩০-৪৭।

৬৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১-৪৩।

৬৮. পূর্বোল্লিখিত, ফোলিও ১১ খ।

৬৯. পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১৪৩-৪৫।

৭০. এস. বি. দাসগুপ্ত : অবসকিউর রিলিজিয়াস কাল্টস পৃ. ২০২ ও পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহ; কল্যাণী মল্লিক : নাথ সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধনা প্রণালী, পৃ. ১১ ও ৯০।

৭১. পূর্বোল্লিখিত, ফোলিও ৯ খ।

৭২. এস. বি. দাশগুপ্ত অবসকিউর রিলিজিয়াস কাল্টস, পৃ. ২৩৩-৩৪।

৭৩. পূর্বোল্লিখিত, ফোলিও ২ খ।

৭৪. এস. বি দাসগুপ্ত : অবসকিউর রিলিজিয়াস কাল্টস পৃ. ২৩৯-৪০।

৭৫. পূর্বোল্লিখিত, ফোলিও ৩ ক; তুলনীয় মূল গ্রন্থাংশের জন্য পরিশিষ্ট ঙ। গোরক্ষ-বিজয়েও এই বক্র-স্নায়ুর উল্লেখ আছে, পৃ. ৯২; "গুরু, বক্রনালীর মাধ্যমে অনুশীলন (দৈহিক অনুশীলন) কর"।

৭৬. জ্ঞান-প্রদীপ, ফোলিও ২ ক, ১০খ এবং ১২ক।

৭৭. পূর্বোল্লিখিত, ফোলিও ৪ খ এবং ১০ খ। নাথদের এসব ধারণার কয়েকটির ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, উপরে পৃ. ১৬৮।

৭৮. স্টাডিজ ইন ইসলামিক মিস্টিসিজম, পৃ. ৮৪।

৭৯. জন. এ. সোবহান : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৬১-৬২ এবং ১৪৯। এনামুল হক : সুফিজম ইন বেঙ্গল (অপ্রকাশিত অভিসন্দর্ভ)।

৮০. প্রাগুক্ত। লতায়েফ (এক বচন লতীফা) শব্দটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হুজউইরী বলেছেন যে এগুলি হৃদয়কে নিবেদিত অনুভূতির অতিসূক্ষ্মতার প্রতীক (ইশারতী) কে বুঝায়; পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৩৮৫।

৮১. জে. আর. এ. এস. ১৯০৪, পৃ. ১২৫ ও পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহ আর. এ. নিকলসন : দি মিস্টিকস অফ ইসলাম, ভূমিকা, পৃ. ১০-১৯, এবং "মিস্টিসিজম", পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ২১৩ ও ২১৫; ফিলিপ কে, হিট্টি : হিট্টি অফ দি অ্যারাবস, ৪র্থ সংস্করণ, পৃ. ৪৩৩।

৮২. এনামুল হক : মুসলিম বাঙ্গালা সাহিত্য, পৃ. ১৯৩-৯৫।

৮৩. আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ কর্তৃক সম্পাদিত।

৮৪. ডি. আর. এস. যাদু ঘরে যোগ-কালন্দরের অপ্রকাশিত সংমিশ্রমূল-পাঠ, এনামুল হক কর্তৃক সম্পাদিত, পৃ. ৫-৮ এবং ১২-১৬। বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাখা আরবি হরফে যোগ-কালন্দরের একটি অনুলিপির সঙ্গে আমরা এ মূলপাঠের তুলনা করে দেখেছি, শেষোক্তটির সঙ্গে এনামুল হকের সংরক্ষণের গুরুত্বপূর্ণ কোনো পার্থক্য নেই।

৮৫. প্রাগুক্ত, ডি.আর. এস. যাদুঘর পাণ্ডুলিপি, পৃ. ২-৫ এবং ৭-৮।

৮৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০।

৮৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫।

৮৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫. ৬ এবং ১৪।

৮৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১।

৯০. হথযোগ প্রদীপিকা, ১ম পরিচ্ছেদ, শ্লোক ৩১, ৪৫ ইত্যাদি; গোরক্ষ সংহিতা, প্রসন্নকুমার কবিরত্ন সম্পাদিত, দেখুন শ্লোক ৮ ও ১০।

৯১. ডি. আর. এস. যাদুঘর পাণ্ডুলিপি, পৃ. ৭-৮।

৯২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২-৪, ৭-৮ এবং ১০।

৯৩. এস. বি. দাশগুপ্ত : অবসকিউর রিলিজিয়াস কাল্টস, পৃ. ৩০৬।

৯৪. ডি. আর. এস. যাদুঘর পাণ্ডুলিপি, পৃ. ৫; "এ জ্ঞান লাভ কর যে পরমাত্মা সংবেদনশীল আত্মার সঙ্গে বসবাস করে"। "পরমাত্মার সঙ্গে সংবেদনশীল আত্মার মিলন ঘটেছে" ইত্যাদি; জীবাত্মা ও পরমাত্মা যথাক্রমে মানুষের ব্যক্তিত্ব ও ঐশ্বরিক ব্যক্তিত্বকে বুঝায়।

৯৫. এস. বি. দাশগুপ্ত : অবসকিউর রিলিজিয়াস কাল্টস, পৃ. ১৭৯।

৯৬. আলী রিজা: জ্ঞান-সাগর, পৃ. ৭১; আরও দেখুন পৃ. ৪৫।

৯৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫-৫৬। এসব নাথ-যোগ শব্দাবলির জন্য দেখুন উপরে, পঞ্চম পরিচ্ছেদ, পৃ. ১৬৮ ও ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ পৃ. ১৯৫।

৯৮. পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ২০ ও ৩৬-৩৮।

৯৯. জ্ঞান-প্রদীপ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পাণ্ডুলিপি, ফোলিও ৪র্থ ; তুলনীয়, মূলপাঠের জন্য পরিশিষ্ট গু।

১০০. পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ২২।

১০১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২।

১০২. উপরে পঞ্চম পরিচ্ছেদ, পৃ. ১৬৮।

১০৩. জ্ঞান-সাগর, পৃ. ৪৯ : "জীবাত্মা পরমাত্মা যুগল মিশ্রিত। জীবাত্মা বা সংবেদনশীল আত্মা এবং পরমাত্মা বা শ্রেষ্ঠ আত্মা হচ্ছে এক জুটি যা মিশ্রিত হয়ে থাকে।"

১০৪. উপরে পৃ. ১৯৮।

১০৫. জ্ঞান-সাগর, পৃ. ৮০: স্বকীয়ার সঙ্গে নহে অতি প্রেমরস, পরকীয়া সঙ্গে যোগ্য প্রেমের মনাস।

১০৬. মনীন্দ্রমোহন বসু : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১৯।

১০৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০।

১০৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯।

১০৯. জ্ঞান-সাগর, পৃ. ২৬-২৭।

১১০. আর. এ. নিকলসন কর্তৃক উদ্ধৃত, দি মিস্টিকস অফ ইসলাম, পৃ. ৮১।

১১১. আর. এ. নিকলসন : স্টাডিজ ইন ইসলামিক মিস্টিসিজম, পৃ. ৮০।

১১২. জ্ঞান-সাগর, পৃ. ২৪-২৫।

১১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১. ৫. ইত্যাদি।

১১৪. হাউজ-উল হায়াত বা অমৃতকুণ্ডের আরবি সংস্করণ ইউসুফ হোসেন কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে, জার্নাল এশিয়াটিক, খণ্ড ২১৩, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ১৯২৮, পৃ. ৩০৬-৪৪। যোগীর ধর্মান্তরণের ও অমৃতকুণ্ডের অনুবাদের কাহিনীর জন্য দেখুন মূলপাঠ, পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৩১১-১৩।

১১৫. বহর-উল-হায়াত শিরোনামে ফার্সি সংস্করণ বোম্বের ফয়জুল করিম প্রেস থেকে ১৩১০ হিজরিতে প্রকাশিত হয়েছে। অনূদিত এ ফার্সি সংস্করণের চিত্রশোভিত পাণ্ডুলিপির জন্য দেখুন স্যার টমাস ডব্লিউ, আর্ণল্ড; এ ক্যাটালোগ অফ দি ইন্ডিয়ান মিনিয়েচারস. জে. ভি এস. উইলকিনসন কর্তৃক পুন : পরীক্ষিত ও সম্পাদিত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮০-৮২।

১১৬. হাউজ-উল-হায়াত, পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৩১৬-৪৪।

১১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৭।

১১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৬-১৭।

১১৯. এস. বি. দাশগুপ্ত : অবসকিউর রিলিজিয়াস কাল্টস, পৃ. ২৩৫ ও পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহ ; কল্যাণী মল্লিক : নাথ সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধনা প্রণালী, পৃ. ৫৩৬-৩৭।

১২০. হাউজ-উল-হায়াত, পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৩১৩।

১২১. হাউজ-উল-হায়াতে মাত্র পাঁচটি ভঙ্গির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, পূর্বোল্লিখিত পৃ. ৩২৩-২৫; কিন্তু বহর-উল হায়াতের একটি পাণ্ডুলিপিতে ২১ টি ভঙ্গির চিত্র-ব্যাখ্যা ও বর্ণনা রয়েছে; দেখুন টমাস ডব্লিউ, আর্ণল্ড; এ ক্যাটালোগ অফ ইন্ডিয়ান মিনিয়েচারস, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮১-৮২।

১২২. হাউজ-উল-হায়াত, পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৩২৩, আর্নল্ড; এ ক্যাটালোগ অফ ইন্ডিয়ান মিনিয়েচারস ১ম খণ্ড, পৃ. ৮০।

১২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২।

১২৪. গোরক্ষ সংহিতা, শ্লোক ৮ ও ১০; হথযোগ প্রদীপিকা, ১ম পরিচ্ছেদ, শ্লোক ৪৬ ও ৫০-৫১। তালুর গহ্বরে জিহ্বা ফেরানোকে বিশেষ অর্থে খেচরী মুদ্রা বলা হয়; দেখুন হথযোগ প্রদীপিকা, ৩য় পরিচ্ছেদ, শ্লোক ৩৭; আরও দেখুন আর্ণল্ড: এ ক্যাটালোগ অফ ইন্ডিয়ান মিনিয়েচার পেইন্টিং, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮২, চিত্র নং ১৪। আমরা ইতোমধ্যেই দেখেছি যে খেচরী মুদ্রা নাথপন্থীদেরও অমৃতপানের পদ্ধতি যা বাংলার কিছুসংখ্যক সুফি গ্রহণ করেছিলেন, উপরে পৃ. ১৮৯। বহর উল- হায়াতের পাণ্ডুলিপিতে প্রাপ্ত গর্ভ এবং সভা ভঙ্গির চিত্র আর্ণল্ড কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে : দি ক্যাটালোগ অফ ইন্ডিয়ান মিনিয়েচারস, ৩য় খণ্ড, প্লেট ৯৮।

১২৫. হাউজ-উল-হায়াত, পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৩৪১।

১২৬. কথোপনিষদ, এস, বি. দাশগুপ্ত কর্তৃক ভারতীয় সাধনার ঐক্য. পৃ. ৮ এ উদ্ধৃত।

১২৭. হাউজ-উল-হায়াৎ, পৃ. ৩৩৫ এবং গোরক্ষ-বিজয়, পৃ. ১৪৩।

১২৮. দবিস্তান-উল-মজাহিব, বোম্বে সংস্করণ, পৃ. ১৪৪।

১২৯. ওফাতে-রসূল বা রসূলের মৃত্যু আলী আহমদ সম্পাদনা করেছেন এবং নোয়াখালি থেকে ১৩৫৬ বঙ্গাব্দে এটা প্রকাশিত হয়েছে। নবী বংশের বহু পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়। এর একটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদের সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

১৩০. এনামুল হক কর্তৃক প্রদত্ত নবীবংশ থেকে উদ্ধৃতাংশ : মুসলিম বাঙ্গালা সাহিত্য, পৃ. ১৪৯-৫০ এবং এস. পি. পি, ১৩৪১ বঙ্গাব্দ, ২য় সংখ্যা, পৃ. ৫০।

১৩১. সৈয়দ সুলতানের একটি বৈষ্ণব পদ, এনামুল হক কর্তৃক উদ্ধৃত: এস. পি. পি, ১৩৪১ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৭৪-৪৮।

১৩২. যতীন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য কর্তৃক উদ্ধৃত : বাংলার বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মুসলমান কবি, নং ৯৪।

১৩৩. ওফাতে-রসূল, পৃ. ৭-৮ এবং শব-ই মিরাজ, এনামুল হক কর্তৃক উদ্ধৃত : মুসলিম বাঙ্গালা সাহিত্য, পৃ. ১৪৪ এবং এস. পি. পি. ১৩৪১ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৪০, টীকা ৩ এবং পৃ. ৪৪।

১৩৪. এনামুল হক : বঙ্গে সুফি প্রভাব, পৃ. ১৬৫-৭০; তাঁর অপ্রকাশিত অভিসন্দর্ভ, সুফিজম ইন বেঙ্গল।

১৩৫. এনামুল হক : বঙ্গে সুফি প্রভাব, পৃ. ১৭১-৭৮, তাঁর অপ্রকাশিত অভিসন্দর্ভ।

১৩৬. সুকুমার সেন: বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮৩-৮৭; এস. কে. দে : বৈষ্ণব ফেইথ, ইত্যাদি পৃ. ২১-২২।

১৩৭. দি ভাগবত পুরাণ, এস. বি. দাসগুপ্ত কর্তৃক উদ্ধৃত : অবসকিউর রিলিজিয়াস কাল্টস, পৃ. ১৬৯, টীকা ২।

১৩৮. দেখুন জন. এ. সোবহান : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৩৮।

১৩৯. চৈতন্য-ভাগবত, আদি, ৮ম, পৃ. ৫৪-৫৫।

১৪০. সুকুমার সেন কর্তৃক উদ্ধৃত : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮৩।

১৪১. প্রাগুক্ত।

১৪২. এস. কে. দে: দি আর্লি হিস্ট্রি অফ বৈষ্ণব ফেইথ ইত্যাদি, পৃ. ৩৫৩ ও ৩৫৯।

১৪৩. এনামুল হক : পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম , পৃ. ১১২-১৭।

১৪৪. চৈতন্য-ভাগবত, অন্ত্য, ৪র্থ, পৃ. ৩৪৯ এবং ৫ম, পৃ. ৩৮১।

১৪৫. চৈতন্য-চারিতামৃত, আদি, সপ্তদশ, পৃ. ৬৭।

১৪৬. পূর্বোল্লিখিত, মৃণাল কান্তি ঘোষ কর্তৃক সম্পাদিত, ৩য় সংস্করণ, পৃ. ২৫ ও ২৬।

১৪৭. প্রাগুক্ত,পৃ. ৩৫।

১৪৮. চৈতন্য-ভাগবত, আদি, চতুর্দশ, পৃ. ৯৯।

১৪৯. পূর্বোল্লিখিত, মধ্য, ষোড়শ, পৃ. ১৮০ এবং অষ্টাদশ, পৃ. ১৯৬।

১৫০. চৈতন্য-চরিতামৃত, আদি, সপ্তদশ, পৃ. ৬৪-৬৬; চৈতন্য ভাগবত, মধ্য, ২য়, পৃ. ১৩৭; ত্রয়োবিংশ, পৃ. ২৬৬-৬৭ এবং ২৭৪-৭৭।

১৫১. চৈতন্য-ভাগবত, আদি , চতুর্দশ, পৃ. ১০৭।

১৫২. প্রাগুক্ত, মধ্য ২য়, পৃ. ১৩৭ এবং অষ্টম, পৃ. ১৭৬।

১৫৩. প্রাগুক্ত, মধ্য, ত্রয়োবিংশ, পৃ. ২৭৪-৭৭।

১৫৪. চৈতন্য-চরিতামৃত, আদি, সপ্তদশ, পৃ. ৬৫।

১৫৫. প্রাগুক্ত, আদি, অষ্টম, পৃ. ৩৮ এবং মধ্য, প্রথম, পৃ. ৭৬।

১৫৬. পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৩৬; আরও দেখুন একই গ্রন্থের পৃ. ১৫-১৬, ২৫, ২৬, ৩৫, ৩৯ এবং ৭৫। প্রেম-বিলাস ও অদ্বৈত-প্রকাশের মতো গ্রন্থের অকৃত্রিমতা সম্পর্কে প্রায়ই সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে; দেখুন সুকুমার সেন : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭৬ ও ৪০৮। বিমান বিহারী মজুমদার : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৪৪৬-৫৮ এবং ৫০৭-১৪। এসব গ্রন্থে চৈতন্যের জীবনের যে বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাবলিতে সে সম্পর্কে সমর্থন নাও পাওয়া যেতে পারে এবং এমন কি এগুলির অংশবিশেষ মিথ্যাও হতে পারে। কিন্তু ইসলামের প্রতি বৈষ্ণব মনোভাব এগুলিতে যেভাবে চিত্রিত করা হয়েছে তার সঙ্গে কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য–চরিতামৃতে পাওয়া বিবরণের মৌলিক কোনো তফাৎ নেই।

১৫৭. নিত্যানন্দ দাস : পূর্বোল্লিখিত, ১ম পরিচ্ছেদ।

১৫৮. এম. শহীদুল্লাহ : শূন্য-পুরাণের ভূমিকা, পূর্বোল্লিখিত পৃ. ১২-১৩ এবং ৩৬-৩৮; এস. বি. দাশগুপ্ত : অবসকিউর রিলিজিয়াস কাল্টস, পৃ. ২৬৬-৬৭।

১৫৯. পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৩৬-৩৮।

১৬০. ধর্ম-পূজা-বিধান, পৃ. ২১৫ ও ২১৯।

১৬১. এম. শহীদুল্লাহর ভূমিকা, পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১৩।

১৬২. পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ২৩২-৩৩।

১৬৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৩-৩৫। শূন্য-পুরাণের নিরঞ্জনের উষ্মায় বর্ণিত উড়িষ্যার জাজপুরের উপর মুসলমানদের আক্রমণ হোসেন শাহের উড়িষ্যা অভিযানরূপে শনাক্ত করা যেতে পারে। কথিত আছে যে এ অভিযানকালে তিনি বেশকিছু মন্দির ও দেব-দেবীর মূর্তি ধ্বংস করেছিলেন; উপরে ২য় পরিচ্ছেদ, পৃ. ৪৪-৪৫।

১৬৪. মানিক গাঙ্গুলী : ধর্ম-মঙ্গল, পৃ. ৯।

১৬৫. ধর্ম-পূজা-বিধান, পৃ. ১৬৫।

১৬৬. প্রাগুক্ত,পৃ. ১৬৫।

১৬৭. শূন্য-পুরাণ, পৃ. ২৩৫-৩৬।

১৬৮. পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ২১৯-২৪।

১৬৯. নিচে, ৭ম পরিচ্ছেদ।

১৭০. এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণের জন্য এ গ্রন্থের ৭ম পরিচ্ছেদ দেখুন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

আলোচ্য সময়কালে ব্যাপক সাহিত্যিক কর্মকাণ্ড লক্ষ্য করা যায় যা ছিল সে কালে তুলনাহীন। ব্রাহ্মণ্যসংস্কৃতির বাহন সংস্কৃত এবং দেশীয় ভাষা দু'টোই ছিল এর মাধ্যম। দেশীয় ভাষা মনে হয়, জনগণের ধর্মীয় ও পার্থিব ধারণা প্রকাশ করার মতো দক্ষতা এবং স্পষ্টরূপ লাভ করেছিল। সমাজের উঁচুশ্রেণীর হিন্দুদের ভ্রূকুটি সত্ত্বেও বাংলা কিছু সুবিধা ভোগ করতে শুরু করেছিল, যেগুলি সংস্কৃত বা ফার্সির ছিল না। মুসলমানদের বাংলা বিজয়ের সময় থেকেই সংস্কৃতি হিসেবে ব্রাহ্মণ্যবাদের অধোগতির কারণে সংস্কৃত তার প্রভাব হারিয়ে ফেলছিল। শেষপর্যন্ত দেশীয় এক ভাষাকে তার স্থান ছেড়ে দিতে হয় যার পিতামহ ছিল সংস্কৃত ও জনক ছিল মাগধী প্রাকৃত। প্রাক-মুসলমান আমলের বাংলায়ও ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি ও স্থানীয় চিন্তাধারার মধ্যে একটা অব্যক্ত বিরোধ চলছিল। বাংলা ভাষার উন্নতি ও বাংলা সাহিত্যের উদ্ভব ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির উপর স্থানীয় সংস্কৃতির বিজয়ের প্রতীক। হোসেন শাহী আমলে এ সমাজতাত্ত্বিক প্রক্রিয়ার সমাপ্তি ঘটে। মোঘল আমলে জাতির মজ্জাগত সামাজিক-ধর্মীয় আদর্শগুলি মেনে নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করায় দেশীয় ভাষা ব্রাহ্মণ্যবাদের পরিবর্তন ঘটাতে প্রভূত সাহায্য করে। দরবারি জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ফার্সি সাধারণ মানুষের উপর কোনো প্রভাব ফেলেছিল বলে মনে হয় না। আমাদের আলোচ্য আমলে ফার্সি ভাষায় গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যও সৃষ্টি হয় নি।

১.

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পাঠের সময় এর উদ্ভব ও বিকাশে মুসলমান শাসকদের অবদানকে খাটো করে দেখা কারও উচিৎ নয়। মুসলমানদের বিজয়ের অব্যবহিত পরে সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীল অবস্থার কারণে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সাহিত্যিক কর্মকাণ্ড ছিল প্রায় অসম্ভব। ইলিয়াস শাহী শাসকদের অধীনে বাংলার রাজনৈতিক স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার সময় থেকে বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসের শুরু। চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তাঁরা এদেশে শান্তি ও সমৃদ্ধি পুনরুদ্ধার করেন। বাংলায় কাব্য রচনা এবং সংস্কৃত গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ করে চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে প্রসিদ্ধ লাভকারী চণ্ডীদাস, কৃত্তিবাস এবং মালাধর বসু সাহিত্যিক বিকাশের ক্ষেত্রকে আরও সুগম করেন। সে প্রক্রিয়া এতদিন ধরে সক্রিয় ছিল তা হোসেন শাহী আমলেও অব্যাহত থাকে এবং দেশীয় ভাষা নতুন জীবন লাভ করে। এ আমলের শাসকরা সমকালীন কিছু কবির পৃষ্ঠপোষকতা করে বিকাশমান দেশীয় সাহিত্যের প্রতি সক্রিয় আগ্রহ প্রদর্শন করেছিলেন। জনগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনে

তাঁরা মনে হয় রাজনৈতিক বিবেচনার দ্বারা প্রণোদিত হয়েছিলেন। যাদের তাঁরা শাসন করতে চেয়েছিলেন তাদের সামাজিক-ধর্মীয় ধারণা ও ঐতিহ্য না জেনে একটা সুষ্ঠু শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলা তাঁদের পক্ষে ছিল প্রায় অসম্ভব। ফলে তাদের ভাষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতার প্রশ্ন দেখা দেয়। অবশ্য অন্যান্য কারণও ছিল। চারপাশের শক্তিবর্গের শত্রুতার কারণে বাংলার রাজনৈতিক অবস্থা ছিল বিপজ্জনক। এসব শক্তির বিরুদ্ধে হোসেন শাহী শাসকরা প্রায় একই সময়ে যুদ্ধ করেছিলেন। প্রজাদের সহানুভূতি ও সমর্থন অর্জন না করে সামরিক সাফল্যের আশা করা ছিল তাঁদের পক্ষে অসম্ভব, কারণ অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতা ছিল বলিষ্ঠ বৈদেশিক নীতি বা সফল যুদ্ধের পূর্ব-শর্ত। এখানে মনে রাখা উচিৎ যে, হোসেনী শাসকরা আরব উদ্ভূত হলেও মাতৃভূমির সঙ্গে তাঁদের প্রত্যক্ষ কোনো যোগাযোগ ছিল না। আরবদেশ থেকে বহু হাজার মাইল দূরে বাংলার মাটিতে তাঁরা আরবি সংস্কৃতির কোনো প্রসার ঘটাতে পারেন নি। বিভিন্ন সময়ে বাংলায় আগত আরব বণিকরা এ ধরনের সংস্কৃতির উৎকর্ষ ঘটাতে স্থায়ীভাবে এদেশে বাস করে নি। কাজেই শাসকগোষ্ঠীকে তাঁদের বিদেশীয় উৎসের কথা ভুলে গিয়ে স্থানীয় সংস্কৃতির সঙ্গে নিজেদের ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত করতে হয়েছিল। আবার আমরা আগেই যেমন লক্ষ্য করেছি, স্থানীয় সংস্কৃতির ক্রমবর্ধমান প্রভাব দেশীয় ভাষা বিকাশের প্রক্রিয়াকে অত্যন্ত দ্রুত গতিসম্পন্ন করে তুলেছিল। ইতোমধ্যে রাজনৈতিক ক্ষমতাচ্যুত ব্রাহ্মণ্যবাদের মুসলমান শাসকগোষ্ঠীর প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন হওয়ার কোনো কারণ ছিল না। মনে হয়, সুলতানরা ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রতিপক্ষীয় সংস্কৃতিকে মৌন স্বীকৃতি দিয়ে এর গতিরোধ করতে চেয়েছিলেন। সমসাময়িক বাংলা উৎসগুলি আমাদের মনে বিশ্বাস জাগায় যে সে সময়ের সুলতান ও গভর্নররা সভা-কবিদের আবৃত্তি করা পৌরাণিক গল্প ও কাহিনী শুনতেন।[১] সে কালের বাঙালি কবিদের মধ্যে যশোরাজ খান, কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকর নন্দী এবং শ্রীধর রাজদরবারের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। বিজয় গুপ্ত এবং বিপ্রদাস দু'জনই সর্প পূজার কাহিনী সম্পর্কে কাব্য রচনা করেছিলেন। তারা দরবারের কোনো পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিলেন বলে মনে না হলেও হোসেন শাহের প্রশংসা করা থেকে বিরত থাকেন নি।[২] জনগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের কারণে বাঙালিকরণের পরে এসব সুলতান বাংলাভাষাকে প্রতিষ্ঠা ও মর্যাদা দান করেন। প্রাক-মুসলমান বাংলায় সংস্কৃত যে ভূমিকা নিয়েছিল বাংলা তখন সে ভূমিকা পালন করতে শুরু করে।

বিষয়বস্তুর দিক থেকে এ আমলে কমপক্ষে পাঁচ ধরনের কাব্য সৃষ্টি হয়েছিল। এগুলি হচ্ছে (ক) সর্প-পূজা বিষয়ক কাব্য (খ) মহাভারতের ছন্দোবদ্ধ অনুবাদ (গ) বৈষ্ণব পদাবলী (ঘ) যোগ-দর্শন সম্পর্কে একটি কাব্য এবং (ঙ) শ্রীধরের বিদ্যা-সুন্দরের মতো আবেগ প্রবণ কাব্য। রচনার প্রতিটি ধরনেরই সযত্ন বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

১ (ক)

এ আমলের একজন স্থানীয় দেবী ছিলেন মনসা যার উদ্ভব মুসলমানদের বাংলা বিজয়েরও আগে হয়েছিল বলে মনে হয়। তিনি ছিলেন ব্রাহ্মণ্যবাদ -বিরোধী এবং অনার্য দেবী।

সমাজের নিম্নশ্রেণীর মানুষ তাঁর পূজা করত এবং পরবর্তীকালে উচ্চশ্রেণীর মানুষও তাঁকে স্বীকার করে নেয়। সুদূর অতীতে তাঁকে নিয়ে রচিত এবং লোকমুখে প্রচলিত গানগুলিকে আমাদের পর্যালোচনাধীন সময়কালের কবিরা সংকলন এবং যথাযথ রূপদান করেন। গ্রামীণ সমাজের পেশাদার গায়করা এগুলি আবার গাইতে শুরু করেন। এজন্যই এ গানগুলি যে রাগে গাইতে হতো এ সব কাব্যে তা উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে মনসাপূজা সম্পর্কে যে সব কবি কাব্য রচনা করেছিলেন তাঁরা শুধু সময়ের প্রয়োজনই পূরণ করেছিলেন, কোনো সাহিত্যিক উদ্দেশ্য তাঁদের প্রভাবিত করে নি। দীনেশ চন্দ্রসেন মনসাসহ স্থানীয় পূজা-পদ্ধতির উপর ইসলামের প্রভাব নিরূপণ করার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেছেন, "এ সময়কাল নাগাদ মুসলমানরা তাঁদের সতেজ ও প্রাণবন্ত ধর্ম নিয়ে বাংলায় আসেন। তাঁদের যে কোরানকে তারা ঐশ্বরিক বলে বিশ্বাস করতেন তাতে বলা হয়েছে যে ইসলামের আল্লাহ্ বিশ্বাসীদের সাহায্য করেন এবং অবিশ্বাসীদের ধবংস করেন। ব্যক্তিগত ঈশ্বরে ইসলামের দৃঢ়বিশ্বাসকে প্রতিহত করার জন্য প্রয়োজন ছিল এক ধরনের ধর্ম যেখানে দেবত্বের ব্যক্তিগত উপাদানের প্রাধান্য ছিল। ফলে শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্ম প্রসার লাভ করে। নৈর্ব্যক্তিক আদর্শ ও অতীন্দ্রিয়বাদের শৈব ধর্ম, যাতে মানুষ অদ্বৈতবাদে তার ঈশ্বরের পর্যায়ে পৌঁছে যায়, ক্রমশ গুরুত্ব হারায় কারণ জনসাধারণ এ কাল্পনিক বৈশিষ্ট্য বুঝতে পারে নি"।[৩] কিন্তু এ ধরনের উপসংহারকে অসমর্থিত বলে মনে হয়। এ দেশে ইসলামের প্রাণবন্ত আল্লাহ্‌র উপস্থিতি ছাড়াও মনসা ও চণ্ডীপূজার শক্তি ও প্রভাব বৃদ্ধি পেত। শৈবধর্মের নিষ্ক্রিয়, বিমূর্ত ও নৈর্ব্যক্তিক ঈশ্বর জনগণের মনের বাসনা পূর্ণ করতে পারে নি। তারা সাধারণত জনগণের মনে গভীরতম আবেগের উদ্রেক করতে সক্ষম একজন ব্যক্তিগত ঈশ্বরের উপর নির্ভর করতে অভ্যস্ত ছিল। বাংলায় মনসা ও চণ্ডীর ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব সম্ভবত বহুলাংশে এ মানব-মনস্তত্ত্বের কারণে ঘটেছিল, ইসলামের প্রভাবের কারণে নয়, যেমনটি প্রয়াত পণ্ডিত বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। ব্রাহ্মণ্যবাদের অতীন্দ্রিয়বাদী সংস্কৃতি বা শৈবধর্মের বিরুদ্ধে স্থানীয় সংস্কৃতির প্রতিক্রিয়ার জন্য এ মনস্তত্ত্বই দায়ী ছিল।

সর্পপূজা নিয়ে যে দু'জন কবি কাব্য রচনা করেছিলেন তাঁরা হচ্ছেন বিজয় গুপ্ত এবং বিপ্রদাস। তাঁদের বর্ণিত কাহিনী সংক্ষেপে নিম্নলিখিতভাবে উপস্থাপন করা যেতে পারে : শিবের কন্যা মনসার জন্ম হয়েছিল রহস্যজনকভাবে। প্রথম দিকে শিব তাঁকে নিজের বাড়িতে লুকিয়ে রেখেছিলেন। শেষপর্যন্ত তাঁর স্ত্রী চণ্ডী তাকে খুঁজে বের করে। জগৎকারু নামে এক ঋষির সঙ্গে মনসার বিয়ে হয়েছিল। দাম্পত্যজীবনে হতাশাগ্রস্ত হয়ে জগৎকারু অবশ্য ধ্যান ও কৃচ্ছ্রসাধনে জীবন কাটাতে সংসার ত্যাগ করে চলে যান। চণ্ডীর বিমাতাসুলভ হিংসার কারণে শিব তাঁর কন্যাকে জয়ন্তীনগরে নির্বাসনে পাঠাতে বাধ্য হন। লোককাহিনীর স্থপতি বিশ্বকর্মা সেখানে তার বসবাসের জন্য একটি গৃহ তৈরি করে দেন। মনসা তখন জনগণ দ্বারা সর্প-দেবী হিসেবে পূজিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করেন এবং অতি অল্পসময়ের মধ্যেই নিম্নশ্রেণীর মানুষ তাঁকে সর্প-দেবীরূপে স্বীকার করে পূজা করতে থাকে। তাঁর সহচর ও বন্ধু নেত্রবতী বা নেতাই জনগণের মধ্যে তাঁর পূজা প্রসারে তাকে

প্রভৃত সাহায্য করে। যে হাসান ও হোসেন গো-পালকদের মনসাকে পূজা করতে বাধা দিয়েছিল তাদের তিনি কঠিন শাস্তি দিয়েছিলেন। চম্পকনগরের এক বিখ্যাত ব্যবসায়ী চন্দ্রধরের সঙ্গে সর্প-দেবীর বিবাদ হয়। তিনি সর্প-দেবীকে পূজা করতে অস্বীকার করেছিলেন। এরফলে চাঁদ তার ছয় সন্তানসহ সবকিছুই হারিয়ে ছিলেন। সমুদ্র যাত্রা কালে চাঁদ খুব শোচনীয় দুর্দশায় পড়েন যা ছিল বহুলাংশে মনসার ক্রোধের ফল। তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র লক্ষ্মীন্দর বিয়ে করেছিলেন বেহুলাকে। বিয়ের রাতেই লক্ষ্মীন্দর সর্পদংশনে মারা যায়। চাঁদের স্ত্রী সোনেকার দুঃখের আর সীমা রইল না। স্বামী শিবের উপাসক হলেও স্ত্রী ছিলেন মনসার ভক্ত। এ ধরনের যন্ত্রণাদায়ক পরিস্থিতির মধ্যেও চাঁদ ভয় না পেয়ে তাকে দেবী হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকার করতে থাকেন। বহু কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বেহুলা কৈলাসপুরী যান। সেখানে তিনি তাঁর অপূর্ব নৃত্য প্রদর্শন করে শিব ও পার্বতীকে মুগ্ধ করেন এবং তার স্বামীর জীবন ফিরে পান। দুর্দশার মধ্যে দিন কাটিয়ে সংশোধিত হয়ে চাঁদ মনসাকে পূজা করতে শুরু করেন। সর্প-দেবীর কৃপায় তিনি মনসার সঙ্গে বিবাদের পরে হারানো সকল সন্তানকে ফিরে পান। বেহুলাকে সঙ্গে নিয়ে লক্ষ্মীন্দর স্বর্গে চলে যান। চাঁদ তাঁদের অনুসরণ করেন।[৪] বিপ্রদাসের মনসা-বিজয় রচিত হয়েছিল ১৪৯৫-৯৬ সালে, হোসেন শাহের রাজত্বকালেই। কবি তাঁকে গৌড়ের শুভচিহ্ন রূপে গণ্য করেছেন।[৫]

মনসাপূজা কিভাবে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের মধ্যে প্রসার লাভ করছিল এসব গ্রন্থে বর্ণিত কাহিনী থেকে তা দেখা যায়। প্রথম দিকে উঁচুশ্রেণীর মানুষ এ পূজার বিরোধিতা করলেও শেষপর্যন্ত তাদের এর সামনে নতি স্বীকার করতে হয়েছিল। চাঁদ বেনে কাহিনীতে এটাই প্রতীকীভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। সম্ভবত মনসা ছিলেন দেশজ দেবী এবং এটা খুবই স্বাভাবিক যে ব্রাহ্মণ শ্রেণী এটাকে অশ্লীল পূজা রূপে আখ্যায়িত করেছিল এবং এটাকে অপছন্দ করত। এ কাহিনী শৈবধর্ম এবং স্থানীয় মনসাপূজার মধ্যে বিরোধের চিত্র তুলে ধরে। কেমন করে ধীরে ধীরে মনসাপূজা শৈবধর্মকে পরাস্ত করে সেটাও এ থেকে দেখতে পাওয়া যায়। আদিতে শিবের উপাসক চাঁদ সওদাগরের পূজা না পাওয়া পর্যন্ত মনসা সন্তুষ্ট হতে পারে না। মনসা সবসময়ই সক্রিয় ছিলেন এবং তাঁকে পূজা করতে চাঁদকে বাধ্য করার জন্য তিনি নিষ্ঠুর ব্যবস্থাবলি গ্রহণ করতেও দ্বিধা করেন নি। কিন্তু শিব ছিলেন নিষ্ক্রিয় ও নিশ্চেষ্ট এবং তাঁর ভক্তের জীবন বাঁচাতে তিনি এগিয়ে আসেন নি। বাঙালিসমাজে তাদের নিজেদের প্রাধান্য স্থাপনের জন্য স্থানীয় ধর্মবিশ্বাসগুলির নিজেদের মধ্যে প্রায়শ প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছিল। এ আমলের কাব্যে চণ্ডী ও মনসার বিরোধের যে চিত্র প্রায়ই দেখা যায় তা স্পষ্টভাবে এটারই ইঙ্গিত করে।

সুতরাং এটা সুস্পষ্ট যে মনসা-মঙ্গলগুলিতে এ দেশের সামাজিক ইতিহাসের কিছু মুখ্য বৈশিষ্ট্য সংরক্ষিত রয়েছে। এগুলির কাহিনী কাল্পনিক প্রকৃতির হলেও এ থেকে গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে। সে যুগের বিভিন্ন প্রবণতার উল্লেখ এগুলিতে রয়েছে এবং এগুলি থেকে পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকের বাঙালি জীবনধারার বিভিন্ন দিক আমরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারি।

আলোচ্য সময়কালে চণ্ডী, ধর্ম এবং নাথপূজা সম্পর্কে কোনো গ্রন্থ রচিত হয়েছিল বলে জানা না গেলেও এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না যে বাংলায় এগুলি অনুপস্থিত ছিল, বস্তুত প্রাক-মোগল বাংলায় এসব স্থানীয় ধর্মবিশ্বাসের প্রত্যেকটিই স্পষ্ট রূপ ধারণ করছিল। বিপ্রদাসের মনসা-বিজয়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে শিবকে প্রায় ১২ বছর নিরঞ্জনের তীরে ধর্ম ঠাকুরের ধ্যান করতে হয়েছিল যাকে হিন্দু দেবতামণ্ডলের অন্যান্য দেব-দেবীরা ঈশ্বর বা পরম ব্রহ্মারূপে গণ্য করত।[৬] যুক্তিসঙ্গতভাবে ব্যাখ্যা করলে এর অর্থ দাঁড়ায় এই যে জনসাধারণ ধর্মপূজাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিত যা শিবের পূজার স্থান দখল করে নিয়েছিল। ষোড়শ শতকের তৃতীয়-চতুর্থাংশে লিখতে গিয়ে নবদ্বীপের হিন্দু সমাজের উপর চণ্ডীপূজার প্রভাব সম্পর্কে বৃন্দাবন দাসের খেদ ব্যক্ত করার যথেষ্ট কারণ ছিল।[৭] নাথপন্থীদের সংখ্যা এত বেশি ছিল যে তারা সহজেই কুতবনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিল। কথিত আছে যে কুতবন মৃগাবত রচনা করেছিলেন।[৮] আমরা ইতোমধ্যেই উল্লেখ করেছি যে এসব ধর্মবিশ্বাসের প্রায় সবকয়টিই ব্রাহ্মণ্যবাদের যথেষ্ট বিরোধিতা করেছিল। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত চণ্ডীমঙ্গল কাব্যগুলির অধিকাংশই চণ্ডীপূজা ও শৈবধর্মের মধ্যে বিরোধের ঘটনায় ভরা।

এসব কাব্যে চণ্ডীকে যারা তার পূজা করে তাদের উপর তাকে অনুগ্রহবর্ষণকারী এবং যারা তাকে পূজা করতে অস্বীকার করে তাদের কঠোর শাস্তির মাধ্যমে তাকে পূজা করতে বাধ্যকারিণী হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে।[৯] সমসাময়িক উৎসগুলিতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে জনসাধারণ চণ্ডীকে দেবীরূপে গ্রহণ করার বহু আগে থেকেই নিয়মিতভাবে শিবের পূজা চলে আসছিল। চণ্ডী শিবের প্রাধান্য সইতে পারেন নি এবং তখন তিনি জোর করে নিজের কর্তৃত্ব বজায় রাখতে সচেষ্ট হন। মনে হয় মনসা ও চণ্ডী অব্রাহ্মণ্য ও অনার্য দেবী ছিলেন এবং তাদের বিজয়কে, যা মঙ্গল কাব্যগুলিতে বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে, যথার্থভাবে বাংলার অনার্য জনগণের সংস্কৃতির বিজয়রূপে গণ্য করা যেতে পারে। প্রাক-মুসলমান আমলের বাংলায় ব্রাহ্মণ্য প্রভাবে এরা এক নগণ্য জীবন যাপন করেছিল বলে মনে হয়। এসব স্থানীয় ধর্মবিশ্বাসের প্রভাব নিম্নশ্রেণীর মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এমন মনে করার আমাদের কোনো কারণ নেই। বস্তুত উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণদের মধ্যে নিম্নশ্রেণীর সামাজিক-ধর্মীয় ধারণার প্রবেশের নিয়মিত একটি প্রক্রিয়া কার্যকর ছিল। মুকুন্দরাম চক্রবর্তী এবং মাধব আচার্য চণ্ডীপূজা সম্পর্কে ষোড়শ শতকের শেষদিকে কাব্য রচনা করেছিলেন। মানিক গাঙ্গুলি রূপারাম চক্রবর্তী এবং খেলারাম চক্রবর্তী সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে ধর্মপূজা সম্পর্কে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এরা সবাই ছিলেন ব্রাহ্মণ। কাজেই পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে ব্রাহ্মণ্যবাদের অভিযোজনের সময় মনসা, চণ্ডী এবং ধর্মের মতো স্থানীয় ধর্মবিশ্বাসগুলি হিন্দু দেবমণ্ডলে নিজেদের জন্য যথোপযুক্ত স্থান করে নিতে পেরেছিল। আর্য দেবতা শিবকে তখন নামিয়ে আনা হয় একজন সাধারণ বাঙালি কৃষিজীবীর পর্যায়ে রামেশ্বর ভট্টাচার্যের শিবায়নে তাঁকে এভাবেই চিত্রিত করা হয়েছে। রূপান্তরের সময়কালে ব্রাহ্মণ্যবাদ তার আদি কঠোরতা অনেকাংশে হারিয়ে এক নতুন ব্যাখ্যা লাভ করে। এভাবে এটা সাধারণ মানুষের মনের খুব কাছে আসতে সক্ষম হয়। এ

সামাজিক-ধর্মীয় বিবর্তন বহু শতাব্দী ধরে ঘটতে পারত। কিন্তু পঞ্চদশ শতকে বা তারও আগে আমরা এ প্রক্রিয়ার শুরু দেখতে পাই। মিশ্র তার ব্রাহ্মণসর্বস্বে চণ্ডীর পূজার উল্লেখ করেছেন এবং গেবিন্দানন্দ তার স্মৃতিগ্রন্থে [১০] মনসা পূজার আচার-অনুষ্ঠানাদি বর্ণনা করেছেন। চৈতন্য-ভাগবত নির্ভরযোগ্য হলে[১১] মনে করতে হবে যে নবদ্বীপের কিছুসংখ্যক ব্রাহ্মণ যথোপযুক্ত জীবিকা অর্জনের উদ্দেশ্যে মনসা ও চণ্ডীপূজার পুরোহিত হয়েছিলেন। কাজেই এটা মনে হয় সুস্পষ্ট যে অর্থনৈতিক প্রয়োজনের চাপে কিছুসংখ্যক ব্রাহ্মণ স্থানীয় ধর্মপূজাগুলিকে স্বীকৃতি দিচ্ছিলেন। উপরোল্লিখিত সমাজতাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব ও আপোসের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছিল।

১. (খ)

বাংলা ভাষায় মহাভারতের অনুবাদকদের মধ্যে কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকর নন্দীর নাম প্রধান। প্রথমজন পেয়েছিলেন পরাগল খানের পৃষ্ঠপোষকতা, দ্বিতীয়জন লাভ করেছিলেন তাঁর পুত্র ছুটি খানের পৃষ্ঠপোষকতা। পিতা-পুত্র দু'জনই ছিলেন হোসেন শাহের অধীনে চট্টগ্রামের গভর্নর। উভয় কবিই [১২] তাঁদের গ্রন্থের প্রারম্ভিক অংশে তাঁদের পৃষ্ঠপোষকদের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

জয়মিনীর সংস্কৃত সংস্করণের মাধ্যমে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত মহাভারতের কাহিনী বাংলার জনগণের মধ্যে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল বলে মনে হয়। পরাগল খান ও ছুটি খান যখন দেশীয় ভাষায় এ মহাকাব্যের অনুবাদের নির্দেশ দিয়েছিলেন তখন তাঁরা শুধু জনগণের বুদ্ধিবৃত্তিগত দাবিরই প্রতিফলন ঘটিয়েছিলেন। নবীবংশে বিধৃত ইসলামের কাহিনী নিয়ে সৈয়দ সুলতানের কাব্য রচনার আগে কবীন্দ্রের মহাভারত মুসলমান জনগোষ্ঠীর মন এত বেশি দখল করে রেখেছিল যে সৈয়দ সুলতান স্পষ্টভাবে বলেছেন যে কবীন্দ্রের ভারত কথা থেকে মুসলমানদের মন অন্যত্র সরিয়ে নেবার উদ্দেশ্যেই তিনি ইসলামি বিষয় নিয়ে লিখেছেন।[১৩] এভাবে মুসলমান কবি পরাগলী মহাভারতের প্রতিরূপ হিসেবেই সমাজে তাঁর নবীবংশকে উপস্থাপন করতে চেয়েছিলেন। এ ধরনের পরিস্থিতির আলোকে বিবেচনা করলে সুবিখ্যাত মুসলমান গভর্নর পরাগল খান মহাভারতের বিষয়বস্তু[১৪] নিয়ে কবিতা লিখেছিলেন, আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদের এ অনুমান যথাযোগ্য বিবেচনার দাবি রাখে। মহাভারতের বাংলা সংস্করণ আর একবার লৌকিক সংস্কৃতির বিজয় চিহ্নিত করে যা ইতোমধ্যেই উল্লেখ করেছি।

১. (গ)

আলোচ্য সময়কালের বৈষ্ণব পদাবলীর স্বল্পসংখ্যক রচয়িতাদের মধ্যে যশোরাজ অমর হয়ে আছেন। কথিত আছে যে তিনি হোসেন শাহের অধীনে রাজকর্মচারীরূপে নিযুক্ত ছিলেন। পীতাম্বর দাসের রস-মঞ্জরীতে যশোরাজের একটি ব্রজবুলি কবিতা প্রকাশিত হয়।[১৫] এতে এমন কোমলতা ও মাধুর্য প্রকাশ পায় যা অতুলনীয়। এটাকে মধ্যযুগের বাংলায় রচিত ব্রজবুলি পদগুলির অন্যতম সেরা দৃষ্টান্তরূপে বিবেচনা করা যেতে পারে।

শেখ কবীরের ভণিতা সংবলিত এ রকম আর একটি পদ আমাদের হাতে এসেছে। কোনো বিদেশী ভাষায় এ কবিতার অনুবাদ মূলকবিতার কোমলতা ও সৌন্দর্য রক্ষা করতে পারে না। আমরা নিচে এটা উদ্ধৃত করছি—১৬

ধানশী (বেলাবেলী) শ্রী রাধার রূপ
একি অপরূপ রূপের রমণী ধনি ধনি।
চলিতে পেখল গজরাজ গমনী ধনি ধনি। ধু।
কাজলে রঞ্জিত ধনি নয়ান ধবল ভালে।
ভ্রমর ভোলাল বিমল কমল দলে।
গুমান না করধনি ক্ষীণ অতি মাজাখানি।
কুচগিরি ফলের ভারে ভাঙ্গি পড়িব যৌবনি।
সুন্দরি চাঁদ মুখি বচন বোলসি হাসি।
অমিয়া বরিখে যেয়সে শারদপূরণ শশী।
শেখ কবীরে ভণে অহিগুণ পামরে জানে।
ছুলতান নাছির সাহা ভুলিছে কমল বনে।

সরল বাংলায় এর অর্থ এরকম দাঁড়ায় :

কুমারীর কি অপরূপ রূপ!
হাতির মত ধীর তার চলন।
শুভ্র কপালে তার কাজল রঞ্জিত আঁখি
মনে হয় সুন্দর পদ্মবনে ভ্রমর।
তার কোন অহংকার নেই এবং তার কটীদেশ ক্ষীণ।
কুচগিরি ফলের ভারে তার যৌবন ভেঙে পড়বে।
চাঁদমুখী সুন্দরী কুমারী হেসে কথা বলে।
শারদীয় পূর্ণিমার চাঁদের মতো এটা সুধা ঢালে।
শেখ কবীর বলে যে অধম এ গুণের মর্ম উপলব্ধি করে
এবং সুলতান নাসির শাহ পদ্মবনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

শেখ কবীর নামটি এ ইঙ্গিত দেয় যে তিনি ছিলেন একজন মুসলমান কবি। তাঁর জীবনের বিস্তারিত বিবরণ জানা না গেলেও মনে হয় যে তিনি সুলতান নসরত শাহের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। যশোরাজ খানের মতো হয়তো তিনিও ছিলেন নসরত শাহের একজন কর্মকর্তা। সুতরাং মুসলমানরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে অবদান রাখছিলেন। সম্ভবত তাদের সামাজিক- রাজনৈতিক অবস্থার কারণে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত তাদের সাহিত্যিক কর্মকাণ্ড তেমন কোনো অর্থবহ গুরুত্ব লাভ করে নি। যে সব বিদেশী মুসলমান এখানে বসতিস্থাপন করেছিলেন তারা ক্রমশ বাঙালিতে রূপান্তরিত হচ্ছিলেন এবং ইসলামে ধর্মান্তরিত দেশীয় জনগণ সম্ভবত নতুন অবস্থার সঙ্গে নিজেদেরকে খাপ খাইয়ে নিচ্ছিল। সমাজতাত্ত্বিক এ প্রক্রিয়া নিশ্চয়ই দীর্ঘসময় নিয়েছিল যে সময়ে বাঙালি মুসলমানরা পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে নিজেদের বিরোধ দূর করতে চেষ্টা করেছিল।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষপর্যন্ত মুসলমান বাংলা সাহিত্যের তুলনামূলক যে গুরুত্বহীনতা আমরা লক্ষ্য করি মনে হয় এটা তার ব্যাখ্যা দান করে।

১. (ঘ)

আদ্য পরিচয় যোগ দর্শনের প্রতিনিধিত্ব করে। এটা রচিত হয়েছিল, যেমনটি এর প্রারম্ভিক অংশ থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়, ১৪২০ শকাব্দ/১৪৯৮-৯৯ সালে।[১৭] এর রচয়িতা শেখ জাহিদ শুরুতেই বলছেন যে তিনি মানবদেহ গঠনের প্রশ্নটি আলোচনা করবেন, কারণ কবি বিশ্বাস করেন যে ভ্রূণের বিকাশের জ্ঞানসহ প্রসব সম্পর্কে পূর্ণজ্ঞান নিশ্চিতভাবে মানুষকে মুক্তি দান করে। ইতোমধ্যে আমাদের পরিলক্ষিত সৃষ্টিতত্ত্বের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়ার পর তিনি ভ্রূণ যে সব অবস্থার মধ্য দিয়ে রূপান্তরিত হয় বলে মনে করা হয় তার, শুক্র সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা,জন্মের শুভ ও অশুভ মুহূর্তসমূহ, যা শিশুর ভাগ্য নির্ধারণ করে এবং শরীরের অপরিহার্য উপাদানগুলি এবং যেখানে কামদেব ঘন ঘন আসেন বলে বিশ্বাস করা হয় সেই ইঙ্গলা ও পিঙ্গলা সহ বহু গ্রন্থি ও স্নায়ুর বর্ণনা দিয়েছেন! কাব্যের ভাষাবিদ্যাগত দিক সম্পর্কে বলা যায় যে, কাব্যে বহু শব্দের প্রাচীনরূপ সংরক্ষিত হয়েছে[১৮] যা শুধু দশম থেকে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত সময়কালে রচিত চর্যাপদ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, শ্রীকৃষ্ণ-বিজয় এবং গোরক্ষ-বিজয়ে অনুসরণ সাধ্য। এ কাব্যে পরিলক্ষিত ছন্দের অসম্পূর্ণতাও এর প্রাচীনত্বের ইঙ্গিত দেয়। সন্দেহাতীতভাবে যদি প্রমাণিত হয় যে এ কাব্যের রচনাকাল ১৪২০ শকাব্দ,তবে নিশ্চিত ভাবে বলা যায় যে আদ্য পরিচয় হচ্ছে প্রাচীনতম বাংলা কাব্য (যদি চর্যাপদ সঙ্গীত বাদ দেওয়া হয়) যার বিষয়বস্তু হচ্ছে যোগ ধারণা এবং এটি গোরক্ষ-বিজয়, জ্ঞান-প্রদীপ, যোগ-কালন্দর এবং জ্ঞান-সাগরের মতো কাব্যের অগ্রদূত।

১. (ঙ)

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, পর্যালোচনাধীন সময় কাল বাংলা সাহিত্যে আবেগপ্রবণতার বিকাশ দ্বারা চিহ্নিত। বিদ্যাসুন্দরের রচয়িতা শ্রীধর নসরত শাহের পুত্র ফিরোজের[১৯] পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। সাবিরিদ খান নামক একজন মুসলমান কবি অন্য একটি বিদ্যা-সুন্দর রচনা করেছিলেন[২০] এর ভণিতায় রচনাকালের কোনো নির্দেশ না থাকায় এর রচনাকাল সঠিকভাবে নির্ধারণ করা যায় না। সাবিরিদের কাব্যের কিছুঅংশের ভাষা শ্রীকৃষ্ণ--কীর্তনের ভাষার সদৃশ।[২১] এ কাব্যে প্রায়ই উপস্থিত ক্রিয়া-সমাপ্তির অপ্রচলিত রূপ এবং দ্বিতীয় কারকসমাপ্তি এর সন্দেহাতীত প্রাচীনত্ব নির্দেশ করে।[২২] ভাষাবিদ্যাগত এসব বৈশিষ্ট্য শ্রীধরের কাব্যে দেখা যায় না যা সাবিরিদের বিদ্যা-সুন্দরের আগে রচিত বলে মনে হয় না। এ দু'টি কাব্য সম্বন্ধে লক্ষণীয় সবচেয়ে অদ্ভুত বিষয়টি হচ্ছে এ দু'টি কাহিনীর একটির সঙ্গে অপরটির মনোযোগ আকর্ষণকারী সাদৃশ্য। দুই কবির বিদ্যাসুন্দরীতে একই সময়ে সংঘটিত ঘটনার বর্ণনা ও একই শব্দসমষ্টি বারংবার সহজেই একজনের চোখে পড়ে। তুলনামূলকভাবে সাবিরিদ খানের গ্রন্থের কাহিনী দীর্ঘ এবং

শ্রীধরের গ্রন্থের কাহিনী সংক্ষিপ্ত। শেষোক্তের গ্রন্থটিতে ছন্দ ও উপমার বৈচিত্র্য কম, সাবিরিদের কাব্যে এগুলির প্রাচুর্য রয়েছে। সাবিরিদের গ্রন্থে প্রাপ্ত রচনাশৈলীর নির্মল সহজবোধ্যতা শ্রীধরের গ্রন্থে দেখা যায় না। শ্রীধর কর্তৃক উল্লিখিত সঙ্গীতের বিভিন্ন রীতি বা রাগ সাবিরিদ খানের কাব্যে সুস্পষ্টভাবে অনুপস্থিত। দু'টি কাব্যে বর্তমান এসব সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের বিষয় বিবেচনা করে যুক্তিসঙ্গতভাবে এ ইঙ্গিত দেওয়া যেতে পারে যে শ্রীধর সাবিরিদ খানের কাব্যের একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ রচনা করেছিলেন এবং সাবিরিদ খানের কাছে তার ঋণ স্বীকার না করেই যথাস্থানে রাগ সন্নিবিষ্ট করে একে গায়কদের উপযোগী করে তুলেছিলেন।

বিদ্যা ও সুন্দরের আবেগপ্রবণ উপাখ্যান নিয়ে উল্লিখিত কবিদের কাব্য রচনা করা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এসব কাব্যের প্রকাশিত অংশগুলি সযত্নে পড়ে যতদূর নিরূপণ করা যায় তা থেকে বলা যায় যে প্রারম্ভিক পংক্তিগুলিতে [২৩] যে ধর্মীয় পটভূমির ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে তা মানবিক আকর্ষণকে পরিহার করতে পারে নি। এভাবে কবির মনোযোগ দেব-দেবীর জগৎ থেকে ক্রমান্বয়ে সরিয়ে তার সংবেদনশীলতা, দুঃখ ও আনন্দসহ মানুষের জগতের দিকে ফিরানো হয়েছে। শ্রীধর ও সাবিরিদের রচনাবলিকে ধর্মীয় সাহিত্য থেকে পার্থিব সাহিত্যে এবং মধ্যযুগীয়তা থেকে আধুনিকতায় উত্তরণের এক সুস্পষ্ট পর্যায়ের নির্দেশক রূপে গণ্য করা যেতে পারে। এ কবিরা যে সাহিত্যিক ঐতিহ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা অষ্টাদশ শতাব্দীর এক শক্তিশালী কবি ভারতচন্দ্র অনুসরণ করেছিলেন। সাবিরিদ যে রচনাশৈলীতে বিদ্যার সৌন্দর্যের বিবরণ দিয়েছেন [২৪] তার স্পষ্ট প্রতিধ্বনি ভারতচন্দ্রের গ্রন্থে রয়েছে। সাবিরিদ ও শ্রীধরের মতো ভারতচন্দ্রও তার গ্রন্থের বিদ্যা ও সুন্দরের কথোপকথনমূলক কিছু অংশে সংস্কৃত শ্লোক ব্যবহার করেছেন।[২৫] ভারত চন্দ্রের গ্রন্থ ধর্মীয় প্রভাবে পরিপৃক্ত কারণ চণ্ডী দেবীর মহত্ব বর্ণনার বিঘোষিত উদ্দেশ্য নিয়েই এটা রচনা করা হয়েছিল।

সে কালের বাংলা সাহিত্যে এভাবে যে বিকাশ ঘটছিল তাতে সে আমলের জৌনপুর ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার সাংস্কৃতিক পারিপার্শ্বিক অবস্থা মনে হয় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল। সিকান্দর লোদীর কাছে পরাজিত হয়ে হোসেন শাহ শর্কি কহলগাঁওয়ে অবস্থান করেছিলেন।[২৬] সম্ভবত তিনি তাঁর সঙ্গে কিছুসংখ্যক সুফি ও কবিকে বাংলায় নিয়ে এসেছিলেন। এ শরণার্থীদের মধ্যে একজন ছিলেন কুতবন যিনি ৯৩৯ হিজরি ১৫০৩ সালে[২৭] মৃগাবতী নামে হিন্দিতে একটি আবেগপ্রবণ কাব্য রচনা করেছিলেন। কাব্যের কাহিনীর সংক্ষিপ্তসার নিচে দেওয়া হলো : চন্দ্রগড়ের সূর্যবংশীয় রাজা গণপত দেও-এর পুত্র রাজকুমার একবার শিকারে গিয়েছিলেন। দ্রুতসঞ্চারী সপ্তবর্ণ এক হরিণ দেখে মুগ্ধ হয়ে তিনি এই অদ্ভুত জন্তুর পশ্চাদ্ধাবন করে সাত যোজন বা বিশ ক্রোশ অতিক্রম করে সবুজ পত্র শোভিত বিরাট গাছের নিচে প্রবাহিত এক হ্রদের তীরে উপস্থিত হন। হরিণটি হ্রদে অদৃশ্য হয়ে যায়। তাকে ধরার জন্য রাজকুমারও হ্রদে ঝাঁপ দেন। তাঁর চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলে তিনি হ্রদের তীরে সাততলা বাড়িতে বসবাস করতে থাকেন। এটা তাঁর বাবা তাঁর থাকার জন্য তৈরি করেছিলেন। এ পলাতক হরিণটি ছিল কাঞ্চননগরের রাজা

রূপ মুরার এর সুন্দরী কন্যা মৃগাবতী। ইচ্ছা করলেই মৃগাবতী হরিণের বেশ গ্রহণ করতে পারত। একবার রাজকুমার সাতজন পরী-সদৃশ মহিলাকে হ্রদে আনন্দ ও স্নান করতে দেখতে পায়। এ সাতজন মহিলার মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরীজন ছিল মৃগাবতী। আরেকবার এক একাদশীর দিনে মৃগাবতী হ্রদে স্নান করতে এলে রাজকুমার তার বস্ত্র হরণ করে তার আনুকূল্য লাভ করতে সমর্থ হন। কিন্তু এ মিলনের পরে আসে বেদনাদায়ক বিরহ। রাজকুমারের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে মৃগাবতী একবার পালিয়ে যায়। তাঁর আকুল আকাঙ্ক্ষার বিস্ময়-বিমুগ্ধ অবস্থায় রাজকুমার তাকে খুঁজতে বের হন। পথিমধ্যে তিনি এক পর্বতময় সমুদ্রসৈকতে হাজির হন। সেখানে তিনি এক দৈত্যকে হত্যা করে রুক্মিনী নামে একজনকে দৈত্যের কবল থেকে রক্ষা করেন। রুক্মিনীর বাবা রঘুবংশীয় রাজপুত রাজা দেবী রায় সিন্ধিয়ার সনির্বন্ধ অনুরোধে রাজকুমার তাকে বিয়ে করেন। কিন্তু বিবাহিতা স্ত্রীর অনুরাগী স্বভাব তার মন থেকে প্রথম প্রেমের ভাবনাকে দূর করতে পারেন নি। বহু বাধার সম্মুখীন হয়ে তিনি কাঞ্চননগর পৌঁছেন এবং দু'জনের দীর্ঘদিনের কাঙ্ক্ষিত মিলন ঘটে। গণপত দেও-এর পাঠানো বার্তাবাহরা প্রণয়াহত রুক্মিনীর কাছ থেকে রাজকুমারের অবস্থান জানতে পারে। প্রণয়-পীড়িত রুক্মিনী এক পাখির কাছে তার আবেগ-অনুভূতির কথা বারমাসার আকারে বলছিল। তারা কাঞ্চননগরে রাজপুত্রের দেখা পায় এবং রাজপুত্র তখন মৃগাবতীকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে ফিরে আসে। ফেরার পথে তারা রুক্মিনীকেও সঙ্গে নিয়ে আসে। কাহিনীর শেষ বিয়োগান্তক। শিকারে গিয়ে রাজপুত্র এক মত্ত হাতির পিঠ থেকে পড়ে মারা যায়। দুই রানী সতী হন। [২৮]

এ কাহিনীর উৎস সম্পর্কে কবি বলেছেন যে স্থানীয় ভাষায় অধেল ও আর্যা ছন্দে বর্ণিত কাহিনী থেকে তিনি তার উপাদান সংগ্রহ করেছেন।[২৯] পলায়নপর হরিণের ধারণা রামায়ণের মারীচ কাহিনীতে এবং মহাযান বৌদ্ধ বিনয়পিন্টকের সুধন-মনোহরা কাহিনীতেও পাওয়া যায়।[৩০] কুতবন এসব উৎস দেখেছিলেন কিনা তা স্পষ্টভাবে জানা যায় না। অক্সফোর্ডের বডলীন গ্রন্থাগারের দ্বাদশ শতাব্দীর কিতাব সমকিয়ার এর শুরুতে ছলনাময় হরিণের একটি ভূমিকা রয়েছে [৩১] যদিও গ্রন্থের দীর্ঘ কাহিনীর সঙ্গে এর কোনো অপরিহার্য সম্পর্ক নেই। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষদিকে রচিত নিজামীর হফত পয়করে এক রহস্যময় ও দ্রুতগামী বন্যগাধার উল্লেখ আছে যার পিছু ধাওয়া করে পারস্যদেশীয় রাজকুমার বাহরাম গোর এক পাহাড়ের গুহায় উপস্থিত হয়েছিলেন। একটি ড্রাগনকে হত্যা করে তিনি এক রহস্যময় কক্ষে প্রবেশ করেন। সেখানে সাতটি দেশের প্রতিনিধিত্বকারী সাতজন সুন্দরী মহিলার ছবি ছিল। এ সাতজন মহিলার সঙ্গে বাহরামের বিয়ের পর সাত গম্বুজ বিশিষ্ট একটি অট্টালিকা নির্মাণ করা হয় যেখানে তিনি তার স্ত্রীদের সঙ্গে সাতটি রাত কাটান। এ মহিলাদের বলা সাতটি গল্প নিয়ে হফত পয়করের কাহিনী রচিত।[৩২] আগেই যেমন লক্ষ্য করা গেছে, কুতবনের মৃগাবতীতে শুধু সাত রং এর একটি হরিণের বর্ণনাই দেওয়া হয়নি, এতে সাত যোজন, সাত-তলা অট্টালিকা এবং হ্রদে স্নানরত সাতজন মহিলারও উল্লেখ রয়েছে।[৩৩] নিজামী এবং কুতবন দু'জনই মনে হয় সাত সংখ্যাটির সঙ্গে গুহ্যরহস্যমূলক গুরুত্ব যুক্ত করেছিলেন। প্রতীকী কাব্য মৃগাবতীর কবি কুতবন মনে হয়

হফ্‌ত পয়কর দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত হয়েছিলেন। শেষোক্তটিকেও প্রতীকী প্রকৃতির বলে বিবেচনা করা হয়।[৩৪] কুতবনের মতো একজন সুফি কবির পক্ষে ইরানি সুফি নিজামীর রচনা থেকে প্রেরণা লাভকে খুবই স্বাভাবিক মনে হয়। কুতবনের কাব্যে ইরানি প্রভাব নির্দেশ করতে গিয়ে অবশ্য জোর দিয়ে বলা হচ্ছে না যে মৃগাবতীর কাহিনী প্রকৃতিগতভাবে সম্পূর্ণ ইরানি, এর কোনো ভারতীয় পটভূমি ছিল না। প্রকৃতপক্ষে এতে প্রচুর ভারতীয় উপাদান রয়েছে যা নিচে উল্লেখ করা হবে। উপরন্তু কুমারীদের আনন্দোৎসব ও হ্রদে স্নানের এবং রাজপুত্রের মৃগাবতীর বস্ত্রহরণের দৃশ্যাবলি রাধা-কৃষ্ণলীলার কাহিনীর দৃশ্যের অনুরূপ। বহু গোপী বা গোয়ালিনীসহ কবি প্রসঙ্গক্রমে এ সব দৃশ্যের উল্লেখ করেছেন।[৩৫] রূপক প্রকৃতির হলেও মৃগাবতীতে মানব সম্বন্ধীয় বিষয়ের ঘাটতি নেই যা এ কাব্যে এক বিরল গীতধর্মী সৌন্দর্য সংযোজন করেছে। কাহিনীর আধ্যাত্মিক প্রতীকীবাদকে এর অপরিহার্য মানবতাবাদের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছে বলে মনে হয়। বাস্তবতার পারিপার্শ্বিকতায় স্থাপিত গণপত, রুক্মিনী এবং রাজপুত্র—এরা সবাই মানুষ।

মৃগাবতী এবং লোরক-চান্দা বা ময়না-সত[৩৬]-এর মতো মধ্যযুগীয় হিন্দি আবেগপ্রবণ কাহিনীগুলিতে বেশকিছু সার্বজনীন উপাদান রয়েছে যা এসব গ্রন্থের তুলনামূলক পরীক্ষা করলে স্পষ্টভাবে তুলে ধরা যেতে পারে। এ সব কাহিনীর প্রত্যেকটিতে নায়ক তার প্রেয়সীর খোঁজে ঘুরে বেড়ান এবং দৈত্য ও মানুষ-খেকোদের সঙ্গে যুদ্ধ করা সহ পথে বহু কষ্টের সম্মুখীন হন। তাদের পিছনে ফেলে আসা বিবাহিতা স্ত্রী বছরের বার মাসের বিরহের বিভিন্নতার প্রকৃতি বর্ণনা করেন। সাধারণত পরম্পরাগত বারমাসার আকারে তাদের মনের কথা তারা প্রকাশ করেন। নায়ক যখন প্রেয়সীকে বিয়ে করে তার পূর্বতন স্ত্রীর কাছে ফিরে আসেন তখন তার মৃত্যু ঘটে। এরপর তার দুই রানীও সতী হন। এ ধরনের সর্বজনীন উপাদানের সংখ্যাবৃদ্ধি না করেও আমরা এখানে ইঙ্গিত করতে পারি যে উপরে উদ্ধৃত কাহিনীগুলিতে অদ্ভুত কাকতালীয় ঘটনাবলির কারণ এই যে এগুলি সবই এসেছে এক সর্বজনীন উৎস থেকে সম্ভবত স্মরণাতীতকাল থেকে উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের মুখে মুখে প্রচলিত জনপ্রিয় লোক-কাহিনী থেকে। চতুর্দশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের লেখা জ্যোতিরীশ্বর কবি শেখরাচার্য কর্তৃক উল্লিখিত লুরিক নাচ এবং দক্ষিণ বিহারে প্রচলিত লুরিকমল্ল লোককাহিনীর[৩৭] প্রাচীন প্রকৃতি থেকে প্রাচীন কালে এসব আবেগপ্রবণ কাহিনীর জনপ্রিয়তা প্রকাশ পায়।

বাংলা সাহিত্যে রোমান্টিকতার বিকাশে কুতবনের মৃগাবতীর প্রভাব যথেষ্ট সুদূরপ্রসারী। সপ্তদশ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী পাঁচজন বাঙালি কবি মৃগাবতীর কাহিনী অনুসরণ করেছেন।[৩৮] কিন্তু মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে এর পরোক্ষ প্রভাবের গুরুত্ব তাৎপর্যপূর্ণ। মালিক মোহাম্মদ জয়সী মনে হয় তার বিখ্যাত প্রেমগাথা পদুমাবতার আদর্শরূপে মৃগাবতীকে গ্রহণ করেছিলেন। এতে তিনি মৃগাবতী রাজকুমার কাহিনীর পরিষ্কার উল্লেখ করেছেন।[৩৯] উপরে পরিলক্ষিত সাধারণ উপাদান বিশিষ্ট হওয়া ছাড়াও এ দু'টি গ্রন্থ স্পষ্টভাবে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত। কুতবনের গ্রন্থে রাজপুত উপাদানের

প্রাধান্য সহজেই চোখে পড়ে। তিনি গণপত দেও এবং রাজা দেবী রায় সিন্ধিয়াকে রাজপুত উপজাতির যথাক্রমে সূর্য বংশ ও রঘুবংশোদ্ভূতরূপে গণ্য করেন।[৪০] চন্দ্রগড় নামটি চন্দ্রাবতী [৪১] বা আরও যথাযথভাবে গোয়ালিয়রের রাজপুত রাজ্য চান্দেরীর মতো শোনায়।[৪২] সম্ভ্রান্ত বংশীয় রাজপুত মহিলারা তাদের মৃত স্বামীর চিতায় উঠার সময় ভাউ রাজধানী দেরওয়ালের জনৈকা মৃগাবতীর [৪৩] নাম স্মরণ করতেন যিনি সতী হয়ে পৌরাণিক কাহিনীর বিখ্যাত ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছিলেন বলে মনে করা হয়। রাজপুত কাহিনীটি কুতবনের মৃগাবতীর অনুরূপ। তাকেও সতীরূপে চিত্রিত করা হয়েছে।[৪৪] কৈথি হরফে বিকানীর ও চৌখাম্বায় মৃগাবতীর পাণ্ডুলিপির আবিষ্কার ও মধ্য ষোড়শ শতকের রাজস্থানী চিত্রকর্ম দ্বারা এর একটির অলঙ্করণ থেকে মধ্যযুগের রাজস্থানে এ কাহিনী কতটুকু জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল তা প্রকাশ পায়। এ ধরনের আবেগপ্রবণ কাহিনীর সঙ্গে রাজপুত মানসের যে পরিচয় ছিল ১৫৪০ সালে জয়সলমীরের কুশললাভর রাজস্থানী ভাষায় ঢোলা-মারবনীর লোককাহিনী নিয়ে কাব্য রচনা করা থেকে তার সাক্ষ্য পাওয়া যায়।[৪৫] এসব থেকে মৃগাবতীর রাজপুত পটভূমির নির্দেশ পাওয়া যায়। মনে হয় যে রাজপুতানা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে প্রচলিত লোক-কাহিনী থেকে নির্বাচিত উপাদানের ভিত্তিতে মৃগাবতী রচিত হয়েছিল। কুতবন হয়তো এসব অঞ্চল থেকে আগত সুফিদের কাছে এসব লোক-কাহিনী শুনেছিলেন।

পদুমাবতীতে রাজপুত প্রভাব যথেষ্ট স্পষ্ট। এতে নায়ক রত্ন সেনকে আলাউদ্দীন খলজী কর্তৃক আক্রান্ত চিতোরের রাজা হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। পদ্মাবতী ও তার সহচরীদের মানস হ্রদে আমোদ প্রমোদ ও স্নান করার বিস্তারিত বিবরণ জয়সী দিয়েছেন।[৪৬] এটাকে মৃগাবতী ও তার সুন্দরী সহচরীদের মাঝে মাঝে হ্রদে স্নান করার দৃশ্যের নিকট-সদৃশ অনুকরণ বলে মনে হয়।[৪৭] বসন্ত পঞ্চমীর একদিনে মহাদেবের মন্দিরে পদ্মাবতীর সঙ্গে রত্ন সেনের প্রথম দেখা হয়েছিল।[৪৮] রাজকুমার একাদশীর দিন, সুন্দর জানালাবিশিষ্ট এবং রামায়ণ ও মহাভারতের দৃশ্যাবলি অঙ্কিত এক সাততলা মন্দিরে মৃগাবতীর সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন।[৪৯] মৃগাবতীর প্রারম্ভিক স্তবকের একটি থেকে যেমন নির্দেশ পাওয়া যায় [৫০] এ কাহিনী হচ্ছে ভক্তের সঙ্গে পরম সত্তার মিলনের উদাহরণমূলক। জয়সী তার কাহিনীর প্রতীকত্ব নিম্নলিখিতভাবে প্রকাশ করেছেন : "আমরা দেহকে চিতাস্তর বানাই, মনকে বানাই রাজা : হৃদয়কে সিংহল ও বুদ্ধিকে পদ্ম-নারীরূপে স্বীকার করি। আধ্যাত্মিক গুরু হচ্ছেন তোতা পাখি যিনি পথ দেখান : আধ্যাত্মিক গুরু ছাড়া কে এই বিশ্বে সৃষ্টিকর্তার সন্ধান পান ? নাগমতি হচ্ছেন এ বিশ্বের দুশ্চিন্তা : যার চিন্তা এর সঙ্গে বন্ধনযুক্ত তিনি মুক্তি পাবেন না। সংবাদ বাহক রাঘব হচ্ছে শয়তান এবং সুলতান আলাউদ্দীন হচ্ছেন মায়া। এ কাহিনীকে এভাবে বিবেচনা কর : যদি পার শিক্ষা গ্রহণ কর।" [৫১] জয়সীর উপর কুতবনের এই হচ্ছে সম্ভাব্য প্রভাব। জয়সীর রচনা বিখ্যাত কবি আলাওল ছন্দে বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন।[৫২] আলাওল সপ্তদশ শতকে আরাকান রাজসভায় সমৃদ্ধি লাভ করেছিলেন। আগেই যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, সাধনের ময়না সতের কাহিনীর সঙ্গে মৃগাবতী ও পদুমাবতীর সাদৃশ্য রয়েছে। এর বিষয়বস্তু দৌলত

কাজীর 'সতী ময়না ও লোর চন্দ্রাণী'র মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে প্রবেশ করেছে। কাজেই মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে আবেগপ্রবণতার অন্যতম উৎস হিসেবে কুতবনকে গণ্য করা যায়।

শ্রীধর এবং সাবিরিদ খানের বর্ণিত বিদ্যা-সুন্দরের কাহিনীর সঙ্গে এ হিন্দি আওধী পটভূমির কোনো অপরিহার্য সম্পর্ক আছে কিনা তা বলা অত্যন্ত কঠিন। তাদের গ্রন্থের অসম্পূর্ণ মূল পাঠগুলিতে বিদ্যার পিতার রাজধানী কাঞ্চীপুরে সুন্দরের উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত ঘটনাবলি রয়েছে। শ্রীধরের গ্রন্থের শেষে অসম্পূর্ণ শ্লোকগুলিতে[৫৩] কোতওয়াল কর্তৃক সুন্দরের গ্রেপ্তার এবং এর পরে বিদ্যার বারংবার বিলাপের উল্লেখ রয়েছে। কাহিনীর অবশিষ্টাংশ সম্পর্কে পাঠককে অনবহিত রাখা হয়েছে। এ সব কাহিনী বাঁধাধরা ছকের হওয়ায় এবং সুব্যবস্থিত ও যুক্তিমতো ধারায় বিকশিত হওয়ায় এ কাহিনীর লুপ্ত অংশগুলি ভারতচন্দ্রের রচনার প্রাসঙ্গিক অংশটি বিবেচনা করলে পুনর্গঠিত করা সম্ভব। ভারতচন্দ্রের রচনায় বলা হয়েছে যে সুন্দর ভূগর্ভস্থ এক সুড়ঙ্গপথে বিদ্যার শয়নকক্ষে প্রায়ই আসা-যাওয়ার সময় কোতওয়ালদের হাতে ধরা পড়ে এবং রাজা তাকে শূলবিদ্ধ করার আদেশ দান করেন। তার অলিন্দ থেকে কোতওয়ালদের হাতে সুন্দরের অমানুষিক নির্যাতন দেখে বিদ্যা মর্মস্পর্শী ভাষায় তার অনুভূতি প্রকাশ করে। দেবী চণ্ডীর কাছে ঐকান্তিক প্রার্থনা জানিয়ে সুন্দর তার জীবন রক্ষা করতে এবং বিদ্যাকে বিয়ে করতে সক্ষম হন। বিয়ের অনুষ্ঠানের পর স্ত্রী বিদ্যাকে নিয়ে সুন্দর ফিরে আসেন। এর সঙ্গে ষড়ঋতুর বর্ণনা দিয়ে কবি এটাকে কিছুটা গীতিকাব্যধর্মী করেছেন।[৫৪]

অদ্ভুতভাবে এসব কিছুরই স্পষ্ট অনুরূপ জয়সীর পদুমাবতীর সিংহলী উপাখ্যানে রয়েছে : রত্ন সেন ভূগর্ভস্থ এক সুড়ঙ্গপথে সিংহলগড়ে প্রবেশের চেষ্টা করেন। সুড়ঙ্গ থেকে বের হবার পথে তিনি রাজার প্রহরীর হাতে ধরা পড়েন এবং রাজা তাকে শূলে প্রাণদণ্ডের আদেশ দান করেন। তার অলিন্দ থেকে প্রহরীদের হাতে রত্ন সেনের নির্যাতন দেখে পদ্মাবতীর আসামী যন্ত্রণায় ভোগেন। মহাদেব ও পার্বতীর হস্তক্ষেপের ফলে রাজা শুধু রত্ন সেনের প্রাণই রক্ষা করেননি তিনি তার কন্যা পদ্মাবতীর সঙ্গে তার বিয়েও দেন। দম্পতি চিতোরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। এখানেও আমরা ষড়ঋতুর বর্ণনা দেখতে পাই।[৫৫]

চতুর্দশ শতকের জৈন কবি রাজশেখর সূরীর কাব্যে এবং বিহলন-যামিনীপূর্ণতিলকা উপাখ্যানে[৫৬] বিদ্যা-সুন্দরের কাহিনীর যে সংস্কৃত সংস্করণ দেখা যায় তা শ্রীধর, সাবিরিদ এবং ভারত চন্দ্রের কাব্যে প্রাপ্ত বাংলা কাহিনী থেকে যথেষ্ট ভিন্নতর। কিন্তু পদুমাবতীর সিংহল উপাখ্যানের সঙ্গে বাংলা বিদ্যা-সুন্দরের যে অদ্ভুত মিল দেখা যায় তা থেকে এ ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে উত্তর ভারত ও বিহারের লোক-কাহিনীর বহু উপাদান আত্মস্থ করার পর এ কাহিনী বাংলায় এসেছিল। কিন্তু আরও নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্য না পাওয়া পর্যন্ত এ যুক্তিটিকে আর প্রসারিত করা যায় না। এ কাহিনী শর্কি শাসক হোসেন শাহের অনুচররা বাংলায় এনেছিলেন বলে মনে হয়।

শ্রীচৈতন্যের জীবনচরিত বাংলা সাহিত্যে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। এটা

বিস্ময়কর যে এই মহান ধর্মীয় নেতার কোনো গুরুত্বপূর্ণ জীবনীগ্রন্থ তাঁর জীবদ্দশায় লেখা হয় নি। চৈতন্য-ভাগবত এবং চৈতন্য-চরিতামৃতের মতো বিখ্যাত রচনাবলি চৈতন্যের মৃত্যুর পর ষোড়শ শতকের শেষদিকে রচিত হয়েছিল। আমাদের আলোচনাধীন আমলে রচিত বলে বিবেচিত একমাত্র গ্রন্থ হচ্ছে গোবিন্দদাসের কড়চা। কথিত আছে যে তিনি ছিলেন মহাপ্রভুর ঘনিষ্ঠ সহচর। কিন্তু এ গ্রন্থের ঐতিহাসিকতা বিষয়ক সমস্যা বাঙালি পণ্ডিতদের মধ্যে তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি করেছে, যাদের মধ্যে কেউ কেউ এতোদূর পর্যন্ত বলেছেন যে, এ গ্রন্থ সম্পূর্ণ জাল। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কড়চার প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছেন বলে মনে হয়। এ গ্রন্থে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে তিনি চৈতন্যের জীবনের বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন।[৫৭] দীনেশ চন্দ্র সেন কড়চার ঐতিহাসিক মূল্যকে গুরুত্ব দেওয়ার চেষ্টা করেছেন।[৫৮] কিন্তু বৈষ্ণবরা এটাকে আদৌ চৈতন্যের সমসাময়িক বলে স্বীকার করেন না। কাজেই এ গ্রন্থটিকে কেন্দ্র করে সীমাহীন বিতর্ক রয়ে গেছে। এর ভাষা, ধারণা এবং বাক্যের ধারাগুলি সন্দেহাতীতভাবে আধুনিক এবং এ গ্রন্থকে মনে হয় জাল।

২.

স্থানীয় ভাষা বাংলা ছাড়া, ফার্সিও প্রচলিত ছিল। বিদেশী ভাষা হওয়া সত্ত্বেও প্রা-ক-মোগল বাংলায় ফার্সি এতো প্রাধান্য লাভ করেছিল যে, এটা পঞ্চদশ শতকের প্রথম ভাগে বাংলায় আগত চৈনিক পর্যটক মাহুয়ানের[৫৯] দৃষ্টি সহজে আকর্ষণ করেছিল। পর্যালোচনাধীন সময়কালে এটা দরবারি ভাষার মর্যাদা লাভ করেছিল বলে মনে হয়। চতুর্দশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত প্রায়ই বাংলা ছিল দিল্লি সাম্রাজ্যের অংশ, যেখানে ফার্সি ছিল দরবারি ভাষা। বাংলার স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠাকারী ইলিয়াসশাহীরা নিশ্চয়ই সকল সরকারি কাজকর্মে ফার্সি বহাল রেখেছিলেন। হোসেন শাহী সুলতানরা যে আরবিকে এর স্থলাভিষিক্ত করেছিলেন তা প্রমাণ করার মতো কোনো বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষ্য আমাদের নেই। লিপি ও সাহিত্যিক উৎসগুলিতে আমরা শরাবদার, জমাদার, শিকদার, সর-ই-লস্কর, ওয়াজির-লস্কর, লস্কর-ওয়াজির, সর-ই-খৈল, কার-ই-ফরমান, সর-ই-গোমাশতা এবং দবীর-ই-খাসের মতো পদবী পাই [৬০]–এগুলির সবই ফার্সি শব্দগুচ্ছ। জয়ানন্দের চৈতন্য-মঙ্গলে[৬১] উল্লেখ আছে যে, জগাই ও মাধাই মসনবি থেকে শ্লোক আবৃত্তি করতেন এবং ব্রাহ্মণদের মধ্যে কেউ কেউ ফার্সি সাহিত্য পড়তেন। এ তথ্য মূল্যবান কারণ এটা এই ইঙ্গিত দেয় যে, হোসেন শাহের দু'জন কর্মকর্তা, জগাই ও মাধাইকে ফার্সি শিখতে হয়েছিল। এসব থেকে হোসেন শাহী শাসকরা যে সরকারি ভাষা হিসেবে ফার্সিকে গ্রহণ করেছিলেন তার সমর্থন পাওয়া যায় বলে মনে হয়। এ আমলের মুদ্রায় উৎকীর্ণ লিপিগুলি আরবি ভাষায়। কিন্তু তা আরবি যে সরকারি ভাষা ছিল সে অনুমানকে সমর্থন করে না কারণ সাধারণত : মুদ্রায় শাসনকারী সুলতানদের নাম, তারিখ, টাকশাল নগরীর নাম এবং কলিমা থাকে এবং মুদ্রায় ফার্সি লিপি ব্যবহার করার সুযোগ ছিল না। জাজনগর বিজয় লিপিবদ্ধকারী মুদ্রাগুলিতে আমরা ফার্সি বর্ণগ্রাফ দেখতে পাই।[৬২] অবশ্য শিলা-লিপিগুলির অধিকাংশই আরবিতে

হওয়ায় আরবি শিলালিপির প্রাধান্য দেখা যায় এবং মাত্র কয়েকটি শিলালিপি রয়েছে ফার্সিতে।[৬৩] এসব শিলালিপি মসজিদ ও সমাধিসৌধে লাগানো বলে এসব ধর্মীয় অট্টালিকা নির্মাণের যৌক্তিকতা প্রমাণের জন্য এগুলিতে কোরানের আয়াত থাকা ছিল অপরিহার্য। কাজেই শিলালিপির প্রস্তরখণ্ডে ফার্সি ব্যবহারের সুযোগ সীমিত হলে আমরা দ্বিভাষিক বহু শিলালিপি পাই। এসব শিলালিপির অংশ বিশেষের উদ্দেশ্য ছিল জনগণের কাছে কোনো তথ্য পৌঁছে দেওয়া এবং সে অংশগুলি ফার্সিতে লেখা।[৬৪] কামরূপ ও উড়িষ্যার শাসকদের বিরুদ্ধে হোসেনের বিজয় লিপিবদ্ধকারী সিলেট শিলালিপি যে ফার্সিতে লেখা এটা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

বাংলার জীবনধারায় ফার্সি যথেষ্ট প্রভাব ফেললেও হোসেন শাহী আমলে ফার্সি সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছিল বলে মনে হয় না। বস্তুত প্রাক-আফগান মুসলমান আমলে নিশ্চিতরূপে নির্ধারণ করা যেতে পারে এমন কোনো ফার্সি সাহিত্যের নমুনা আমাদের হাতে পৌঁছে নি। বাংলা রাজনৈতিকভাবে উত্তর ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল এবং এ রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতার ফলে ঘটেছিল তার সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতা। তার চারপাশের দেশগুলি এবং পারস্য থেকে দিল্লিতে নতুন অভিবাসীরা আসতে শুরু করেছিল। সন্দেহাতীতভাবে এটা প্রাক-মোগল যুগে উত্তর ভারতে প্রচুর ফার্সি সাহিত্যের বিকাশের একটি কারণ। এটা বাংলায় সম্ভব ছিল না, কারণ দিল্লি সাম্রাজ্যের সঙ্গে তার কোনো সাংস্কৃতিক সম্পর্ক ছিল বলে মনে হয় না। পারস্যের সঙ্গে তার কোনো স্থায়ী বন্ধুত্বের বন্ধনও ছিল না। ষোড়শ শতকের প্রথম দিকে বার্বোসা বাংলার শহরগুলিতে পারস্যদেশীয় বণিকদের উপস্থিতি দেখতে পেয়েছিলেন। ভারত মহাসাগর ও বঙ্গোপসাগর হয়ে পারস্য থেকে সরাসরি এখানে আগত এসব বণিক তাদের আরবীয় সঙ্গীদের মতো এতো বেশিসংখ্যক ছিল না। তারা এখানে স্থায়ীভাবে বসবাসও করেনি : যার ফলে বাংলায় ফার্সি সাহিত্যের বিকাশে তারা কোনও অবদানও রাখতে সক্ষম হয় নি। মোগলদের দ্বারা বিজিত ও সাম্রাজ্যভুক্ত হওয়া পর্যন্ত এ অবস্থা পরিবর্তিত থেকে যায়।

৩.

সেন আমল ছিল সংস্কৃত সাহিত্যের স্বর্ণযুগ এবং এ আমলে বহু কবি ও পণ্ডিতব্যক্তির আবির্ভাব ঘটেছিল। এরপর সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের সর্বস্তরে আসে স্থবিরতা। মুসলমানদের বিজয়ের পর এক শতাব্দীর অধিককালব্যাপী বাংলার জীবনধারায় বিশেষভাবে চিহ্নিত সামাজিক-রাজনৈতিক অস্বাভাবিক অবস্থাকে এর কারণরূপে নির্দেশ করা যেতে পারে। পাঁচ শতাব্দীরও অধিককালব্যাপী সমগ্র মুসলমান শাসনামলে একজনও জয়দেব বা ধোয়ীর আবির্ভাব ঘটে নি। এর কারণ খুঁজে বের করা কঠিন নয়। উন্নতি ও বিকাশের জন্য সংস্কৃত সাহিত্য ছিল সাধারণত সেন রাজসভার পৃষ্ঠপোষকতা ও অভিজাতদের লালিত ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির ওপর নির্ভরশীল। সেন শাসনের অবসানের পর নির্ভর করার মতো রাজদরবার বা অভিজাত শ্রেণী কোনোটাই তার রইল না। বিদেশী মুসলমান শাসক শ্রেণীও সংস্কৃত ভাষা ও ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগী হয় নি। ইলিয়াস শাহী শাসকদের প্রতিষ্ঠিত

রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষকে সামাজিক নিরাপত্তাবোধ দান করে, ব্রাহ্মণ্য শ্রেণীও এ থেকে বাদ পড়ে নি। উপরন্তু রাজাগণেশ প্রতিষ্ঠিত স্বল্পকাল স্থায়ী হিন্দু রাজবংশ ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির উদ্যম সঞ্চার করেছিলেন বলে মনে হয়। এ সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশেই মধ্যযুগের বাংলার বিখ্যাত সংহিতা-রচয়িতাদের মধ্যে দু'জন শূলপাণি ও রায়মুকুট বৃহস্পতি সমৃদ্ধি লাভ করেছিলেন।[৬৫] প্রথমোক্তজন ছিলেন মূলত স্মৃতি রচয়িতা এবং শেষোক্তজন ছিলেন স্মৃতি রচয়িতা ও প্রাচীন সংস্কৃত মহাকাব্য ও অভিধানের টীকাকার। সৃজনশীল শিল্পরূপে অভিহিত করার মতো কিছু ছিল না, কারণ সংস্কৃত নাটক ও সৃজনশীল কবিতার কোনো নিদর্শন ইলিয়াস শাহী আমলে নেই। হিন্দু মানসের সৃজনশীল শক্তি মনে হয় স্থবির হয়ে পড়েছিল। হোসেন শাহী আমলে এসে আমরা হঠাৎ সাহিত্যিক-কর্মকাণ্ডের বহিঃপ্রকাশ দেখতে পাই। প্রাচীন ধর্মশাস্ত্র, নব্য-ন্যায়ের মৈথিলী চিন্তাধারা এবং বিকাশমান গৌড়ীয় বৈষ্ণববাদ মনে হয় এর অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল।

৩ (ক)

স্মৃতি সম্পর্কে বলা যায় যে বাংলা অতীতে এক উজ্জ্বল ঐতিহ্য গড়ে তুলেছিল। বেশকিছু সংহিতা- রচয়িতার উদ্ভব হয়েছিল বাংলায় যাদের মধ্যে ভবদেব ভট্ট, জীমূতবাহন, হলায়ুধ ভট্ট, শূলপাণি এবং বৃহস্পতির নাম এবং তাদের গ্রন্থাবলি যথেষ্ট বিখ্যাত।[৬৬] আলোচ্য এ আমলের সংহিতা-রচয়িতারা নিশ্চয়ই এসব পণ্ডিতের রচনাবলি দ্বারা দারুণ প্রভাবিত হয়েছিলেন। এ আমলের সবচেয়ে কীর্তিমান সংহিতা-রচয়িতা ছিলেন রঘুনন্দন। তাঁর রচিত স্মৃতিতত্ত্বের উদ্দেশ্য ছিল সামাজিক-ধর্মীয় বিধিমালার পরিধিতে বিশ্বকোষের মানের হওয়া। এটা ছিল সেকালের হিন্দু মানসের স্মৃতি-জ্ঞানের সমষ্টি। অষ্টাবিংশতিতত্ত্ববাণী[৬৭] রূপেও পরিচিত এ গ্রন্থ স্মৃতির সমগ্রক্ষেত্রেই প্রসারিত। হিন্দু সামাজিক-ধর্মীয় বিধি সম্পর্কিত বিস্তীর্ণ বিভিন্ন বিষয়ে এতে আলোচনা রয়েছে যেমন–সৌরাব্দপূরক মাস, উত্তরাধিকার, বণ্টন, ধর্মনিষ্ঠ হিন্দুর জন্ম ও বিবাহ সম্পর্কিত ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি, শুদ্ধি, প্রায়শ্চিত্ত, চান্দ্র-দিবস, জন্মাষ্টমী এবং দুর্গাপূজার উৎসব, আইন, মূর্তি ও মন্দির উৎসর্গীকরণ, গৃহস্থের দৈনন্দিন কর্তব্যসমূহ, শূদ্রের কর্তব্য ও বিশেষ সুবিধাবলি, তীর্থ, শবদাহ ও শ্রাদ্ধ এবং এ ধরনের অন্যান্য অনুষ্ঠান।[৬৮] বাংলার ও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বহু প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সংহিতা রচয়িতার এবং পুরাণ, ভাগবতগীতা, রামায়ণ এবং মহাভারতের উদ্ধৃতিতে স্মৃতিতত্ত্ব ভরপুর।[৬৯] স্মৃতিতত্ত্বের উপর এসব গ্রন্থের প্রভাবের অতিমূল্যায়ন করা যায় না। রঘুনন্দন সম্ভবত গীতার প্রভাবে ধর্মশাস্ত্রে ভক্তিমূলক উপাদান উপস্থাপন করেছিলেন এবং তিনি তাঁর রচনায় বহুবার গীতা থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন।[৭০] একই উৎস অনুসরণ করে তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, মানুষ পার্থিব বস্তুর আসক্তি থেকে নিজেকে মুক্ত করে এবং ঈশ্বরের কাছে নিজের কর্মযোগ সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করে মুক্তিলাভ করতে পারে।[৭১] উত্তরাধিকার, বণ্টন, আইনসম্পর্কিত কার্যপ্রণালী এবং ধর্মীয় কর্তব্য পালনের উপযুক্ত সময়াদি সম্পর্কিত প্রশ্নের আলোচনাকালে তিনি প্রায়ই

জীমূতবাহন, ভবদেব ভট্ট, শূলপাণি এবং অন্যান্য বাঙালি স্মৃতিরচয়িতাদের[৭২] উদ্ধৃতি দিয়েছেন এবং তাদের প্রায় সকলকেই প্রামাণিক রূপে গ্রহণ করেছেন। রঘুনন্দনের সমন্বিত রচনাবলি ক্রমশ শ্রীনাথ, রামভদ্র এবং গোবিন্দানন্দ সহ সমকালীন নিবন্ধকারদের রচনাবলি স্থান দখল করে নেয়।[৭৩] বস্তুত নবদ্বীপ স্মৃতি চিন্তাধারার রঘুনন্দন ছিলেন প্রাণ। তিনি মনে হয় ধর্মশাস্ত্রের চূড়ান্ত রূপদান করেছিলেন। কারণ দেখা যায় যে এখনও বাংলার গোঁড়া হিন্দুদের সামাজিক ধর্মীয় আচরণ তাঁর নির্দেশাবলি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। স্মৃতির ক্ষেত্রে তাঁর বহু দীপ্তিমান পূর্বসূরি থাকলেও তাঁর কোনো যোগ্য উত্তরসূরি বাংলায় নেই। ব্রাহ্মণ্য মানস তখন চৈতন্যের জীবনচরিত রচনা ও বৈষ্ণবদর্শন আলোচনার দিকে সরে আসে। উপরন্তু, বাংলা ভাষার উদ্ভব মনে হয় সংস্কৃতের মাধ্যমে অনুশীলিত সব চিরায়তবিদ্যাকে আড়াল করে রাখে।

আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে, রঘুনন্দন হিন্দু সামাজিক-ধর্মীয় আইনগুলিকে সংহিতাকারে লিপিবদ্ধ করতে চেষ্টা করেছিলেন এবং তিনি প্রাচীন স্মৃতিসমূহ এবং বহু বাঙালি সংহিতা-রচয়িতার ওপর নির্ভর করেছেন। তিনি শুধু মনুস্মৃতি, যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি, নারদস্মৃতি, পরাশর স্মৃতি, অগস্ত্যসংহিতা এবং পুরাণের মতো গ্রন্থগুলি থেকে উদ্ধৃতিই দেন নি,[৭৪] এসব প্রামাণিক গ্রন্থের মতামতকে তিনি সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য বলেও গ্রহণ করেছেন। এ থেকে আমাদের ধারণা জন্মে যে বাঙালিদের সামাজিক-ধর্মীয় আচার ও আইনগুলি হাজার হাজার বছর ধরে অপরিবর্তিত ছিল। কিন্তু এটা একটা অযৌক্তিক উক্তি। প্রকৃতপক্ষে হিন্দুসমাজে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটছিল, আগেই যেমন লক্ষ্য করা হয়েছে, নিম্নশ্রেণীর সামাজিক-ধর্মীয় ধারণা ও আচারাদি ক্রমান্বয়ে ব্রাহ্মণ্য সমাজে প্রবেশ করছিল এবং মনসা, চণ্ডী এবং ধর্মের মতো অব্রাহ্মণ্য দেব-দেবীরা হিন্দু দেব-দেবীর মধ্যে যথাযোগ্য স্থান পাওয়ার চেষ্টা করছিল। উপরন্তু, বাংলার সমাজ জীবনে ইসলামের প্রভাবও পড়েছিল। বিখ্যাত সংহিতা রচয়িতার রচনাবলি থেকে দেখা যায় যে ইতোমধ্যে ঘটে যাওয়া পরিবর্তনগুলিকে স্বীকৃতি না দিয়েই তিনি সামাজিক-ধর্মীয় বিধিগুলি প্রথাগতভাবে রচনা করার চেষ্টা করেছিলেন। এটা নিঃসন্দেহে জীবনের বাস্তবতার প্রতি উদাসীনতা। যে সব সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন বাংলার জন-জীবনের উপর সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলেছিল সেগুলি সম্পর্কে রঘুনন্দন সচেতন ছিলেন না এমন চিন্তা করার কোনো কারণ আমাদের নেই। এখানে একটি ব্যাখ্যা যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয়। ইসলামি ও স্থানীয় ধারণাগুলি ব্রাহ্মণ্যবাদের কাঠামোর ওপর আঘাত হানতে উদ্যত এটা দেখে ব্রাহ্মণ্যশ্রেণীর জনগণের ধর্মীয় ন্যায়পরতা এবং সামাজিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে স্মার্ত পণ্ডিত মনে হয় প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য সামাজিক-আইন সম্বন্ধীয় পদ্ধতিকে কঠিন করেছিলেন। এতে মনে হয় যে সমাজে সক্রিয় বিভিন্ন পরস্পরবিরোধী শক্তিগুলির যে একটি উদার সমন্বয় সাধন করা প্রয়োজন এবং তদানুসারে প্রাচীন রক্ষণশীল শাস্ত্রের সংস্কার করা প্রয়োজন এ সত্যটি উপলব্ধি করতে তিনি ব্যর্থ হয়েছিলেন। রঘুনন্দন সম্পর্কে পক্ষপাতহীনভাবে এটা নিশ্চয়ই বলা উচিত যে সে কালের সুস্পষ্ট রক্ষণশীলতার দিনে, যখন সামাজিক-ধর্মীয় আচরণে কোনো পরিবর্তনের অনুমতি দেওয়া হতো না, তখন

কোনো উদার পথ তাকে আকৃষ্ট করতে পারে নি। তিনি প্রাচীন শাস্ত্রের অবশ্য পালনীয় নির্দেশাবলি অমান্যও করতে পারতেন না। রঘনন্দনের রচনাবলি ব্রাহ্মণ্য শ্রেণী ও নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে বর্তমান পার্থক্য কমাতে সফল হন নি। বিখ্যাত সংহিতা-রচয়িতা সামাজিক-ধর্মীয় নিয়মের ক্ষেত্রে যে সব পরিবর্তন প্রবর্তন করেছিলেন সেগুলির ব্যাপ্তি ছিল যথেষ্ট সীমিত।

৩ (খ)

জ্ঞানের এক অত্যন্ত অনুমানমূলক শাখা, ন্যায়ে বাঙালি পণ্ডিতগণ শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিলেন এবং ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের নৈয়ায়িকদের ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। নবদ্বীপের নব্যন্যায় চিন্তাধারা অবিচ্ছেদ্যভাবে রঘুনাথ তার্কিক শিরোমনির নামের সঙ্গে জড়িত, যাকে এর প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা রূপে গণ্য করা যেতে পারে। ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধে তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন এবং বেশকিছু গ্রন্থ রচনা করেছিলেন যার মধ্যে তত্ত্বচিন্তামণি-দীধিতি এবং পদার্থ খণ্ডনম বেশ বিখ্যাত। প্রথমোক্তটি হচ্ছে গঙ্গেশের রচিত তত্ত্বচিন্তামণির সমালোচনামূলক টীকা এবং নঞর্থক অব্যয়সহ ন্যায়ের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে ধারাবাহিক সমালোচনা। শেষোক্তটি বৈশেষিক পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত শ্রেণীসমূহের অত্যন্ত বিতর্কিত সমালোচনা। রঘুনাথের অন্যান্য রচনাবলির অধিকাংশই হচ্ছে তাঁর মৈথিলী পূর্বসূরিদের রচনাবলির ব্যাখ্যা বা টীকা। এটা অত্যন্ত সম্ভব যে তাঁর জীবদ্দশায় রঘুনাথের রচনাবলি যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করেছিল কারণ, জানকীনাথ ভট্টাচার্য চূড়ামণি কণাদ তর্কবাগীশ এবং হরিদাস ন্যায়ালঙ্কারসহ তাঁর সমকালীনদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁর রচনাবলির উল্লেখ ও সমালোচনা করেছিলেন বলে জানা যায়[৭৫] ষোড়শ শতকের শুরুতে রঘুনাথ প্রতিষ্ঠিত নব্যন্যায় চিন্তাধারা অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতীয় বুদ্ধিবৃত্তিক জীবনকে প্রভাবিত করতে থাকে। রঘুনাথের রচনাবলির বহু টীকাকারের মধ্যে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ, মথুরানাথ তর্কবাগীশ, জগদীশ তর্কালঙ্গার এবং গদাধর ভট্টাচার্য চক্রবর্তী[৭৬] ছিলেন বিখ্যাত নৈয়ায়িক যারা নব্যন্যায় চিন্তাধারায় মূল্যবান অবদান রেখেছিলেন।

এটা যথেষ্ট নিশ্চিত যে দশম শতকে গঙ্গেশ প্রতিষ্ঠিত মিথিলার নব্যন্যায় চিন্তাধারা বর্ধমান ও জয়দেব সহ তাঁর কিছু বিখ্যাত উত্তরসূরি যার আরও শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়েছিলেন। সেটা মধ্যযুগের বাংলায় ন্যায় অধ্যয়নকে দারুণভাবে উদ্দীপিত করেছিল। বাংলার নব্যন্যায় চিন্তাধারার প্রায় সব বিখ্যাত পণ্ডিতই উপরিল্লিখিত মৈথিলী পণ্ডিতদের[৭৭] কারও কারও গ্রন্থের টীকা লিখেছিলেন বলে জানা যায়, তাঁরা যে মৈথিলী নৈয়ায়িকদের মতবাদের প্রবল সমালোচনা করেছিলেন তা থেকে এ ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে দু'টি চিন্তাধারার মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিদ্যমান ছিল। শেষপর্যন্ত নবদ্বীপ-চিন্তাধারা মিথিলার চিন্তাধারাকে ম্লান করে দিয়েছিল বলে মনে হয় এবং শেষোক্তটি ষোড়শ শতকের শেষদিকে তার প্রাধান্য হারিয়ে ফেলে।

ইলিয়াস শাহী ও হোসেন শাহী আমলে বাংলায় শান্তি ফিরে এলে যুক্তিবিদ্যা অধ্যয়নে আগ্রহী বাঙালি ছাত্রদের আবশ্যকীয়ভাবেই নবদ্বীপে গিয়ে জড়ো হতে হতো, কারণ সেটাই

ছিল তখন যুক্তিবিদ্যা অধ্যয়নের একমাত্র প্রসিদ্ধ কেন্দ্র। বহুদিন ধরে মুসলমানদের আক্রমণ থেকে মুক্ত থাকায় মিথিলার শিক্ষাকেন্দ্রগুলি টিকে ছিল এবং কামেশ্বরের প্রতিষ্ঠিত রাজবংশের শাসকদের (১৩১৫-১৫১৫) পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিল। আবার চতুর্দশ শতকের বহু আগেই এখানে নব্যন্যায় চিন্তাধারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কাজেই অনুপ্রেরণার জন্য বাংলাকে মিথিলার ওপর নির্ভর করতে হতো। পুরাতন ন্যায় এবং নব্যন্যায় নামে পরিচিত বৈশেষিক পদ্ধতির সংযোজন-প্রক্রিয়া মিথিলাতে শুরু হয়ে বাংলায় শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছে। এ কারণেই বাংলার সাহিত্য ও যুক্তিবিদ্যায় মিথিলার প্রভাব দেখা যায়।

পর্যালোচনাধীন সময়কালে নবদ্বীপে নিয়মিতভাবে ভারতীয় দর্শনের ছয়টি পদ্ধতি অনুশীলন করা হতো বৃন্দাবনদাসের কাছ থেকে তা আমরা জানতে পাই।[৭৮] সাংখ্য, যোগ, মীমাংসা এবং পাতঞ্জল পদ্ধতিগুলি একেবারে উপেক্ষিত না হলেও এর কোনোটি সম্পর্কেই কোনো গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচিত হয় নি বলেই মনে হয়। সম্ভবত ষোড়শ শতকে জীবিত মধুসূদন সরস্বতী গ্রন্থ রচনা করেছিলেন অদ্বৈতবাদ সম্পর্কে। তাঁর গ্রন্থাবলির মধ্যে অদ্বৈতসিদ্ধি যথেষ্ট প্রসিদ্ধ। এতে তিনি অদ্বৈতমতবাদের অকাট্যতা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর অন্যান্য রচনবলিতে[৭৯] তিনি বেদান্তদর্শন সম্পর্কে আলোচনা এবং ভাগবতগীতা ও শংকরাচার্যের গ্রন্থাবলির ব্যাখ্যা এবং ভক্তিকে মুক্তিলাভের পথরূপে গণ্য করেন।

৩ (গ)

শ্রীচৈতন্যের আবেগপ্রবণ বৈষ্ণববাদ এবং রাধাকৃষ্ণপূজা এবং এর গীতিধর্ম সংস্কৃত সাহিত্যকে বহুলাংশে সমৃদ্ধ করেছিল। আলোচ্য সময়কালে বাংলাভাষায় চৈতন্যের কোনো জীবনীগ্রন্থ রচিত না হলেও সংস্কৃতে এর শুরু হয় এবং কথিত আছে যে এসব জীবনীকার চৈতন্যের ঘনিষ্ঠ সহচর ছিলেন। বিষয়ীকেন্দ্রিক উপাদানমুক্ত হওয়া এগুলির পক্ষে সম্ভব ছিল না। তবুও এগুলি আমাদের শ্রীচৈতন্যের জীবনী ও দর্শন সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য দান করে। ঐতিহাসিক নির্ভুলতা ও প্রামাণিকতা, যা প্রায়ই লেখকদের কাব্যিক কল্পনা ও ভক্তিমূলক মনস্তত্ত্বের কারণে শক্তিহীন হয়ে পড়েছে-এসব গ্রন্থের মূল বৈশিষ্ট্য নয়। তবুও বিকাশমান ভক্তিমূলক পূজাপদ্ধতি হিসেবে বৈষ্ণববাদ ও জনসাধারণের জীবনে এর প্রভাব সম্পর্কে এগুলি আমাদের একটা স্পষ্ট ধারণা দান করে।

মুরারীগুপ্ত রচিত চৈতন্য-চরিতামৃত সম্ভবত সংস্কৃতে রচিত সর্বপ্রথম চৈতন্যের জীবনী। কাব্য-রীতিতে রচিত এ গ্রন্থে চারটি প্রক্রম বা অংশ এবং আটাত্তরটি সর্গ রয়েছে এবং জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত চৈতন্যের জীবনের প্রায় সকল তথ্যই এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। গম্ভীর-লীলা সহ চৈতন্যের জীবনের শেষভাগ ও ১৫৩৩ সালে তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলির বিবরণ রয়েছে শেষ স্তবকটিতে যদিও এই স্তবকে ১৪৩৫ শকাব্দ/১৫১৩-১৪ সালকে এর রচনাকাল রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। কাজেই যুক্তিসঙ্গতভাবেই অনুমান করা হয়েছে যে চৈতন্যের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই এটি রচিত

হয়েছিল। কিন্তু মুদ্রিত গ্রন্থের শেষে রচনাকাল হিসেবে প্রদত্ত ১৪৩৫ শকাব্দ/১৫১৩-১৪ সাল সন্তোষজনকভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না।[৮০] গ্রন্থটি এ কারণে গুরুত্বপূর্ণ যে কবিকর্ণপুর, লোচনদাস এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজসহ পরবর্তী জীবনীকাররা তথ্যের জন্য এ গ্রন্থ দেখেছিলেন এবং এর অংশবিশেষ ব্যবহার করেছিলেন।[৮১] কাজেই এটা যথেষ্ট নিশ্চিত যে মুরারীগুপ্তের পরবর্তী চৈতন্যের জীবনীকাররা এ কাব্যকে একটি মূল্যবান তথ্য উৎস হিসেবে গণ্য করেছিলেন। বিভিন্ন ছন্দে পরিপূর্ণ এ গ্রন্থটির যথেষ্ট শৈল্পিক মূল্য ছিল বলে মনে হয় না।

কথিত আছে যে দামোদর স্বরূপ একটি কড়চা বা জীবনীগ্রন্থ[৮২] লিখেছিলেন যা মনে হয় অনুদ্ধরণীয়ভাবে হারিয়ে গেছে। এটা থাকলে আমরা দামোদর কর্তৃক প্রবর্তিত রূপে কথিত পঞ্চ-তত্ত্বের[৮৩] মতবাদ সম্পর্কে সম্ভবত কিছু ধারণা লাভ করতে পারতাম। উপরন্তু , দামোদর শ্রীচৈতন্যের প্রত্যক্ষ সহচর হওয়ায় এ ধরনের একটি জীবনীগ্রন্থের মূল্য সুস্পষ্ট।

আমাদের আলোচ্যকালের অব্যবহিত পরবর্তী বছরগুলিতে রচিত চৈতন্যের জীবনীমূলক অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে কবিকর্ণপুর রূপেও পরিচিত পরমানন্দ সেনের চৈতন্য-চরিতামৃত এবং চৈতন্য-চন্দ্রোদয় বেশ গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমোক্তটি ২৪ সর্গের একটি মহাকাব্য। এটি রচিত হয়েছিল ১৪৬৪ শকাব্দ/ ১৫৪২-৪৩ সালে[৮৪] এবং চৈতন্যের জীবনের ৭৪ বছরের ঘটনাবলি হচ্ছে এর বিষয়বস্তু। চৈতন্যের প্রথম জীবন সম্পর্কে লেখার সময় গ্রন্থকার তাঁর পূর্বসূরি মুরারীগুপ্তের যথাযথ অনুসরণ করেছেন। কিন্তু দ্বাদশ থেকে বিংশতিতম পর্যন্ত সর্গগুলি মুরারীর গ্রন্থের সাহায্য ছাড়া রচিত বলে মনে হয়। কাজেই মনে হয় যে একাদশ সর্গের পর কবিকর্ণপুর অন্যান্য উৎস এবং সম্ভবত তাঁর সমসাময়িকদের কাছ থেকে সংগৃহীত তথ্যের ওপর নির্ভর করেছিলেন। এ গ্রন্থে কবির আলঙ্কারিক দক্ষতা, বহুসংখ্যক ছন্দের উপর তাঁর নিয়ন্ত্রণ এবং দৃশ্য ও ঘটনাবলি সুন্দর কাব্যিক বর্ণনার ক্ষমতা দেখতে পাওয়া গেলেও এর কাব্যিক গুণ সামান্য। কবিকর্ণপুরের চৈতন্য-চন্দ্রোদয়[৮৫] দশ অঙ্কের একটি নাটক–চৈতন্যের জীবনী এর বিষয়বস্তু। এটাকে চৈতন্য-চরিতামৃতের সংক্ষিপ্ত, নাটকে রূপান্তরিত সংস্করণ বলে মনে হয়। চৈতন্য-চারিতামৃত হচ্ছে এই লেখকেরই রচিত কাব্য। নাটকটিও এই কাব্যের মধ্যে লক্ষণীয় পার্থক্য হচ্ছে এই যে নাটকে চৈতন্যের শেষভাগ বিস্তৃতভাবে চিত্রিত হয়েছে যা কাব্যে আলোচিত হয়েছে সংক্ষেপে এবং নাটকে দৃষ্ট পৌরাণিক ও রূপক উপাদানগুলি কাব্যে অর্থপূর্ণভাবে অনুপস্থিত।

এসব জীবন চরিত ছাড়া রাধা-কৃষ্ণ পূজাপদ্ধতিবিষয়ক কাব্য ও নাটক রচিত হয়েছিল। রূপগোস্বামী লিখেছিলেন *দান-কেলি কৌমুদী*, *ললিত-মাধব* এবং *বিদগ্ধমাধব* নামক নাটক। রাধাকৃষ্ণের যৌন-কামনা উদ্রেককারী *বৃন্দাবন-লীলা* হচ্ছে এগুলির সাধারণ বিষয়বস্তু। রূপ রচনা করেছিলেন *হংস-দূত* ও *উদ্ধবমনদেশ* এবং রুদ্রন্যায় বাচস্পতি রচনা করেছিলেন *ভ্রমর-দূত*। প্রেম-বার্তা প্রেরণ ছিল এগুলির মূলভাব। এগুলি কালিদাসের *মেঘ-দূতের* আদর্শরীতি অনুকরণ করলেও সেই বিখ্যাত কাব্যের সঙ্গে এগুলির কোনো

তুলনাই হতে পারে না। মনে হয় যে মেঘদূতের অনুকরণ করা বাংলার একটা ঐতিহ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল কারণ লক্ষণ সেনের দরবারে অবস্থানকারী ধোয়ী কালিদাসের দূত-কাব্যের আদর্শে তাঁর পবন-দূত রচনা করেছিলেন।[৮৬] আলোচ্য সময়কালের দূত-কাব্যগুলির বিষয়বস্তু ছিল রাধা-কৃষ্ণের লৌকিক-কাহিনী। রূপের পদ্যাবলী [৮৭] মধ্যযুগীয় ও প্রাচীন বেশকিছু কবির একটি কবিতা সংকলন। এ কবিতাগুলি কৃষ্ণ-লীলা বিষয়ক। শ্রীধর দাসের সদুক্তি-কর্ণমৃত [৮৮] হচ্ছে আর একটি সংকলন। এর রচনাকাল হচ্ছে ১২২৭ সম্বৎ/ ১২০৫ সাল। মনে হয় এটা রূপকে তার সংকলনের পরিকল্পনার ইঙ্গিত দিয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে রূপ সে সংকলন থেকে বেশকিছু কবিতা পদ্যাবলীতে পুনরায় অন্তর্ভুক্ত করেছেন। বৃন্দাবনের গোস্বামীদের ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয় রচনাবলি, গদ্য ও পদ্য উভয়েই রচিত বিভিন্ন চম্পু, কবিকর্ণপুরের কৃষ্ণাহ্নিক-কৌমুদী, কৃষ্ণদাস কবিরাজের গোবিন্দ-লীলামৃত, জীবের সংকল্প-কল্পদ্রুম ও মাধব-মহোৎসব ষোড়শ শতকের তৃতীয় ও চতুর্থভাগে রচিত হলেও এগুলিতে রাধা-কৃষ্ণ পূজাপদ্ধতির ক্রমবিবর্তন দেখা যায় যে, প্রক্রিয়া নিশ্চয়ই জয়দেবের কালে (যাঁর গীত-গোবিন্দের বিষয়বস্তু হচ্ছে রাধা-কৃষ্ণের প্রেম) বা এমন কি তারও আগেই শুরু হয়েছিল।

ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধে চৈতন্য পূজাপদ্ধতি কিভাবে সুস্পষ্ট রূপ ধারণ করেছিল মুরারীগুপ্ত ও কবিকর্ণপুরের রচনাবলি থেকে তা পরিষ্কারভাবে দেখা যায়। আমরা জানি যে বিষ্ণু-প্রিয়া পূজা করার জন্য চৈতন্যের মূর্তি তৈরি করেছিলেন।[৮৯] তাঁর মৃত্যুর আগেই তাঁকে কৃষ্ণের অবতার রূপে গণ্য করা হতো এবং তার অনুচররা প্রকাশ্যে তাঁর দেবত্ব স্বীকার করতেন।[৯০] বস্তুত মুরারীগুপ্ত ও কবিকর্ণপুর প্রায়ই চৈতন্যকে দ্বিবাহু, চতুর্বাহু এবং ষড়-বাহু বিশিষ্ট কৃষ্ণরূপে চিত্রিত করেছেন।[৯১] এদের রচনাবলি থেকে ভক্তি যে চৈতন্য-পূজা পদ্ধতির প্রধান বিষয় ছিল এবং প্রভু ও তাঁর অনুসারীরা যে অদ্বৈতবাদের ঘোর বিরোধী ছিলেন এ ধারণা আমরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারি।[৯২] মুরারীগুপ্ত, কবিকর্ণপুর এবং বৃন্দাবনদাসের লেখা জীবনচরিতগুলি থেকে আমরা দেখতে পাই যে শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণববাদ ছিল সহজ, ভক্তিমূলক ধর্ম যাতে মতবাদ সম্বন্ধীয় কোনো জটিলতা ছিল না। বৃন্দাবনের গোস্বামীদের পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনাবলিতে লক্ষিত বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্ব ও রসশাস্ত্রের আদর্শরীতি মনে হয় যে চৈতন্যের মৃত্যুর অন্তত পক্ষে কয়েক দশক পরে তাঁরা রচনা করেছিলেন। প্রগাঢ় আবেগে পরিপৃক্ত ভক্তির মাধ্যমে রাধা-কৃষ্ণের পূজাপদ্ধতির বাস্তবায়ন তাদের লক্ষ্য ছিল বলে মনে হয়। মুরারীগুপ্ত, কবিকর্ণপুর এবং বৃন্দাবনদাসের রচিত পূর্ববর্তী জীবন চরিতগুলিতে প্রোথিত চৈতন্য পূজাপদ্ধতি বৃন্দাবন-চিন্তাধারার ব্যাখ্যায় বৈষ্ণবদর্শনের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য ছিল না। এ চিন্তাধারা বৃন্দাবনলীলাকে মহিমান্বিত করে এবং এর গূঢ় ব্যাখ্যা দান করে রাধাকৃষ্ণের পূজাপদ্ধতির উপর অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছিলে [৯৩] বৃন্দাবন গোস্বামীদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁদের নমক্রিয়ায়[৯৪] চৈতন্যের দেবত্ব স্বীকার করে নিয়েছিলেন যদিও এটাকে ধর্মতত্ত্বীয় বিষয় হিসেবে গণ্য করা হয় না।

আলোচ্য সময়কালে সংস্কৃতে রচিত গ্রন্থাবলির তালিকা[৯৫] বেশ হৃদয়গ্রাহী যদিও এগুলির মান কোনো বিশেষ কৃতিত্বের দাবি করতে পারে না।

এসব কবিদের অধিকাংশই বড় পণ্ডিত হওয়ায় তাঁদের লেখায় তাঁদের পাণ্ডিত্যের ছাপ এবং শ্রমসাধ্য সৃজনশীলতা দেখতে পাওয়া যায়। কাব্য ও নাটকগুলিতে যে কমনীয়তা ও সৌন্দর্য দেখা যায় তা নিঃসন্দেহে সংশ্লিষ্ট কবিদের শৈল্পিক দক্ষতার ফসল। তাঁরা যা সৃষ্টি করেছিলেন তা মৌলিক বা অভিনব কোনোটাই নয়। এর একটা বড় কারণ এই যে চৈতন্যের জীবনী ও কৃষ্ণ-লীলাকে তাঁরা তাঁদের বিষয়বস্তু হিসেবে নির্বাচিত করেছিলেন যাতে মৌলিকত্ব বা অভিনবত্বের কোনো সুযোগ ছিল না। বৃহদাকার স্মৃতি রচনাবলি এবং ন্যায়গ্রন্থগুলির টীকা ও উপ-টীকাগুলির সাহিত্যিক কোনো আকর্ষণ নেই, এগুলি যাঁরা লিখেছিলেন। তাঁদের কোনো সাহিত্যিক উদ্দেশ্যও ছিল না। সমকালীন হিন্দুসমাজকে সামাজিক ও ধর্মীয় বিধান দান করাই মনে হয় ছিল স্মৃতি রচনাবলির লক্ষ্য। সর্বসাধারণ্যের কাছে দর্শনের অত্যন্ত অনুমানমূলক ও জটিল শাখা নব্য-ন্যায়ের কোনো আকর্ষণ ছিল বলে মনে হয় না। এটা সম্ভবত ছিল ধারাবাহিকভাবে সম্পূর্ণ পণ্ডিতসুলভ বুদ্ধিবৃত্তিক অনুশীলনের ফল। এ আমলের নৈয়ায়িক ও সংহিতারচয়িতাদের তালিকা থেকে দেখা যায় যে নব্য-ন্যায় ও স্মৃতিচর্চায় ব্রাহ্মণদের ছিল একচেটিয়া অধিকার। সৃজনশীল সাহিত্যের ক্ষেত্রে আমরা মুরারীগুপ্ত, কবিকর্ণপুর এবং রঘুনাথ দাসের মতো [৯৬] কিছু অব্রাহ্মণকে দেখতে পাই যারা উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের জীবনধারায় উদার চৈতন্যবাদের প্রচণ্ড প্রভাবে ধর্মতত্ত্ববিদ ও সাহিত্যিকদের জগতে স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন বলে মনে হয়।

এসব অব্রাহ্মণ মনে হয় ব্রাহ্মণদের দ্বারা প্রবলভাবে প্রভাবিত সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁদের কনিষ্ঠ অংশীদার রূপে কাজ করেছিলেন। কাজেই এ আমলের সাহিত্যের বৃহৎ অংশই এসেছিল ব্রাহ্মণদের কাছ থেকে। স্মৃতি ও নব্য-ন্যায় সম্পর্কিত গ্রন্থাবলিতে যে সংস্কৃতি রয়েছে তা অপরিহার্যভাবে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি। কাব্য ও নাটকসহ এগুলি আমাদের বৃহত্তর সমাজের বিভিন্ন দিক হৃদয়ঙ্গম করায়। কিন্তু তাদের আবেদন নিশ্চিতভাবেই ছিল সীমিত। এ আমলের অপরিহার্যরূপে ব্রাহ্মণ্য প্রকৃতির সংস্কৃত সাহিত্য সাধারণ মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল বলে মনে হয় না। তাদের কাছে এটা বোধগম্যও ছিল না। উপরন্তু সে আমলের সাহিত্য কাব্যনীতি, ধর্মতত্ত্ব, রসশাস্ত্র ও সঙ্গীতজ্ঞানে অতিশয় ভারাক্রান্ত মার্জিত মানসের সৃষ্টি হওয়ায় তা সাধারণ মানুষের বোধগম্য ছিল না। কৃত্রিম কমনীয়তা, শৈল্পিক অলঙ্করণ এবং যথেষ্ট প্রায়োগিক দক্ষতা এ আমলের সংস্কৃত কাব্যকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে যা এর উপরে নাগরিক সভ্যতার প্রভাবের ইঙ্গিত বহন করে। দু'টি কাব্য ও একটি নাটক ছাড়া গোটা সংস্কৃত সাহিত্য যৌন-কামনা উদ্রেককারী ভাবানুভূতি ও প্রণয়ঘটিত বর্ণনায় ভরপুর।[৯৭] বৃন্দাবন-লীলা যাদের বিষয়বস্তু, সে সব কবি রাধাকৃষ্ণের যৌনমিলন, তাঁদের যৌনকামনা উদ্রেককারী অঙ্গভঙ্গি, তাদের প্রণয়াসক্ত আচরণ এবং প্রগাঢ় আবেগপূর্ণ সম্পর্কের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন।[৯৮] মনে হয় বৃন্দাবন-লীলা আলোচনাকালে তাঁরা অচেতনভাবে দরবারের বা উচ্চবিত্ত সমাজের প্রণয়াকুল জীবনের চিত্র পুনরাঙ্কন করেছেন, যা তাঁদের মনে ছিল। এটা যথেষ্ট সম্ভাব্য মনে হয় এ জন্য যে, রূপ, সনাতন এবং জীবের মতো এ আমলের কিছু লেখক অন্ততপক্ষে তাঁদের প্রথম জীবনে দরবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। অবশ্য রাধাকৃষ্ণের যৌনকামনা

উদ্রেককারী বিষয় নিয়ে লেখা জয়দেব এবং চণ্ডীদাসের রচনাবলিও মনে হয় তাঁদের রচনাকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল। এ দু'জন কবির রচনাবলিতেও সেন ও সেন-পরবর্তী আমলের উচ্চবিত্ত শ্রেণীর অবস্থার প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায় বলে মনে হয়। নাগরিক সংস্কৃতি, অপরিবর্তনীয় কৌশল এবং ধর্মতত্ত্বীয় পাণ্ডিত্য সংবলিত বৈষ্ণব সংস্কৃত কাব্য এবং ন্যায় ও স্মৃতি সম্পর্কিত রচনাবলির নীরস বুদ্ধিবৃত্তিকতা সাধারণ মানুষের মনকে আকর্ষণ করতে পারে নি। কাজেই সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চা উচ্চশিক্ষিত, উচ্চশ্রেণীর লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। এটা কখনই জনগোষ্ঠীর সাধারণ শ্রেণীর সংস্কৃতির মাধ্যম হতে পারে নি। সাধারণ মানুষ এখন তাদের ধারণা ও আবেগ প্রকাশ করার জন্য দেশীয় ভাষাকে গ্রহণ করে। এভাবে গ্রামীণ সংস্কৃতির ওপর নির্ভরশীল বাংলা সাহিত্য প্রাণশক্তি ও সতেজতা দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয় যা নিঃশেষিত অত্যন্ত রীতিগত, নাগরিক সংস্কৃত সাহিত্যে লক্ষ্য করা যায় না।

আলোচ্য সময়কালে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রকৃতি ও পরিধি যাই হয়ে থাকনা কেন উপরে পরিলক্ষিত চিরায়ত সাহিত্য ও সংস্কৃতির পুনর্জাগরণ মধ্যযুগীয় বাংলার ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। জীবন চরিত এবং কাব্য, নাটক ও কৃষ্ণ পূজাপদ্ধতি সম্পর্কিত চম্পুগুলিসহ বৈষ্ণব রচনাবলির সৃষ্টির জন্য চৈতন্য আন্দোলন প্রত্যক্ষভাবে দায়ী ছিল। নব্যন্যায় ও স্মৃতি চিন্তাধারার উদ্ভব ও বিকাশ মনে হয় ঘটেছিল কিছু সামাজিক-রাজনৈতিক শক্তির সক্রিয়তার ফলে। মুসলমান শাসনের স্থায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হওয়ায় রাজনৈতিক ক্ষমতাচ্যুত ব্রাহ্মণরা মনে হয় অপ্রচলিত, চিরায়ত সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে জ্ঞানের অনুমানমূলক ও অসংলগ্ন শাখাগুলিকে পুরুজ্জীবিত করে তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করেছিল। 'স্মৃতি ও ন্যায়ে'র মতো বিষয়গুলির অনুশীলন এভাবে ব্রাহ্মণদের পরাজিত মনোবৃত্তির ইঙ্গিত বহন করে। প্রশাসনিক ব্যবস্থার দৃঢ়ীকরণ ও স্থিতিশীলকরণ আলোচ্য সময়কালের বৈশিষ্ট্য হওয়ায় শাসকরা নিশ্চয়ই জনসাধারণকে একটি আইন-সংহিতা দিতে চেষ্টা করেছিলেন। ব্রাহ্মণরা মনে হয় আশঙ্কা করেছিলেন যে মূলত ইসলামি হতে পারে এমন একটি আইনসংহিতার সম্ভাব্য প্রয়োগের ফলে তাদের সমাজের মৌলিক শুদ্ধতা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। চৈতন্যবাদ ও শক্তিতান্ত্রিক নিম্নশ্রেণীর ধারণাগুলির উচ্চব্রাহ্মণশ্রেণীতে প্রবাহিত হওয়ার উদ্দেশ্যও ছিল সম্ভবত তাদেরকে স্মৃতি রচনার কাজে প্রণোদিত করা। একই ধরনের প্রক্রিয়া সম্ভবত সেন আমলেও সক্রিয় ছিল। বৌদ্ধধর্মের ধ্বংসকারী শক্তি তখন যেন হিন্দুসমাজকে প্রবলভাবে আলোড়িত করতে না পারে সে জন্য অনুষ্ঠানাদি উপলক্ষে পালনীয় শুদ্ধতার বিধিগুলি কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে বহু ধর্মশাস্ত্র রচিত হতে দেখা গিয়েছিল। বল্লাল সেন কর্তৃক রচিত বলে কথিত দানসাগর সহ সে আমলের অধিকাংশ স্মৃতি গ্রন্থেই বৌদ্ধদের প্রতি প্রকাশ্য বৈরিতা দেখা যায়।[৯৯] আলোচ্য আমলে সমাজে প্রয়োগের উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণরা তাদের নিজস্ব ধর্মীয়-সামাজিক রীতি সম্পর্কে আইন-সংহিতা রচনা করে এ পরিস্থিতিতে নিজেদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলেন বলে মনে হয়। রঘুনন্দনের রচনাবলি সম্ভবত এ উদ্যোগের একটি উদাহরণ। আবার, স্মৃতিচর্চার জন্য ন্যায়ের মৌলিক জ্ঞান ছিল আবশ্যকীয়, কারণ নিয়ন্ত্রিত, স্বচ্ছচিন্তাধারা নিশ্চয়ই ছিল

স্মৃতিচর্চার জন্য পূর্বাবশ্যক। সংহিতা রচয়িতাদের কেউ কেউ কেন ন্যায় শাস্ত্রেও পণ্ডিত ছিলেন এ থেকে তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।[১০০] রঘুনন্দনের ধর্মশাস্ত্রের পথ যুক্তির পূর্বমীমাংসা পদ্ধতি দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। ফলে মনে হয় যে স্মৃতি ও ন্যায় ছিল ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত বিজ্ঞান। কিন্তু ব্রাহ্মণ্য পুনরুত্থানবাদ সামাজিক অগ্রগতি ও প্রসারের কোনো সুযোগ দান করে নি।

সংরক্ষণমূলক ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রতি মুসলমান শাসকশ্রেণীর সহানুভূতিশীল হওয়া সম্ভব ছিল না। আলোচ্য আমলের সংস্কৃত পণ্ডিত কবিরা হোসেন শাহী সুলতানদের কাছ থেকে কোনো পরোক্ষ পৃষ্ঠপোষকতা বা উৎসাহ পেয়েছিলেন কিনা তাও যথেষ্ট সন্দেহজনক। সুলতানরা ব্রাহ্মণ্য পুনরুত্থানের গুরুত্বের প্রতি দৃষ্টি দিতে ব্যর্থ হন নি। সংস্কৃত কবিদের শাসনকারী সুলতানদের নামোল্লেখের কোনো কারণ ছিল না, যা দেশী ভাষার কবিরা প্রায়ই করেছেন। শেষপর্যন্ত ক্ষয়িষ্ণু ব্রাহ্মণ্যবাদকে বিকাশমান স্থানীয় সংস্কৃতির জন্য জায়গা ছেড়ে দিতে হয় যা ইতোমধ্যেই বাংলার জীবনচর্যায় বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হচ্ছিল। বহুদিন ধরে ব্রাহ্মণ্যবাদ যে সামাজিক-সাংস্কৃতিক শূন্যতা সৃষ্টি করে আসছিল বাংলা ভাষা এবং সতেজ ও সজীব স্থানীয় সংস্কৃতি তা পূর্ণ করে। বাংলা ভাষা এ সংস্কৃতিকে অনুপ্রাণিত ও ধারণ করেছিল।

টীকা

১. এ পরিচ্ছেদের পরবর্তী এক অংশে আমরা এ বিষয়টি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি।

২. নিচে।

৩. ডি. সি. সেন : হিস্ট্রি অফ বেঙ্গলি ল্যাংগুয়েজ অ্যান্ড লিটারেচার পৃ. ২৩৭-৩৮।

৪. বিজয়গুপ্তের মনসা-মঙ্গল গৌড়ের সুলতান হোসেন শাহের রাজত্বকালে ১৪১৬ শকাব্দে ১৪৯৪-৯৫ সালে রচিত হয়েছিল। বসন্ত কুমার ভট্টাচার্য সম্পাদিত বিজয়গুপ্তের মনসা-মঙ্গলে উল্লিখিত তারিখ হচ্ছে ১৪০৭ শকাব্দ=১৪৮৫ সাল, ৩য় সংস্করণ, পৃ. ৪। স্পষ্টতই এটা ভুল কারণ কবি কর্তৃক প্রশংসিত হোসেন শাহ সে বছর বাংলার সুলতানই হন নি। স্ট্যাপলটন যে পাণ্ডুলিপি পেয়েছিলেন তাতে পাওয়া ১৪১৬ শকাব্দই সঠিক তারিখ বলে মনে হয়; ডি. সি. সেন : বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য, পৃ. ১১১-১২, টীকা। গ্রন্থের প্রারম্ভিক অংশে কবি উল্লেখ করেছেন যে তিনি বাস করতেন ফুল্লশ্রী গ্রামে যা ছিল পণ্ডিতব্যক্তিদের আবাসস্থল। এটা ছিল গৌড় রাজ্যের ফতেহাবাদ বিভাগের অন্তর্ভুক্ত বাঙ্গরোড়া তকসিমে। গৌড়রাজ্যে তখন রাজত্ব করছিলেন নৃপতিতিলক হোসেন শাহ; বঙ্গ-ভাষা ও সাহিত্য, পৃ. ১১১-১২ মনসা-মঙ্গল, পৃ. ৪। এ গ্রামটিকে বর্তমানকালের বরিশাল জেলার ফুল্লশ্রী গ্রাম হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। নিম্নলিখিত কারণে একজন আধুনিক পণ্ডিত এ গ্রন্থের প্রামাণিকতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন : (ক) হোসেন শাহ গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণের অব্যবহিত পরেই বিজয়গুপ্ত তাঁর কাব্য রচনা করেন। ফলে গৌড় থেকে বহুদূরে অবস্থিত বঙ্গ থেকে বিজয়গুপ্তের পক্ষে হোসেন শাহকে নৃপতি তিলক হিসেবে গণ্য করা সম্ভব ছিল না। (খ) দ্বিতীয়ত ,এ কবির মনসামঙ্গলের ভাষা তুলনামূলক ভাবে আধুনিক এবং এর

কথিত রচনাকাল ১৪১৬ শকাব্দ সংবলিত কোনো অকৃত্রিম পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় না। বিজ্ঞ পণ্ডিত উত্থাপিত প্রশ্নগুলি যথাযথ মনে হলেও এগুলির জবাব সহজে দেওয়া যায়। একটি শিলালিপি অনুসারে আমাদের কবিব জেলা বরিশাল ৮৭০ হিঃ/১৪৬৫-৬৬ সালের মতো পূর্ববর্তী সময়েও গৌড় রাজ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল। সে বছর একই জেলার মীরগঞ্জে জনৈক অজিয়াল খান একটি মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। জে. এ. এস. বি. ১৮৬০, পৃ. ৪০৭। কাজেই এটা অত্যন্ত পরিষ্কার যে, বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল রচনাকালে এ জেলা গৌড়ের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত ছিল। উপরন্তু, শামসউদ্দীন মোজাফফর শাহের মন্ত্রী হিসেবে হোসেন শাহ্ ইতোমধ্যেই বাংলার ইতিহাসের পাতায় রেখাপাত করেছিলেন। এ রকম রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে তাঁর সিংহাসনারোহণের সংবাদ গৌড় রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের সর্বত্রই রটে গিয়েছিল। এ গ্রন্থের ভাষাবিদ্যাগত দিক সম্পর্কে বলা যায় যে বিভিন্ন নকলনবিশের হাতে এবং বহু গায়কের গলায় এতে প্রচুর অংশ অন্যায়ভাবে সন্নিবেশিত হয়েছিল ও পরিবর্তন ঘটেছিল। এ গ্রন্থে ভাষাবিদ্যাগত যে অপমিশ্রণ দেখা যায় সেটা পূর্ব বাংলায় এর জনপ্রিয়তা ও বহুল প্রচার প্রকাশ করে। যে সব গায়করা গানের উদ্দেশ্যে এটা ব্যবহার করেছে তারা মনে হয় বিভিন্ন সময়ে এর ভাষা পরিবর্তন করেছে। কিন্তু শুধু বিজয় গুপ্তের মনসা-মঙ্গলের বিরুদ্ধেই এ অভিযোগ আমরা করব কেন ? চণ্ডীদাস, কৃত্তিবাস, এবং বৃন্দাবনদাসের বিখ্যাত রচনাবলিও এ সাধারণ দুর্ঘটনার ব্যতিক্রম নয়। এ গ্রন্থের ভাষায় যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটলেও এর বিষয়বস্তু রয়েছে অপরিবর্তিত, কারণ এতে যে কাহিনী রয়েছে তার মূল বিষয়গুলি বিপ্রদাসের মনসা-বিজয়ের কাহিনীর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বিজয় গুপ্তের গ্রন্থটি অকৃত্রিম এবং সর্প-পূজা সম্পর্কে প্রাচীনতম গ্রন্থগুলির মধ্যে এটি একটি। ১৪১৬ শকাব্দ, এ তারিখ কোনো পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া যায় না এ অভিযোগের কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই। ফুল্লশ্রীর পার্শ্ববর্তী গৈলা গ্রামে স্ট্যাপলটন একটি প্রাচীন পাণ্ডুলিপি পেয়েছিলেন। এতে নিম্নলিখিত পংক্তিগুলি রয়েছে: ঋতুশশী বেদশশী পরিমিত শক। সুলতান হোসেন শাহ নৃপতি তিলক, ডি.সি. সেন : বঙ্গভাষা ও সাহিত্য পৃ. ১১২ টীকা। অধুনা এ মত প্রকাশ করা হয়েছে যে বিজয়গুপ্ত জালালউদ্দীন ফতেহ্ শাহের রাজত্বকালে তার কাব্য রচনা করেছিলেন কারণ এ কাব্যের মুদ্রিত সংস্করণে ১৪০৬ শকাব্দ/ ১৪৮৪-৮৫ সাল, এ তারিখটি পাওয়া যায় এবং এটি সেই সুলতানের আমলের অন্তর্গত এবং এ সুলতানের কিছু মুদ্রায় 'হোসেন শাহী' এ শব্দগুচ্ছ রয়েছে, যা থেকে এ ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে তাঁর লোকপ্রিয় নাম ছিল হোসেন শাহ; এস. মুখোপাধ্যায় ; পূর্বোল্লিখিত পৃ. ১২৭-২৮। নিজস্ব এলাকা থেকে বহু দূরবর্তী অঞ্চলে সুলতান তাঁর লোকপ্রিয় নামে পরিচিত ছিলেন এটা বিশ্বাস করা কষ্টসাধ্য। গৌড়ের পার্শ্ববর্তী এলাকার লোকেরা সুলতানের লোকপ্রিয় নাম জানতে পারত। কিন্তু দূরবর্তী এলাকার লোকেদের এ নাম তেমন শোনার কথা নয়। এ ছাড়া ডি. সি. সেন বলছেন যে, এ গ্রন্থের প্রাচীন পাণ্ডুলিপির সবগুলির তারিখই ১৪১৬ শকাব্দ/১৪৯৪-৯৫ সাল : বঙ্গভাষা ও সাহিত্য পৃ. ১১১-১২। বিজয়গুপ্তের বাড়ির পাশে গৈলায় স্ট্যাপলটন কর্তৃক একই তারিখ সংবলিত পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার সাধারণের চেয়ে বেশি কৌতূহলোদ্দীপক। কবির গ্রামে বা তার পাশে যে পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে তাতে মূল তারিখ ও রচনা রক্ষিত থাকা সম্ভাব্য। গৈলা পাণ্ডুলিপির সংক্ষিপ্ত সমালোচনা ঢাকা রিভিউতে প্রকাশিত হয়েছিল, মার্চ, ১৯১৩, পৃ. ৪৫৭। কাজেই উপরে উদ্ধৃত দু'টি পংক্তি ইঙ্গিত করে যে বিবেচনাধীন কাব্যটি হোসেন শাহের রাজত্বকালে ১৪৯৪-৯৫ সালে রচিত হয়েছিল।

৫. কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে ১৯৫৩ সালে সুকুমার সেন মনসা-বিজয় সম্পাদনা করেছেন। এর রচনাকাল ও হোসেন শাহের রাজত্বকালের বিষয়ে দেখুন এ সংস্করণের পৃ. ৩।

৬. পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৫-৬

৭. পূর্বোল্লিখিত, আদি ১ম পৃ. ১১ এবং মধ্য, ত্রয়োদশ, পৃ. ২১০।

৮. উপরে পৃ. ২৩৫ এবং পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহ ; জে. বি. আর. এস. এ প্রকাশিত কুতবানের মৃগাবত এর উদ্ধৃতাংশ দেখুন, ১৯৫৫, ডিসেম্বর, ৪১, ৪র্থখণ্ড, পৃ. ৪৭৫।

৯. চণ্ডীর উপাসক কালকেতুকে দেবী প্রচুর পুরস্কার দিয়েছিলেন। চণ্ডীর কৃপায় তিনি যথেষ্ট ধনসম্পদ এবং গুজরাট রাজ্য লাভ করেছিলেন। কলিঙ্গের রাজার হাতে পরাজিত ও বন্দি হলেও চণ্ডীর মধ্যস্থতার ফলে কলিঙ্গরাজ তাঁকে মুক্তি দিয়েছিলেন। কালকেতুর কাহিনীর জন্য দেখুন কবিকঙ্কণ-চণ্ডী, ১ম খণ্ড, অন্যান্য মঙ্গলকাব্যেও এ কাহিনী দেখতে পাওয়া যায়। ধনপতি ছিলেন শিবের উপাসক কিন্তু তাঁর স্ত্রী খুল্লনা ছিলেন চণ্ডীর উপাসিকা। তাঁর স্বামী শ্রীলঙ্কা যাত্রার প্রাক্কালে চণ্ডীকে অপমান করেছিলেন, চণ্ডী তাঁকে যথেষ্ট কষ্ট ভোগ করান এবং শেষপর্যন্ত তাঁকে পূজা করতে বাধ্য করেন; প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড।

১০. সুকুমার সেন : মধ্য যুগের বাংলা ও বাঙ্গালী, পৃ. ৩৭।

১১. পূর্বোল্লিখিত, আদি, দশম পরিচ্ছেদ, পৃ. ৭২।

১২. শ্রীকরনন্দীর অশ্বমেধ পর্বকে কখন কখন কবীন্দ্র পরমেশ্বরের রচনা বলে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু এ বিবেচনার ভিত্তি খুবই দুর্বল। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত অশ্বমেধ পর্বের বহু ভণিতার মধ্যে শুধু দু'টি বা তিনটিতে কবীন্দ্রের নাম রয়েছে এবং বাকি সবগুলিই একইভাবে শ্রীকর নন্দীর উল্লেখ করেছে; পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৬৩, ১৩৯ এবং ১৪০। এ দু'তিনটি ভণিতাতেও পরাগল খানের নামের সঙ্গে কবীন্দ্রের নামোল্লেখ করা হয়েছে। মনে হয় এভাবে শ্রীকর নন্দী যুক্তিসঙ্গতভাবে তাঁর সমসাময়িক কবি। কবীন্দ্র ও তাঁর পৃষ্ঠপোষক পরাগল খানের নামোল্লেখ করেছেন, কারণ বাংলায় অশ্বমেধপর্ব অনুবাদ করে তিনি কবীন্দ্রের পদাঙ্কই অনুসরণ করেছিলেন। কেউ কেউ কবীন্দ্রকে শ্রীকরনন্দী রূপে ভাবতে পারেন; কিন্তু শ্রীকর নন্দীর পৃষ্ঠপোষক ছুটিখানকে কবীন্দ্রের পৃষ্ঠপোষক পরাগলের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা অসম্ভব। শ্রীকর নন্দী বারবার উল্লেখ করেছেন যে ছুটি খান ছিলেন তাঁর পৃষ্ঠপোষক, কিন্তু পরাগল খান সম্পর্কে তিনি একবারও এ কথা বলেন নি। কাজেই মনে হয় যে এটা যথেষ্ট সুপ্রতিষ্ঠিত যে কবীন্দ্র ও শ্রীকর নন্দী ছিলেন দু'জন ভিন্ন ব্যক্তি যারা হোসেন শাহের রাজত্বকালে দু'টি ভিন্ন কাব্য রচনা করেছিলেন তাঁরা একই ব্যক্তি হলে কবীন্দ্রের রচিত পরাগলী মহাভারতেও শ্রীকার নন্দীর নামোল্লেখ থাকত।

১৩. সৈয়দ সুলতান : শব-ই মিরাজ, এনামুল হক কর্তৃক উদ্ধৃত : মুসলিম বাঙ্গালা সাহিত্য, পৃ. ১৪৪।

১৪. সাহিত্যবিশারদ মহাভারতের বিষয় সম্পর্কিত রচিত একটি কবিতা উদ্ধৃত করেছেন। এতে পরাগল খানের ভণিতা রয়েছে ; বাংলা প্রাচীন পুথির বিবরণ, ১ম অংশ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০-১২।

১৫. এস. পি. পি. ১৩০৫ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৮।

১৬. এ বাংলা পদের জন্য দেখুন এস. পি. পি. ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২২-২৩। মূল পাঠ্যাংশের সামান্য ভিন্নতর পাঠের জন্য তুলনীয়, মুসলিম কবির পদ-সাহিত্য, আহমদ শরীফ কর্তৃক সম্পাদিত, পৃ. ৪৬, নং ২৪। একাধিক কারণে আমরা এ কবিতার সময়কাল ষোড়শ শতকের গোড়ার দিকে নির্ধারণের পক্ষপাতী, কবিতার শেষ পংক্তিতে নাসির শাহের নাম রয়েছে যিনি ও নাসির উদ্দীন নশরত শাহ (১৫১৯-৩২ খ্রি:) সন্দেহাতীতভাবে অভিন্ন ব্যক্তি। ছোট বিদ্যাপতিরূপেও পরিচিত কবি শেখর ছিলেন নসরত শাহের সমসাময়িক। তিনি সুকুমার সেন কর্তৃক উদ্ধৃত অন্য একটি পদে শেষোক্ত ব্যক্তিকে নাসির শাহ রূপে অভিহিত করেছেন : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৩। আবার শ্রীধর তার বিদ্যা-সুন্দরে যে বিভিন্ন ভণিতা দিয়েছেন তা থেকে দেখা যায় যে নসরত শাহ নাসির শাহ রূপেও পরিচিত ছিলেন যার পুত্র ছিলেন ফিরূজ শাহ। ফলে এটা স্পষ্ট যে নসরত শাহ প্রায়ই তাঁর জলুস নামে অভিহিত হতেন। কবি শেখর রচিত পদাবলীকে "বৈষ্ণবদের অনুরূপ স্বর্গীয় প্রেমের প্রতি নসরতের ঝোঁকের প্রতি ইঙ্গিত বলে মনে করা যেতে পারে।" হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫৮, টীকা। উপরে উদ্ধৃত পদ থেকেও একই রকম ধারণা পাওয়া যায়। এ কবিতার ভাষা, ছন্দ এবং ভাব ও যশোরাজ খান ও কবি শেখরের পদাবলীতে প্রাপ্ত ভাষা, ছন্দ ও ভাবের মধ্যে মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই। শেখ কবীর যে নসরতের সমসাময়িক ছিলেন সেটা মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত বলে মনে হয়। কবীরের ভণিতা সংবলিত অন্যএকটি ব্রজবুলি কবিতার বিষয়বস্তু হচ্ছে হোলি-লীলা বা শ্রীকৃষ্ণের বসন্ত উৎসব; জে. এম. ভট্টাচার্য কর্তৃক উদ্ধৃত: পূর্বোল্লিখিত, পদ নং ২৮। মনে হয় যে এই কবীর ও শেখ কবীর অভিন্ন ; কিন্তু এম. শহীদুল্লাহ শেখ কবীরকে কবি শেখররূপে শনাক্ত করেছেন; দেখুন বাংলা সাহিত্যের কথা, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৬ ও পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহ।

১৭. যে শ্লোকে তারিখটি পাওয়া যায় তা হচ্ছে : ব্রহ্মার আনন যত রাবণের করে, গুণিলে যত হয় সহস্র উপরে।

১৮. যেমন আউট >সাড়ে তিন ;অর্ধ-চতুর্থ > অদ্ধ্যোঠি আউট > আউট; তুলনীয় গোরক্ষ-বিজয়, পৃ. ২৪১; জন্ম > জন্ম, কম্ম > কর্ম, মিত্ত > মিত্র ইত্যাদি।

১৯. কবি যুবরাজ ফিরূজ ও তাঁর পিতা নসরত শাহের নাম উল্লেখ করেছেন। আহমদ শরীফ শ্রীধরের কাব্যের ছেঁড়া মূল পাঠ সম্পাদনা ও প্রকাশ করেছেন, সাহিত্য পত্রিকা, ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১৫-৩৪।

২০. আহমদ শরীফ কর্তৃক সম্পাদিত অসমাপ্ত মূলপাঠ সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৬-১১৪।

২১. সুকুমার সেন : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৯৯-৬০০।

২২. আশুতোষ ভট্টাচার্য : "টু আর্লি রাইটার্স অফ বিদ্যা-সুন্দর" বেঙ্গলি লিটারারি রিভিউ, এপ্রিল, ১৯৫৬, ২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা, পৃ. ১৫।

২৩. সাহিত্য পত্রিকা, ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৬-৯৯ এবং ১১৫-১৭।

২৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২।

২৫. ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী, ব্রজেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি ও সজনীকান্ত দাস কর্তৃক সম্পাদিত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৬-৫৭।

২৬. উপরে, ২য় পরিচ্ছেদ, পৃ. ৩৭।

২৭. মৃগাবতীর রচনাকাল হিসেবে কবি দিয়েছেন নওসইনও (সম্বৎ ?) বা ৯০৯ হিঃ, দেখুন মৃগাবতী, অধ্যাপক আসকারি কর্তৃক উদ্ধৃত, জে.বি. আর এস. ১৯৫৫, খণ্ড, ৪১ ৪র্থ অংশ, পৃ. ৪৫৯।

২৮. মৃগাবতীর উদ্ধৃতাংশ, জে. বি. আর. এস. ১৯৫৫, চতুর্থ অংশ। পৃ. ৪৬০-৮৩; আরও দেখুন আমার প্রবন্ধ "বাংলা রোমান্টিক কাব্যের হিন্দী অবধী পটভূমি", বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯-২০।

২৯. মৃগাবতী, অধ্যাপক আসকারি কর্তৃক উদ্ধৃত, পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৪৫৯।

৩০. সুকুমার সেন : ইসলামী বাংলা সাহিত্য, পৃ. ১০।

৩১. ত্রথে : ক্যাটালগ অফ দি পার্সিয়ান ম্যানস্ক্রিপ্টস ইন দি বডলীন লাইব্রেরি, নং ৪৪২, পৃ. ৪২-৪৩, উসলী নং ৩৭৯-৮০।

৩২. পূর্বোল্লিখিত সি. ই. উইলসন কর্তৃক অনূদিত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫১-৫৬ এবং ১০৬ ও পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহ।

৩৩. উপরে, পৃ. ২৩৬; আরও দেখুন মৃগাবতীর উদ্ধৃতাংশ, জে. বি. আর. এস. পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৪৬১-৬৫ এবং ৪৬৬।

৩৪. হফত পয়কর এ বর্ণিত বাহরাম গোরের কাহিনীকে সাতটি আধ্যাত্মিক পর্যায়ের মধ্য দিয়ে একজন সুফির অগ্রগতির উদাহরণরূপে বিবেচনা করা হয়; দেখুন হফত পয়কর এর ভূমিকা, পৃ. ১৮।

৩৫. মৃগাবতীর উদ্ধৃতাংশ, পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৪৬৬।

৩৬. কুতবনের মৃগাবতী প্রকাশিত হয় নি। অধ্যাপক এস. এইচ, আসকারি এক দীর্ঘ প্রবন্ধে প্রচুর উদ্ধৃতিসহ দিল্লি ও মনের (দু'টিই ফার্সি হস্তলিপিতে) পাণ্ডুলিপি থেকে প্রচুর অংশ উদ্ধৃত করেছেন (জে. বি. আর. এস. ১৯৫৫, ডিসেম্বর, ৪র্থ অংশ পৃ. ৪৫২-৮৭)। এটাই বর্তমান লেখকের মৃগাবতী সম্পর্কে আলোচনার প্রধান ভিত্তি। কৈথী লিপিতে দু'টি পাণ্ডুলিপির একটি এখন বেনারসের ভারতীয় কলাভবনে রয়েছে যার ছবিগুলিতে মুখভাবের কৌণিকতা, বিস্ফারিত শূন্য দৃষ্টি এবং চেহারার সবল চিত্র প্রদর্শিত হয়েছে। এ সবই এ শিল্পের প্রাচীনত্বের আভাস দেয় এবং রাজস্থানী চিত্রকলারীতিতে সেই প্রাচীন কালেও কুতবনের গ্রন্থের জনপ্রিয়তা নির্দেশ করে; আরও দেখুন দি ইলাস্ট্রেটেড উইকলি অফ ইন্ডিয়া, মে, ১৮, ১৯৫৮, পৃ. ২০ ও কার্ল খণ্ডলবল; "দি অরিজিন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফ রাজস্থানী পেইন্টিং", মার্গ, ৯ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা, ১৯৫৮, মার্চ, পৃ. ১৯, চিত্র ১-৫ এবং পৃ. ৩৩, চিত্র ১-২। মালিক মোহাম্মদ জয়সীর পদ্মাবতীর বিভিন্ন সংস্করণের মধ্যে বিব্লিওথেকা ইন্ডিকা সিরিজে গ্রীয়ারসন ও সুধাকর ত্রিবেদী কর্তৃক সম্পাদিত সংস্করণ এবং বিব্লিওথেকা ইন্ডিকায়, ১৯৪৪, এ.জি. শিরেক কর্তৃক ঐ গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ পড়ে দেখা যেতে পারে। সাধনের ময়নাসত এবং মাওলানা দাউদের চন্দায়ীনের ছেঁড়া পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়। বিদ্যাপীঠ থেকে আগর চান্দ নহত ময়না সত এর একটি সংস্করণ প্রকাশ করেছেন। লুরক ও চান্দার প্রেম কাহিনী নিয়ে মাওলানা দাউদ ফিরুজ শাহ তুঘলকের

রাজত্বকালে তাঁর ওয়াজীর জুনা শাহের সম্মানে চন্দায়ীন রচনা করেছিলেন: বদাউনী পূর্বোল্লিখিত, ১ম খণ্ড, বিব্লিওথেকা ইন্ডিকা সিরিজ, মূলপাঠ, পৃ. ২৫০। মনের ও ভুপালে আবিষ্কৃত এ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির উদ্ধৃতাংশ এ ঘটনার এবং এর রচনাকাল অর্থাৎ ৭৭৯হিঃ/১৩৭৭-৭৮ সালের উল্লেখ করেছে। উদ্ধৃতি এবং কাব্যের অংশবিশেষের জন্য দেখুন এস. এইচ. আসকারি : "বেয়ারা ফ্র্যাগমেন্টস অফ চন্দায়ীন অ্যান্ড মৃগাবতী", কারেন্ট স্টাডিজ, ১৯৫৫, পৃ. ৬-২৩; একই লেখকের মুয়াসির ষোড়শ খণ্ড, পৃ. ৪৫ ও পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহে "চন্দায়ীন আজ মোল্লা দাউদ আওর ময়নাসত আজমিয়া সাধন কদীম হিন্দী পরীম কথায়ীন"; এম. আর. তরফদার : "বাংলা রোমান্টিক কাব্যের হিন্দী অবধী পটভূমি", ২ অংশ, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫ ও পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহ, এবং ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৮ ও পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহ। বর্তমানে লাহোর যাদুঘর, চণ্ডীগড় যাদুঘর এবং বেনারসের ভারত কলাভবনে লুরক-চান্দার কাহিনীর রাজস্থানী এবং অপভ্রংশ ব্যাখ্যামূলক চিত্র রয়েছে। দেখুন ব্যাসিল গ্রে, রাজপুত্র পেইন্টিং, পৃ. ৩ ও দি আর্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যান্ড, পাকিস্তান, রঙিন প্লেট ক, এবং প্লেট ৮২, চিত্র ৩৯৯ (খ) : কার্ল খণ্ডল বল; "লীভস ফ্রম রাজস্থান", মার্গ, ৪র্থ খণ্ড, ৩য় সংখ্যা, পৃ. ১৩, চিত্র ১৩ ক; চাঘতাই; "এ ফিউ হিন্দু মিনিয়েচার পেইন্টারস অফ দি এইটিনথ অ্যান্ড নাইনটিনথ সেঞ্চুরি", ইসলামিক কালচার, ৮ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা, প্লেট ৩; রায় কৃষ্ণদাস : "অ্যান ইলাস্ট্রেটেড অবধী ম্যানস্ক্রিপ্ট অফ লেটর চান্দ ইন দি ভারত কলা ভবন", ললিতকলা, সংখ্যা ১-২, ১৯৫৫-৫৬, পৃ. ৬৬-৭১, প্লেট ঙ এবং ১৭, চিত্র ১-4; এম. আর. তরফদার : "ইলাস্ট্রেশন্স অফ দি চন্দায়ীন ইন দি সেন্ট্রাল মিউজিয়াম লাহোর", জে. এ. এস. পি. ১৯৬৩, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০৯ ও পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহ, এবং চিত্র ১-১১। সাধনের ময়নাসত একটি দীর্ঘ বারমাসা যাতে চান্দার খোঁজে পাওয়া তার স্বামী লুরক কর্তৃক পরিত্যক্ত ময়নার দুঃখ বিবৃত হয়েছে। এতে ময়না কত ঘৃণার সঙ্গে অন্য এক রাজকুমার ছাটন এর প্রেম প্রত্যাখ্যান করছে তাও দেখানো হয়েছে। এর সঙ্গে দৌলত কাজীর বাংলা কাব্য সতীময়না ও লোর-চন্দ্রাণীর বারমাসা অংশ তুলনা করে বর্তমান লেখক দেখিয়েছেন যে মূল উপাদানের ক্ষেত্রে এ দু'টির মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে। এটা মোটামুটি নিশ্চিত বলে মনে হয় যে দৌলত কাজীর বারমাসা সাধনের ময়নাসত-এর ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে এবং বাংলা কাব্যটির কাহিনীর অংশটি দাউদের চন্দায়ীন থেকে অভিযোজন ; তুলনীয় এ টীকায় উদ্ধৃত বর্তমান লেখকের বাংলা প্রবন্ধ।

৩৭. সুকুমার সেন : ইসলামী বাংলা সাহিত্য, পৃ. ২৮-২৯; আরও দেখুন ভেরিয়ার এলউইন; ফোক-সংস অফ ছত্তিশগড়, পৃ. ৩৩৮-৭০, এবং হান্টার : এ স্ট্যাটিস্টিকাল অ্যাকাউন্ট অফ বেঙ্গল, ভাগলপুর, চতুর্দশ খণ্ড, পৃ. ৮৭-৮৯।

৩৮. এ সব কবি হচ্ছেন দ্বিজ পশুপতি, দ্বিজরাম, মোহাম্মদ খাতের, করিমউল্লাহ এবং ইবাদতউল্লাহ ; সুকুমার সেন : ইসলামী বাংলা সাহিত্য, পৃ. ৩০-৪০ এবং ১৩৪।

৩৯. পদ্মাবতী : বিব্লিওথেকা ইন্ডিকা, ক্যান্টো ২৩, পৃ. ৫১২ : রাজকুমার কাঞ্চনপুর গায়ু মৃগাবতী কনহা যোগী ভায়ু। রাজকুমার কাঞ্চনপুর গেছেন। তিনি মৃগাবতীর জন্য যোগী হয়ে গিয়েছেন।

৪০. মৃগাবতীর উদ্ধৃতাংশ : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৪৭৫ ও ৪৭৬। এসব রাজপুত উপজাতির লোককাহিনীমূলক ইতিহাসের জন্য দেখুন টড : অ্যানালস অ্যান্ড এন্টিকুয়িটিজ অফ রাজস্থান, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৫ ও ২৪৭।

৪১. ঝালওয়ারের অন্তর্ভুক্ত চন্দ্রাবতীর প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ও ইতিহাসের জন্য দেখুন টড: পূর্বোল্লিখিত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৯ ; ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৭৮৪-৮৬ এবং আই. জি. আই, চতুর্দশ খণ্ড, পৃ. ১২৩-২৪।

৪২. টড : পূর্বোল্লিখিত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৭-৪৮, টীকা ৭ এবং পৃ. ১৮০; আই. জি. আই. দশম খণ্ড, পৃ. ১৬৩-৬৪।

৪৩. টড : পূর্বোল্লিখিত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০৩০।

৪৪. মৃগাবতীর উদ্ধৃতাংশ, পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৪৮৩।

৪৫. সুকুমার সেন : ইসলামী বাংলা সাহিত্য, পৃ. ১৩-১৪।

৪৬. পূর্বোল্লিখিত, ক্যান্টো ৪।

৪৭. পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৪৬৬ এবং ৪৬৮-৬৯।

৪৮. পদ্মাবতী, ক্যান্টো ২০।

৪৯. মৃগাবতী থেকে উদ্ধৃতাংশ পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৪৬৬ এবং ৪৬৮-৭২।

৫০. পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৪৫৫।

৫১. পদ্মাবতী. শিরেফ কর্তৃক অনূদিত, পৃ. ৩৭১।

৫২. আলাওলের পদ্মাবতী বাজার সংস্করণে পাওয়া যায়। এ কাব্যের প্রথম অংশ এম. শহীদুল্লাহ ১৯৫০ সালে ঢাকা থেকে সম্পাদনা করেছেন।

৫৩. সাহিত্যপত্রিকা, ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩২-৩৪

৫৪. পূর্বোল্লিখিত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৮-১৬৩।

৫৫. পদুমাবতী, ক্যান্টো ২৩-২৯ এবং ৩২।

৫৬. সুকুমার সেন : বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮২৪-২৮।

৫৭. আর. ডি. ব্যানার্জি : বাঙ্গালার ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৯৬-৯৭ এবং ৩০০-৩০৫।

৫৮. গোবিন্দ দাসের কড়চা, দীনেশ চন্দ্র সেন কর্তৃক সম্পাদিত, সম্পাদকের ভূমিকা দেখুন।

৫৯. জে. আর. এ. এস. ১৮৯৫. পৃ. ৫৩০; আরও দেখুন চৈনিক বিবরণের বাগচীকৃত অনুবাদ, বিশ্বভারতী অ্যানালস, ১৯৪৫, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১৬ ও ১২৬।

৬০. এ সব সরকারি উপাধির জন্য প্রশাসনিক ব্যবস্থা সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ দেখুন।

৬১. পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৫৬, ১৩৯।

৬২. উপরে, পৃ. ৪২, ৪৪ এবং ৪৫-৪৬।

৬৩. তাঁকে কামরূপ কামতা, উড়িষ্যা এবং জাজনগর বিজয়ীরূপে ঘোষণাকারী হোসেন শাহের ৯১২ হিং/১৫১২ সালের সিলেট শিলালিপি নিখুঁত ফার্সিতে লেখা ; দেখুন জে. এ. এস. বি.

১৯২২, প্লেট ৯, পৃ. ৪১৩; দানী : বিব্লিওগ্রাফি, পৃ. ৫৮ , এবং এস. আহমদ ইনস্ক্রিপশন্স, পৃ. ২৫, চিত্র ৮। অন্যান্য শিলালিপিতে ফার্সি রচনাংশের জন্য দেখুন জে.এ. এস. বি. ১৮৭২ ১ম অংশ, ৪১, পৃ. ১০৬; জে. বি. ও. আর. এস, ৪র্থ খণ্ড, ২য় অংশ পৃ. ১৮৪; এ. এস. আর. পঞ্চদশ খণ্ড, পৃ. ৯৯-১০০; ই. আই. এম., ১৯২৯-৩০, পৃ. ১২; দানী : বিব্লিওগ্রাফি, পৃ. ৫৩, ৫৭, ৬৩, ৬৪, ৭২ ইত্যাদি; এস. আহমদ : ইনস্ক্রিপশন্স, পৃ. ১৬৩, ১৭৫, ১৭৬ ইত্যাদি।

৬৪. দেখুন নসরত শাহের সাতগাঁও শিলালিপি, জে. এ. এস. বি. ১৮৭০, ১ম খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা, পৃ. ২৯৭; এ শিলালিপির প্রথম অংশে কোরানেব একটি আয়াত ৬২, ৯ এবং হাদিস রয়েছে, দ্বিতীয় অংশ ফার্সিতে লেখা এবং তাতে মোল্লা ও জমিদারদের "সম্পত্তি প্রতারণা" থেকে বিরত রাখার দায়িত্বে নিয়োজিত গভর্নর ও কাজীদের কর্তব্যগুলি স্পষ্টভাবে নির্দেশ করা হয়েছে; তুলনীয়, দানী : বিব্লিওগ্রাফি, পৃ. ৭২ এবং এস. আহমদ : ইনস্ক্রিপশন্স, পৃ. ২২৫।

৬৫. শূলপাণির সময়কাল নির্ভুলভাবে নির্ধারণ করা যায় না, রায়বাহাদুর মনোমোহন চক্রবর্তী কিছু যুক্তিসঙ্গত কারণে ইঙ্গিত করেছেন যে তিনি এর আগে না হলেও পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে খ্যাতিলাভ করেছিলেন।" "দি হিস্ট্রি অফ স্মৃতি ইন বেঙ্গল অ্যান্ড মিথিলা"; জে এ.এস. বি. ১৯১৫. ৯ম খণ্ড, ৯ম সংখ্যা পৃ. ৪৩২। এটা মোটামুটিভাবে নিশ্চিত যে বৃহস্পতি মিশ্র তাঁব কিছু কিছু গ্রন্থ রাজা গণেশেব ধর্মান্তরিত পুত্র জালালউদ্দীন মোহাম্মদ শাহের রাজত্বকালে (১৪১৫-১৪৩১) রচনা করেছিলেন। এদের দু'জনের কথাই তিনি স্মৃতিরত্নহার এর প্রারম্ভিক একটি শ্লোকে উল্লেখ করেছেন যা আর. সি. হাজরা আই. এইচ. কিউ, সপ্তদশ খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা, পৃ. ৪৪৭ এ উদ্ধৃত করেছেন। তাঁর রচিত অন্যান্য গ্রন্থগুলি হচ্ছে কালিদাসের কুমারসম্ভব ও রঘুবংশ, মাঘের শিশুপালবধ এবং বিখ্যাত সংস্কৃত অভিধান অমরকোষের টীকা; দেখুন হাজরা; "রায়মুকুট বৃহস্পতি", প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪২-৪৫৫; আরও দেখুন ডি. সি. ভট্টাচার্য "ডেট অ্যান্ড ওয়ার্কস অফ রায়মুকুট"; প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৬-৭১।

৬৬. এসব নিবন্ধকারের সময়কাল ও রচনাবলির জন্য দেখুন রায়বাহাদুর মনোমোহন চক্রবর্তী : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৩১৩-৪২ বৃহস্পতি রায়মুকুটের জন্য উপরে দেখুন। এরা সবাই ছিলেন রঘুনন্দনের পূর্বসূরি; পি. ডি. কানে : হিস্ট্রি অফ ধর্মশাস্ত্র, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯৮-৩০৬, ৩১৮-২৭ এবং ৩৯৩-৯৬; আরও দেখুন এস. বন্দ্যোপাধ্যায় : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৮ ও পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহ।

৬৭. এ গ্রন্থ অষ্টাবিংশতিতত্ত্বাণীরূপে বা আটাশটি তত্ত্ব নামে পরিচিত কারণ এটি ২৮টি অংশে বিভক্ত। এগুলি হচ্ছে মলমাসতত্ত্ব, দায়, সংস্কার, শুদ্ধি, প্রায়শ্চিত্ত, বিবাহ, তিথি, জন্মাষ্টমী, দুর্গোৎসব, ব্যবহার, একাদশী, জলাসয়োৎসর্গ, ছন্দগবৃষোৎসর্গ, যজুর্বৃষোৎসর্গ, ঋগ্বৃষোৎসর্গ, ব্রত, দেবপ্রতিষ্ঠা, মঠ-প্রতিষ্ঠা, দিব্য, জ্যোতিষ, বাস্তুযাগ, দীক্ষা, আহ্নিক, কৃত্য, পুরুষোত্তম, শ্রাদ্ধ যজুশ্রাদ্ধ, এবং শূদ্রকৃত্য। তত্ত্বের এ তালিকা এম. এম. চক্রবর্তীর প্রবন্ধ থেকে নেওয়া হয়েছে; জে. এ. এস. বি. ১৯১৫. পৃ. ৩৬৩। তত্ত্ববিন্যাসে চক্রবর্তী রঘুনন্দনের মলমাসে প্রদত্ত ক্রমানুসারে অনুসরণ করেছেন। ফলে এ বিন্যাসে কোনো সময়ানুক্রম অনুসরণ করা হয় নি। তত্ত্বগুলির নাম থেকে এগুলিতে আলোচিত বিষয়বস্তুর

ইঙ্গিত পাওয়া যায়। জীবানন্দ বিদ্যাসাগর কোলকাতা থেকে ১৮৯৫ সালে দুই খণ্ডে রঘুনন্দনের স্মৃতিতত্ত্ব সম্পাদনা করেছেন। শ্যামাকান্ত বিদ্যাভূষণকৃত এর আরও একটি সংস্করণ রয়েছে, কোলকাতা, ১৯৪১। স্মৃতিতত্ত্বের অংশবিশেষ বাংলায়ও অনূদিত হয়েছে।

৬৮. ২৮ টি তত্ত্বে এ বিষয়গুলি ছড়িয়ে আছে এবং নাম থেকেই এদের অন্তর্ভুক্ত বিষয়বস্তুর ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

৬৯. রঘুনন্দন উদ্ধৃত গ্রন্থাবলি ও গ্রন্থকারদের তালিকার জন্য দেখুন এম. এস. চক্রবর্তী : পূর্বোল্লিখিত, পরিশিষ্ট খ. পৃ. ৩৬২-৭৫; ভবতোষ ভট্টাচার্য; পূর্বোল্লিখিত, জে. এ. এস. বি. ১৯৫৩, পৃ. ১৬০ ও পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহ।

৭০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৫।

৭১. প্রাগুক্ত।

৭২. এম.এস. চক্রবর্তী : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৩১৬, ৩১৮, ৩৪০ ইত্যাদি।

৭৩. রঘুনন্দনের গুরু শ্রীনাথ দায়ভাগটিপ্পনী, কৃত্যতত্ত্বার্ণভ, আচারচন্দ্রিকা, শ্রাদ্ধদীপিকা এবং শুদ্ধিবিবেক সহ বহু গ্রন্থ ও টীকা রচনা করেছিলেন। এগুলির কোনো কোনোটি থেকে উদ্ধৃতি রঘুনন্দনের শুদ্ধি, আহ্নিক, এবং অন্যান্য গ্রন্থে পাওয়া যায়। শ্রীনাথের পুত্র রামভদ্র লিখেছিলেন দায়ভাগ বিবৃতি ও স্মৃতিতত্ত্ববিনির্ণয়; দেখুন এম. এস. চক্রবর্তী : পূর্বোল্লিখিত, জে. এ. এস.বি. ১৯১৫, পৃ. ৩৪৩-৫০। গোবিন্দানন্দ লিখেছিলেন বর্ষক্রিয়া কৌমুদী, দান, শ্রাদ্ধ এবং শুদ্ধি। বিব্লিওথেকা ইন্ডিকা ১৯০২-০৫ সিরিজে কমল কৃষ্ণ স্মৃতিতীর্থ এগুলি সম্পাদনা করেছেন। গোবিন্দানন্দ সম্পর্কে তথ্যের জন্য দেখুন এম. এস. চক্রবর্তী : পূর্বোল্লিখিত, জে. এ. এস. বি. ১৯১৫, পৃ. ৩৫৫; পি. ভি. কানে: পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৪১৪-১৫।

৭৪. তিনি প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব, শ্রাদ্ধ, আহ্নিক, শুদ্ধি, জ্যোতিষ ও মলমাসে মনুস্মৃতির উদ্ধৃতি দিয়েছেন, দেখুন জে. এ. এস. বি. ১৯৫৩, পৃ. ১৬৯-৭০। এ সব উদ্ধৃতি খাদ্য, হিন্দুদের গ্রহণীয় পেশা, দানের ধর্মীয় গুণও এ ধরনের অন্যান্য বিষয় সম্পর্কিত। শুদ্ধি, দিব্য, সংস্কার, মলমাস এবং উদ্বাহতে যাজ্ঞবলক্যস্মৃতি থেকে উদ্ধৃতির জন্য দেখুন প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭১ ও পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহ। এসব উদ্ধৃতি শবদাহ, আইন-প্রণালী, বিবাহ, জন্মানুষ্ঠান, ইত্যাদি সম্পর্কিত। একাদশী, মলমাস, তিথি, আহ্নিক ইত্যাদির মতো গ্রন্থগুলি অগস্ত্যসংহিতা ও পরাশর স্মৃতি থেকে উদ্ধৃতিতে ভরপুর।

৭৫. এম. এম. চক্রবর্তী : হিস্ট্রি অফ নব্য-ন্যায় ইন বেঙ্গল অ্যান্ড মিথিলা, জে. এ. এস. বি. ১৯১৫, পৃ. ২৭৪-৭৬ ; সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ : হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়ান লজিক, পৃ. ৪৬৫; ফণীভূষণ তর্কবাগীশ : ন্যায় পরিচয়, পৃ. ২৫-২৬; দীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৯-৮৭ ও ৯৭-১০২ ইত্যাদি।

৭৬. এ সব নৈয়ায়িকের জীবনী ও সময়কালের জন্য দেখুন এম. এম. চক্রবর্তী: হিস্ট্রি অফ নব্য-ন্যায় ইত্যাদি, জে. এ. এস. বি. ১৯১৫, পৃ. ২৭৭-৭৮, ২৮১-৮২, ২৮৫-৮৬, ২৮৯-৯০; ডি. সি. ভট্টাচার্য : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১৩৩-৪৮, ১৫৩-৭১; ১৭৮-৮৫; সতীশ চন্দ্র বিদ্যাভূষণ : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৪৬৭, ৪৬৯ ইত্যাদি।

৭৭. রঘুনাথ ও তাঁর উত্তরসূরিদের দ্বারা সমালোচিত ও টীকাকৃত গঙ্গেশ উদয়নাচার্য, বর্ধমান এবং মৈথিলি পণ্ডিতদের গ্রন্থের নামের জন্য উপরে উদ্ধৃত গ্রন্থাবলি ও প্রবন্ধগুলি দেখুন।

৭৮. পূর্বোল্লিখিত, আদি, একাদশ, পৃ. ৮০।

৭৯. চিন্তাহরণ চক্রবর্তী : বেঙ্গলস কন্ট্রিবিউশন টু ফিলসফিকাল লিটারেচার, ইন্ডিয়ান অ্যান্টিকোয়ারি, ১৯২৯, পৃ. ২০৪-০৫।

৮০. "রচনাকাল দানকারী শেষ স্তবকটি আদিতে দ্বিতীয় অংশের শেষে স্বাভাবিক স্থানে ছিল। কিন্তু যে ভাবেই হোক না কেন সম্পূরক অংশ বা অংশগুলি যুক্ত হওয়ার পরেও সেটা সেখানে থেকে যায়" (এস. কে. দে : আর্লি হিস্ট্রি অফ দি বৈষ্ণব ফেইথ অ্যান্ড মুভমেন্ট, পৃ. ২৯), এ অনুমান পুনঃপরীক্ষাযোগ্য। আমরা কি তাহলে মনে করব যে প্রথম প্রক্রম দু'টি ১৫১৩-১৪ সালে এবং ৩য় ও ৪র্থটি চৈতন্যের মৃত্যুর পরে রচিত হয়েছিল।

৮১. লোচনদাস চৈতন্য-মঙ্গলের বিভিন্ন খণ্ডে বহুবার মুরারির নাম ও চৈতন্যের জীবন সম্পর্কে তাঁর তথ্যের উৎসের উল্লেখ করেছেন। বস্তুত, মাঝে মাঝে তিনি মুরারীগুপ্তের বিবরণের অনুবাদ করেছেন। মনে হয় তিনি মুরারীর গ্রন্থ থেকে বিভীষণ উপাখ্যান গ্রহণ করেছিলেন, কৃষ্ণদাস কবিরাজ যে মুরারির কাব্য পড়েছিলেন সেটা চৈতন্য-চরিতামৃতে মুরারির গুপ্ত ও দামোদর স্বরূপের স্পষ্ট উল্লেখ থেকে জানা যায়, আদি, ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ, পৃ. ৫১। বিমান বিহারী মজুমদার (পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৭১-৭২) দেখুন, যিনি চৈতন্যের অষ্টাদশ শতকের জীবনীগ্রন্থ ভক্তিরত্নাকরের উপরও মুরারিগুপ্তের গ্রন্থের প্রভাব উপস্থাপন করেছেন।

৮২. উপরে যেমন ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে, কৃষ্ণদাস কবিরাজের এ গ্রন্থ পড়ার ও ব্যবহার করার সুযোগ ছিল।

৮৩. উপরে পৃ. ১৬৩।

৮৪. চৈতন্য-চরিতামৃতের শেষ শ্লোকটি, শ্লোক নং ৪৯ হচ্ছে : বেদারসাহ শ্রুতয় ইন্দুরিতি-প্রসিদ্ধে ইত্যাদি। এর ব্যাখ্যা হচ্ছে বেদ=৪, রস=৬, শ্রুতি =৪ এবং ইন্দু= ১। এভাবে আমরা পাই ৪৬৪১-১৪৬৪ শকাব্দ।

৮৫. এর রচনাকাল নিয়ে বিতর্ক সম্পর্কে আলোচনার জন্য দেখুন, বিমান বিহারী মজুমদার : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৮৯-৯৪ এবং এস. কে. দে : পূর্বোল্লিখিত. পৃ. ৩৪, টীকা ১।

৮৬. হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬৩-৬৪।

৮৭. এস. কে. দে কর্তৃক সম্পাদিত এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৩৪।

৮৮. রামাবতার শর্মা কর্তৃক সম্পাদিত : পাঞ্জাব সংস্কৃত সিরিজে প্রকাশিত, লাহোর ১৯৩৩।

৮৯. মুরারিগুপ্ত : পূর্বোল্লিখিত, এস. কে. দে কর্তৃক উদ্ধৃত, দি আর্লি হিস্ট্রি, পৃ. ৪২৮।

৯০. চৈতন্য-চন্দ্রোদয়, উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৮।

৯১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৬, ৪৩০ এবং ৪৩৮।

৯২. মুরারী গুপ্ত : পূর্বোল্লিখিত, কবিকর্ণপুর : চৈতন্য-চরিতামৃত উদ্ধৃত পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৪২৬, ৪২৭ এবং ৪৩০।

৯৩. বৃন্দাবনলীলার প্রেমসংক্রান্ত দিক সম্পর্কে সচেতন হওয়ায় জীব ষোড়শ শতকের শেষদিকে রচিত তার গোপাল-চম্পুতে একটি ধর্মতাত্ত্বিক কৈফিয়ত দেখিয়েছেন। তিনি মনে করেন যে দৃশ্যত: প্রেমমূলক বৃন্দাবনলীলায় একটি গূঢ় তাৎপর্য রয়েছে যা সাধারণ ভক্তরা উপলব্ধি করতে পারে না; প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮১-৮২।

৯৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৩-৩০।

৯৫. উপরে উল্লিখিত গ্রন্থাবলির অধিকাংশই সম্পাদিত ও মুদ্রিত হয়েছে। চৈতন্য সম্পর্কিত সংস্কৃত সাহিত্য সম্পর্কে আমাদের বিবরণ মূলত: বি.বি. মজুমদারের শ্রী-চৈতন্যচরিতের উপাদানের ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ এবং এস. কে. দে. দি আর্লি হিস্ট্রির ২য় ও ৭ম পরিচ্ছেদের উপর ভিত্তি করে লেখা।

৯৬. মুরারিগুপ্ত ও কবিকর্ণপুর ছিলেন জাতে বৈদ্য। রঘুনাথ দাস ছিলেন কায়স্থ এবং হুগলিতে তাঁর ভূ-সম্পত্তি ছিল। পরবর্তীকালে রঘুনাথ দাস বৃন্দাবনের ছয়জন গোস্বামীর একজন হয়েছিলেন এবং বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্ব ও সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছিলেন। মুরারি সম্পর্কে তথ্যের জন্য দেখুন, চৈতন্য-ভাগবত, আদি, ৯ম, পৃ. ৫৮। কবিকর্ণপুরের জন্য দেখুন, এস. কে দে : দি আর্লি হিস্ট্রি, পৃ. ৩২। রঘুনাথের ভূ-সম্পত্তি ও সাহিত্যিক অবদানের জন্য দেখুন, চৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্য ৬ষ্ঠ, পৃ. ২৯৩-৯৪ এবং এস. কে. দে : দি আর্লি হিস্ট্রি ইত্যাদি, পৃ. ৮৯-৯৩।

৯৭. এ আমলের অধিকাংশ সংস্কৃত নাটক ও কাব্যকে রসশাস্ত্রের নীতি অনুসরণ করতে হয়েছে। দৃষ্টান্ত হিসেবে রূপের বিদগ্ধ মাধবের কথা তুলে ধরা যায়। এতে রাধার বিভিন্ন মেজাজ যে ভাবে চিত্রিত করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ নির্ভুলভাবে রসের ব্যাকরণ সম্মত। অধিকাংশ লেখকই অলংকারবিদ্যায় তাঁদের জ্ঞান ও দক্ষতা দেখাতে চেয়েছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজের গোবিন্দ-লীলামৃত (এস. কে. দে : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৪৬৩, উদ্ধৃতাংশ) সঙ্গীতের শৈল্পিক বিস্তারিত উল্লেখ করেছে।

৯৮. বিদগ্ধ-মাধবে রাধাকে অভিসারিকা, বাসকমজ্জা, উৎকণ্ঠিতা, বিপ্রলব্ধা এবং খণ্ডিতা মহিলা রূপে চিত্রিত করা হয়েছে। তার প্রতিদ্বন্দ্বিনী চন্দ্রাবলীর পূর্বরাগও বর্ণিত হয়েছে। এস. কে. দে : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৪৪৪। ললিত-মাধবে বর্ণিত বৃন্দাবনে কৃষ্ণের প্রেমলীলার জন্য দেখুন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৫। গোপীদের সঙ্গে কৃষ্ণের প্রেম, রাধার সঙ্গে তাঁর মিলন এবং তাঁর অন্যান্য প্রেমমূলক কার্যাদির জন্য দেখুন কবিকর্ণপুর : কৃষ্ণাহ্নিক-কৌমুদী, এস. কে. দে কর্তৃক উদ্ধৃত পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৪৫৫ ও পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহের উদ্ধৃতি। রাধা-কৃষ্ণের যৌন-লীলাসহ অন্যান্য অনুরূপ বিষয় কৃষ্ণদাস কবিরাজের গোবিন্দ-লীলা-মৃতাতে প্রচুর রয়েছে, দেখুন এস. কে. দে : পৃ. ৪৬০ ও পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহ। প্রামাণিক গ্রন্থের বিস্তৃততর উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। জীবের কাব্য ও চম্পকগুলি অনুরূপ বিষয়ে ভরপুর।

৯৯. আর. সি. মিত্র : দি ডিক্লাইন অফ বুডিজম ইন ইণ্ডিয়া, পৃ. ৭৮-৭৯।

১০০. ডি.সি. ভট্টাচার্য : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৪৯। বিখ্যাত সংহিতা রচয়িতা শূলপাণি দর্শনের মীমাংসা পদ্ধতি সম্পর্কে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন; প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

চারুকলা ও স্থাপত্যশিল্প

পঞ্চদশ শতকের চৈনিক পর্যটক মাহুয়ান বাংলার নগরীগুলিতে বহু পেশাদার শিল্পী দেখতে পেয়েছিলেন। এটা সত্যিই দুর্ভাগ্যজনক যে এদের সৃষ্ট শিল্প বা দক্ষতা-নির্ভর পেশার কোনো নমুনা আমাদের কাছে নেই। আলোচ্য আমলে সাহিত্য ও স্থাপত্যশিল্প ছাড়া অন্য কোনো শিল্পে বাংলার অবদান ছিল নেহাৎ অকিঞ্চিৎকর। তবুও এ আমলে সমৃদ্ধিলাভকারী শিল্পের কিছু শাখা সম্পর্কে ধারণা লাভ করা প্রয়োজন। স্থাপত্যশিল্প ও চারুলিপি শিল্প ছিল বহুলাংশে দরবারি পৃষ্ঠপোষকতার ফসল। সম্ভবত সঙ্গীত, বিশেষত (দরবারে উন্নতি-লাভকারী) এর চিরায়ত শাখার ব্যাপারটিও ছিল অনুরূপভাবে দরবারি পৃষ্ঠপোষকতার ফসল। সে কালের স্থানীয় চিত্রকরদের সঙ্গে হোসেন শাহী আমলের শাসকদের কোনো প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল কিনা তা আমরা জানি না। তবুও মনে হয় যে বিভিন্ন ধরনের শিল্প বিভিন্ন স্থানীয় উপাদান আত্মস্থ করে সমাজজীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়েছিল।

অদ্যাবধি আবিষ্কৃত আরবি ও ফার্সি ভাষায় উৎকীর্ণ লিপিগুলি থেকে স্পষ্টভাবে দেখা যায় যে মুসলমান বাংলায় চারুলিপি শিল্পের ধারাবাহিক বিকাশ ও উন্নয়ন ঘটেছিল। পর্যালোচনাধীন আমলের সুলতানদের কাছ থেকে এটা যথাযোগ্য উৎসাহ পেয়েছিল বলে মনে হয়। সুলতান ও তাঁদের গভর্নরদের স্পষ্ট নির্দেশে নির্মিত মসজিদ ও অট্টালিকাগুলিতে স্থাপিত বহু লিপি থেকে সে আমলে সমৃদ্ধি লাভকারী লিখনের বিভিন্ন রীতি দেখতে পাওয়া যায়। এ পর্যন্ত আমাদের হাতে আসা রৌপ্য ও স্বর্ণমুদ্রাগুলি চারুলিপি শিল্পের ইতিহাসের ওপর যথেষ্ট আলোকপাত করে। মোগল ভারতের মতো এখানেও সুলতানরা দরবারে নিযুক্ত অনুলেখকদের জররিন-দস্ত[১] বা "সোনালি হাতের অধিকারীর" মতো বিভিন্ন ধরনের গৌরবসূচক উপাধি দিতেন। ফার্সি এ শব্দগুচ্ছ আমাদের জররিন-কলম, শিরিন-কলম এবং অনরবীম-কলমের মতো অনুরূপ শব্দগুচ্ছের কথা মনে করিয়ে দেয় যা মোগল চিত্রকলা ও চারুলিপির ইতিহাসে পাওয়া যায়।[২] প্রাক-হোসেন শাহী আমলের মুদ্রা ও লিপি সযত্নে পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে এখানে চারুলিপিকরগণ কুফিক, নসখ, সুলস এবং তুঘরার[৩] মতো বিভিন্ন মুখ্য ও গৌণ লিখনরীতির চর্চা করতেন। লিখন শিল্প হোসেন শাহী আমলে যথেষ্ট মাত্রায় উৎকর্ষ লাভ করেছিল।

উল্লিখিত কিছু কিছু রীতি হোসেন শাহী আমলে প্রচলিত ছিল। নস্‌খ রীতির সংশোধিত রূপ হোসেন শাহের ত্রিবেণী লিপিতে[৪] দেখা যায় যাতে শরটি অদ্ভুতভাবে দীর্ঘায়িত। সুতরাং এটাতে যে তুঘরা রীতির প্রভাব রয়েছে তা স্পষ্ট। সুলসকে আবুল

ফজল "এক-তৃতীয়াংশ বক্ররেখা ও দুই-তৃতীয়াংশ সরলরেখা"[৫] নিয়ে গঠিত রূপে সংজ্ঞায়িত করেছেন যা ফিরূজ শাহের ৯৩৯ হিজরির কাল না লিপিতে[৬] দেখতে পাওয়া যায়। বক্রতাগুলি তুলনামূলকভাবে নগণ্য ও অবহেলিত এবং শরগুলি সুব্যবস্থিতভাবে সাজানো ও দীর্ঘায়িত। হোসেন শাহের রাজত্বকালে উৎকীর্ণ হাজী বাবা সালেহ্ লিপি একই শ্রেণীভুক্ত[৭] যার রীতি জটিল প্রকৃতির।

তুঘরার তুলনায় সুল্‌স ও নস্‌খ রীতি, মনে হয়, গৌণ রীতি ছিল। তুঘরা একটি স্বতন্ত্র রীতি নয়—এটা আলঙ্কারিক লিখন রীতির একটি উপশ্রেণী যাতে অক্ষরগুলির এক ধরনের কৃত্রিম বিন্যাস থাকে। এতে অক্ষরগুলি এত নিবিড়ভাবে সংযুক্ত থাকে যে সেগুলি একটি শোভাকর রূপ নেয় যা পড়া কষ্টসাধ্য।[৮] এর ক্রমিক বিবর্তনকালে তুঘরা রীতি তিনটি স্পষ্ট পর্যায় অতিক্রম করে আসে বলে মনে হয়। প্রথম পর্যায়ে উল্লম্ব টানগুলি সরলীকৃত এবং এক সারি বর্শার মধ্যে সুব্যবস্থিতভাবে সাজানো হয়েছে এবং এ পর্যায়ের তুঘরা লিপি বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে প্রায় সুল্‌স লিপির অনুরূপ। দ্বিতীয় পর্যায়ে, উল্লম্ব টানগুলির উর্ধ্বাংশে তীরের মতো দেখতে কিছু তির্যক চিহ্ন লক্ষ্য করা যায়। তৃতীয় ও শেষ পর্যায়ে, নুন, সিন, শিন, ইয়ার মতো কিছু অক্ষর এবং বক্রতা বিশিষ্ট অন্যান্য অক্ষর শরের গায়ে ধনুকের আকারে আড়াআড়িভাবে লেখা। দীর্ঘায়িত শরগুলির অগ্রভাগ তীরের মতো এবং উপরে বর্ণিত বক্র অক্ষরগুলি দ্বারা ধনুক সৃষ্টি করা হয়েছে। সুতরাং সর্বজনীনভাবে তীর ধনুক নামে অভিহিত এ রীতি হচ্ছে লিখনের একটি অলঙ্কারিক রীতি যাতে বক্র অক্ষরগুলি ধনুকাগ্র অক্ষরগুলির সাথে আড়াআড়িভাবে সাজানো যার ফলে গোটা লিখনরীতিটি তীর ও ধনুকের উপাদানে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। সন্দেহাতীতভাবে এটা হোসেন শাহী আমলের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ চারুলিপি রীতি। এ আমলের লিপিগুলির সযত্ন পরীক্ষা থেকে দেখা যায় যে, তুঘরা অধিকতর সুন্দর, পুষ্পিত এবং আলঙ্কারিক হয়ে উঠে এবং এটা অন্যান্য লিখন রীতিকে ম্লান করে দেয়।

নসরত শাহের ৯৩৮ হিজরির/১৫৩০-৩১ খ্রিঃ দু'টি সন্তোষপুর লিপিতে [৯] স্পষ্টভাবে তীরধনুক রীতির তুঘরা দেখা যায়। দু'টি লিপিতেই খাড়া টানগুলির দীর্ঘায়িত শরগুলির শীর্ষকে তীরের সূক্ষ্মাগ্রভাগের আকার দেওয়া হয়েছে এবং অনুভূমিকভাবে অঙ্কিত নুন ও ইয়ার মতো অক্ষরগুলির বক্র রেখাগুলিকে ধনুকের জ্যার মতো দেখায়। একই সুলতানের ৯৩০ হিঃ / ১৫২৪ সালের একটি অত্যন্ত সুন্দর লিপিতে তীর-ধনুক রীতির উদাহরণ দেখা যায়। এ লিপিটি বর্তমানে ঢাকা জাদুঘরে রয়েছে।[১০] অক্ষরগুলির বক্ররেখাগুলি সতর্কতার সঙ্গে আঁকা হয়েছে এবং উল্লম্ব শরগুলিকে সুন্দরভাবে দীর্ঘায়িত করা হয়েছে। শিল্পসুলভ এ লিখনের মধ্যে পত্রপূর্ণ অলঙ্করণ ঘনভাবে সংযুক্ত করায় এটা আরও চিত্তাকর্ষক হয়েছে যার ফলে অলঙ্করণ থেকে অক্ষরগুলিকে পৃথক করা কঠিন। নসরতশাহের ৯২৬ হি:/১৫১৯-২০ সালের গৌড় লিপিতে[১১] মনে হয় তীর-ধনুক রীতির তুঘরার বিকাশ প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত পর্যায়ের উদাহরণ দেখা যায়। তীরাগ্র বিশিষ্ট শরগুলি সুব্যবস্থিতভাবে নিখুঁত এবং এগুলির চারপাশে জড়ানো বক্ররেখাগুলি শিল্পসম্মতভাবে আঁকা হয়েছে। হোসেন শাহের এই শ্রেণীর কিছু লিপি[১২] যথেষ্ট মাত্রায় শৈল্পিক সৌন্দর্যে

বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। এ রীতির তুঘরা মনে হয় ষোড়শ শতকের তিন-চতুর্থাংশ পর্যন্ত বাংলায় স্থায়ী ছিল। গিয়াসউদ্দীন বাহাদুর শাহ সুরের[১৩] ৯৬৬ হিঃ/১৫৫৮-৫৯ সালের রাজশাহী লিপিতে বৈশিষ্ট্যরূপে তীর ও ধনুক স্পষ্টভাবে দেখা যায়। তীরাগ্রযুক্ত টানগুলির নিয়মিত দীর্ঘায়ন ও অনুভূমিকভাবে আঁকা বক্ররেখাগুলি থাকা ছাড়াও এ লিপিতে কিছু অক্ষর আছে যা কৌতূহলোদ্দীপক জন্তুর অবয়ব সৃষ্টি করেছে। লিপির শুরুতে ফি শব্দটি আমাদের একটি ফণাতোলা সাপের নিখুঁত প্রতিমূর্তি দান করে। এ বৈশিষ্ট্য উপরে আলোচিত নসরত শাহের সন্তোষপুর লিপিগুলিতে বর্তমান। হোসেন শাহের ৯০৫ হিজরির মুর্শিদাবাদ ববরগ্রাম লিপি[১৪] তুঘরার অর্গানপাইপ শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করে যাতে দীর্ঘায়িত শরগুলিকে সুব্যবস্থিত রূপে সারিবদ্ধভাবে সাজানো হয়েছে।

এ আমলে কুফিক লিখনের অনুপস্থিতি লক্ষণীয়। এটা ছিল আববি লিখনের আদিম নমুনা। কোরানের অনুলিপি প্রস্তুত করার জন্য সাধারণত এটা ব্যবহার করা হতো। শুরুতে এটা অত্যন্ত সাদামাটা ছিল; কালক্রমে এটা প্রকৃতিগতভাবে এত কৃত্রিম ও আলঙ্কারিক হয়ে পড়ে যে, এ রীতির লিপিগুলির পাঠোদ্ধার সাধারণ মানুষের পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। এর বিরুদ্ধে শুরু হওয়া প্রতিক্রিয়ার ফলে, মনে হয়, ত্রয়োদশ শতাব্দী নাগাদ সমস্ত মুসলমান বিশ্ব থেকে কুফিক রীতি অন্তর্হিত হয়ে যায়।[১৫] পূর্ববর্তী তুর্কি-আফগান আমলের মসজিদ ও অন্যান্য ইমারত-সংলগ্ন কিছু লিপিতে এটা দেখা গেলেও ভারতীয় মুসলিম ইতিহাসের পরবর্তী পর্যায়ে এ রীতি কেন প্রায় সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত এ থেকে তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।[১৬] হোসেন শাহী শাসকবৃন্দ সমকালীন মুসলমান বিশ্বে অপ্রচলিত এ রীতিকে পুনঃপ্রচলিত করার কোনো প্রয়োজন অনুভব করেন নি। হোসেন শাহী আমলে বাংলায় নস্তালিক রীতির লিখনও ছিল অনুপস্থিত এবং এর স্পষ্ট কারণের প্রতিও আবুল ফজল ইঙ্গিত করেছেন। তাঁর মতে, কেবলমাত্র আকবরের সময় থেকেই নস্তালিক রীতি 'নতুন গতি শক্তি' লাভ করতে শুরু করেছিল।[১৭]

এখানে উল্লেখ করা উচিৎ যে বাংলা তীর-ধনুক ও অর্গান-পাইপ নমুনার তুঘরার একচেটিয়া অধিকার ভোগ করেনি, কারণ পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকের ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলেও এগুলি উৎকর্ষ লাভ করেছিল। জৌনপুরের শর্কি শাসকদের কিছু মুদ্রায় অর্গান-পাইপ ধরনের তুঘরা রয়েছে।[১৮] এটা লক্ষ্য করা কৌতূহলোদ্দীপক যে গোলকুণ্ডায় মির্জা মোহাম্মদ আমিনের সমাধির সবচেয়ে উপরের প্রস্তরখণ্ডে ১০০৪ হিজরি/১৫৯৬ সালের লিপিতে[১৯] তীর-ধনুক শ্রেণীর তুঘরার একটি সুন্দর নমুনা রয়েছে। এসব অঞ্চলে বাংলার প্রভাবের প্রবেশ-প্রক্রিয়া স্পষ্টভাবে জানা না গেলেও এখানে যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুমান করা যেতে পারে যে জৌনপুরী ও দক্ষিণী কারিগরগণ বাংলা থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করেছিল। বাংলা ও জৌনপুর পাশাপাশি হওয়ায় এক দেশ সহজেই অন্যদেশের সাংস্কৃতিক জীবনকে প্রভাবিত করতে পারত। ষোড়শ শতকের শেষভাগে গোলকুণ্ডায় তীর-ধনুক নমুনার আকস্মিক আবির্ভাব সন্তোষজনকভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। ঘটনাপঞ্জি রচয়িতাদের কাছ থেকে আমরা জানতে পারি যে হোসেন শাহ কর্তৃক বাংলা থেকে বিতাড়িত হাবসীরা দাক্ষিণাত্য ও গুজরাটে চলে গিয়েছিল।[২০] এটা খুবই সম্ভাব্য যে, তারা তাদের সঙ্গে

বাংলার চারুলিপির রীতি দাক্ষিণাত্যে নিয়ে গিয়েছিল। বাংলার চারুলিপি শিল্পের সঙ্গে হাবসীদের নিবিড় পরিচয় সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত কারণ শেষ হাবসী শাসক মোজাফফর শাহের[২১] (৮৯৮ হিঃ) হজরত পাণ্ডুয়া লিপি থেকে স্পষ্টভাবেই দেখা যায় যে তীর-ধনুক নমুনার তুঘরা ইতোমধ্যে যথেষ্ট মাত্রায় উৎকর্ষ অর্জন করেছিল। উপরে বর্ণিত পরিস্থিতি বিবেচনা করলে গোলকুণ্ডার চারুলিপি শিল্পের ওপর বাংলার শৈল্পিক রীতির প্রভাব খুবই সম্ভাব্য বলে মনে হয়। আলোচ্য সময়কালে যথেষ্ট মাত্রায় উৎকর্ষ অর্জনকারী তীর-ধনুক নমুনার তুঘরার স্থূল রূপের শুরু পঞ্চদশ শতকের প্রথম চতুর্থাংশে গুজরাটে হয়েছিল।[২২] সাংস্কৃতিক যোগাযোগের এ প্রক্রিয়ার বিষয়টি অন্যত্র আলোচিত হয়েছে।[২৩]

আমাদের বিবেচ্য আমলের বিশিষ্ট এ তুঘরা রীতি দীর্ঘস্থায়ী হয়নি, কারণ মোগলদের বিজয়ের পর মোগল শিল্পীদের অনুশীলিত বিভিন্ন রীতি এখানে প্রচলিত হয় এবং উত্তর ভারতের মতো এখানেও নস্তালিক অন্যান্য রীতিকে ম্লান করে ফেলে যার ফলে হোসেন শাহী আমলের অত্যন্ত সুন্দর শৈলীর তুঘরা সম্পূর্ণভাবে অন্তর্হিত হয়ে যায়।[২৪]

সুতরাং এটা স্পষ্ট যে বাংলার হোসেন শাহী শাসকদের আমলে তুঘরা রীতির লিখন চরম উৎকর্ষ লাভ করেছিল এবং তাঁরা তীর-ধনুক নমুনায় শোভা ও মার্জিতভাব যুক্ত করে এটাকে নিখুঁত করে তুলেছিলেন। এ আমলের চারুলিপির বৈশিষ্ট্য ছিল কমনীয়তা এবং মার্জিতভাব যা আমরা সমকালীন দিল্লি রীতিতে পাই না। সেখানে যথেষ্ট শক্তি ও তেজীভাব দেখতে পাওয়া যায়। দিল্লি রীতিতে প্রায় অনুপস্থিত বিজড়িত তীর-ধনুক ও অর্গান পাইপকে মধ্যযুগের বাংলার চারুলিপি শিল্পের গুরুত্বপূর্ণ ও প্রধান উপাদানরূপে গণ্য করা যেতে পারে।

২.

উপাদানের স্বল্পতার জন্য দেশে নিশ্চিতভাবে প্রচলিত সঙ্গীত ও চিত্রকলা সম্পর্কে যথাযথ ধারণা করা কঠিন। কবিতা ও সঙ্গীতের মধ্যে কোনো পার্থক্য ছিল না, কারণ সাঙ্গীতিক উদ্দেশ্যেই কবিতাগুলি রচিত হতো। সমকালীন বাংলা কবিতায় বহু রাগের বা সেগুলি গাইবার রীতির উল্লেখ আছে। এসব রাগের সযত্ন পরীক্ষা থেকে বাংলায় প্রচলিত সঙ্গীতের প্রকৃতি দেখতে পাওয়া যায়। কেদার, ধানশ্রী, মল্লার, তোড়ি, বেলাবেলি এবং ভৈরবীর[২৫] মতো রাগের প্রায়শ উল্লেখ থেকে এ ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে এসব ধ্রুপদী সুর বাংলার সঙ্গীতের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল এবং এগুলি উত্তর ভারতের চিরায়ত সঙ্গীত রীতির সঙ্গে জড়িত ছিল, কারণ উল্লিখিত রাগগুলি ঐ রীতিতে নিয়মিত স্থান লাভ করেছে।[২৬] কখন ও কিভাবে এসব চিরায়ত উপাদান বাংলার সঙ্গীতে প্রবেশ করেছিল তা স্পষ্টভাবে জানা যায় না। সিন্ধু, মারাঠা অঞ্চল এবং ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গীতের ঐতিহ্য যথেষ্ট পরিমাণে বাংলার সঙ্গীতকে প্রভাবিত করেছিল বলে মনে হয়। সিন্ধুরা ও মারহাটি[২৭] রীতি সম্ভবত সিন্ধু ও মারাঠা অঞ্চলের সুর হওয়ার ইঙ্গিত দান করে যা শেষপর্যন্ত বাংলার সঙ্গীত রীতিতে যথোপযুক্ত স্থান লাভ করে। বাংলাকাব্যে নিয়মিতভাবে উল্লিখিত অন্যান্য রাগের মধ্যে আমরা এখানে পথমঞ্জরী, বরাড়ি গুজ্জরী,

বিহাগড়া, রামকেলি (রামগিরি), শ্যাম-গৌড়া, আহীর, বাঙ্গাল, দেশাখ এবং অন্যান্য রাগের উল্লেখ করতে পারি।[২৮] বাংলায় প্রচলিত বিভিন্ন রীতির একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা এখানে দেওয়া সম্ভব না হলেও এটা যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুমান করা যেতে পারে যে সেগুলির অধিকাংশই ছিল চিরায়ত। জৌনপুরের শর্কি বংশের শেষ শাসক আলাউদ্দীন হোসেন নতুন উপাদানের প্রচলন ও বহু সুর রচনা করে ধ্রুপদী সঙ্গীতে গতি সঞ্চার করেছিলেন।[২৯] ১৪৯৪ সালে সিকান্দর লোদীর হাতে পরাজয়ের পর ভাগলপুরের কহলগাঁওয়ে তাঁর দীর্ঘদিন অবস্থান বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। শর্কি বংশের অবসানের অব্যবহিত পরে প্রচুর সংখ্যক শিল্পী ও সঙ্গীতজ্ঞ নিশ্চয়ই বাংলায় অভিবাসনের জন্য এসেছিলেন। বাংলার শিল্পে তাদের অবদানের পরিমাণ নিরূপণ করা কঠিন। ইতোপূর্বে আমরা ইঙ্গিত দান করেছি যে কুতবনের মৃগাবতীর আবেগপ্রবণ উপাদানের কাছে বাংলা সাহিত্য যথেষ্ট ঋণী এবং বাংলার চারুলিপি শিল্পীদের অনুশীলিত অর্গান পাইপ রীতির তুঘরা লিখন শর্কিদের কিছু কিছু মুদ্রায় দেখা যায়। ফলে এটা যথেষ্ট প্রমাণিত যে বাংলা ও জৌনপুরের শিল্পীদের মধ্যে ভাব ও রীতির বিনিময় ঘটেছিল। জৌনপুরের সঙ্গীত শিল্পীদের কাছ থেকে বাংলার সঙ্গীত নিশ্চিতভাবেই প্রেরণা পেয়েছিল। বিখ্যাত কবি কুতবন তাঁর মৃগাবতীতে ভৈরো, সন্ধুরা (সিন্ধুরা), বাংলা (বাঙালি), তোড়ি (তুড়ি), দেসাখ (দেশাখ), পতমঞ্জরী (পটমঞ্জরী) বরারি (বরাড়ি), ধনাসরি (ধানশ্রী), স্রিরাগ (শ্রীরাগ), মলর (মল্লার) এবং গুজরি (গুজ্জরী)[৩০] সহ রাগ ও রাগিণীর এক দীর্ঘ তালিকা দিয়েছেন। আমরা উপরে দেখিয়েছি যে সঙ্গীতের এ রীতিগুলি সমকালীন বাংলায় প্রচলিত ছিল। হোসেন শাহ শর্কি প্রবর্তিত কিছু কিছু সুর বাঙালি সঙ্গীতজ্ঞরা গ্রহণ করে থাকবেন। শর্কি শাসক কর্তৃক প্রবর্তিত রূপে কথিত রাগ গৌড়ি-শ্যামাকে[৩১] লোচনদাস[৩২] ষোড়শ শতকের বাংলায় প্রচলিত একটি সুর রূপে উল্লেখ করেছেন। চর্যাচর্য বিনিশ্চয়ে[৩৩] রাগ গৌড়া রূপে উল্লিখিত এবং কুতবনের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত রাগ গৌরী সম্ভবত গৌড় এলাকার সঙ্গে সম্পর্কিত। আলোচ্য এ আমলে কীর্তন প্রথার উদ্ভব দেখা গিয়েছিল যা ষোড়শ শতকের শেষদিকে সুস্পষ্টরূপ গ্রহণ করে। বাংলা সঙ্গীতে চিরায়ত রীতি এত প্রবল ছিল যে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে সে সম্পর্কে বেশকিছু গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। কিছু কিছু ধ্রুপদী সুরের উদ্ভব, বিকাশ ও ইতিহাস সাধারণভাবে রাগনামা[৩৪] রূপে পরিচিত এ সব গ্রন্থের বিষয়বস্তু। কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীতের অনুসিদ্ধান্ত রূপে নাচের একটি অত্যন্ত রীতিগত প্রকৃতি ছিল। গোবিন্দ-লীলামৃতের শেষসর্গে নাচের তালের ছন্দোবদ্ধ নমুনা রয়েছে।[৩৫]

এ আমলের সঙ্গীতের ধ্রুপদী প্রকৃতির ওপর গুরুত্ব দিতে গিয়ে এতে কিছু স্থানীয় উপাদানের উপস্থিতি উপেক্ষা করা আমাদের উচিৎ নয়। পাহাড়িয়া ও ভাটিয়ালির[৩৬] মতো কিছু স্থানীয় রাগ বেশ প্রসিদ্ধ ছিল বলে মনে হয়। এটা অনুমান করা অযৌক্তিক হবে না যে আদিতে বাঙ্গালা ছিল বঙ্গ বা আধুনিক পূর্ববাংলার স্থানীয় রূপ। উত্তর ভারতের ধ্রুপদী সঙ্গীতের কাঠামোতে এটা কিভাবে নিজের স্থান করে নিয়েছিল তা স্পষ্টভাবে জানা যায় না। বৃহত্তর সম্প্রদায়ের মনে আবেদন সৃষ্টিকারী পাল রাজা[৩৭] এবং স্থানীয় দেব-দেবীদের

সম্পর্কে গানগুলি নিশ্চিতভাবেই লোক-সঙ্গীতের রূপ গ্রহণ করেছিল। প্রকৃতপক্ষে, সে আমলের কিছু সংস্কৃত কাব্যে রাগগুলিকে মার্গ বা চিরায়ত এবং দেশীরূপে শ্রেণীভাগ করা হয়েছে।[৩৮] স্থানীয় সঙ্গীতজ্ঞ ও নর্তকীরা যারা নিশ্চিতভাবে ছিল অসংখ্য, তাদের প্রাণবন্ত দেশীয় সঙ্গীত ও স্থানীয় নৃত্য দিয়ে ধনী ব্যক্তিদের সামাজিক সমাবেশ ও উৎসব অনুষ্ঠানগুলিকে প্রাণবন্ত করে তুলতেন।[৩৯] ১৫২৪ সালে সংকলিত সি ইয়াং চাও কুং তিয়েন লু নামের চৈনিক বিবরণের নিম্নলিখিত পংক্তিগুলিতে স্থানীয় যন্ত্র-সঙ্গীতের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে : "কেন-সিয়াও-সু-লু-নাই (কাঁসা ও সানাই বা বাঁশি? বাদক) নামে অভিহিত এক শ্রেণীর সঙ্গীতজ্ঞ আছেন। তাঁরা ধনী ব্যক্তি ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের গৃহে গিয়ে রোজ সকালে তাদের বাদ্যযন্ত্র বাজান। একজন একটি ছোট ঢোল বাজান, আর একজন বাজান একটি বড় ঢোল এবং তৃতীয় জন একটি পি-লি (বাঁশি) বাজান। তাঁদের সঙ্গীত নিচু ও ধীর সুরে শুরু হয়, কিন্তু এটা খুব দ্রুত ও উচ্চসুরে শেষ হয। সঙ্গীতানুষ্ঠান শেষ করলে গৃহপতিরা তাঁদের সুরা, খাদ্য এবং টংকা (রৌপ্যমুদ্রা) দিয়ে পুবস্কৃত করেন।"[৪০] সুতরাং হোসেন শাহী আমলের সঙ্গীত ছিল স্থানীয় ও চিরায়ত উপাদানের মিশ্রণ।

এ সময়কার চিত্রকলা সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। এ আমলে শিল্পের এ শাখায় কোনো চর্চা হয়নি এমন কথা বলা যায় না। কারণ আমরা জানি যে রামকেলি থেকে বৃন্দাবন যাবার পথে শ্রী-চৈতন্য কানাইনাটশালা গ্রামে বেশকিছু চিত্র দেখতে পেয়েছিলেন সেগুলির বিষয়বস্তু ছিল কৃষ্ণ-লীলা।[৪১] কাজেই এটা স্পষ্ট যে, সে সময়ের চিত্রগুলি ছিল ধর্মীয় প্রকৃতির। বর্তমানে কোলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিতে সংরক্ষিত ১৪০১ শকাব্দের চিত্রশোভিত হরিবংশের পাণ্ডুলিপি থেকে এ যুক্তির সমর্থন পাওয়া যায়।[৪২] এ পাণ্ডুলিপির মলাটে বিভিন্ন পৌরাণিক দেব-দেবীর ছবি এবং কৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলার দৃশ্যাবলি আঁকা রয়েছে। এসব চিত্র কৃষ্ণ-পূজা পদ্ধতির আবেগপ্রবণতা প্রকাশ করে যা বাংলার গোটা সাংস্কৃতিক জীবনকে পরিপৃক্ত করেছিল বলে মনে হয়। দীনেশচন্দ্র সেন কর্তৃক প্রকাশিত চিত্রাবলীতে[৪৩] নব-বৈষ্ণববাদের চেতনার আভাস পাওয়া যায়। এগুলি ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে আরোপিত হলেও সে সময়ের হতেও পারে, নাও হতে পারে; কিন্তু পূর্ববর্তী সময়ে বাংলার চিত্রকলার কোনো ঐতিহ্য না থাকলে যে এগুলির সৃষ্টি সম্ভব ছিল না এসব চিত্র থেকে তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

৩.

হোসেন শাহী বংশ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগেই বাংলায় স্থাপত্যশিল্পের ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল। উচ্চাকাঙ্ক্ষী পরিকল্পনার আদিনা মসজিদ, স্থাপত্য শিল্পের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ একলাখী সমাধিসৌধ, জমকালো দখিল দরওয়াজা এবং সুন্দর তাঁতিপাড়া মসজিদ হচ্ছে পূর্ববর্তী আমলের প্রতিনিধিত্বকারী কয়েকটি অট্টালিকা যা বাংলায় স্থাপত্যশিল্পের ক্রম-বিবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়গুলি নির্দেশ করে। হোসেন শাহী স্থাপত্যশিল্প ইলিয়াসশাহী, এমন কি হাবসী প্রতিপক্ষদের স্থাপত্যশিল্পের অনুবর্তন হলেও পূর্ববর্তী আমলের শিল্পের

সঙ্গে এর অন্তত পক্ষে একটি আংশিক পার্থক্য রয়েছে। আমরা এখন এর উল্লেখ করব।

এ আমলের যে সব সৌধ পরবর্তীকালে টিকে রয়েছে সেগুলিতে বৈচিত্র্যের যথেষ্ট প্রাচুর্য ও নির্মাণগত বৈশিষ্ট্য দেখা যায় না। সাধারণত পরিকল্পনায় আয়তাকার এ অট্টালিকাগুলির সম্মুখভাগ দীর্ঘ ও নিচু যেখানে উপরের কার্নিশে এবং নিচে বহুসংখ্যক ছুঁচালো খিলানে প্রচলিত বক্রতা দেখতে পাওয়া যায় এবং এর প্রতিটি কোণে একটি অষ্টভুজী বুরুজ আছে। একসারি আয়তাকার প্যানেল বিশিষ্ট বহির্ভাগ অথবা পাথরের স্তম্ভ ও উপরের ছুঁচালো শ্রেণীবদ্ধ খিলানের ভাররক্ষাকারী ইটের পিলপা (Pier) দ্বারা বহু খিলানপথ (Aisle) ও বে (Bay)-তে বিভক্ত অভ্যন্তরভাগ, কোনোটাই মনে কোনো গভীর রেখাপাত করে না। ভিতরের জায়গাটা আয়তাকার অথবা বর্গাকৃতি এবং প্রায়ই পশ্চিমের দেয়ালের ভিতরের দিকে অনেকগুলি খোদাই করা মিহরাব রয়েছে। দেয়ালগুলির বাইরের দিক পাথর বা চকচকে টালি দ্বারা আবৃত।

লট্টন মসজিদের ভূমি-নকসা, মনে হয়, চামকাটি মসজিদ থেকে নেওয়া যদিও প্রথমোক্তটি সামান্য বড় আকৃতির। এর বর্গাকৃতি কক্ষটি প্রতি দিকে ৩৪ ফুট এবং পূর্বদিকের অলিন্দ ১১ ফুট চওড়া। ৭২½ ফুট দীর্ঘ ও ৫১ ফুট প্রস্থ মাপবিশিষ্ট এ অট্টালিকার সামনের দিকে তিনটি খিলানযুক্ত প্রবেশপথ ও খাড়া কুলুঙ্গিযুক্ত প্যানেল রয়েছে যার প্রতিটিতে অলঙ্কৃত থাম থেকে উঠে আসা সূক্ষ্মাগ্র খিলান একটি কুলুঙ্গি সৃষ্টি করেছে। বর্গাকার কক্ষের চারকোণে চারটি এবং বারান্দার দুই প্রান্তে দুইটি, এ ছয়টি বুরুজের প্রতিটিকে অলঙ্করণের ছাঁচ দ্বারা গোলাকৃতি খাঁজ বিশিষ্ট তিনটি অংশে বিভক্ত করা হয়েছে। পশ্চিমের দেয়ালের পেছনে উদ্গত মিহরাবের দু'পাশে শিরাকৃতির গোল থাম রয়েছে যা আমাদের দিল্লির ফিরুজীয় স্থাপত্যশিল্পের কথা মনে করিয়ে দেয়। বর্গাকার কক্ষ আচ্ছাদনকারী বৃহৎ গম্বুজটি ছাড়া বারান্দার উপরে তিনটি ক্ষুদ্রতর গম্বুজ রয়েছে যা সুন্দরভাবে বাঁকানো কার্নিশ ও ছিদ্র-প্রাচীর (Battlements) গুলির উপরে উঠে এসেছে। বারান্দার মাঝখানের গম্বুজটির সঙ্গে ছোট সোনা মসজিদের কোনো কোনো গম্বুজের সাদৃশ্য রয়েছে। এটা বাংলার চৌচালা ছাঁচের। এর বক্রাকার চারটি অংশ রয়েছে যা বাঁকানো মটকা (Ridge) দ্বারা যুক্ত এবং এতে ফোঁটা ফোঁটা করে জল গড়ানো নিচাংশ (Eaves) রয়েছে। বৃহৎ কক্ষটিকে আচ্ছাদনকারী গোলার্ধ আকৃতির প্রধান গম্বুজটির বন্ধ মার্লন (Merlon) সহ নলাকৃতির ভিত্তি রয়েছে। এটি ভিতরের দিকে অষ্টভুজী আকৃতির ওপর স্থাপিত একটি সমতল ভল্ট (Vault)। কালো পাথরের থামগুলি থেকে নির্গত খিলানগুলি এ বর্গক্ষেত্রকে অষ্টভুজীতে রূপান্তরিত করেছে।

এ মসজিদের বর্তমানে মুছে যাওয়া অলঙ্করণ বৈশিষ্ট্যগুলি কানিংহাম সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। মনে হয় শাসকবৃন্দ এবং এ মসজিদের নির্মাণ কাজের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত স্থপতিগণ এর আঙ্গিক সৌন্দর্যের চেয়ে সম্মুখভাগে চকচকে টালির আবরণ দিয়ে অর্জিত এর বাইরের অলঙ্করণে অধিকতর উদ্বিগ্ন ছিলেন।[৪৪] এ অট্টালিকার আয়তনের ক্ষুদ্রতা হচ্ছে এর ফল যা আলোচ্য সময়কালের অন্যান্য অট্টালিকাতেও দেখা যায়। সন্দেহ নেই যে এটা জমকালো ভাব সৃষ্টি করেছে যা ছিল এর নির্মাতাদের লক্ষ্য; কিন্তু পূর্ববর্তী

আমলের কিছু অট্টালিকার সর্বজনীন আবেদনের বৈশিষ্ট্য এতে নেই। ক্রেটন[৪৫] এবং কানিংহাম[৪৬] ইউসুফ শাহের রাজত্বকালে ৮৮০ হিজরিতে এর তারিখ নির্ধারণের পক্ষপাতী যদিও এ ধরনের সিদ্ধান্তের সমর্থনে কোনো প্রমাণ নেই। এ মসজিদের সাধারণ নকশা চামকাটি মসজিদের অনুরূপ হলেও অন্য কোনো বিষয়ে এটা ইলিয়াস শাহী আমলের প্রতিনিধিত্বকারী নয়। এ অট্টালিকার স্থাপত্য রীতি হোসেন শাহী আমলের স্পষ্ট চিহ্ন বহন করে।

গুমতি তোরণ[৪৭] এক গম্বুজবিশিষ্ট একটি বর্গাকার অট্টালিকা। এর চারকোণে একটি করে অষ্টভুজী বুরুজ রয়েছে। বাইরের দিকে এটি ৪২ ফুট ৮ ইঞ্চি বর্গ। এতে পূর্ব বুরুজ থেকে পশ্চিম দিকে যাবার জন্য খিলানবিশিষ্ট দ্বারের মধ্য দিয়ে ৫ ফুট চওড়া একটি পথ রয়েছে। এ প্রবেশপথ আয়তাকার এক কাঠামো দিয়ে ঘেরা যার উপরিভাগে কারুকাজের সারি এবং তার উপরে শোভাবর্ধক ক্ষুদ্র কুলুঙ্গি রয়েছে। পূর্ব ও পশ্চিম দিকে প্রবেশদ্বারের উভয় পাশে ইটের থাম আছে যার মধ্যে কারুকাজের রেখা দ্বারা শিরাযুক্ত অংশ পৃথককৃত। কোণার বুরুজগুলির এখন শুধু ভিত্তির অলঙ্করণটুকু আছে। ছিদ্র-প্রাচীরগুলিতে (Battlement) এবং রঙ্গীন মিনা করা ইটের বিভিন্ন নকশা সজ্জিত কার্নিশের সারিতে বাংলার চৌচালার রীতিগত বক্রতা অনুকরণ করা হয়েছে। প্যানেল ও গৎবাঁধা "ঘণ্টা ও শিকল উপাদান" খোদিত নকশা করা পাশের দেয়ালগুলির কুলুঙ্গি ও উদগত অংশগুলির উদ্দেশ্য ছিল মনে হয় বৈসাদৃশ্য প্রদর্শন যা এ আমলের অধিকাংশ অট্টালিকায় অনুপস্থিত। ভিতরের কক্ষটি ২৫ ফুট বর্গ, এর উপরে গোলার্ধ আকৃতির একটি গম্বুজ রয়েছে যার ভার পাথরের থামের সাহায্যে মাটিতে পরিবহণ করা হয়েছে। বর্গাকার থেকে বৃত্তে পরিবর্তনের পর্যায়লাভে ব্যবহৃত পদ্ধতিটি হচ্ছে এ অট্টালিকার সবচেয়ে আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। এখানেই আমরা প্রথমবারের মতো স্কুইঞ্চের (Squinch) ব্যবহার দেখি যা বাংলার স্থাপত্য শিল্পে ঐতিহাসিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শাহসুজার তোরণের কাছে এর অবস্থান এবং এটার গম্বুজ নির্মাণে ব্যবহৃত পদ্ধতি এ ধারণারও সৃষ্টি করতে পারে যে গুমতি তোরণ মোগল আমলে নির্মিত হয়েছিল। কিন্তু এর অন্যান্য বৈশিষ্ট্য প্রায় সন্দেহাতীতভাবে এটাকে হোসেন শাহী আমলের অন্তর্ভুক্ত করে। সম্ভবত উত্তর ভারতীয় বা জৌনপুরী কোনো স্থপতি এ অট্টালিকার নির্মাণ কাজ তদারক করেছিলেন– হোসেন শর্কির অভিবাসন কিছু কারিগর ও নকশাবিদকে এদেশে এনে থাকতে পারে এ তথ্য এ অনুমানকে দৃঢ় করে।

কদমরসুলের প্রবেশ পথে আঁটা একটি শিলালিপি অনুসারে ৯৩৭ হিজরি/১৫৩১ সালে[৪৮] নসরত শাহ এটা নির্মাণ করেছিলেন। এতে ১৯ ফুট বর্গের একটি কেন্দ্রীয় কক্ষ রয়েছে এবং এর তিনদিকে ১৫ ফুট চওড়া বারান্দা আছে। কোণের চারটি বুরুজ ছাড়া এর বাইরের আয়তন হচ্ছে দৈর্ঘ্যে ৬০ ফুট এবং প্রস্থে ৩৯ ফুট ৬ ইঞ্চি। সামনে একটি এবং দু'পাশে দু'টি, বড় কক্ষটির এ তিনটি প্রবেশ পথ ছাড়া বারান্দায় পাথরের বেঁটে, বৃহৎ এবং অষ্টকোণী থামের ওপর খিলানযুক্ত তিনটি প্রবেশ পথ রয়েছে। খিলানযুক্ত প্রবেশপথ বেষ্টনকারী আয়তাকার কাঠামোর অংশরূপে অনুভূমিক সারির কারুকার্যের নিচে রয়েছে

স্প্যান্ড্রেলে (Spandrel) পদ্মফুলের সমুন্নত কারুকার্য। তিন সারি কার্নিশ ও ছিদ্র-প্রাচীর দিয়ে প্রচলিত চৌচালার বক্রতা দেখানো হয়েছে। প্রবেশপথে বাধাপ্রাপ্ত কারুকাজের অবিচ্ছিন্ন সারি সম্পূর্ণ সম্মুখভাগকে দু'টি সমান অংশে বিভক্ত করেছে। এর প্রত্যেক অংশে রয়েছে প্যানেলের সারি যাতে রীতিগত 'শিকল ও ঘণ্টা অলঙ্করণ' দেখা যায় যাকে পার্সি ব্রাউন "একঘেয়ে প্যানেলের নকশার প্রত্যেকটিতে বারবার একই অর্থহীন ও কষ্টবোধ্য অলঙ্করণ সম্পূর্ণটাকে এক অতি সাধারণ ও গতানুগতিক রূপ প্রদানকারী রূপে" অভিহিত করেছেন।[৪৯]

সুতরাং অত্যন্ত অলঙ্কৃত সম্মুখভাগ অন্যান্য দিকের চেয়ে ভিন্নতর যেগুলিকে অনুভূমিক কারুকার্য দ্বারা ও খাড়াভাবে সমতা বিধান করে স্পষ্টতর করা হয়েছে। কোণের অষ্টকোণী বুরুজগুলির প্রত্যেকটির শীর্ষে একটি ছোট পাথরের চূড়া রয়েছে যা এ আমলের অন্যকোনো অট্টালিকায় দেখা যায় না। কেন্দ্রীয় কক্ষটি একটি গম্বুজ দ্বারা আচ্ছাদিত যার শীর্ষে কারুকার্যমণ্ডিত একটি পদ্ম রয়েছে এবং বারান্দাটি বাইরের দিকে চ্যাপ্টা নলাকৃতি খিলান করা ছাদ দিয়ে আবৃত। পার্সি ব্রাউন এ অট্টালিকায় "অবক্ষয়ের শুরু" দেখেছিলেন[৫০], তবে ফার্গুসন অত্যুৎসাহে মন্তব্য করেছেন যে "এ রীতির সাধারণ প্রকৃতি কদম-ই-রসুল নামে অভিহিত একটি মসজিদের? নমুনায় দেখতে পাওয়া যায়। এ মসজিদটি গৌড় দুর্গের দক্ষিণ-পূর্ব তোরণে অবস্থিত এবং কোনোমতেই এটা স্থাপত্যশিল্প গুণবর্জিত নয়। ভারবহনের দৃঢ়তা ইটের স্থাপত্যের সহজাত দুর্বলতাকে অনেকাংশেই লাঘব করে এবং শুরুতে খিলানগুলিকে শক্ত ভিত্তি দান করে বলে এদের অংশগুলির ক্ষুদ্রতা সাধারণ কার্যকারিতাকে ক্ষুণ্ন করে না। সম্মুখভাগ অনুভূমিক কারুকার্য ও ইটের নকশাকৃত প্যানেল দ্বারা স্পষ্টতর করা হয়েছে। জালিকাজ এর সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্য জুড়ে আছে। খুব অবদমিতভাবে হলেও এতে ছাদের বক্ররূপ দেখা যায় যা এ রীতির একটা বৈশিষ্ট্য।"[৫১] গৎবাঁধা বৈশিষ্ট্যগুলির প্রায়শ উপস্থিতি এবং সম্মুখভাগে একঘেয়ে প্যানেলের পুনরাবৃত্তি এ অট্টালিকার গঠন-সৌন্দর্যকে ব্যাহত করেছে। বাংলার মন্দির স্থাপত্যের ওপর এ রীতির প্রভাব থেকে সম্ভবত কদমরসুলের গুরুত্ব অনুধাবন করা যেতে পারে।

সম্ভবত এর তিনদিকে বারান্দা থাকার কারণেই অধিকাংশ পণ্ডিত এটাকে মসজিদ বলে অভিহিত করেন।[৫২] কিন্তু এতে কোনো মিহরাব বা মিম্বর নেই। এর প্রবেশপথ সংলগ্ন লিপিতেও এটাকে মসজিদ রূপে আখ্যায়িত করা হয় নি। কক্ষের মাঝখানে কাল পাথরের ছোট একটি খোদাই করা স্তম্ভমূল রয়েছে যা থেকে দেখা যায় যে এর উদ্দেশ্য ছিল রসুলের পায়ের ছাপ গ্রহণ করা যেমনটি উল্লিখিত লিপিতে শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। রসুলের পায়ের ছাপ সংরক্ষণের জন্য উদ্দেশ্যমূলকভাবে নির্মিত অট্টালিকা গুজরাটের আহমেদাবাদ ও ঢাকার নবীগঞ্জের মতো জায়গাতেও দেখা যায়।

৯৪১ হিজরি/১৫৩৫ সালে নির্মিত জাহানিয়া মসজিদটি[৫৩] ৫৬ ফুট দীর্ঘ ও ৪২ ফুট প্রশস্ত একটি আয়তাকার অট্টালিকা। এর চারকোণে একটি করে অষ্টকোণী বুরুজ আছে যার শীর্ষে রয়েছে দীর্ঘায়িত পাথরের মিনার। সম্মুখভাগের সম্পূর্ণটাই বক্র কার্নিশের নিচে সমান্তরালভাবে বিস্তৃত সামান্য বক্র রেখার কারুকার্য দ্বারা চারটি সমান্তরাল সারির

একইরকম প্যানেলে বিভক্ত যাতে পোড়া মাটির অলঙ্করণ দেখা যায়। অভ্যন্তরভাগ দু'টি বে (Bay) তে বিভক্ত এ মসজিদের সামনের তিনটি প্রবেশ পথের মুখোমুখি পশ্চিমের দেয়ালে তিনটি অলঙ্কৃত মিহরাব আছে। ছাদ আচ্ছাদনকারী ছয়টি গম্বুজের প্রত্যেকটির শীর্ষে বাইরের দিকে পদ্ম-চূড়া রয়েছে।

পূর্ববর্তী অংশে বর্ণিত অট্টালিকাগুলি ছিল ইটের তৈরি যা অবশ্য প্রাক-হোসেন শাহী আমলে নির্মাণসামগ্রী হিসেবে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়েছে। একজন আধুনিক লেখক[৫৪] যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গতভাবেই এ রীতিকে "বাংলার রীতি" রূপে গণ্য করেছেন। পর্যালোচনাধীন সময়কালে ভাস্কর্য-শিল্পের পুনরুত্থান দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হওয়ায় সম্ভবত শিল্পের পৃষ্ঠপোষণকারী রাজশক্তির প্রকাশ্য নির্দেশে কোনো কোনো অট্টালিকায় পাথর ব্যবহার করা হয়েছিল। গৌড়ের সোনা মসজিদগুলি এবং রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত অন্য বহু অট্টালিকা এ শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করে।

ছোট সোনা মসজিদ নির্মিত হয়েছিল হোসেন শাহের রাজত্বকালে। এটা বহু গম্বুজ ও পাঁচটি বে (Bay) বিশিষ্ট দৈর্ঘ্যে ৮২ ফুট ও প্রস্থে ৫২½ ফুট একটি আয়তাকার অট্টালিকা। এর চারকোণে আছে চারটি অষ্টকোণী বুরুজ যাতে অগভীর কারুকাজের সারি রয়েছে। মসজিদটির সামনের দিকে পাঁচটি খিলানযুক্ত প্রবেশপথ আছে। খিলানগুলি বাইরের দিকে খাঁজযুক্ত এবং এদের স্প্যান্ড্রেলগুলিতে (Spandrel) উদ্‌গত কারুকার্য আছে। অলঙ্করণ হিসেবে গুটানো কাজ বিশিষ্ট আয়তাকার ফ্রেম প্রত্যেকটি প্রবেশদ্বারকে বেষ্টন করে আছে। সম্মুখভাগে পরিলক্ষিত অনুভূমিক কারুকাজের সারি এবং বিভিন্ন ধরনের খোদাইকাজগুলি সনাতন প্রকৃতির। মসজিদটি বাইরের দিকে সম্পূর্ণভাবে এবং ভিতরের দিকে আংশিকভাবে পাথর দিয়ে আবৃত। পাশের প্রত্যেকটি দেয়ালে তিনটি করে প্রবেশপথ আছে যা দিয়ে অট্টালিকার লম্বালম্বিভাবে বিস্তৃত তিনটি বে-তে যাওয়া যায়।

এ মসজিদের ভিতরের দিকের মাপ হচ্ছে দৈর্ঘ্যে ৭০ ফুট ৪ ইঞ্চি ও প্রস্থে ৪০ ফুট ৯ ইঞ্চি। পাশের আইলগুলি (Aisle) অপেক্ষা বৃহত্তর মাঝের আইলগুলি তিনটি চৌচালা গম্বুজ দ্বারা আবৃত যার প্রত্যেকটিতে চারটি ঢালু অংশ আছে যা মাঝের দিকে নেমে এসে আদর্শ বাঙালি কুটিরের বক্রতার প্রতিনিধিত্ব করে। চারটি আইল বারটি গোলার্ধাকৃতির গম্বুজ দ্বারা আবৃত যেগুলি পিরামিড আকৃতির গম্বুজগুলিসহ সামান্য বক্র কার্নিশ ও বুরুজের উপরে উঠে এসেছে। মসজিদের উত্তর পশ্চিম কোণায় উপরের তলায় মহিলাদের কক্ষ আছে। এ কক্ষটি কতকগুলি পাথরের থামের ওপর দাঁড়ানো এবং উত্তর দিকের সিঁড়ি দিয়ে এ কক্ষে যাওয়া যায়। মহিলাদের কক্ষের ক্ষুদ্র কুলুঙ্গিটি (Niche) ছাড়া পশ্চিম দিকের দেয়ালের ভিতরের দিকে সামনের পাঁচটি খিলানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পাঁচটি কুলুঙ্গি আছে।

দুই দিকে বারান্দা বেষ্টিত নামাজের কক্ষটিকে আদিনা মসজিদের নামাজের কক্ষের অনুরূপ মনে হলেও[৫৫] আলোচ্য সময়কালের ভাস্কর্য শিল্পের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি অত্যন্ত অলঙ্কৃত ছোট সোনা মসজিদের আগের আমলের অট্টালিকার সঙ্গে অবশ্য কোনো অনুকূল তুলনা হয় না। ছোট সোনা মসজিদে সেগুলির নকশা ও অলঙ্করণের অন্ধ অনুকরণ করা

হয়েছে। ছোট সোনা মসজিদের কেন্দ্রীয় প্রার্থনা কক্ষের ছাদের পদ্ধতিও আদিনা মসজিদ থেকে ভিন্নতর। আদিনা মসজিদে নলাকার ভল্ট (vault) ছিল।

বড় সোনা মসজিদের সামনে একটি আয়তাকার আঙ্গিনা আছে। এর প্রতিদিকে একটি খিলানযুক্ত প্রবেশপথ রয়েছে যার উচ্চতা ৯½ ফুট ও প্রস্থ ১০½ ফুট।[৫৬] বড় সোনা মসজিদ এক বিশাল ও বলিষ্ঠ আয়তাকার অট্টালিকা। এর দৈর্ঘ্য ১৬৮ ফুট ও প্রস্থ ৭৬ ফুট। এর ছয়টি বুরুজ আছে যার চারটি প্রার্থনা কক্ষের চার কোণে এবং দু'টি বারান্দার শেষপ্রান্তে অবস্থিত। অনলঙ্কৃত পূর্বদিকে ১১টি খিলানযুক্ত প্রবেশপথ রয়েছে যার মধ্য দিয়ে প্রার্থনাকক্ষের সম্মুখস্থ বারান্দায় যাওয়া যায়। সেখানেও সমসংখ্যক খিলানযুক্ত প্রবেশপথ রয়েছে। পার্শ্বদেয়ালের খিলানযুক্ত প্রবেশপথগুলি দিয়ে পাথরের থাম দ্বারা মসজিদের লম্বালম্বিভাবে বিস্তৃত তিনটি বে-তে যাওয়া যায়। উত্তর-পশ্চিম দিকের তিনটি আইল নিয়ে মহিলাকক্ষ গঠিত যেখানে যাওয়ার জন্য উত্তরদিকে এক সারি সিঁড়ি রয়েছে। আদিতে যে ৪৪টি অর্ধগোলার্ধাকার গম্বুজ দিয়ে অট্টালিকাটি আবৃত করা হয়েছিল তার মধ্যে বারান্দার ওপর বর্তমানে টিকে থাকা মাত্র ১১টি গম্বুজ বক্রাকার কার্নিশ ও অনুভূমিক ছিদ-প্রাচীরের উর্ধ্বে উঠেছে। মসজিদের প্রধান বারান্দা, এর মিতব্যয়ী ও সাধারণ অলঙ্করণ এবং সম্পূর্ণ অট্টালিকার বিশাল আয়তন এর হৃদয়গ্রাহিতা বৃদ্ধি করেছে যা এ আমলের অন্যান্য অট্টালিকায় কদাচিৎ দেখা যায়।

পর্যেষণাধীন সময়ে গৌড় ও পাণ্ডুয়া নগরীর বাইরেও বহু মসজিদ ও অট্টালিকা নির্মিত হয়েছিল। দিনাজপুর জেলার সুরাস্থ মসজিদের দেয়ালের বাইরের দিক পাথর দিয়ে আবৃত যাতে ছোট সোনা মসজিদের অনুরূপ প্যানেল ও বিভিন্ন নকশা দেখা যায়। এ মসজিদের শৈলীগত বৈশিষ্ট্য সযত্নে-পরীক্ষা করলে মনে হয় যে এটা হোসেন শাহী আমলে নির্মাণ করা হয়েছিল। লট্টন মসজিদের আদর্শে নির্মিত এ অট্টালিকার কেন্দ্রীয় কক্ষটি ১৬ ফুট বর্গ। এ অট্টালিকার সামনের দিকে ১৭ ফুট ৬ ইঞ্চি দীর্ঘ একটি বারান্দা আছে এবং বিভিন্ন কোণে, কেন্দ্রীয় কক্ষের চারকোণে চারটি এবং বারান্দার দু'প্রান্তে একটি করে মোট ছয়টি অষ্টকোণী বুরুজ রয়েছে। পূর্বদিকে তিনটি খিলানযুক্ত প্রবেশপথ আছে এবং বারান্দাটি তিনটি অর্ধগোলাকৃতি গম্বুজ দ্বারা ঢাকা যা প্রচলিত বক্রাকৃতি কার্নিশের উপরে উঠে এসেছে। প্রার্থনাকক্ষের পূর্বদিকে তিনটি প্রবেশ পথ আছে যা পশ্চিমদিকের দেয়ালের তিনটি মিহরাবের মুখোমুখি। পাশের দেয়ালের প্রত্যেকটিতে একটি করে প্রবেশপথ রয়েছে। বর্গাকার কেন্দ্রীয় কক্ষটি স্তম্ভের ওপর নির্ভরশীল একটি অর্ধগোলাকৃতি গম্বুজ দিয়ে ঢাকা।[৫৭] দিনাজপুর জেলার ইটের তৈরি হেমতাবাদ মসজিদে (৯০৬হিঃ/১৫০০ খ্রিঃ) ছোট সোনা মসজিদের নকশা অনুসরণ করা হয়েছে। ৯৩০ হিঃ/১৫২৩ সালে নির্মিত বলে কথিত বাঘার মসজিদে [৫৮] শুধু পরিকল্পনায়ই নয়, আয়তনের ক্ষেত্রেও তাঁতিপাড়া মসজিদের [৫৯] অনুসরণ করা হয়েছে। ৭৫ ফুট ৮ ইঞ্চি দীর্ঘ ও ৪২ ফুট ২ ইঞ্চি প্রস্থ এ অট্টালিকার চারকোণে চারটি বুরুজ আছে। পূর্বদিকে এর ৫টি প্রবেশ পথ আছে। প্রতি প্রান্তের পাশের দু'টি প্রবেশপথ দিয়ে অট্টালিকার দু'টি বে-তে প্রবেশ করা যায় যা দশটি গম্বুজ দ্বারা ঢাকা। এর উত্তর পশ্চিম কোণে মনে হয় মহিলাদের কক্ষ ছিল। পাবনা জেলার

নবগ্রাম মসজিদটি নির্মিত হয়েছিল ৯৩২হিঃ/১৫২৬ সালে।[৬০] এটি এক গম্বুজ বিশিষ্ট একটি বর্গাকার অট্টালিকা এবং এর চারকোণে অষ্টকোণী বুরূজ রয়েছে। এতে লট্টন মসজিদ এবং গুমতি তোরণের[৬১] অলঙ্করণ ও নকশার অনুকরণ করা হয়েছে। ফরিদপুরের পথরাইলের মজলিস আউলিয়া ও সিলেটের শঙ্কর পাশা মসজিদের নির্মাণ-তারিখ অনুল্লেখিত হলেও এগুলি হোসেন শাহী আমলে নির্মাণ করা হয়েছিল বলে মনে হয় কারণ এ আমলের অট্টালিকার চমৎকার অলঙ্করণের ও প্রচলিত রীতির নকশার প্রাচুর্য এগুলিতে রয়েছে। সুতরাং গৌড় ও পাণ্ডুয়ার বাইরে পরিলক্ষিত পুরাকীর্তিগুলিতে ঐ রাজধানী শহরগুলির অট্টালিকার পরিকল্পনা ও নকশা অনুসরণ করা হয়েছিল বলে মনে হয়। এ সব অট্টালিকার অধিকাংশে রুচিহীন নকশার পুনরাবৃত্তি দেখা যায় এবং এগুলিতে খোদাই কাজ ও নকশায় গতিময়তার যথাযথ বোধও নেই।

সুনির্দিষ্ট দৃষ্টান্তের অনুপস্থিতিতে বাংলায় হোসেন শাহী আমলে বিরাজমান মন্দিরের ধরণ সম্পর্কে ধারণা করা অত্যন্ত দুরূহ। মধ্যযুগের এখনও বর্তমান হিন্দু অট্টালিকা সম্পর্কে গবেষণা চূড়ান্তভাবে প্রমাণ করেছে যে মুসলমান আমলে পরিমার্জিতরূপে প্রাচীন রেখা ধরনের মন্দির নির্মাণ অব্যাহত ছিল।[৬২] এ ধরনের প্রতিটি নমুনা সাধারণত নিচু ভিত্তির ওপর একটি বিমান, বিভিন্ন রকম নকশা খোদাইকৃত একটি লম্বায়িত শিখর এবং একটি মণ্ডপ নিয়ে গঠিত। গোটা অট্টালিকার শীর্ষে রয়েছে প্রকাণ্ড এক আমলকশীলা। খ্রিস্ট্রীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়ে ওঠা চৌচালা ধরনের মন্দির পর্যালোচনাধীন আমলেও নির্মিত হয়েছিল কিনা তা স্পষ্টভাবে জানা যায় না। একই শতাব্দীতে বিষ্ণুপুরে নির্মিত কিছু মন্দির যথেষ্ট বিকশিত এ রীতির প্রতিনিধিত্ব করে এবং এরফলে মনে করা যায় যে আগেই এর উদ্ভব হয়েছিল।[৬৩] রেখা রীতিতে উড়িষ্যার সুস্পষ্ট প্রভাব দেখা গেলেও চৌচালা নমুনায় মসজিদ স্থাপত্য থেকে ধার করা গঠনশৈলী ও অলঙ্করণ সংক্রান্ত বেশকিছু বৈশিষ্ট্য দেখতে পাওয়া যায়। এ বৈশিষ্ট্যগুলি হচ্ছে আর্কুয়েট (arcuate) পদ্ধতি, প্রধান কক্ষের তিনদিকে বিস্তৃত বারান্দা, সামনের দিকে প্রচুর পোড়ামাটির অলঙ্করণ এবং একটা বিশেষ ধরনের বেঁটে ও মোটাসোটা থাম বিশিষ্ট সামনের ও পাশের নির্দিষ্টসংখ্যক প্রবেশ পথ। সুতরাং এর দ্বিতীয় ধরন হচ্ছে স্থানীয় চৌচালা পদ্ধতি ও গুরুত্বপূর্ণ ভারতীয় মুসলিম উপাদানের সংমিশ্রণ। এটা লিন্টেল পদ্ধতির পরিবর্তে আর্কুয়েট পদ্ধতিকে গ্রহণ করে বাংলার মন্দির স্থাপত্যশিল্পে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তনের সূচনা করেছিল। নিচে যেমন নির্দেশিত হয়েছে, কদম রসুলের মতো মুসলমান অট্টালিকাগুলি এ ধরনের মন্দির স্থাপত্যের আগেই করা হয়েছিল। আবার চৌচালা ছাদের রীতি ছোট সোনা মসজিদের কেন্দ্রীয় প্রার্থনাকক্ষে অনুসরণ করা হয়েছে এবং পর্যালোচনাধীন সময়কালের কোনো কোনো অট্টালিকার কার্নিশ ও ছিদ্র-প্রাচীরে এর বক্রতা অনুকরণ করা হয়েছে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে এ আমলের বাংলার পুরাকীর্তিগুলির কিছু কিছু স্থাপত্যবৈশিষ্ট্য গুজরাটে খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে নির্মিত অট্টালিকাগুলির অনুরূপ। ছোট সোনা মসজিদের দু'টি প্রবেশপথের স্তম্ভশীর্ষের প্রধান কড়িকাঠগুলি[৬৪] আশ্চর্যজনকভাবে জুনাগড়ের জুমা মসজিদের মিহরাবে ব্যবহৃত কড়িকাঠগুলির সদৃশ।[৬৫] গৌড়ের বর্গাকার

কক্ষবিশিষ্ট অট্টালিকাগুলির একটিতে সারখেজের শেখ আহমদ খট্টীর (১৪৪১-৫১ খ্রিঃ) সমাধিসৌধের কেন্দ্রীয় বর্গাকার কক্ষের প্রতিটি কোণে অতিরিক্ত স্তম্ভস্থাপনের পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। গুজরাটের এ অট্টালিকায় বর্গাকার কক্ষের প্রতি কোণে এভাবে সৃষ্ট শূন্যস্থান অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হয় এবং এটা মোটেই দৃষ্টিনন্দন নয়। বাঙালি স্থপতিগণ সম্ভবত প্রযুক্তিগত এ ত্রুটি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তাঁরা কক্ষটিকে মনোরম রূপ দেবার উদ্দেশ্যে এ অপ্রয়োজনীয় শূন্যতাকে ইট দিয়ে ভরাট করে দেবার প্রয়োজনীয়তা দেখতে পেয়েছিলেন। ছোট সোনা ও পূর্ববর্তী সময়ের আদিনা মসজিদের প্রত্যেকটির কেন্দ্রীয় প্রার্থনাকক্ষ দু'টি পার্শ্ববর্তী বারান্দা ও উত্তর-পশ্চিম কোণের একটি মহিলা কক্ষ দ্বারা বেষ্টিত। এগুলি দেখতে উত্তর ভারতীয় মসজিদের চেয়ে বরং আহমদাবাদের মসজিদগুলির[৬৬] অধিকতরসদৃশ। গৌড়ের দরসবাড়ি মসজিদের (১৪৭৯ খ্রিঃ) পোড়ামাটির অলঙ্করণের বিস্তারিত পত্রগুচ্ছ সহ তালগাছ ও লতাপাতার অলঙ্করণ আহমদাবাদের সিদি সৈয়দ মসজিদের[৬৭] (১৫১০-১৫ খ্রিঃ) জালি পর্দায় অঙ্কিত অলঙ্করণের প্রায় সদৃশ। অবশ্য সিদি সৈয়দের মসজিদের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এর জালির রুচিশীল ধারা ও কমনীয় গতিময়তা পূর্বোক্ত অট্টালিকায় নেই। ৯৯০হিঃ/১৫৮২ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হজরত পাণ্ডুয়ার কুতুব শাহী মসজিদে বক্রাকার ছিদ্র-প্রাচীর ও চারকোণে প্রচলিত কারুকাজ সহ চারটি ক্ষুদ্র বুরুজ, পাথরের ব্যবহার এবং দেয়ালে গিলটি কাজের সম্ভাব্য উপস্থিতির[৬৮] মতো হোসেন শাহী আমলের অট্টালিকাদির বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এর মিম্বরের সামনে একটি বর্গাকার মঞ্চ রয়েছে[৬৯] যা শেখ আহমদ খট্টীর সমাধিসৌধের (১৪৫১ খ্রিঃ) কাছে মসজিদেও দেখা যায়। মনে হয় যে এ সবই বাংলা ও গুজরাটের মধ্যে শৈল্পিক ধ্যান-ধারণা ও বিন্যাস প্রণালী বিনিময়ের এক দীর্ঘ প্রক্রিয়া নির্দেশ করে। বহির্বাণিজ্য ঐ সময় দীর্ঘ দূরত্বে অবস্থিত এ দুই দেশের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনকে সহজ করে থাকতে পারে। নসরতশাহ গুজরাটের বাহাদুর শাহের সঙ্গে রাজনৈতিক মৈত্রী প্রায় স্থাপন করতে যাচ্ছিলেন। কথিত আছে যে সামুদ্রিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাংলার শক্তিশালী অবস্থান সম্পর্কে বাহাদুর শাহ নিশ্চিতভাবে অবগত ছিলেন।[৭০] চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে এ ধরনের যোগাযোগ থাকা খুবই সম্ভাব্য বলে মনে হয়। আগেই যেমন উল্লেখ করা হয়েছে যে পর্যালোচনাধীন সময়কালের বাংলার কিছু কিছু প্রশাসনিক ও লিপিগত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে পঞ্চদশ শতকের গুজরাটের সাদৃশ্য রয়েছে যা এ ইঙ্গিত দান করে যে এ দু'টি দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল।

হোসেন শাহী শাসকরা যে রীতির বিকাশ ঘটিয়েছিলেন সেটা মধ্যযুগের মন্দির স্থাপত্যকে প্রভাবিত করেছিল বলে মনে হয়। সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগের বিষ্ণুপুরের মন্দিরের সম্মুখভাগের সঙ্গে কদম রসুল[৭১] অট্টালিকার সম্মুখভাগের অনেক ক্ষেত্রেই সাদৃশ্য রয়েছে। দু'টিতেই খিলানযুক্ত প্রবেশপথ রয়েছে যেগুলি বেঁটে ও মোটা থামের ওপর ভর করে আছে। এ প্রবেশপথগুলির উপরিভাগে বক্র কার্নিশ ও ছিদ্র-প্রাচীর রয়েছে। বিষ্ণুপুর মন্দিরের সম্মুখভাগে বিশদ অলঙ্করণ রয়েছে যা কদমরসুলের সম্মুখভাগেও দেখা যায়, যদিও শেষোক্তটি মুসলমান অট্টালিকা হওয়ায় এর দেয়ালে দেব-দেবীর মূর্তি প্রদর্শন

করা হয় নি। উল্লিখিত হিন্দু মন্দিরের খিলানের উপরে সূক্ষ্মাগ্র নকশা গৌড়ের ছোট মসজিদসহ মুসলমান অট্টালিকাগুলিতে প্রাপ্ত নকশার সদৃশ। এ রীতির অন্য একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে দিনাজপুরের কান্তনগর মন্দির। আবার দিমাপুর তোরণের পার্শ্বদিকে বুরুজ, বক্র ছিদ্র-প্রাচীর এবং প্রবেশপথে একটি সূক্ষ্মাগ্র খিলান রয়েছে।[৭২] এটাকেও বাংলায় বিকশিত স্থাপত্যরীতির অনুকরণ বলে মনে হয়। গৌড়ের বড় সোনা মসজিদের প্রাঙ্গণের তোরণের সঙ্গে এর যথেষ্ট অনুকূল তুলনা করা চলে।[৭৩]

ইলিয়াস শাহী শাসকবৃন্দ ছিলেন বাংলার স্থাপত্যশিল্পের সহজ সরল পর্যায়ের প্রতিনিধিত্বকারী। হোসেন শাহী শাসন প্রতিষ্ঠার ফলে এর সমাপ্তি ঘটেছিল বলে মনে হয়। হোসেন শাহী শাসকবৃন্দ ছিলেন শৈল্পিক মাধুর্য ও রুচিশীলতার অনুকূলে। পর্যালোচনাধীন সময়কালের সুলতানরা আর পূর্ব আমলের শক্ত সবল ও বৃহদায়তন ধরনের অট্টালিকা তৈরি করতে পারেন নি। বড় সোনা মসজিদ, ছোট সোনা মসজিদ এবং লট্টন মসজিদের প্রত্যেকটিতেই অলঙ্করণের একটি প্রবণতা রয়েছে যা পূর্ববর্তী অট্টালিকাগুলিতে অনুপস্থিত।

এ আমলে পাথর-খোদাই শিল্পের প্রাধান্য আমরা দেখতে পাই। প্রাক-হোসেন শাহী আমলে উৎকীর্ণ লিপি খণ্ড ও প্রস্তর স্তম্ভের ব্যবহার যে সাধারণভাবে প্রচলিত ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই; কিন্তু সে আমলে অন্যান্য ধরনের প্রস্তর-শিল্প ছিল তুলনামূলকভাবে বিরল। গৌড়ীয় স্থাপত্যের ইটের রীতির প্রাণবন্ত হৃদয়গ্রাহিতা এ আমলের পাথর-খোদাই রীতিতে ছিল না।

বিবেচ্য সময়কালে নির্মাতারা কিছুটা পরিবর্তন করে ইলিয়াস শাহীদের দ্বারা বিকশিত স্থাপত্যের অধিকাংশ অবয়ব ও বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করেছিলেন। পূর্ববর্তী মুসলমান শাসনামলে পুনরুজ্জীবিত পোড়ামাটির পুরাতন শিল্প হোসেন শাহী সুলতানদের আমলে অব্যাহত ছিল। স্থাপত্যশিল্পে অভিব্যক্ত স্থানীয় উপাদানগুলির মধ্যে রয়েছে কার্নিশ ও ছিদ্র-প্রাচীরের বক্রতা এবং চৌচালার অনুকরণ। বাঁশের কুটিরের বক্রতা প্রথম দেখা যায় একলাখী সমাধিসৌধের ছিদ্র-প্রাচীর ও কার্নিশে। এটা দেখা যায় এর পরবর্তী ইলিয়াস শাহী শাসকদের অট্টালিকাগুলিতে। আগেই যেমন নির্দেশ করা হয়েছে, হোসেন শাহী আমলের অট্টালিকাগুলিতে এটা বহাল ছিল। বাগেরহাটের ষাট-গম্বুজ মসজিদে চৌচালার সর্বপ্রথম অনুকরণ দেখা যায়। এটা তৈরি করেছিলেন খান জাহান। তিনি ১৪৫৯ সালে মারা যান। এ ধরনের পিরামিড গম্বুজ ছোট সোনা মসজিদ এবং লট্টন মসজিদে দেখতে পাওয়া যায়। এ দু'টিই আমাদের পর্যালোচনাধীন সময়কালের। হোসেন শাহী শাসকদের কারিগররা পাথরে পোড়ামাটির কাজের অনুকরণ করতে শুরু করেন। কিন্তু এ অনুক্রিয়াজাত শিল্প নিজস্ব বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত মূল-শিল্পের প্রাণবন্ত হৃদয়গ্রাহিতা ফুটিয়ে তুলতে ব্যর্থ হয়। কাজেই মনে হয় যে স্থাপত্যশিল্পের অবনতি হোসেন শাহী আমলে লক্ষ্য করা যায়। তবুও এ আমলের স্থাপত্য স্পষ্টভাবে স্থানীয় প্রভাবগুলি এবং বাংলার জীবনধারা ও সংস্কৃতি প্রকাশ করে। অলঙ্করণসমৃদ্ধ হোসেন শাহী রীতি ছিল পূর্ববর্তী পর্যায়ের অনাড়ম্বর রীতির বিপরীত।

টীকা

১. গিয়াসকে জররীন-দস্ত উপাধি দেওয়া হয়েছিল। ব্লখম্যান মনে করেন যে তিনি ছিলেন সিকান্দর শাহের কাতিব; ৭৬৫হিঃ/১৩৬৩ সালের সিকান্দর শাহের লিপি দেখুন; জে. এ. এস. বি. ১৮৭২, নং ১, পৃ. ১০৫; দানী : বিব্লিওগ্রাফি, পৃ. ১২।

২. আইন, অনূদিত ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৬, ১০৯ এবং ১১৪। জাফর হাসান : "স্পেসিমেন্স অফ ক্যালিগ্রাফি ইন দি দিল্লী মিউজিয়াম", মেময়েরস অফ দি আর্কিওলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া, নং ২৯, পৃ. ১০।

৩. এ আমলের অধিকাংশ মুদ্রায় নসখ রীতি দেখতে পাওয়া যায়। জালালউদ্দীন মোহাম্মদ শাহ, নাসিরউদ্দীন মাহমুদ শাহ এবং রুকনউদ্দীন বারবক শাহের অল্প কয়েকটি মুদ্রা তুঘরা রীতিতে উৎকীর্ণ। উৎকীর্ণ মুদ্রায় তুঘরার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে দেখুন, লেইন-পুল : পূর্বোল্লিখিত, প্লেট ৪ নং, ৮১, ৮৩ (শুধু উল্টা পিঠে তুঘরা রীতি), ৮৫ (শুধু উল্টা পিঠ) এবং ৮৭; এইচ. এন. রাইট : ক্যাটালগ, ২য় খণ্ড, ২য় অংশ, বাংলা, প্লেট ৩, নং ১০৬, ১১০ (শুধু ওপর পিঠ দেখুন), ১১১ (শুধু ওপর দিক) এবং ১২৫ (শুধু ওপর দিক)। আদিনা মসজিদের লিপির উপরের প্যানেলে কুফিক রীতির লিখন এবং নিচের প্যানেলে তুঘরা রীতির লিখন দেখা যায়; দেখুন ইন্ডো-ইরানিকা, ৪র্থ খণ্ড, নং ২-৪, চিত্র ১; আরও দেখুন জে. এ. এস. বি. ১৮৭৩, ১ম অংশ, পৃ. ২৫৬-৫৭। ৮৮৭ হিজরির জালালউদ্দীন ফতেহ শাহের রাজশাহী লিপিতে নসখ রীতি দেখা যায়; দেখুন ভি. আর. এস. মনোগ্রাফস, নং ৬, মার্চ ১৯৩৫, প্লেট ২; এস. আহমদ : ইনস্ক্রিপশন্স, চিত্র ২৯। এ লিপিটি মনে হয় নস্খ থেকে সুল্স রীতিতে উত্তরণ নির্দেশ করে কারণ এতে শেষোক্ত রীতির সামান্য লক্ষণ রয়েছে। ৮৮০ হিজরির সাইফউদ্দীন ফিরুজের বিরল লিপিতে সুল্স রীতি দেখা যায়; প্রাগুক্ত, চিত্র ৩১। ৮৬৩ হিজরীর নাসিরউদ্দীন মাহমুদ শাহের পাণ্ডুয়া লিপিতে একই রীতি দেখা যায়। এটাতে স্তম্ভগুলি সুব্যবস্থিত কিন্তু বক্ররেখাগুলি অসমঞ্জস ও উপেক্ষিত; জে. এ. এস. বি. ১৮৭৩, ১ম অংশ, প্লেট ৫, চিত্র ৪; এস. আহমদ : ইনস্ক্রিপশন্স, চিত্র ২০। ঢাকার বন্দরে প্রাপ্ত ফতেহশাহের ৮৮৬ হিজরির লিপিতে (জে. এ. এস. বি. ১৮৭৩, প্লেট ৭, নং ১) সুলস এর হাল্কারীতি (খাফি) দেখা যায়। ২য় নাসিরউদ্দীন মাহমুদ শাহের হজরত পাণ্ডুয়া লিপিতে (প্রাগুক্ত, প্লেট ৭, নং ৩; এস. আহমদ : ইনস্ক্রিপশন্স, চিত্র ৩৩) তুঘরার বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত সুলসের স্পষ্ট (জলী) রীতি দেখা যায়। সিকান্দর শাহের ৭৭০ হিজরির হজরত পাণ্ডুয়ালিপি তুঘরা রীতির নমুনা ; জে. এ. এস. বি. ১৮৭৩, প্লেট , নং ৩; এস. আহমদ : ইনস্ক্রিপশন্স, চিত্র ১৪। বারবক শাহের পাঁচটি লিপিতে নস্খ ও তুঘরা রীতি দেখা যায়; ই. আই, ১৯৫৩-৫৪ (অ্যারাবিক অ্যান্ড পার্সিয়ান সাপ্লিমেন্ট), প্লেট ৭ (ক) এবং ৮।

৪. ইন্ডো-ইরানিকা, ৪র্থ খণ্ড, নং ২-৪, চিত্র ৭।

৫. এটা নস্খ রীতির লিখনেরও যথাযথ বৈশিষ্ট্য; আইন, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৬।

৬. জে. এ. এস. বি. ১৮৭৩, প্লেট নং ২; এস. আহমদ : ইনস্ক্রিপশন্স, চিত্র ৪৯।

৭. সৈয়দ আওলাদ হোসেন : নোটস অন দি অ্যান্টিকুইটিজ অফ ঢাকা, পৃ. ৫৫।

৮. মেময়েরস অফ দি আর্কিওলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া, নং ২৯, পৃ. ১৮।

৯. ই. আই. (অ্যারাবিক অ্যান্ড পার্সিয়ান সাপ্লিমেন্ট) ১৯৫১-৫২. – প্লেট ১১, চিত্র ক ও খ।

১০. এ জেনারেল গাইড টু দি ঢাকা মিউজিয়াম, পৃ. ৪৫ ও ৪৯।

১১. ই. আই. এম. ১৯১১-১২, প্লেট ৩১।

১২. আই. এইচ. কিউ. ১৯৫০, পৃ. ১৮৩ এর মুখোমুখি প্লেট; জে. এ. এস. বি. ১৮৭১, ১ম অংশ, প্লেট ৪ ও ৫।

১৩. ভি. আর. এস. মনোগ্রাফস, নং ৬, মার্চ ১৯৩৫, প্লেট ৩; এস. আহমদ : ইনস্ক্রিপশন্স, চিত্র ৫০।

১৪. জে. এ. এস. বি. ১৯১৭, প্লেট ৩; এস. আহমদ : ইনস্ক্রিপশন্স, চিত্র ৩৮।

১৫. জাফর হাসান : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১।

১৬. কুওত-উল-ইসলাম মসজিদ, আজমীরের আড়াই দিন কা ঝোপড়া মসজিদ এবং সুলতান ঘারি ও ইলতুৎমিশের সমাধিতে কুফিক লিপি দেখা যায়; ই. আই. এম. ১৯১১-১২; প্লেট ১৬ ও ২৭।

১৭. আইন, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৯; তুলনীয় জে. এ. এস. বি. ১৯৫৮, পৃ. ২১২।

১৮. লেইন-পুল : পূর্বোল্লোখিত, প্লেট ৯, নং ২৬৩ (শুধু উপর পিঠ দেখুন); এইচ. এন. রাইট: ক্যাটালগ, ২য় খণ্ড, ২য় অংশ, প্লেট ৮, নং ১ ও ১১০ (পিছনের দিক শুধু)।

১৯. ইন্ডো-ইরানিকা, ৪র্থ খণ্ড, নং ২-৪, পৃ. ১৮; আরও দেখুন পৃ. ১৬ এর মুখোমুখি প্লেটে চিত্র ১১।

২০. সেলিম : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১৩৩; ফিরিশতা : পূর্বোল্লিখিত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩০২।

২১. এ লিপিটি তীর-ধনুক রীতির তুঘরার সবচেয়ে সুন্দর নমুনাগুলির মধ্যে একটি : জে. এ. এস. বি. ১৮৭৩, প্লেট ৪, চিত্র নং ২; ইন্ডো-ইরানিকা, পূর্বোল্লিখিত, চিত্র ৪; এস. আহমদ: ইনস্ক্রিপশন্স, চিত্র ৩৫; আরও তুলনীয়, চিত্র ৩৬।

২২. এম. এ. চাঘতাই : পূর্বোল্লিখিত, প্লেট ৪-৬, নং ৮, ১০ক, ১৩, ১৪ ইত্যাদি।

২৩. উপরে পৃ. ১০৯ ও বর্তমান পরিচ্ছেদের ৩য় অংশ।

২৪. মোগল বিজয়ের পর তীর-ধনুক রীতির তুঘরা অন্তর্হিত হয়ে যায় বলে মনে হলেও অন্যান্য রীতির তুঘরার অনুশীলন বজায় থাকে। সরকারি সীলমোহর ও স্বাক্ষর প্রায়ই তুঘরা প্রকৃতির ছিল; ভট্টশালীর তৈফুর সংগ্রহে শাহ সুজার দলিলটি দেখুন, প্লেট-১টি। দলিলের শীর্ষে তুঘরা রীতিতে শাহজাহান ও সুজার স্বাক্ষর দেখা যায়।

২৫. বিপ্রদাস : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৬, ৪৬, ৫৪, ৫৭ ইত্যাদি; বিজয়গুপ্ত : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৪১; চণ্ডীদাস : শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন, পৃ. ৩, ৬, ৯, ১২, ১৪, ১৮, ২২, ৩০, ৩১, ৬২, ৭৫ ইত্যাদি; শ্রীধর : বিদ্যাসুন্দর, পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১২০-২৩, ১২৫, ১২৯-৩০ এবং ১৩২-৩৩। বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য-ভাগবত ও লোচনদাসের চৈতন্য-মঙ্গল সহ অন্যান্য বাংলা কাব্যেও এগুলির উল্লেখ রয়েছে।

দাসের চৈতন্য-ভাগবত ও লোচনদাসের চৈতন্য-মঙ্গল সহ অন্যান্য বাংলা কাব্যেও এগুলির উল্লেখ রয়েছে।

২৬. লেগেসি অফ ইন্ডিয়া, পৃ. ৩২০-২১; এ. এইচ. ফক্স স্ট্র্যাংওয়েজ : দি মিউজিক অফ হিন্দুস্তান, পৃ. ১৭০-৭১।

২৭. বিজয় গুপ্ত : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৯২; শ্রীধর : বিদ্যা-সুন্দর, পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১২০; চণ্ডীদাস : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৭০, ৭১ এবং ১১৪; এ বিষয়ে দেখুন নীহাররঞ্জন রায় : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৭৬৯।

২৮. চণ্ডীদাস, বৃন্দাবনদাস এবং লোচনদাসের গ্রন্থে এগুলি প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়।

২৯. এ. হালিম : "নর্থ ইন্ডিয়ান মিউজিক", জে. এ. এস. বি. ১৯৫৬, ১ম খণ্ড, নং ১, পৃ. ৫৯-৬০; লেগেসি অফ ইন্ডিয়া, পৃ. ২৯৩।

৩০. পূর্বোল্লিখিত মৃগাবতীর উদ্ধৃতাংশ দেখুন, পৃ. ৪৮৬-৮৭। কুতবনের উল্লিখিত অন্যান্য রাগগুলি হচ্ছে মধিমালতি, বৈরাতিক, গুণকি, কৌশিক, গৌরি, দেওকলি, খনভাবতি, কুনকুম্ভ, হিন্দোল, বৈরারি, নত্ত, সহজগৃতা, অবধি, দীপকদ, কনোদ, পঞ্চবরঙ্গনা, কেরই, মেঘ,মলসরি (মালশ্রী বা বাংলায় মালসি), মারঙ্গি, কান্ধারি, হেমকলি, ভুইউ, ভিলামি এবং খত্তো; প্রাগুক্ত।

৩১. এ. হালিম : "নর্থ ইন্ডিয়ান মিউজিক", পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৫৯।

৩২. পূর্বোল্লিখিত, মধ্য, পৃ. ৮।

৩৩. পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৩২, গান নং ১৮; আরও দেখুন গান নং ২ ও ৩।

৩৪. বাংলা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ, ১ম অংশ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৯, ১০৫-৬, ১১৭-১৮, ১৪৩ এবং ১৮৭-তে আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ এসব গ্রন্থের বিবরণ দিয়েছেন।

৩৫. এস. কে. দে কর্তৃক উদ্ধৃত : দি আর্লি হিস্ট্রি অফ বৈষ্ণব ফেইথ ইত্যাদি, পৃ. ৪৬৩।

৩৬. বিজয় গুপ্ত : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৯১, ৯৪, ১০০, ১০১; বৃন্দাবন দাস : পূর্বোল্লিখিত, মধ্য অষ্টম, পৃ. ১৭৩, ত্রয়োবিংশ, ২৭২, ছাব্বিশ, ২৯৫; লোচনদাস : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১৯, ৩৪, আদি; চণ্ডীদাস : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১৬, ৩২, ১০৬ ইত্যাদি।

৩৭. বৃন্দাবন দাস : পূর্বোল্লিখিত, অন্ত্য, ৪র্থ, পৃ. ৩৬২।

৩৮. এস. কে. দে : আর্লি হিস্ট্রি অফ দি বৈষ্ণব ফেইথ, পৃ. ৪৬৩।

৩৯. বিশ্বভারতী অ্যানালস, ১৯৪৫, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২৪-২৫; জে. আর. এ. এস, ১৮৯৫, পৃ. ৫৩২।

৪০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩৩; বিশ্বভারতী অ্যানালস, পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১২৪।

৪১. কৃষ্ণদাস কবিরাজ : চৈতন্য-চরিতামৃত, মধ্য, ১ম, পৃ. ৭৭।

৪২. তপন কুমার রায় চৌধুরী : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১৫৬।

৪৩. বৃহৎ বঙ্গ, ২য়, বৈষ্ণব চিত্র প্রদর্শনকারী প্লেটগুলি দেখুন।

৪৪. কানিংহাম মন্তব্য করেছেন যে মসজিদের বহির্ভাগ একসময় সবুজ, হলুদ, নীল এবং সাদা রং এর টালির বিভিন্ন নকশা দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল, নামাজের জায়গার উপরের খিলানের মনোরম দৃশ্য "স্প্যানড্রিলের (Spandril) বিভিন্ন রং এর সংকীর্ণ অনুভূমিক রেখা সম্পূর্ণভাবে নষ্ট করে দিয়েছে" এবং "স্প্যানড্রিলের মাঝে নীল ও সাদা পদ্মফুলগুলি সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক, সবগুলি কার্নিস যথার্থ এবং গম্বুজের চারপাশের ছিদ্র-প্রাচীরগুলি, যেখানে সেগুলি আবহাওয়ার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে, সেগুলিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয়েছে যা অভ্যন্তরের নকশায় অনুপস্থিত।" পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৬৩-৬৫; তুলনীয়, এ. এইচ. দানী : মুসলিম আর্কিটেকচার, পৃ. ১১৩-১৪।

৪৫. এইচ. ক্রেটন : দি রুইন্স অফ গৌড়, নং ৯।

৪৬. পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৬২।

৪৭. আবিদ আলী ৯১৮ হিঃ/১৫১২ সালের একটি লিপির সঙ্গে একে সম্পর্কিত করার পক্ষপাতী, পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৬৭।

৪৮. এ লিপির জন্য দেখুন কানিংহাম : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৫৫; ই. জি. গ্লেজিয়ার : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১০৮; জে. এ. এস. বি. ১৮৭২, ১ম অংশ, পৃ. ৩৩৮; র‍্যাভেনশ : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ২০, প্লেট ৫৭, নং ২৩; ই. আই. ২য় খণ্ড, পৃ. ২৮৬; আবিদ আলী : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৬১-৬২।

৪৯. পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৪১।

৫০. পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৪১-৪২।

৫১. পূর্বোল্লিখিত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৫৬।

৫২. ক্রেটন : পূর্বোল্লিখিত, নং ১১; কানিংহাম : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৫৪; ফার্গুসন : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ২৫৬ এবং ই. বি. হ্যাভেল : ইন্ডিয়ান আর্কিটেকচার, ইটস সাইকোলজি, স্ট্রাকচার ইত্যাদি, পৃ. ৫৯ ও ১২৭। কিন্তু তুলনার জন্য দেখুন দানী : মুসলিম আর্কিটেকচার, পৃ. ১২৮। সেখানে এ মতকে খণ্ডন করা হয়েছে।

৫৩. মসজিদের মাঝখানের প্রবেশপথের উপরে সংলগ্ন লিপিতে এ তারিখটি দেওয়া আছে, দেখুন জে. এ. এস. বি. ৪১, ১৮৭২, ১ম অংশ, পৃ. ৩৩৯; কানিংহাম : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৭৩; র‍্যাভেনশ : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১০, প্লেট ৫৮, নং ২৫ এবং আবিদ আলী : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৯৩; এস. আহমদ : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ২৩৮।

৫৪. সরসী কুমার সরস্বতী : "ইন্ডো-মুসলিম আর্কিটেকচার ইন বেঙ্গল", জে. আই. এস. ও এ. ১৯৪১, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৩। উপাদানের ভিত্তিতে শ্রেণীবিভাজনের একই রীতি এ. এইচ. দানীও অনুসরণ করেছেন, মুসলিম আর্কিটেকচার, পৃ. ১১৮ ও ১২৯।

৫৫. কানিংহাম : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৯০, প্লেট ২৫; আবিদ আলী : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১২৭ এবং চিত্র ২৪, পৃ. ১২৮; দানী : মুসলিম আর্কিটেকচার, পৃ. ১৩৮-৩৯।

৫৭. তুলনীয়, দানী : মুসলিম আর্কিটেকচার, পৃ. ১৬১।

৫৮. জে. এ. এস. বি. ১৯০৪, খণ্ড ৬৩, পৃ. ১১১।

৫৯. এ অট্টালিকার বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন কানিংহাম : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৬১-৬২; ক্রেটন : পূর্বোল্লিখিত, প্লেট ১২; আবিদ আলী : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৭০-৭২; তুলনীয়, সরস্বতী : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ২৮; দানী : মুসলিম আর্কিটেকচার, পৃ. ১৫৯।

৬০. ই. আই. এম, ১৯৩৭-৩৮, পৃ. ৩৭-৩৮।

৬১. দানী : মুসলিম আর্কিটেকচার, পৃ. ১৫৭-৫৯।

৬২. বর্ধমানের বরকরে এ ধরনের একটি মন্দিরের তারিখ হচ্ছে ১৩৮২ শকাব্দ/১৪৬১ খ্রিস্টাব্দ, দেখুন, ভট্টশালী : আইকনোগ্রাফি অফ বুডিড্স্ট অ্যান্ড ব্রাহমনিকাল স্কাল্পচারস ইন দি ঢাকা মিউজিয়াম, পৃ. ১৭। মুসলমান আমলে নির্মিত এ ধরনের মন্দিরের জন্য দেখুন, প্রাগুক্ত, প্লেট, ৮১, (চিত্র ক ছাড়া); এস. কে. সরস্বতী : "দি বেগুনিয়া গ্রুপ অব টেম্পলস", জে. আই. এস. ও. এ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২৪-২৮, প্লেট ৩৬। সরস্বতী বহু মন্দিরের উল্লেখ করেছেন "সেগুলির তারিখ খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতকের পূর্বে নির্ধারণ করা যায় না।" হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫০২।

৬৩. সুলতানি আমলের উদার নীতিকে এ ধরনের মন্দিরের বিকাশের একটি বড় কারণ রূপে বিবেচনা করা হয়। এম. এম. চক্রবর্তী : "বেঙ্গলি টেম্পলস অ্যান্ড দেয়ার জেনারেল ক্যারেক্টারিস্টিকস", জে. এ. এস. বি. ১৯০৯, পৃ. ১৪১-৫১; চিত্রের জন্য দেখুন, প্রাগুক্ত, চিত্র ১-১০।

৬৪. পার্সি ব্রাউন : পূর্বোল্লিখিত, প্লেট ২৮, চিত্র ২; আবিদ আলী : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৮০, চিত্র ১৭ এবং হ্যাভেল : পূর্বোল্লিখিত, প্লেট ৩১।

৬৫. হ্যাভেল : পূর্বোল্লিখিত, প্লেট ৩২।

৬৬. পার্সি ব্রাউনের চিত্র দ্বারা ব্যাখ্যাত কেন্দ্রীয় প্রার্থনাকক্ষ ও মহিলাদের কক্ষসহ আহমেদাবাদের জুমা মসজিদ দেখুন : পূর্বোল্লিখিত, প্লেট ৩৪ ও ৩৫, চিত্র ১ এবং হ্যাভেল : পূর্বোল্লিখিত, প্লেট ২৫; উপরে পৃ. ও পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহ।

৬৭. পার্সি ব্রাউন : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৪১, প্লেট ৪১, চিত্র ১; ফার্গুসন : পূর্বোল্লিখিত, ২৩৭ পৃষ্ঠায় নং ৩৯৪ এবং হ্যাভেল : পূর্বোল্লিখিত, প্লেট ৬২ ও ৫৮।

৬৮. কানিংহাম : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৮৬-৮৮ এবং আবিদ আলী : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১২১, চিত্র ২১।

৬৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২, চিত্র ২২।

৭০. জোয়াও ডি ব্যারোস : পূর্বোল্লিখিত, বুক অফ ডুয়ার্তে বারবোসা, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪৬ এ পুনর্মুদ্রিত।

৭১. এস. কে. সরস্বতী : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৩৪।

৭২. গেইট : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ২৪৫ এর মুখোমুখি প্লেট।

৭৩. আবিদ আলী : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৪৪, চিত্র ৬।

নবম পরিচ্ছেদ

জীবনচর্যা

দেশের সার্বিক সামাজিক ও ধর্মীয় কাঠামো গঠনকারী প্রধান দু'টি উপাদান ছিল ইসলাম ও হিন্দুধর্ম। এ দু'টি সমাজের প্রত্যেকটিকে আলাদাভাবে সতর্কতার সঙ্গে পরীক্ষা করা প্রয়োজন। দেশীয় সাহিত্যে মুসলমান সমাজ সম্পর্কে যে উল্লেখ রয়েছে তা অপ্রচুর ও অসম্পূর্ণ। এ থেকে স্পষ্টত অনুমান করা যায় যে, উঁচুশ্রেণীর বা দেশীয় নিচুশ্রেণীর মুসলমানদের সঙ্গে হিন্দু কবিদের কোনো যোগাযোগ ছিল না। বিজয়গুপ্ত, বিপ্রদাস এবং কবিকঙ্কণ মুসলমানদের সম্পর্কে যা বলেছেন তাকে ধারাবাহিকতাহীন বলেই মনে হয়। বিস্ময়কর হলো, এ দেশের রাজনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কে কিছুটা বিশদ বিবরণদানকারী ফার্সি উৎসগুলি সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে মোটামুটি নীরব। এসব সীমাবদ্ধতার কারণে হোসেন শাহী আমলের মুসলমান সমাজ সম্পর্কে আমাদের পর্যবেক্ষণ উপপ্রমেয়মূলক ও অনুমানমূলক; এ ব্যাপারে আমাদের সিদ্ধান্তগুলিও হবে অপরিহার্য ও পরীক্ষামূলক।

সমাজের শীর্ষে ছিলেন সুলতান। তাঁর সীমাহীন ক্ষমতা, জাঁকজমক, বাহ্যাড়ম্বর মানুষের মনে ভীতি ও শ্রদ্ধার উদ্রেক করত। খলিফাতুল্লাহ্ উপাধি গ্রহণ করে শাসকের ঐশ্বরিক অধিকারকে[১] জোরদার করার কোনো ইচ্ছা তাঁর ছিল কিনা তা জানা যায় না। কিন্তু তাঁর প্রজাদের তাঁকে শুধু 'জগৎ-ভূষণ' এবং 'নৃপতি-তিলকচিহ্ন' রূপেই শুধু নয়, 'কলিযুগে কৃষ্ণের অবতার' রূপেও উচ্চপ্রশংসা করার কারণ ছিল। সুলতানের পরে সুবিধাজনকভাবে সামরিক গভর্নর ও রাজস্ব-আদায়কারীদের স্থাপন করা যেতে পারে। মুসলমান ওয়াজীর কর্তৃক দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার রাজস্ব সংগ্রহকারী রামচন্দ্রের নিগৃহীত হওয়ার যে চিত্র চৈতন্য-চরিতামৃতে রয়েছে তা থেকে এ ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে সাধারণ রাজস্ব কর্মকর্তার পদমর্যাদা বাস্তবে প্রাদেশিক গভর্নরের চেয়ে নিম্নতর ছিল। জাঁকালো উপাধি ও সম্মানের অধিকারী অভিজাতবর্গ নিঃসন্দেহে মধ্যযুগের সমাজে এক বিশেষাধিকারভোগী স্থান দখল করেছিলেন। হোসেন শাহের হাতে কিভাবে অভিজাতবর্গের রূপান্তর ঘটেছিল অন্যত্র আমরা তা ব্যাখ্যা করেছি। তিনি হিন্দুদের সম্মানজনকপদে উন্নীত করার চেষ্টা করেছিলেন। সক্রিয় সমর্থন ও সহযোগিতার জন্য শাসককে অভিজাতবর্গের ওপর নির্ভর করতে হতো এবং তিনি প্রায়ই তাঁর জীবন ও সিংহাসনের জন্য শেষোক্তদের কাছে ঋণী থাকতেন। শীর্ষে রাজনৈতিক পরিবর্তন অবশ্য জনসাধারণের জন্য তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু ছিল না। বাবুর[২] যেমন উল্লেখ করেছেন, যে কোনো উপায়েই যে-কেউ বাংলার সিংহাসন দখল করতে পারলে জনসাধারণের সম্পূর্ণ আজ্ঞানুবর্তিতা লাভ করা তাঁর পক্ষে কঠিন হতো না।

সৈয়দ, মোগল, পাঠান এবং নগর ও শহরগুলিতে বসবাসকারী বহুসংখ্যক আরব ও

পারস্যদেশীয় ব্যবসায়ীদের নিয়ে গঠিত ছিল মুসলমান সমাজের উচ্চশ্রেণী।[৩] রিয়াজ-উস-সালাতীনের ভাষ্যানুযায়ী এই বহিরাগত মুসলমানদের কেউ কেউ গৌড়রাজ্যে গুরুত্বপূর্ণ সরকারি পদে আসীন হতেন।[৪] তখন পর্যন্ত ভারতের রাজনৈতিক প্রভু না হওয়া সত্ত্বেও মোগলরা যে দেশের মুসলমান জনগোষ্ঠীর এক সামাজিক উপাদান হিসেবে পরিগণিত হতে শুরু করেছিল সেটা স্পষ্টত প্রতীয়মান। বিপ্রদাসের মনসা-বিজয়ে মোঙ্গল শব্দটির উল্লেখ রয়েছে। তিনি মোঙ্গলদের পাঠানদের সঙ্গে জড়িত করেছেন।[৫] এটা খুবই সম্ভাব্য যে জালালউদ্দীন ও আলাউদ্দীন খলজী যে-সব মোঙ্গলকে দিল্লির আশেপাশে বাস করার অনুমতি দিয়েছিলেন[৬] তাদের মধ্যে কিছুসংখ্যক চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতকে অভিবাসনের জন্য বাংলায় এসেছিলেন। বাবুরের সঙ্গে নসরত শাহের কূটনৈতিক সম্পর্ক থাকায় এটাও সম্ভাব্য যে কিছুসংখ্যক মোগল তাঁর রাজত্বকালে বসবাসের জন্য বাংলায় এসেছিলেন। পাঠানরা অবশ্য ছিলেন যদিও তখন পর্যন্ত তাঁরা উত্তর ভারত থেকে বিতাড়িত হন নি বা বাংলার রাজনৈতিক প্রভুও হন নি। এর অল্প কিছুদিন পরই তাঁরা বাংলার রাজনৈতিক প্রভু হয়েছিলেন। কবিকঙ্কণ[৭] উল্লিখিত সুবালি, নেহালি, পনি, কুদানি ও অন্যান্য বহুসংখ্যক পাঠান গোত্র সম্ভবত হোসেন শাহী আমলেও ছিল; অন্যথায় কবিকঙ্কণের সময়ে হঠাৎ করে বাংলায় তাদের উপস্থিতি ব্যাখ্যা করা নিশ্চিতরূপেই দুরূহ। সমসাময়িক সুলতান হোসেন শাহ ছিলেন আরবোদ্ভূত। তিনি নিজেকে হোসেনের বংশধর বলে দাবি করতেন। সেই একই কারণ দিয়ে বহু সৈয়দের অভিবাসন ব্যাখ্যা করা যায় যারা এ দেশে পৌঁছে দেশের শাসকগোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। আগেই আলোচনা করা হয়েছে যে অধিকাংশ আরব ও পারস্যবাসী ব্যবসা-বাণিজ্যকে তাদের পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। করমণ্ডল ও মালাবারের যে বর্ণনা বার্বোসা দিয়েছেন তা থেকে পরিষ্কার দেখা যায় যে, ভারতের উপকূলীয় অঞ্চলে ইসলামের বিস্তারে আরব ও পারস্যবাসীদের বহুল অবদান ছিল। এ আমলে মালাবারে মৌপলার বা আরবরা নৌচালনা ও কৃষিকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছিল। শেষোক্ত পেশায় ছিল তাদের একচেটিয়া অধিকার।[৮] সেখানে অভিবাসী মুসলমানরা দেশীয় স্ত্রী গ্রহণ করছিলেন এবং দেশীয় জনগোষ্ঠীর আত্মীভূত হয়ে পড়েন। হোসেন শাহী আমলের বাংলায়ও একই ধরনের প্রক্রিয়া সক্রিয় ছিল বলে মনে হয়। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আঞ্চলিক ভূ-স্বামী হয়ে দাঁড়ান। পর্তুগিজ বার্বোসা যেমন নির্দেশ করেছেন, শহরাঞ্চলে সাদা লোকের কেন্দ্রীকরণ থেকে আরব ও পারস্যবাসীদের গৃহীত পেশাগুলির প্রকৃতি দেখতে পাওয়া যায়। এটা মোটামুটি নিশ্চিত যে আরব ও পারস্যবাসীদের মধ্যে অন্তর্বিবাহ ঘটত এবং এ থেকে জন্মগ্রহণকারী সন্তানরাও তাদের বংশধররা সমাজে যথেষ্ট সম্মান ও প্রতিপত্তির অধিকারী হতো। জন্মসূত্রে হোসেন শাহ ছিলেন আরব। তিনি মনে হয় একজন পারস্যবাসিনীর পাণি গ্রহণ করেছিলেন। কথিত আছে যে তিনি তাঁর পারস্যবাসিনী স্ত্রীর গর্ভজাত কন্যা রওশন আখতার বানুকে কুতুবুল আশগীনের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর বংশধররা মোগল শাসকদের আমল পর্যন্ত সোনারগাঁও সরকারে জমিদারির মালিক ছিলেন।[৯]

বার্বোসা সম্ভ্রান্ত মুসলমানদের জীবনযাত্রার যে বিবরণ দিয়েছেন তা থেকে দেখা যায়

যে তাঁরা সর্বতোভাবে অর্থনৈতিক প্রাচুর্য উপভোগ করতেন এবং বিলাসী ও "অমিতব্যয়ী" জীবন যাপন করতেন।[১০] শহর ও নগরে তাঁরা ইটের তৈরি অট্টালিকায় বাস করতেন। এগুলির ছাদ ছিল সমতল এবং এগুলিতে সোপান-শ্রেণী ছিল।[১১] স্নানের জন্য তাদের বাসগৃহ সংলগ্ন বিশাল দিঘি ছিল এবং তারা ব্যয়বহুল খাদ্য গ্রহণ করতেন। তারা অত্যন্ত সূক্ষ্ম, সাদা, গোড়ালি পর্যন্ত লম্বা পোশাক পরিধান করতেন। এর নিচে থাকত কাপড়ের কোমরবন্ধ এবং উপরে থাকত রেশমি চাদর। তারা মূল্যবান পাথর খচিত আংটি এবং পাগড়ি পরতেন এবং প্রকাশ্যে কোমরবন্ধে ছোরা বহন করতেন।[১২] কিছুটা আগের একটি চৈনিক বিবরণ অনুযায়ী গরু ও ছাগলের ধূমায়িত ও রোস্ট করা মাংস, কলা, কাঁঠাল ও ডালিম ছিল তাদের খাদ্যের অন্তর্ভুক্ত। খাওয়া শেষ হলে তারা মধু ও মিষ্টি গোলাপজল পান করতেন।[১৩] উচ্চশ্রেণীর মধ্যে মদ্যপান প্রচলিত ছিল। বার্বোসা প্রসঙ্গক্রমে সম্ভ্রান্ত মহিলাদের তালের রস থেকে তৈরি মদপানের উল্লেখ করেছেন।[১৪] বাংলার শহরগুলিতে মাহুয়ান বহু মদের দোকান দেখেছিলেন এবং তিনি মনে করেন যে নারিকেল, ভাত, ট্যারি এবং 'কদজং' থেকে মদ তৈরি হতো এবং কড়া মদ বাজারে বিক্রি হতো।[১৫] ধনী মুসলমানরা মাঝে মাঝে সামাজিক সমাবেশের আয়োজন করতেন এবং নাচ-গানে এগুলি জীবন্ত হয়ে উঠত। এ ধরনের উপলক্ষে তাঁরা গায়ক ও নর্তকীদের আমন্ত্রণ করতেন[১৬] যাদের রঙিন পোশাকও চোখ-ধাঁধানো অলঙ্কার আমোদ-প্রমোদের জাঁক-জমক ও মহিমা বৃদ্ধি করত।

বাংলার বিলাসিতার ধরন ছিল এমন বিভ্রান্তিকর যে কথিত আছে যে ১৫৩৮ সালে হুমায়ুন গৌড়ে এসে এর সুন্দর রাজপ্রাসাদগুলির দৃশ্য দেখে বিস্ময়াভিভূত হয়েছিলেন। এগুলিতে ঝর্না, ফুলের কেয়ারিপূর্ণ বাগান ও জলের জন্য পাথরের খাল ছিল। এসব প্রাসাদের কক্ষগুলির মেঝে ও ভিতরের দেয়ালে চীনদেশীয় টালি ব্যবহার করা হয়েছিল। এ কক্ষগুলিতে দামি আসবাবপত্র ও বিলাসবহুল পর্দা ছিল। গোটা পরিবেশটাই নিশ্চয়ই হুমায়ুনের মনে এক মোহিনী প্রভাব ফেলেছিল।[১৭]

ধনী মুসলমানদের বিলাসী অভ্যাসগুলি কিছু সামাজিক রীতির প্রচলনের জন্য দায়ী ছিল। তাদের মধ্যে বহু-বিবাহ ছিল বহুল প্রচলিত এবং তাদের স্ত্রীর সংখ্যার কোনো সীমা ছিল না। "এসব মহিলাদের জীবনযাপন নিজ নিজ গৃহের সীমানার মধ্যে সীমিত রাখা হলেও তারা এদের সঙ্গে ভাল আচরণ করত। তাঁরা এসব মহিলাকে প্রচুর সোনা-রূপার অলঙ্কার ও সূক্ষ্ম রেশমি বস্ত্র দিতেন।" মহিলারা শুধু রাতেই একত্রিত হতেন এবং তখন এ উপলক্ষে "প্রচুর আমোদ-প্রমোদ ও আনন্দোৎসব হতো এবং সুরার বন্যা বয়ে যেত।" বিভিন্ন ধরনের বাদ্যযন্ত্র তাঁরা দক্ষতার সঙ্গে বাজাতে পারতেন।[১৮] বার্বোসা সোনা, রূপা এবং সূক্ষ্ম রেশমি বস্ত্রের উল্লেখ করেছেন যা থেকে পরিষ্কার দেখা যায় যে উচ্চশ্রেণীর মহিলারা সোনা-রূপার গহনা ও রেশমি পোশাক পরতেন। চৈনিক বিবরণ এ বক্তব্যকে সমর্থন করে বলে মনে হয়।

উচ্চশ্রেণীর মানুষের জীবনের সঙ্গে উপ-পত্নী প্রথা ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল বলে মনে হয়। তৃতীয় মাহমুদ শাহের নারীর সংখ্যা ছিল দশ হাজার।[১৯] এ সংখ্যা দিয়েছেন দ্য

ব্যারোস যাঁর সুলতানের প্রতি বিরূপ হওয়ার যথেষ্ট কারণ থাকায় তিনি তার উপপত্নীদের সংখ্যার অতিরঞ্জন ঘটিয়েছেন। কিন্তু তাঁর বিবরণে যে কিছুটা সত্যতা আছে সেটা অস্বীকার করা যায় না কারণ বার্বোসা এ তথ্য সমর্থন করেছেন। বার্বোসা বলেছেন যে, সম্ভ্রান্ত মুসলমানরা "তিন বা চার বা যতজন পোষণ করা যায় ততজন স্ত্রী রাখতেন"।[২০] অপরিবর্তনীয় ইসলামি বিধি একসঙ্গে একজন মুসলমানের চারজনের অধিক স্ত্রী রাখা অনুমোদন করে না। তবে আমরা যদি মনে রাখি যে, ধনী মুসলমানদের বহু বিবাহিত স্ত্রী ছাড়াও উপপত্নী থাকত তাহলে বার্বোসার বক্তব্য সন্তোষজনকভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। উচ্চ শ্রেণীর মানুষের হাতে অতিমাত্রায় সম্পদ জড়ো হওয়াই সম্ভবত এ ধরনের রীতির বিকাশের কারণ। এসব ধনী ব্যক্তি মনে হয় খোজা ও ক্রীতদাসও ব্যবহার করতেন। সমাজের উচ্চশ্রেণীতে সম্পদের প্রাচুর্যের কারণে তৎকালে বহু-বিবাহ, উপপত্নী প্রথা ও ক্রীতদাস প্রথার প্রচলন ছিল।

যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুমান করা যেতে পারে যে, মোগল অভিজাতবর্গসহ ধনী মুসলমানদের জীবনযাত্রার যে বিবরণ বাহারিস্তান-ই-গায়েবী ও মোগল শাসনামলে বাংলায় ভ্রমণকারী বিদেশী পরিব্রাজকরাও দিয়েছেন, সেটা সম্ভবত আলোচ্য আমলের মুসলমান অভিজাত শ্রেণীর জাঁকজমক ও মহিমার ক্ষেত্রে অন্তত যথাযথ। আঞ্চলিক গভর্নর ও তাঁর দরবারের সদস্যবৃন্দ তাঁদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও সভ্যতার বিকাশ ঘটিয়েছিলেন। তাঁরা মোগল কর্মকর্তাদের চেয়ে ভিন্নতর ছিলেন এবং জনগণের সঙ্গে তাঁদের সরাসরি যোগাযোগ ছিল। তাঁরা সম্ভবত তাদের ভাষাও জানতেন। আমাদের জানানো হয়েছে যে, স্থানীয় গভর্নররা প্রায়ই মহাভারতের কাহিনীতে আগ্রহী ছিলেন। তাঁদের দরবারে সমৃদ্ধি অর্জনকারী স্থানীয় চারণ কবিরা বাংলা পদ্যে এগুলি তাঁদের শোনাতেন।[২১]

সৈয়দ, মোগল, পাঠান এবং উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী নিয়ে গঠিত ছিল মুসলমান সমাজের উচ্চশ্রেণী। কৃষক, তাঁতি এবং এ জাতীয় পেশা অবলম্বনকারী অন্যরা ছিল জনগোষ্ঠীর নিম্নশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। মুসলমান কৃষক ও তাঁতির অর্থনৈতিক অবস্থা ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। এটা নিতান্ত স্বাভাবিক যে এদের মধ্যে কেউ কেউ ছিল হিন্দুধর্ম থেকে ধর্মান্তরিত বা এ জাতীয় ধর্মান্তরিত ব্যক্তিদের বংশধর। কিছু কিছু পেশা ছিল মুসলমানদের একচেটিয়া। এমনকি হিন্দুদেরও মুসলমান দর্জিদের ওপর নির্ভর করতে হতো।[২২] বাংলার মাঝি সম্প্রদায়ের অধিকাংশই ছিল মুসলমান। পরি (পিষ্টক-বিক্রেতা), কাবাড়ি (মৎস্য-বিক্রেতা), কাগজি (কাগজ প্রস্তুতকারক), রংরেজ (বস্ত্র-রঞ্জক), হাজাম (যারা মুসলমানি করে), কসাই এবং শানাকর[২৩] (তাঁত-নির্মাতা) সহ মুসলমানদের সাধারণ অর্থনৈতিক শ্রেণীবিভাজন এ সিদ্ধান্তের সত্যতাকেই সমর্থন করে যে ষোড়শ শতকের শেষদিকে মুসলমান সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো প্রায় চূড়ান্ত রূপ গ্রহণ করেছিল এবং পর্যালোচনাধীন সময়কালে এ বিকাশের প্রক্রিয়া চলছিল।

শহর ও নগরে বসবাসরত নিম্নশ্রেণীর মানুষ উচ্চশ্রেণীর মানুষদের দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছিল এবং তারা তাদের দৈনন্দিন জীবনে শেষোক্ত শ্রেণীর অনুকরণ করত। তারা "উরুর মাঝামাঝি পর্যন্ত নেমে আসা খাটো সাদা কামিজ ও মাথায় তিন-চার ভাঁজ

বিশিষ্ট পেচানো পাগড়ি" পরিধান করত। তারা 'সঠিক আকৃতির' এবং 'গিল্টি করা' স্যান্ডেল ও জুতাও ব্যবহার করত।[২৪] ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা মাথা কামিয়ে ফেলত, দাড়ি রাখত এবং ইজার, পাগড়ি ও টুপি পরত। একজনের সঙ্গে অন্যজনের দেখা হলে তারা সালাম বিনিময় করতে ভুলত না। সন্ধ্যাবেলায় পীরের দরগাহে বাতি জ্বালানো ও সেখানে মিষ্টান্ন দেওয়া ছিল তাদের মধ্যে বেশ প্রচলিত।[২৫] বস্তুত মসজিদ ও মকামগুলি ছিল তাদের মিলন স্থান। দেশীয় সাহিত্যে বাংলার ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের যে চিত্র পাওয়া যায় সেটা বিশ্বের অন্যত্র বসবাসকারী ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের থেকে মূলত ভিন্নতর নয়। কাজেই মনে হয় যে আলোচ্য সময়কালের কবিরা যে মুসলমান সমাজে তাদের প্রবেশের কোনো সুযোগ ছিল না সে সমাজের একটি আদর্শিক চিত্র তুলে ধরেছেন।

নিম্নশ্রেণীর মুসলমানদের মধ্যে অন্তত বিধবা-বিবাহ রীতির সচরাচর প্রচলন ছিল। গোঁড়া সমাজের হিন্দুদের কাছে এটা এত অপছন্দনীয় ছিল যে মনসা-মঙ্গলের রচয়িতা একজন মুসলমান মহিলার এক মাসের মধ্যে তিনজন স্বামী গ্রহণের পরও স্বামীর মৃতদেহ সমাধিস্থ হওয়ার আগেই আরেকজনকে বিয়ে করার আকুল আকাঙ্ক্ষা প্রকাশের চিত্র অঙ্কনের চেষ্টা করেছেন।[২৬] আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই যে একজন গোঁড়া হিন্দু, সতী হচ্ছে যার আদর্শ, তিনি বিধবা-বিবাহের চিন্তাকে বরদাশত করবেন না। বিধবা-বিবাহ তার কাছে মুসলমান মহিলাদের অপাতিব্রত্য ছাড়া আর কিছু নয়। পক্ষান্তরে মৃত স্বামীর প্রতি বিশ্বস্ততা ছিল বেহুলার কাহিনীর বিষয়বস্তু। মুসলমান মহিলারাও অন্ততপক্ষে এক সপ্তাহ মাছ-মাংস খাওয়া থেকে বিরত থেকে যথাযথভাবে তাদের স্বামীর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করত।[২৭] মুসলমান সমাজে প্রচলিত বিধবা-বিবাহ বুঝাতে সমকালীন দেশীয় সাহিত্যে নিকা (নিকাহ্) শব্দটি প্রায়ই ব্যবহার করা হয়েছে।[২৮]

মুসলমানদের শিক্ষা ও সংস্কৃতি কোন স্তরে উপনীত হয়েছিল তা নিরূপণ করা সম্ভব নয়। বহু কলেজ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে হোসেন শাহ তাঁর প্রজাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারকে উৎসাহিত করেছিলেন। সুলতানের ৯০৭ হিঃ/১৫০২ সালের ইংলিশ বাজার লিপিতে "ধর্মীয় শাস্ত্রসমূহ ও কেবলমাত্র সত্য নির্দেশগুলি সম্পর্কে শিক্ষাদানের জন্য" মাদ্রাসা স্থাপনের উল্লেখ রয়েছে।[২৯] এর ভাষা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, শিক্ষা ছিল ধর্মীয় প্রকৃতির এবং ছাত্রদের সাধারণত ফিকাহ বা মানবিক-আইন বিজ্ঞান ও দর্শনে এবং আইনশাস্ত্র শিক্ষাদান করা হতো। শাসকবর্গ কর্তৃক নিযুক্ত শিক্ষকবৃন্দ সম্ভবত আইনশাস্ত্রসহ বেশকিছু বিষয়ে প্রাজ্ঞ ছিলেন এবং সমাজে তাঁদের যথেষ্ট মর্যাদা ছিল। এসব শিক্ষকের মধ্যে একজন ছিলেন তকীউদ্দীন, যাঁর নাম নসরত শাহের সোনারগাঁও লিপিতে[৩০] লিপিবদ্ধ রয়েছে। তাঁর সাড়ম্বর উপাধি ছিল মালিক-উল-উমারা ওয়াল-ওয়াজারা এবং তাঁকে আইনবিদ ও হাদিসের শিক্ষকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য করা হতো। ইতিপূর্বে উল্লিখিত ইংলিশবাজার লিপি থেকে হোসেন শাহীদের শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপের সাক্ষ্য পাওয়া যায়। রসুলের বিখ্যাত উক্তি "চীনদেশেও যদি হয়, সেখানে জ্ঞানের সন্ধানে যাও" দিয়ে এ লিপির শুরু হয়েছে। এ সব খণ্ডিত উপাদান সে সময়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির প্রকৃতি বুঝতে আমাদের তেমন কোনো সাহায্য করে না, মাধ্যমিক ও

উচ্চশিক্ষা সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। শাসকবর্গ কর্তৃক স্থাপিত প্রতিষ্ঠানগুলি জনগণের অবস্থার উন্নয়নে কতটুকু সফল হয়েছিল সেটা স্পষ্টভাবে জানা যায় না।

এদেশে ইসলামের ক্রমবিস্তারের ফলে মুসলমান সমাজ এক ধারাবাহিক বিস্তৃতির প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল। ফলে এ সময়ের মুসলমান জনগোষ্ঠীর দু'টি স্বতন্ত্র উপাদান লক্ষ্য করা যায়। এর একটি ছিল আরব ও পারস্যবাসীসহ বিদেশীরা, যাদের এক অংশ প্রশাসনের সঙ্গে এবং অন্য অংশ ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে জড়িত ছিল। অপর গুরুত্বপূর্ণ উপাদানটি ছিল ধর্মান্তরিত স্থানীয়রা যাদের নিজেদের আদি ধারণা, বিশ্বাস ও পেশা ত্যাগ করার কোনো কারণ ছিল না। ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়ার ফলে তাদের মুসলমান বলে অভিহিত করা হতো; কিন্তু বাস্তবে তাদের সঙ্গে তাদের হিন্দু ভ্রাতৃবর্গের খুব বেশি পার্থক্য ছিল না। ফলে তারা ছিল দেশজ সংস্কৃতির প্রতিনিধি; অন্যদিকে বিদেশীরা ছিল যাকে বলা যেতে পারে আরবীয় বা পারস্যদেশীয় সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্বকারী। কিন্তু মুসলমান সমাজের মধ্যে আমরা কোনো সাংস্কৃতিক বিরোধ লক্ষ্য করি না। মনে হয় যে এর কারণ ছিল হোসেন শাহী শাসকবর্গের উদার মনোভাব যাঁরা স্থানীয় সংস্কৃতিতে উৎসাহী ছিলেন।

২.

হিন্দু সমাজ ছিল বর্ণভিত্তিক যা আবার গড়ে উঠেছিল সম্প্রদায়ের বিভিন্ন অংশের গৃহীত বিভিন্ন পেশার ভিত্তিতে। আলোচ্য সময়কালে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ এবং বৈদ্যরা ছিল হিন্দু সমাজের গুরুত্বপূর্ণ বর্ণ। পশ্চিম বাংলার রাঢ় ও রাজশাহীর গঙ্গার পূর্ববর্তী ক্ষুদ্র অঞ্চল বরেন্দ্র থেকে পাওয়া নামে পরিচিত রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণরা বাংলায় অনুপস্থিত ছিলেন না। ষোড়শ শতকের শেষদিকে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের পশ্চিম বাংলায় বাস করার কথা কবিকঙ্কণ উল্লেখ করেছেন।[৩১] পঞ্চদশ শতকের মধ্যভাগে জীবিত রাজশাহীর উদয়নাচার্য ভাদুড়ি এসব বারেন্দ্র ব্রাহ্মণকে কয়েকটি শ্রেণী বা পতিতে ভাগ করেছেন। প্রেম বিলাসের ওপর নির্ভর করলে ঐ আমলে এ দুই শ্রেণীর মধ্যে বিবাহ যথেষ্ট প্রচলিত ছিল। দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় বহু বৈদিক ব্রাহ্মণ দেখা যেত। বিজয়গুপ্ত ভাগীরথীর পূর্বদিকের অঞ্চলের হিন্দু-সমাজের বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে ঐ অঞ্চলে বাসকারী ব্রাহ্মণরা ছিলেন চতুর্বেদী ব্রাহ্মণ [৩২] বা চারটি বেদ সম্পর্কে জ্ঞানসম্পন্ন ব্রাহ্মণ। বিজয়গুপ্ত ও বিপ্রদাস [৩৩] যা বলেছেন তা থেকে মনে হয় যে ব্রাহ্মণরা প্রথাগতভাবে তাদের ধর্মীয় কাজ এবং শাস্ত্রপাঠ ও সে সম্পর্কে শিক্ষাদান করতেন। কিন্তু এ বিবরণ পরিপূর্ণ অর্থে গ্রহণ করা যায় না কারণ প্রাচীন শাস্ত্রকারদের নির্দেশিত ব্রাহ্মণদের কর্তব্য ও বৃত্তি থেকে বিচ্যুতির ঘটনাও ছিল। ব্রাহ্মণ হওয়া সত্ত্বেও রূপ ও সনাতন হোসেন শাহী সরকারের অধীনে কর্মলিপ্ত ছিলেন। এটা অবশ্য কোনোভাবেই মধ্যযুগীয় হিন্দু সমাজে কোনো নতুন পর্যায় ছিল না। প্রাচীন বাংলাতেও কিছু কিছু ব্রাহ্মণ শাস্ত্র নির্দেশিত পেশার বাইরে অন্যপেশা গ্রহণ করেছিলেন।[৩৪] ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে রঘুনন্দন তাঁর লেখায় ব্রাহ্মণরা অত্যন্ত দারিদ্র্যপীড়িত হলে যে কোনো জীবিকাই গ্রহণ করতে পারেন এ মতের সমর্থনে মনুস্মৃতি

উদ্ধৃত করেছেন।[৩৫] কাজেই এটা সহজবোধ্য যে হিন্দুসমাজে আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন ইতোমধ্যেই ঘটে গিয়েছিল। হোসেন শাহী আমলের হিন্দুসমাজের বর্ণপ্রথার সঙ্গে প্রাক-মুসলমান আমলের বাংলার বর্ণপ্রথার মৌলিক কোনো পার্থক্য ছিল না। হোসেন শাহী আমলের বাংলায় গন্ধবণিক (মশলা, গন্ধদ্রব্য ও ওষুধ বিক্রেতা), তন্তুবায় (তাঁতি), কুম্ভকার (কুমার), কর্মকার (কামার), তাম্বুলিক (পান বিক্রেতা), মালাকর (ফুল বিক্রেতা), শঙ্খবণিক (শাঁখের ব্যবসায়ী), কাংসকার (কাঁসারি), জালিয়া (জেলে), নাপিত (নরসুন্দর), গোয়ালা (দুধ বিক্রেতা), চামার (চর্মকার), ডোম, চণ্ডাল এবং কায়স্থ ও বৈদ্যদের মতো উচ্চবর্ণের হিন্দুরা প্রথাগতভাবে তাদের নিজ নিজ পেশা অনুসরণ করছিল।[৩৬] একজন পণ্ডিত পরিষ্কারভাবে দেখিয়েছেন যে প্রাক-মুসলমান আমলের বাংলায় এবং উনিশ শতকের বাংলায়ও এসব বর্ণ ছিল।[৩৭] এটা মোটামুটি নিশ্চিত যে বৃহৎধর্মপুরাণ এবং ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে [৩৮] উল্লিখিত প্রায় সকল সম্প্রদায় ও উপ-সম্প্রদায়ই আমাদের আলোচ্য আমলে বিদ্যমান ছিল। হোসেন শাহী আমলের বাংলার সমাজে ক্ষত্রিয়রা একটা সুসংবদ্ধ বর্ণ গড়ে তুলেছিল বলে মনে হয় না। কবিকঙ্কণ নিঃসন্দেহে তাদের উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তিনি তাদের রাজপুতদের সঙ্গে জড়িত করেছেন বলে মনে হয়।[৩৯] এখানে এটা উল্লেখ করা আবশ্যকীয় যে কবিকঙ্কণ তাঁর কাব্যগুলি রচনা করেছিলেন এ দেশে মোগল শাসন প্রতিষ্ঠালগ্নে যে সময়ে উত্তর ভারত থেকে নতুন এক কর্মকর্তা গোষ্ঠীর এখানে আগমন ঘটেছিল। মনে হয়, কবিকঙ্কণ বর্ণিত ক্ষত্রিয়রা মোগল বিজয়ের সূত্র ধরে বাংলায় এসেছিল। বর্ণপ্রথার কঠোরতা সম্ভবত আন্তঃবর্ণ বিবাহ ও খাদ্য-গ্রহণ নিবৃত্ত করেছিল। শূদ্ররা পুরাণ বা বেদগুলি পড়তে পারত না।[৪০] এটা নেহায়েৎই ইদানীংকালের ঘটনা যে হিন্দুদের বর্ণপ্রথা এর পূর্বের কঠোরতা হারাচ্ছে।

এখনকার মতো তখনও হিন্দুদের জন্ম, বিবাহ এবং মৃত্যুর সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান ও রীতি ছিল। জন্মের পর হিন্দু শিশুকে গঙ্গা-জলে স্নান করানো হতো এবং তার মাথায় তেল মাখানো হতো। এ উপলক্ষে শাঁখ ও বাঁশিসহ বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র বাজানো হতো। জন্মের পর ষষ্ঠদিনে শিশুদের দেবী ষষ্ঠীর পূজা করা হতো। এরপর হতো তার জন্মলগ্নে গ্রহাদির অবস্থানের ভিত্তিতে কোষ্ঠী-গণনা অনুষ্ঠান বা নবজাতক শিশুর ভাগ্য-গণনা। স্পষ্টত এটি করতে পারতেন জ্যোতিষতত্ত্বে কিছু জ্ঞানের অধিকারী একজন ব্রাহ্মণ। একমাস অতিবাহিত হলে মা গঙ্গা-স্নান ও নদীকে পূজা করে বালক-উত্থান-পর্ব পালন করতেন। সম্ভবত দ্বিতীয় মাসের শুরুতে শিশুর নামকরণ করা হতো। শিশুর বয়স ছয়মাস হলে অন্নপ্রাশন নামের প্রথম মুখে-ভাত দেওয়া অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করা হতো। এ উপলক্ষে ব্রাহ্মণদের নিমন্ত্রণ করা হতো। এক শুভক্ষণে শিশুর কান ছিদ্র করা হতো। এর পরের অনুষ্ঠান চূড়াকরণ বা প্রথম মস্তক-মুণ্ডন অনুষ্ঠান নামে অভিহিত। শিশুর শিক্ষাজীবন শুরু হতো বেশ আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে।[৪১] সারাদেশ জুড়ে এ সব সামাজিক রীতিনীতির প্রকৃতি একইরকম ছিল না বলে মনে হয়; বিভিন্ন এলাকার প্রতিনিধিত্বকারী বৃন্দাবনদাস, কবিকঙ্কণ এবং বিজয়গুপ্ত একই রকমভাবে এগুলির কেন উল্লেখ করেননি এ থেকে তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। রঘুনন্দন গর্ভাধান, পুংসবন (পুত্র সন্তানের জন্য

নিশ্চিতকরণ অনুষ্ঠান), সীমন্তোন্নয়ন (সিঁদুর দিয়ে কেশ-বিন্যাস অনুষ্ঠান), শোষ্যন্তীহোম (প্রসব বেদনার সময় সম্পাদিত অনুষ্ঠান), জাত-কর্মণ (শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর পালিত অনুষ্ঠান), নামকরণ (শিশুর নামকরণ অনুষ্ঠান), নিক্রমণ (শিশুকে প্রথমবার মুক্তাঙ্গনে নেওয়ার অনুষ্ঠান), অন্নপ্রাশন (শিশুর মুখে প্রথম ভাত দেওয়ার অনুষ্ঠান), চূড়াকরণ (মস্তকমুণ্ডন অনুষ্ঠান), উপনয়ন (শিক্ষা জীবনে দীক্ষিত করার অনুষ্ঠান) এবং সমাবর্তনের (গুরুগৃহ থেকে ছাত্রের প্রর্ত্যাবর্তন অনুষ্ঠান) মতো বিভিন্ন সংস্কার পালনের উপযুক্ত সময় সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।[৪২] রঘুনন্দন উল্লিখিত অনুষ্ঠানের অনেকগুলি সম্বন্ধে দেশীয় উৎসগুলি নীরব। এখানে অনুমান করা যেতে পারে যে, রঘুনন্দন প্রাচীন নিবন্ধকারদের নির্দেশিত অনুষ্ঠানগুলির ওপর গুরুত্ব আরোপের চেষ্টা করেছিলেন। পক্ষান্তরে বাংলা গ্রন্থগুলি এ অনুষ্ঠানগুলির স্থানীয় প্রকৃতির ওপর আলোকপাত করেছে। কাজেই স্মৃতিসাহিত্যগুলিতে উল্লিখিত অনুষ্ঠানগুলি সারাদেশে একইভাবে পালিত হয়েছিল বলে মনে হয় না।

বৈষ্ণব ও মঙ্গল কাব্যগুলির বহু পৃষ্ঠা জুড়ে বৈবাহিক রীতিগুলির বর্ণনা রয়েছে। আলোচ্য সময়কালের হিন্দু বিবাহের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি সামাজিক অনুষ্ঠান-প্রক্রিয়া জড়িত ছিল। বিজয়গুপ্ত প্রদত্ত বৈবাহিক রীতির সাড়ম্বর বর্ণনা থেকে এটা আবশ্যকীয়ভাবে অনুমান করা যায় না যে এটাই ছিল হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত বৈবাহিক অনুষ্ঠানের নিখুঁত বাস্তব চিত্র। এ থেকে শুধু এটাই দেখা যায় যে ধনী ব্যক্তিদের বিবাহ প্রচুর জাঁকজমক ও ঘটা করে অনুষ্ঠিত হতো। এতে খরচও হতো প্রচুর; বৃন্দাবন দাস যার জন্য প্রচুর ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।[৪৩] গরিবদের আবশ্যকীয়ভাবেই তাদের বিয়েতে ন্যূনতম খরচ করতে হতো। চৈতন্যের প্রথম বিয়ের ক্ষেত্রে হতদরিদ্র বল্লভ আচার্য তাঁর মেয়ের বিয়েতে মাত্র পাঁচটি হরীতকী খরচ করতে চেয়েছিলেন।[৪৪] এটা লক্ষণীয় যে মধ্যযুগের হিন্দু বিয়ের প্রচলিত বৈশিষ্ট্যগুলি এবং আধুনিক বিয়ের বৈশিষ্ট্যগুলি প্রায় একইরকম।

বর্ণপ্রথা ও নির্দিষ্ট চতুরাশ্রমের ওপর গড়ে ওঠা হিন্দুদের সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনে বিয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। রঘুনন্দন সন্ন্যাসব্রত ছাড়া অন্য কারণে কৌমার্যের নিন্দা করেছেন। বিয়ের অনুষ্ঠানের মৌলিক গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য রেখে মধ্যযুগীয় নিবন্ধকারগণ বিয়ের উপযুক্ত সময়, ছেলে ও মেয়েদের বৈবাহিক জীবনের উপযুক্ততা, বর ও কনের সপিণ্ড ও সগোত্র সম্পর্ক, পণের বিষয় এবং বিয়ের আনুষ্ঠানিক দিকের সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন রীতি ও সামাজিক-ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি [৪৫] সম্পর্কে বেশ দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। রঘুনন্দনের মতে বয়ঃসন্ধির আগেই মেয়েদের বিয়ে হওয়া উচিৎ, তবে যে সব মেয়ের জন্য উপযুক্ত বর সহজে পাওয়া যায় না তাদের ক্ষেত্রে এ বয়সসীমা প্রযোজ্য নয়। একই স্মার্তপণ্ডিত সমবর্তের নির্দেশ উদ্ধৃত করেছেন যে যুবকদের শিক্ষাজীবন সমাপ্ত করে বিয়ে করা উচিৎ এবং এটা তিনিও সমর্থন করেন। স্মৃতিসাহিত্যে নির্দেশিত বিয়ের সব নিয়ম বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ একইভাবে পালন করত কিনা তা আমরা জানি না। কিন্তু যে মানস এ নিয়ম প্রণয়নের জন্য দায়ী ছিল সেটাকে বোঝা কষ্টসাধ্য নয়।

সাধারণত মেয়ের বাবার কাছে একজনের মাধ্যমে প্রস্তাব পাঠানো হতো।

মধ্যস্থতাকারী সাধারণত ছেলের বাবার বন্ধু বা আত্মীয় হতেন। এক শ্রেণীর পেশাদার বিবাহ-সম্বন্ধকারীর (ঘটক) প্রচলনই শুধু ছিল না, তারা কখনো কখনো বৈবাহিক আলাপ-আলোচনায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। পঞ্জী (বর্ষপঞ্জি) ও কোষ্ঠী (রাশিচক্র) এবং নক্ষত্র ও জ্যোতিষশাস্ত্রের রাশিচক্রের বিভিন্ন গ্রহের অবস্থানের সূত্রে জ্যোতিষ শুভলগ্ন স্থির করতেন।[৪৬] ফলে বিয়ের স্বাধীনতা বেশ সীমিত হয়ে পড়েছিল বলে মনে হয়। বিয়ে ছিল ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও সামাজিক রীতির মিশ্রণে এক আনন্দময় অনুষ্ঠান। বিভিন্ন স্থানে এর রূপান্তর ঘটত। ধর্মীয় অনুষ্ঠান অধিবাস দিয়ে এটা শুরু হতো যা সাধারণত উদ্‌যাপিত হতো বিয়ের আগের দিন। এরসঙ্গে থাকত বাদ্য ও কণ্ঠসঙ্গীত। এর পরের অনুষ্ঠান ছিল বৃদ্ধি। তখন কনের পিতা পূর্বপুরুষদের নামে উৎসর্গ ও প্রার্থনা করতেন। এরপর ষোলজন দৈবমাতা বা ষোড়শ-মাতৃকার উদ্দেশ্যে মন্ত্র আবৃত্তি এবং মৃত্তিকা পূজা করে সিঁদুর দিয়ে ডুমুর পাতা রাঙানো হতো। এ উপলক্ষে শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান, নান্দীমুখ উদ্‌যাপিত হতো যাতে মৃত পূর্বপুরুষদের আত্মার আনন্দ ও সুখ বৃদ্ধি পেত বলে বিশ্বাস করা হতো।[৪৭] সম্ভবত উপলক্ষের সঙ্গে ধর্মপ্রাণতা যুক্ত করার উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ অনুষ্ঠান চলাকালে পূর্ণকুম্ভ, প্রদীপ, ধান, কলাগাছ এবং বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা হতো।

এর পরে হতো অনুষ্ঠানাদির স্নান যার উপরে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হতো। এ সময় চন্দন, হলুদ ও হরীতকী থেকে তৈরি নরম মিশ্রণ বরের শরীরে মাখানো হতো। এ সবই করতেন মহিলারা যারা বিয়ের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন। স্নান শেষ হলে বর নতুন পোশাক এবং দুল, মল ও মুকুটসহ বিভিন্ন অলঙ্কার পরত। বর অগর ও চুয়ার মতো প্রসাধনীও ব্যবহার করত। এরপর শুরু হতো সাড়ম্বর বরযাত্রা যাতে বরের আত্মীয় ও বন্ধুরা এবং বেশকিছু তীরন্দাজ, পাইক ও প্রশস্তিকার যোগদান করত। এ উপলক্ষে বহুসংখ্যক হাতি, দোলনা ও ঘোড়াও ব্যবহার করা হতো।[৪৮]

কনের বাড়িতে উদযাপিত শুভ অলঙ্করণ অনুষ্ঠান বা মঙ্গলাচার সত্যিই এক আনন্দময় দৃশ্যের অবতারণা করত।[৪৯] এর বিশদ বর্ণনার দরকার নেই কারণ এটা বহুলাংশে এর বর্তমান প্রতিরূপের সদৃশ ছিল। কনে বহু অলঙ্কার পরিধান করত যার তালিকা সে সময়ের সাহিত্যে দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলাচারের পর কনের পিতা বরকে অভ্যর্থনা জানাতেন। এ সময় পুরোহিতরা বাক্য আবৃত্তি করতেন, বিতর্ক করতেন এবং পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমন এবং মধুপর্ক (পূজার নিদর্শন হিসেবে দেবতাদের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট কিছু বস্তু নিবেদন) নামে অভিহিত অনুষ্ঠান উদযাপন করতেন। বরের চারপাশে সাতবার ঘুরে কনে তাকে ধান, দূর্বাঘাস ও পট্টবস্ত্র দিয়ে বরণ করে নিত। এ সময়ে উভয়ে মালা বদল করত। এটা দু'টি প্রাণের মিলনের ইঙ্গিত দান করত। বেদ থেকে মন্ত্র আবৃত্তি, কিছু বাদ্যযন্ত্র বাজানো ও আগুন জ্বালানো ছিল এ অনুষ্ঠানের সহগামী ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা। এরপর কনের পিতাকে কনের হাত বরের হাতের ওপর রেখে কন্যাসম্প্রদান করতে হতো এবং এ সঙ্গেই বস্তুত শেষ হতো বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা। পণ হিসেবে বর গরু, জমি, বিছানা, ভৃত্য, কলসি, কাপড় চোপড় ও অলঙ্কারের মতো জিনিস পেত। কনেকে বরের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হতো। সেখানে অন্যান্য নিমন্ত্রিত মহিলাদের সঙ্গে নিয়ে বরের মা যথোচিতভাবে

দম্পতিকে বরণ করে নিতেন।[৫০] বিবাহ অনুষ্ঠান এভাবে দাম্পত্যজীবনের সূচনা নির্দেশ করত। এ দাম্পত্য জীবন প্রায়ই ছিল সুখী ও শান্তিপূর্ণ। প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর দ্বিতীয় বিয়ে করা যেত। চৈতন্যের জীবন কাহিনীতে এর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। তৎকালীন হিন্দুসমাজে নারীর স্থান সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন। তখন শান্তিপূর্ণ সময় হওয়ায় নারীদের ঘরের বাইরে কাজ করতে হতো না। এ আমলের মঙ্গল কাব্যে যে আদর্শ নারীর চিত্র দেওয়া হয়েছে তিনি সমাজে কোনো সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন নি বলে মনে হয় এবং রান্নাঘরেই শুধু তার অস্তিত্ব অনুভূত হতো। কিন্তু সমাজে নারীর গুরুত্ব উপেক্ষা করার আমাদের কোনো কারণ নেই। হিন্দুসমাজের নারী ছিলেন স্নেহময়ী মাতা এবং অনুরক্তা স্ত্রী। ঘরের কাজকর্ম সম্পূর্ণভাবে সম্পন্ন করা ছাড়াও তারা বিভিন্নভাবে স্বামীকে সাহায্য করতেন। চৈতন্য-ভাগবতে আমরা দেখি যে, চৈতন্যের মা শচী তাঁর পুত্রের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করেছিলেন এবং তাঁর স্বামী চৈতন্যের লেখাপড়া বন্ধ করে দিলেও তিনি স্বামীকে চৈতন্যের লেখাপড়া চালিয়ে যেতে অনুরোধ করেছিলেন।[৫১] একটি চৈনিক বিবরণও স্বামীর দৈনন্দিন কাজের ব্যবস্থাপনায় স্ত্রীর সহযোগিতা সম্পর্কে আলোকপাত করেছে। এটা ছিল স্ত্রীর একচেটিয়া অধিকার। গতানুগতিক দৈনন্দিন জীবনে রান্না ছিল তাদের প্রধান গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটা মোটামুটি রীতিগত ছিল যে, নারীরা উপবাস করতেন, একদাশী পালন করতেন এবং এ ধরনের অন্যান্য ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা পালন করতেন।[৫২] গত কয়েক শতাব্দীতে রক্ষণশীল হিন্দু মহিলাদের অবস্থার তেমন বিশেষ কোনো পরিবর্তন ঘটে নি।

উত্তরাধিকার, বিভাজন এবং সম্পত্তির মতো পার্থিব স্বার্থ সম্পর্কিত বিষয়ে স্মার্ত বিধি ও আইনসংক্রান্ত ব্যবস্থা থেকে পরিষ্কার দেখা যায় যে সমাজে নারীর অবস্থান স্বীকৃত ছিল না। স্বামীর অনুমতি ছাড়া নারীরা বহুধর্মীয় অনুষ্ঠান ও বলিতে যোগদান করতে পারতেন না।[৫৩] সম্পত্তির ওপর তাদের অধিকার ছিল অনেকাংশে সীমিত। জিমূতবাহনের দায়ভাগে বিধবাকে সম্পত্তি বিক্রি, মর্টগেজ ও দানের কোনো অধিকার দেওয়া হয়নি এবং তার ভোগের অধিকারও ছিল মৃত স্বামীর আত্মিক মঙ্গল সাধন করতে পারে এমন ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালনের ওপর বহুলাংশে শর্তাধীন। পরিভাষাগতভাবে স্ত্রীধন নামে অভিহিত একবিশেষ ধরনের সম্পত্তির মালিকানায় তার অধিকার ছিল।[৫৪]

আলোচ্য সময়কালের স্মৃতি গ্রন্থকারগণ বিশ্বাস করেন যে, এ জগতে বা পরজগতে স্বামীর অস্তিত্ব ছাড়া নারীর কোনো আত্মিক অস্তিত্ব নেই। এ মনোভাবই মনে হয় হিন্দু বিবাহের সঙ্গে ধর্মপ্রাণতা যুক্ত করার জন্য দায়ী ছিল। হিন্দুবিবাহ ছিল এক অপরিবর্তনীয় মানবীয় সম্পর্ক। শুধুমাত্র কিছু সুনির্দিষ্ট অবস্থায় রঘুনন্দন বিবাহ বিচ্ছেদ অনুমোদন করেছেন যার মধ্যে রয়েছে নিচু জাতের লোক বা পুত্র বা স্বামীর শিষ্যের সঙ্গে সহবাসের ফলে গর্ভধারণ।[৫৫] মধ্যযুগের সমাজে প্রচলিত কুলীন ও বহুবিবাহ প্রথা নিশ্চয়ই নারীর জন্য দুর্ভোগ বয়ে এনেছিল।

সমকালীন সাহিত্যে নারীদের ব্যবহৃত পোশাক, অলঙ্কার ও প্রসাধনী প্রথাগতভাবে উল্লিখিত হয়েছে। এগুলির মধ্যে রয়েছে পট্টবস্ত্র, সুতিবস্ত্র, আংটি, হার, নাকফুল, সোনার

বালা, কানফুল, সোনার তথি, শাঁখা, পাশলী, খাড়ু, মুকুট, কাজল, লাক্ষা, সিঁদুর এবং চন্দন মিশ্রিত কস্তুরী। নারীর চুল যথাযথভাবে আঁচড়ানো ও গোছা বা বেণীর আকারে সুবিন্যস্ত করার পর এতে ফুল বা ময়ূরের পালক সংযুক্ত করা হতো এবং অগর ও ধূপের ধোঁয়া দিয়ে সুরভিত করা হতো।[৫৬] এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা উচিৎ যে এসব অলঙ্কার ও প্রসাধনী সাধারণত বিয়ে উপলক্ষে ব্যবহার করা হতো এবং দৈনন্দিন জীবনে এগুলি ছিল যতটা সম্ভব সাদামাটা।

বিধবারা সাধারণত খনি, শাঁখা ও সিঁদুরের বিকল্প হিসেবে মোটা পট্টবস্ত্র, সোনার বালা এবং ফাগের গুঁড়া ব্যবহার করতেন।[৫৭] সমকালীন কিছু সাহিত্যে[৫৮] সতীদাহ প্রথার উল্লেখ থাকলেও এদেশে এটা সর্বজনীনভাবে পালিত হতো বলে মনে হয় না। শ্রীচৈতন্যের পিতা জগন্নাথ মিশ্র মৃত্যুবরণ করার পর তাঁর স্ত্রীর সহমরণ ঘটে নি। আবার মাঝে-মধ্যে সমকালীন রচনাবলিতে বিধবা শ্রেণীর অস্তিত্বের উল্লেখ থেকে ধারণা করা যায় যে, নিয়মিতভাবে বা একইরূপে সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল না। অবশ্য উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে এটা ধর্মীয় নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করা হতো। বস্তুত দু'শতাব্দী আগে উত্তর ভারতের হিন্দু সমাজে সতীদাহ সাধারণ্যে প্রচলিত প্রথা ছিল। ইবনে বতুতা এর উল্লেখ করেছেন। মোগলরা এ প্রথা নিবারণের চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু বিশেষ কোনো সাফল্য লাভ করেন নি।[৫৯] রঘুনন্দন স্বামীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরপরই বিধবার জন্য কঠোর কৃচ্ছ্র ব্রত পালনের নির্দেশ দিয়েছেন।[৬০] এ থেকে পরিষ্কারভাবে দেখা যায় যে, শাস্ত্রে এ প্রথার কোনো নিয়মানুগ স্বীকৃতি ছিল না। দেশের কোনো কোনো অংশে এটা প্রচলিত থাকলেও এ প্রথা দেশের বহু অংশে অনুপস্থিত ছিল বলে মনে হয়।

সমাজ ছিল পিতৃতান্ত্রিক এবং যৌথপরিবার প্রথা ছিল প্রচলিত রীতি। হিন্দু নারীর আইনগত অবস্থান ও সামাজিক মর্যাদা যাই হয়ে থাকনা কেন স্ত্রীর সেবা ছাড়া গৃহপতি চলতে পারতেন না। প্রাচীন ও মধ্যযুগের হিন্দুসমাজের ভিত্তি ছিল বর্ণাশ্রম ধর্ম। বিবাহিত জীবন প্রথাগতভাবে এর অপরিহার্য অংশ হিসেবেই বিবেচিত হয়েছে। রঘুনন্দনের মতানুসারে গৃহকর্ত্রী ছাড়া কোনো সংসার হতে পারে না। প্রথাগত জীবনচর্যার শুদ্ধতা রক্ষা করতে তিনি যে আগ্রহী ছিলেন ৪৮ বছর বয়সের পরে কেউ বিপত্নীক হলে তাকে রঁড়াশ্রমী বা বিপত্নীক গৃহস্বামী রূপে বিবেচনা করার বিধান থেকে তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।[৬১]

বৈষ্ণব কাব্যগুলি স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের ওপর আলোকপাত করে। এ সম্পর্ক ছিল সহমর্মিতা, ভালবাসা ও মমত্বের। স্ত্রীর সহযোগিতা ছাড়া সাধারণ পারিবারিক কাজ বা মাঝে মধ্যে সামাজিক-ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির ব্যবস্থা করা স্বামীর পক্ষে কঠিন ছিল। স্বামী, স্ত্রী ও পুত্রকন্যা ছাড়াও দাদা-দাদি, সংসারের বিভিন্ন কাজ তদারকের লোকও পুরুষ ও মহিলা ভৃত্যের মতো বেশকিছু অন্য সদস্যও পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ছিল।[৬২] সন্তানেরা সাধারণত মা-বাবার সহজাত স্নেহ-মমতার প্রতিদান দিত। সামাজিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে সংশ্লিষ্ট পরিবারের প্রতিষ্ঠা ও মর্যাদা অনুযায়ী ব্যবস্থা ও নিমন্ত্রণ করার সঙ্গে দম্পতি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন।[৬৩] গৃহস্বামীকে মাঝে মাঝে প্রতিবেশীর সংবেদনশীলতা সম্পর্কে সচেতন

থাকতে হতো। কারণ, বিশেষত প্রতিবেশী বয়স্ক ব্যক্তি হলে অহঙ্কার ও জাত্যাভিমান প্রসূত মানসিক সংবেদনশীলতা ভয়ঙ্করভাবে প্রকাশ করে ফেলতে পারতেন।[৬৪] ধর্মীয় গুরু বা কোনো সন্ন্যাসী পরিবারে অতিথি হয়ে এলে তাকে বিশেষ অভিবাদনের সঙ্গে গ্রহণ করা হতো। গৃহস্বামী সম্মানিত অতিথির সামনে সাষ্টাঙ্গ প্রণত হতেন এবং তাঁর স্ত্রী অতিথিকে পিঁড়ির ওপর বসিয়ে তাঁর পা ধুয়ে দিতেন এবং বাইরের ঘরের মেঝেতে তাঁর জন্য ছোট গালিচা বিছিয়ে দিতেন।[৬৫]

ধনী হিন্দু-মুসলমান, উভয়ই ইটের তৈরি অট্টালিকায় বাস করতেন। গরিবদের ছিল খড়ের ছাওয়া বাঁশের ঘর।[৬৬] বাংলার বিভিন্ন স্থানে ছড়ানো প্রাক-মোগল স্থাপত্যের ধ্বংসাবশেষ থেকে স্পষ্ট দেখা যায় যে এসব অট্টালিকা নির্মাণের জন্য ব্যাপকভাবে ইট ব্যবহার করা হয়েছিল। তাছাড়া, পঞ্চদশ শতকের মধ্যভাগে রচিত চৈনিক বিবরণে ধনী ব্যক্তি, বিশেষত শাসকদের, ইটের তৈরি প্রাসাদোপম অট্টালিকায় বাস করার উল্লেখ রয়েছে। এগুলির অভ্যন্তরভাগ ফুল ও জীবজন্তুর নকশা দিয়ে অলঙ্কৃত ছিল। এসব বাড়িতে সোপান-শ্রেণী ও কয়েকটি থামের ওপর সমতল ছাদ ছিল।[৬৭] কিন্তু বাঁশের কুটিরগুলি ছিল সাধারণভাবে প্রচলিত। এগুলির কোনো কোনোটি "এমনভাবে তৈরি ছিল যে একটির জন্যই খরচ হতো পাঁচ হাজার টাকা বা তারচেয়ে বেশি এবং এগুলি অনেকদিন স্থায়ী হতো।"[৬৮] আবুল ফজল বিশেষভাবে ধনীদের নির্মিত বাঁশের কুটিরের প্রতি নির্দেশ করেছেন বলে মনে হয়। গরিবদের কুটির নিশ্চয়ই আরও দীনতর ছিল কারণ ঘরের জন্য প্রচুর অর্থ খরচ করার সাধ্যই তাদের ছিল না। বাঁশের চৌ-চালা ঘরগুলি এত সুবিদিত ছিল যে সেগুলি বাংলার ইট ও পাথরের স্থাপত্যকে প্রভাবিত করেছিল। গৃহের বেশ কয়েকটি সুনিরূপিত অংশ ছিল। এগুলি হচ্ছে সামনের দিকে অঙ্গনসহ শয়নকক্ষ, উঁচু বারান্দাসহ বসবার ঘর, রান্নাঘর ও চণ্ডীমণ্ডপ যা গৃহদেবতার ঘর হওয়া ছাড়াও, বিশেষত সামাজিক অনুষ্ঠানাদির সময় অতিথিদের শোবার ঘর হিসেবে ব্যবহৃত হতো।[৬৯] উঁচু ছাদবিশিষ্ট ও ক্রমপরম্পরায় সারিবদ্ধ গৃহগুলিকে আদর্শরূপে বিবেচনা করা হতো।[৭০] গৃহের বিভিন্ন অংশের বিন্যাসের মধ্যে কখনো কখনো সংস্কৃতি সুরুচিবোধের প্রকাশ ঘটত। এ প্রসঙ্গে আমরা চূড়ামণিদাস প্রদত্ত চৈতন্যের গৃহের বর্ণনা লক্ষ্য করতে পারি : এ সুন্দর গৃহের দক্ষিণে একটি ও পূর্বে একটি তোরণ ছিল। পূর্বদিকের তোরণের পর ছিল একটি অঙ্গণ।[৭১] ধনীদের শয়নকক্ষে সুসজ্জিত পালঙ্ক, সুন্দর বালিশ, বিভিন্ন পাত্র ও রেশম বা পাটের তৈরি মশারি দেখা যেত।[৭২] কিন্তু এ ব্যাপারে গরিবদের প্রয়োজন নিশ্চিতরূপেই ছিল যথাসম্ভব সীমিত।

গত কয়েক শতকে বাঙালিদের খাদ্যের বিশেষ কোনো পরিবর্তন ঘটে নি। বর্তমানের মতো ভাত ছিল প্রধান খাদ্য। পানিতে ভিজানো ভাত (পান্তাভাত বা আমানি) বর্তমানের মতো শুধু গরিবদের নাশ্তাই ছিল না, সমাজের বিত্তশালী মানুষের কাছেও এটা ছিল উপভোগ্য। ষোড়শ ব্যঞ্জন বা ষোল পদের খাদ্য ধনী হিন্দুদের ঘরে ছিল নিত্যনৈমিত্তিক। এর মধ্যে থাকত বিভিন্ন ধরনের শাক-সব্জি, মাছ, দুধ, মাংস, ফল, দধি, মাখন, পিঠা এবং মিষ্টান্ন। ঘি, তেল, চিনি, নুন, মরিচ ও বিভিন্ন মশলা খাদ্য তৈরিতে

ব্যবহৃত হতো।[৭৩] খাওয়ার পর মানুষ পান খেত। উৎসব উপলক্ষে অতিথিদেরকেও পান দেওয়া হতো। মঙ্গল কাব্যগুলিতে প্রদত্ত বাঙালি খাদ্যের তালিকা-চিত্র বাস্তবের চেয়ে বরং আদর্শিক বেশি। বাঙালি খাদ্য ছিল অনাড়ম্বর, স্বাদু এবং পুষ্টিকর। তখনও খাদ্যে ভেজাল শুরু হয় নি। রান্নাবান্না ছিল মহিলাদের একাধিকার, ধর্মীয় নিষ্ঠার সঙ্গে তারা এ কাজ করত। বস্তুত বাঙালি জীবনের প্রতিটি রীতির মতো রান্নার সঙ্গেও কিছু আধা-ধর্মীয় অনুষ্ঠান জড়িত ছিল। রান্নাঘরে আগুন জ্বালানোর সঙ্গে বেশ কয়েকটি বিশদ অনুষ্ঠান জড়িত ছিল। এগুলির মধ্যে ছিল সাতবার আগুনকে প্রদক্ষিণ করা ও অগ্নি-দেবতার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করা।[৭৪]

হিন্দুদের বহু উৎসব ও সামাজিক অনুষ্ঠানের মধ্যে একটি ছিল দুর্গাপূজা সম্পর্কিত। এটা মহাধুমধামের সঙ্গে সাড়ম্বরে উদযাপিত হতো। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা উচিত যে, রঘুনন্দন তাঁর গ্রন্থ তিথিতত্ত্বের এক বড় অংশ রামনবমী ও দুর্গোৎসবে নিয়োজিত করেছেন। চণ্ডী-মঙ্গল, মনসা-মঙ্গল ও শৈবগীত এবং প্রাচীন বাংলার পাল রাজাদের কৃতিত্ব বর্ণনাকারী গানগুলি গায়েনরা পালা করে গাইতেন। তাঁরা সঙ্গীত শিল্পে যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করেছিলেন বলে মনে হয়।[৭৫] নাট্যাভিনয় জনগণের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। চৈতন্য এগুলির কোনো কোনোটিতে অভিনয় করতেন। এসব নাটকের বিষয়বস্তু ছিল কৃষ্ণ-লীলা ও লঙ্কা-বিজয়ের মতো পৌরাণিক কাহিনী। হিন্দু, মুসলমান সবাই এগুলিতে যোগ দিত।[৭৬]

বর্তমানের মতো তখনও হিন্দুরা শিবলিঙ্গ, শিব, দুর্গা, চণ্ডী, বিষ্ণু, নারায়ণ, ব্যাস, ব্রহ্মা, অগ্নি, শিতলা, ষষ্ঠী এবং গঙ্গার মতো বহু দেব-দেবীর পূজা করত।[৭৭] সনাতনধর্মী হিন্দুদের পালনীয় ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্যে রঘুনন্দন ষষ্ঠী, বিষ্ণু, মনসা, কৃষ্ণ, দুর্গা, যম, সরস্বতী, সূর্য, ভীষ্ম, শিব, শিতলা, রাম এবং মদনের পূজাকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।[৭৮] মনসা ছিলেন হিন্দুদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও শক্তিশালী দেবী। বিজয়গুপ্ত ও বিপ্রদাস কর্তৃক পঞ্চদশ শতকের শেষদিকে মনসাকে নিয়ে কাব্য রচনা পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার মানুষ সর্পদেবীর পূজাকে কতটা গুরুত্ব দিতেন তা স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে। তারা তাঁর অলৌকিক ক্ষমতায় বিশ্বাস করত। মনসা পূজাকে কেন্দ্র করে কিছু লোকপ্রিয় বিশ্বাস গড়ে উঠেছিল। মনে করা হতো যে যেখানে তাঁর সম্পর্কে গান করা হতো তিনি সেখানে তাঁর ভক্তদের বরদানের জন্য এবং তাঁর শত্রুদের অভিশাপ দেবার জন্য উপস্থিত থাকতেন। লোকপ্রিয় বিশ্বাস অনুযায়ী তিনি রুগ্ন ব্যক্তিকে সারিয়ে তুলতে পারতেন। তিনি নিঃসন্তানকে সন্তান দান এবং বন্দিদের মুক্তি দান করতে পারতেন।[৭৯] ধূপ, প্রদীপ, শুকনো চাল, চন্দন ও বিভিন্ন ফুলের মতো জিনিস এবং মহিষ ও পাঁঠা বলি দিয়ে তাঁর পূজা করা যেত। পশ্চিম বাংলায় এ পূজার সঙ্গে জড়িত অনুষ্ঠানাদি সম্ভবত পূর্ব বাংলার চেয়ে কম আড়ম্বরপূর্ণ ছিল।[৮০] যে সব হিন্দু গঙ্গা নদীকে পূজা করত তারা এ নদীর পানিকে পবিত্র মনে করত এবং এর কাছাকাছি জীবনের শেষ দিনগুলি কাটাতে এবং দেহত্যাগ করতে চাইত। রঘুনন্দন গঙ্গার জলে স্নানের ও একে নিষ্ঠার সঙ্গে পূজা করার ধর্মীয় ফলপ্রসূতা সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন।[৮১]

হিন্দুসমাজের রীতিগুলি সংস্কার মিশ্রিত ছিল। বিশ্বাস করা হতো যে সঙ্গীতানুষ্ঠান ধানের মূল্য বৃদ্ধি ঘটাবে এবং দেশে দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি করবে।[৮২] বাইরের দরজায় যে কলসি রাখা হতো (যাত্রাঘট) কোনো দুর্ঘটনায় সেটা ভেঙ্গে গেলে বা মাথা দরজার উপরের চৌকাঠ স্পর্শ করলে যাত্রা অশুভ বলে বিবেচনা করা হতো। অশুভ লক্ষণের কোনো অন্ত ছিল বলে মনে হয় না। বাঁদিকে ঘরের টিকটিকির কিচির মিচির, ডানে সাপের চলাফেরা এবং শিয়ালের ডাক সবকিছুকেই যাত্রা যে শুভ হবে না তার ইঙ্গিত বলে বিবেচনা করা হতো। নারীর সিঁথি থেকে সিঁদুর এবং তাদের হাত থেকে চুড়ি পড়ে যাওয়া এবং শাঁখা ভেঙে যাওয়া—এগুলিকে অশুভ লক্ষণ মনে করা হতো। সকালে মানুষ নিঃসন্তান ব্যক্তির মুখদর্শন করতে চাইত না, নিঃসন্তান ব্যক্তিকে পরজগতে অসহায় ব্যক্তি বলে মনে করা হতো।[৮৩] এসব বিশ্বাসের কিছু কিছু পরিবর্তিতরূপে এখনও আজকের গ্রামবাংলায় টিকে আছে। বৃন্দাবনদাস শ্রীচৈতন্যকে কৃষ্ণের অবতার বলে মনে করতেন। তিনি কিছু অলৌকিক লক্ষণকে চৈতন্যের শৈশবের সঙ্গে জড়িত করেছেন।[৮৪]

সাধারণ মানুষের এসব কুসংস্কারমূলক বিশ্বাস ও ধারণা সে সময়ের নিবন্ধকারদের ওপর যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছিল বলে মনে হয়। তাঁরা অশুভ ঘটনাবলির কুফলের প্রতিবিধানও নির্দেশ করেছেন। এক বিশেষ প্রজাতির পাখি বা প্রাণী কারো মাথায় পড়া বা ঘরে তাদের প্রবেশ এবং অসময়ে ফুল বা ফলের আবির্ভাবকে রঘুনন্দন অশুভ বলে মনে করেন। তাঁর মতে কতিপয় দেব-দেবীর পূজা ও ব্রাহ্মণ-ভোজন এবং তাঁদের স্বর্ণ ও গাভীদান করে মানবজীবনের ওপর এগুলির প্রভাব প্রতিহত করা যায়। তিনি মনে করেন যে, প্রতিকারমূলক অনুষ্ঠানাদি করতে ব্যর্থতা গৃহস্বামীর মৃত্যু ডেকে আনবে।[৮৫] রঘুনন্দনের সমসাময়িক শ্রীনাথ আচার্যচূড়ামনি বিয়ের আচারের সঙ্গে কুসংস্কারমূলক রীতিকে জড়িত করেছেন। তিনি মনে করেন যে, উর্বরাভূমি, গো-চারণভূমি, বেদী (ধর্মীয় বলির জন্য উঁচু করা ভূমি), বিক্রয়স্থান (বাজার), হ্রদ, ঊষরভূমি (অনুর্বর ভূমি), চতুষ্পথ (চারটি রাস্তার মিলনস্থান বা কেন্দ্র) এবং শ্মশান (যেখানে শবদাহ করা হয়) থেকে মাটি নিয়ে তা দিয়ে তৈরি সাতটি পিণ্ড বিয়ের জন্য প্রস্তাবিত কনের অভ্যন্তরীণ গুণাবলি ও দোষ-ত্রুটি নির্ণয়ে বেশ সহায়ক হবে।[৮৬] মধ্যযুগীয় ও প্রাচীন বাঙালি মানসের শ্রেষ্ঠ প্রতিফলন, আইন ব্যবস্থায় কিছু দৈব সাম্য বা দিব্যের[৮৭] ব্যবস্থা আছে, যা আধুনিক মানসে কুসংস্কারের স্তূপ বলে মনে হবে।

হিন্দুসমাজে অনুসৃত শিক্ষা ব্যবস্থা বহু বিষয়েই বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে ভিন্নতর ছিল। গ্রাম্য বিদ্যালয় সে সময়ে সর্বত্র দেখা যেত। এ সব বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ছিল প্রচুর। এরা যে শুধু সমাজের বিত্তশালী শ্রেণী থেকেই আসত তা নয়, দরিদ্র শ্রেণীর ছাত্ররাও ছিল। বেণের মতো নিম্নশ্রেণীতে জন্মগ্রহণ পূর্ববাংলায় শাস্ত্র পাঠের জন্য অন্তরায় হতো না, যদিও গোঁড়া হিন্দুসমাজে এটাকে অনুমোদন করা হতো না। গোঁড়া সমাজে শাস্ত্রপাঠ ছিল ব্রাহ্মণদের একচেটিয়া বিশেষাধিকার।[৮৮] হাতে খড়ি নামের অনুষ্ঠান দিয়ে হিন্দু বালকের শিক্ষা শুরু হতো এবং সম্ভবত সে নিজ গৃহেই বর্ণ-পরিচয় লাভ করত।[৮৯] এ প্রাথমিক পর্যায় শেষ হলে বালক আলাদা আলাদাভাবে একদল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পরিচালিত

পার্শ্ববর্তী টোলগুলির যে-কোনো একটিতে যোগ দিতে পারত। শিক্ষার ধরন সম্পূর্ণভাবে চিরায়ত হওয়ায় তাকে ব্যাকরণ, যুক্তিবিদ্যা এবং অলঙ্কারশাস্ত্র পড়তে হতো।[৯০] ছাত্রের বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশের উচ্চতর পর্যায়ে টীকাসহ বেদগুলি পড়ানো হতো বলে মনে হয়। ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল, মীমাংসা এবং বৈশেষিকের মতো ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন পদ্ধতিও প্রাগ্রসর ছাত্ররা পড়ত।[৯১] প্রগাঢ় চিরায়ত জ্ঞানের কেন্দ্র নবদ্বীপের বুদ্ধিবৃত্তিক মহিমা চৈতন্য-ভাগবতের বিভিন্ন পাতায় উজ্জ্বলভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।[৯২] মনে হয় পূর্ব বাংলা থেকে ছাত্ররা জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে নবদ্বীপে যেত কারণ এ সময়ে পূর্বাঞ্চল সম্ভবত সাংস্কৃতিক দেউলিয়াত্বে ভুগছিল। নবদ্বীপে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির কেন্দ্রীয়করণ ঘটেছিল। সম্ভবত রামকেলি গ্রামেও এটা ঘটেছিল যেখানে রূপ ও সনাতন বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বহু পণ্ডিত ব্রাহ্মণকে নিয়ে এসেছিলেন।[৯৩]

একদল মানুষ এ উচ্চ পর্যায়ের মেধা অর্জন করলেও সার্বিক বিবেচনায় নৈতিক অধঃপতন শুরু হয়েছিল বলে মনে হয়। উচ্চশ্রেণীর মুসলমানরা যখন নিজেদেরকে মদ্যপান ও উপ-পত্নীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত করেছিল, শেষোক্তটি ছিল তাদের যৌন-আনন্দলাভের প্রধান উৎস, তখন হিন্দুরাও মুসলমানদের অনুরূপ কিছু রীতি অবলম্বন করেছিল। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকের বৈষ্ণব সাহিত্য জগাই ও মাধাইর নৈতিক বিচ্যুতির নিন্দা করেছে। তারা হিন্দুধর্মের নীতি ও নৈতিক বিধির পরিপন্থী সবকিছুতেই রত ছিল। বৃন্দাবনদাস বলছেন যে, জাতিগতভাবে ব্রাহ্মণ হলেও তারা সবসময়ই সুরা পান করত ও গো-মাংস খেত এবং চুরি করত।[৯৪] লোচনদাস মনে করেন যে এ দুই ভাই ব্রাহ্মণ ও মুসলমান নারী এবং তাদের বরিষ্ঠদের মহিলাদের সঙ্গও উপভোগ করত এবং গরু, ব্রাহ্মণ ও নারী হত্যা ছিল তাদের সাধারণ কাজ।[৯৫] এ ব্রাহ্মণ ভ্রাতৃদ্বয় গৌড়ের উচ্চবিত্ত মুসলমানদের দ্বারা প্রচণ্ডভাবে প্রভাবিত হয়েছিল বলে মনে হয়। তদানীন্তন হিন্দুসমাজের ক্রমশ ক্ষতিসাধনকারী শক্তিগুলির অন্যতম ছিল তান্ত্রিকবাদ। বৃন্দাবন দাস চৈতন্য-ভাগবতে তান্ত্রিক আচারের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন।[৯৬] নৈতিক মান, বিশেষত ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে, উন্নত ছিল না। গণিকা বৃত্তি প্রচলিত হয়েছিল, কিন্তু গ্রাম-বাংলায় সম্ভবত এটা ছিল অনুপস্থিত। এ বিশেষ প্রথা বাণিজ্য কেন্দ্রগুলির সঙ্গে জড়িত ছিল। সেখানে গণিকাদের জন্য আলাদা বসবাসের এলাকা ভাগ করা ছিল। গ্রামীণ সমাজে এ প্রথা অনুপস্থিত থাকলেও গ্রামের শান্তিপূর্ণ জীবন গ্রামবাসী নারীদের অপহরণের ফলে কখনো কখনো বিঘ্নিত হতো।[৯৭]

আলোচ্য সময়কালের হিন্দুসমাজ ছিল মূলত রক্ষণশীল। প্রাচীন শাস্ত্রকারদের সৃষ্ট গণ্ডি অতিক্রম করা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। বিখ্যাত নিবন্ধকার রঘুনন্দনের রচনা থেকে হিন্দুসমাজের ধারণা লাভ করার চেষ্টা করলে আমাদের যুক্তির সমর্থন পাওয়া যায়। ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধে তিনি স্মৃতি সম্পর্কিত তাঁর গ্রন্থাবলি রচনা করেছিলেন। তাঁর পূর্বসূরিদের মতো রঘুনন্দনও একজন ব্রাহ্মণের পাঁচটি মহাযজ্ঞ (যেমন, শিক্ষাদান, মৃতব্যক্তির আত্মার প্রশান্তিকরণ, বলি, প্রাণীদের খাদ্যদান এবং আতিথেয়তা) নিয়মিত পালনের নির্দেশ দিয়েছেন যাতে করে তিনি তার ঘরের পাঁচটি অপরিহার্য উপাদানের

ব্যবহার থেকে সৃষ্ট পাপ থেকে মুক্তি পেতে পারেন। তিনি এ বিধান দিয়েছিলেন যে দেবতাদের নিবেদন না করে কারও খাদ্য গ্রহণ করা উচিৎ নয়। যাদের খাদ্য গ্রহণযোগ্য নয় তাদের এক দীর্ঘ তালিকা তিনি দিয়েছেন। মৃতব্যক্তির আত্মাকে আষাঢ় (জুন-জুলাই), কার্তিক (অক্টোবর-নভেম্বর) এবং মাঘ (জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি) মাসের পূর্ণিমা তিথিতে শ্রাদ্ধের উপহার দান করা উচিত।[৯৮] তিনি বলেছেন যে, তাঁর নির্দেশিত প্রাত্যহিক কর্তব্যসমূহ যারা সম্পাদন করবে না তাদের সর্বনাশ ঘটবে।[৯৯]

রক্ষণশীল হিন্দুদের জন্য রঘুনন্দন নির্দেশিত সামাজিক-ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি বছরের প্রায় সব মাস জুড়েই রয়েছে। এ সবের মধ্যে বেশকিছু ব্রতপালন ও উপবাস, দান, দেব-দেবীর পূজা এবং অন্যান্য বহু ধর্মীয় আচার পালন ও কিছু কাজ পরিহার করা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এগুলি নিম্নরূপ–[১০০]

ধর্মপ্রাণ একজন হিন্দু বৈশাখ মাসে প্রত্যূষে স্নান করবে, ব্রাহ্মণকে কলসি দান করবে, মসুর ডাল দিয়ে নিমপাতা খাবে এবং ঠাণ্ডা পানিতে বিষ্ণুকে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করবে। সুন্দর সন্তান লাভে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠ দিনে ষষ্ঠীর পূজা করা উচিত। বৈধব্য পরিহারের উদ্দেশ্যে আগের মাসের পূর্ণিমার পরবর্তী একই শুক্লপক্ষের চতুর্দশ দিনে নারীকে সাবিত্রী-ব্রত পালন করতে হবে। গঙ্গা ও অন্যান্য নদীতে পূণ্যস্নান দেহ, মন ও বাকশক্তির দশটি পাপকাজ লাঘব করে। চতুর্মাস্য অনুষ্ঠানের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হচ্ছে বিষ্ণুপূজা, গঙ্গা-স্নান করা, চুল ও নখ কাটা, গুড়, তেল এবং রান্না করা খাদ্য গ্রহণ পরিহার করা। এটা শুরু হয় আষাঢ়ে এবং শেষ হয় কার্তিকে। শ্রাবণ মনসা পূজার জন্য নির্ধারিত। ভাদ্রের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টম দিনে শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিন পালন (জন্মাষ্টমী) পাপের প্রায়শ্চিত্ত ঘটাবে। দুর্গাপূজা ও কোজাগর উৎসব হয় আশ্বিনে। কার্তিক মাসের অনুষ্ঠান ও উৎসবাদির মধ্যে রয়েছে দীপান্বিতা বা গৃহের আলোকসজ্জা, দ্যূত-প্রতিপদ যাতে তার সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্য নিরূপণের জন্য মানুষ পাশা খেলে এবং ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়া যাতে নারীরা যমের পূজা ও তাদের ভাইদের আপ্যায়ন করে। নবান্ন বা নতুন ধানের উৎসব অগ্রহায়ণ মাসে পালন করা উচিত। মাঘ মাসে রয়েছে রন্টনী-চতুর্দশী বা কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশ দিনে প্রভাত-স্নান, সরস্বতীর পূজার জন্য শ্রীপঞ্চমী, মাঘী-সপ্তমীতে স্নান ও সূর্যপূজা, বিধান-সপ্তমী ও আরোগ্য-সপ্তমী উপলক্ষে ব্রত এবং ভীষ্ম-পূজা। শিবরাত্রির উৎসব হয় ফাল্গুনে। এরপরে রয়েছে শীতলার পূজা, বারুণী উৎসব, অশোকাষ্টমী, রামনবমী এবং মদন বা প্রেম-দেবতার পূজা– এর সবগুলিই হয় চৈত্র মাসে।

কোনো কোনো অনুষ্ঠান প্রায়শ্চিত্তমূলক বা প্রসন্নকর প্রকৃতির হলেও অন্যান্যগুলি মনে হয় ইচ্ছা বা পার্থিব আকাঙ্ক্ষা পূরণের নিশ্চিত উদ্দেশ্যেই পালন করা হতো। বাংলার হিন্দুরা এ বহুসংখ্যক অনুষ্ঠান ও উৎসব একভাবে পালন করত কিনা সেটা পরিষ্কারভাবে জানা যায় না; তবে স্মার্ত সামাজিক-ধর্মীয় সংহিতায় এদের অন্তর্ভুক্তি যথেষ্ট তাৎপর্যবহ। বস্তুত পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকের স্মৃতি রচনাবলি তাদের নিজেদের সমাজ সম্পর্কে স্মার্ত পণ্ডিতদের মনোভাবের স্পষ্ট ইঙ্গিত দান করে। নিবন্ধকারগণ সামাজিক আচরণের প্রতিটি দিকই একটা নির্দিষ্ট ধর্মীয় নীতিমালা অনুসারে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছিলেন।

এ নীতিমালা ছিল এক ধরনের অপরিবর্তনীয় ধর্মীয় আচরণ দ্বারা শাসিত। পৃথক পৃথক ভাবে স্মৃতি রচয়িতাগণ যে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের অনমনীয়তার ওপর জোর দিয়েছেন তা সম্ভবত পূর্ববর্তী সামাজিক-ধর্মীয় বিধিমালার প্রতি তার আনুগত্য দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়। এ বিধিমালা তার ইচ্ছেমতো পরিবর্তন করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। পূর্ববর্তী স্মার্ত বিধানগুলির অনমনীয় প্রকৃতি যে কিছু সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি করেছিল তা রঘুনন্দনের রচনাবলি থেকে স্পষ্ট বলে মনে হয়। বিবাহযোগ্যা মেয়ের বয়সসীমা, শূদ্রদের সঙ্গে ব্রাহ্মণের মেলামেশা এবং ব্রাহ্মণ্য আশ্রমে একজন বয়স্ক বিপত্নীক ব্যক্তির স্নান সম্পর্কিত বিধানগুলি শিথিল করার প্রবণতা তার মধ্যে লক্ষ্য করা যায়।

স্মৃতি গ্রন্থাবলিতে আমরা হিন্দুসমাজের যে ছবি পাই সেটা আংশিকভাবে আদর্শিক হতে পারে; কিন্তু এগুলি যে যুগে স্মৃতিসাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছিল সে যুগের প্রবণতা প্রকাশ করে। হিন্দু সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্যমূলক রক্ষণশীলতার কারণ হিসেবে বর্ণপ্রথার কঠোরতা এবং প্রাচীন শাস্ত্রের রক্ষণশীল বিধানের প্রতি মানুষের অসাধারণ গুরুত্ব প্রদানের প্রবণতাকে দায়ী করা যেতে পারে। আবার সামাজিক-ধর্মীয় বিধান রচনায় ব্রাহ্মণরা মনে হয় সমাজে তাদের বিশেষ সুবিধাভোগী অবস্থান বজায় রাখার স্বীয় স্বার্থ দ্বারা প্রণোদিত হয়েছিলেন। একজন শূদ্রের ধর্মীয় কর্তব্য ও বিশেষ সুবিধাবলি সবিস্তারে বর্ণনা করতে গিয়ে রঘুনন্দন উল্লেখ করেছেন যে সে দেবতা ও ব্রাহ্মণদের পূজা করে ধর্মের ফল ভোগ করতে পারে।[১০১] এভাবে ব্রাহ্মণদের দেবতাদের সমপর্যায়ভুক্ত করা হয়েছে। হিন্দু সমাজের রক্ষণশীল প্রকৃতি আলোচনা করার সময় এ সমাজের অনুশীলিত মহৎ গুণাবলিকে উপেক্ষা করা আমাদের উচিৎ হবে না। দান ও প্রায়শ্চিত্তের ধর্মীয় কার্যকারিতার ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করে এবং নিঃস্বার্থ কর্মের ফলপ্রসূতা সম্পর্কে আলোচনা করে[১০২] স্মৃতিকারগণ মনে হয় মানুষের সামনে একটা আদর্শকে তুলে ধরে ছিলেন। আগেই যেমন নির্দেশ করা হয়েছে, ব্রাহ্মণ্য সমাজের পবিত্রতা ও বিশুদ্ধতা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে তাঁর নির্দেশাবলির সমর্থনে রঘুনন্দন প্রাচীন স্মৃতি, মহাকাব্য, পুরাণ এবং নিবন্ধগুলি থেকে সামাজিক-ধর্মীয় নিয়মাবলি উদ্ধৃত করেছেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ্যবাদের অভ্যন্তরে তান্ত্রিক উপাদান ও অনার্য দেব-দেবীর উপস্থিতি এটাই নির্দেশ করে যে এ উদ্দেশ্য-সাধন সহজ ছিল না। অন্যত্র যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, রঘুনন্দন তান্ত্রিক দীক্ষায়ন ও শীতলা এবং মনসার পূজার ব্যবস্থা রেখেছিলেন। ব্রাহ্মণ্যবাদের ওপর অনার্য প্রভাবের প্রক্রিয়া নিশ্চয়ই এ সময়ের আগেই শুরু হয়েছিল। এটা লক্ষ্য করা কৌতূহলোদ্দীপক যে জীমূতবাহন তার কালবিবেকে সর্পদেবী মনসার পূজার নির্দেশ দিয়েছিলেন।[১০৩] ইসলামের প্রভাব কিভাবে ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বীদের পুনরায় নতুনভাবে দলবদ্ধ করেছিল তা আমরা আগেই আলোচনা করেছি।

স্মৃতি রচনাবলিতে প্রাপ্ত বিস্তারিত ব্রাহ্মণ্য নিয়মাবলি হিন্দুসমাজের নিম্নশ্রেণীর মানুষ অনুসরণ করেছিল এ কথা বিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি বহির্ভূত সাধারণ মানুষের সম্ভবত সরল আদিম বিশ্বাস ও রীতি, উপজাতীয় দেব-দেবী, সহজ বিধান এবং তাদের লোক-সংস্কৃতি সৃষ্টির সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য সব উপাদানই ছিল।

৩.
ইতিহাসের একজন ছাত্রের জন্য আলোচ্য সময়কালে হিন্দু ও মুসলমানদের সামাজিক যোগাযোগ সম্পর্কে কৌতূহল না থাকার কথা নয়। সম্ভবত সুফিবাদের উদারতার প্রভাব মুসলমানদের হিন্দু সর্বেশ্বরবাদের প্রতি কম বীতরাগ করে তুললেও, এ দুই শ্রেণীর লোকের মধ্যে সংঘাত একেবারে অনুপস্থিত ছিল না। বস্তুত মনসা-মঙ্গল কাব্যের প্রায় সব লেখকই দুই সম্প্রদায়ের সংঘর্ষ সম্পর্কে একটি পরিচ্ছেদ রেখেছেন। বর্ণ সম্পর্কে হিন্দুরা স্পর্শকাতর ও রক্ষণশীল হওয়ায় মুসলমান প্রশাসকগণ তাদের জাত অপবিত্র করে তাদের ওপর চরমতম আঘাত হানার সহজতম পথ গ্রহণ করেছিলেন, যদিও সুলতানগণ একে উৎসাহিত বা সমর্থন করেন নি। অমুসলমানদের প্রতি সুলতানদের মনে হয় মনোভাব ছিল সাধারণত সহানুভূতি ও সমঝোতার। বিজয়গুপ্তের মনসা-মঙ্গলে হোসেনহাটি গ্রামের স্থানীয় প্রশাসক একজন মুসলমান কাজী হিন্দুদের আচারাদি পালনে কোনো আপত্তি করেন নি। কিন্তু মোল্লা বা মুসলমান পুরোহিত, ইসলামের সুপ্রতিষ্ঠা ছিল যার দায়িত্ব, তিনি সর্পদেবীর উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত মৃৎপাত্রের পূজা নিবারণ না করার জন্য কাজীকে তিরস্কার করেছিলেন। ধর্মান্ধতা একবার সক্রিয় হলে তা সাধারণত ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি সাধন করত। তখন তুলসী পাতাসহ কাউকে পেলেই তাকে কাজীর সামনে হাজির করা হতো এবং নির্দয়ভাবে প্রহার করা হতো। ব্রাহ্মণদের তখন তাদের পৈতা বা পবিত্রসুতা ত্যাগ করতে হতো। কাজেই তারা সবসময়ই সে বিশেষ এলাকার মুসলমানদের কাছ থেকে দূরে থাকাকে সঠিক কাজ বলে মনে করত।[১০৪] বিপ্রদাসের বর্ণিত কাহিনী[১০৫] বিজয়গুপ্তের কাহিনী থেকে খুব ভিন্নতর নয়। সতর্কতার সঙ্গে এসব গ্রন্থ পড়লে মনে হয় যে কিছু কিছু মুসলমান কর্মকর্তার ব্যক্তিগত খেয়াল ও ধর্মান্ধতা এসব সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের জন্য দায়ী ছিল। আবার, সম্পূর্ণ রাজনৈতিক কারণে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার ঘটনাও ঘটেছিল।

ব্রাহ্মণরা মনে হয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে এক সংখ্যালঘু গ্রুপ ছিল। নিম্নবর্ণের হিন্দুরা ছিল জনগোষ্ঠীর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ। উপরের একটি পরিচ্ছেদে আলোচিত মুসলমান ও ব্রাহ্মণদের মধ্যে বিরোধগুলির কিছু সামাজিক-রাজনৈতিক কারণ ছিল। এগুলি সম্ভবত নিম্নবর্ণের হিন্দুদের সঙ্গে মুসলমানদের সামাজিক সম্পর্ককে প্রভাবিত করে নি। তাছাড়া, সমকালীন দেশীয় সাহিত্যে আমরা যেসব ধর্মীয় দাঙ্গার ঘটনার বিবরণ দেখতে পাই সেগুলিকে বড় করে দেখার কোনো কারণ নেই, কারণ এগুলি সমাজতাত্ত্বিক বিবর্তনের সমগ্র ধারাকে প্রভাবিত করেছিল বলে মনে হয় না। হিন্দু ও মুসলমানরা, যাদের অনেকেরই জন্ম হয়েছিল হিন্দু মায়ের গর্ভে বা তাদের বংশধরগণ একসঙ্গে বাস করত এবং উভয়ই জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা করত। ইতোমধ্যেই এটা চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে বহু হিন্দু হোসেন শাহী শাসকদের অধীনে গুরুত্বপূর্ণ সরকারি পদ অধিকার করেছিলেন। এ শাসকরা নিশ্চয়ই দুই প্রধান সম্প্রদায়ের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টির অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন। মহাভারতের অনুবাদ এবং কালী-পূজার সঙ্গে কিছুটা পরোক্ষভাবে জড়িত বিদ্যা-সুন্দরের[১০৬] রচনা কর্মকে উৎসাহিত

করা থেকে অমুসলমান প্রজাদের প্রতি শাসক শ্রেণীর মনোভাব স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। হিন্দু ও মুসলমানরা সব সময়ই বিবাদে লিপ্ত থাকলে এ আমলের হিন্দু কবিরা মুসলমান শাসকদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতেন না।

হিন্দু ও মুসলমানরা পরস্পরের জীবনধারাকে প্রভাবিত করেছিল। বেশ কিছুসংখ্যক মুসলমানের নাম ছিল স্থানীয়।[১০৭] গ্রামাঞ্চলে তারা মোটামুটি শান্তিতে বাস করত এবং তাদের মধ্যে সম্পর্ক ছিল সুখকর। শ্রীচৈতন্য ও তাঁর ভক্তদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েও নবদ্বীপের কাজী এটা ভুলে যান নি। চৈতন্যকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেছিলেন ঃ "গ্রাম সম্পর্কে চক্রবর্তী আমার মামা। গ্রামসম্পর্ক রক্তের সম্পর্কের চেয়ে পবিত্র। নীলাম্বর চক্রবর্তী তোমার মাতামহ। সুতরাং তুমি আমার ভাগ্নে।"[১০৮] সাধারণ মুসলমানরা হিন্দুদের সামাজিক অনুষ্ঠানগুলিতে যোগ দিত, এমনকি কোনো ধনী হিন্দুর বিয়ের শোভাযাত্রাও তাদের উপস্থিতি ছাড়া সম্পূর্ণ হতো না।[১০৯] বৈষ্ণব সাহিত্যে উল্লেখ আছে যে, মুসলমানরা বৈষ্ণবদের সংকীর্তনও উপভোগ করত।[১১০] কাজেই হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সম্পর্ক ছিল আন্তরিকতাপূর্ণ এবং ধর্মান্ধতার ঘটনা ছিল বিরল।

সংস্কৃতির ক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতা ছিল। আমরা আগেই বলেছি যে হিন্দু কর্মচারীদের সরকারি ভাষা ফার্সি শিখতে হতো। এ ভাষায় জ্ঞান কিছু কিছু উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর মনে ফার্সি সংস্কৃতির প্রতি অকৃত্রিম সহানুভূতির সৃষ্টি করেছিল। তারা কেন ফার্সি কবি জালালউদ্দীন রুমীর বিখ্যাত কাব্য মসনবি পড়ত এ থেকে তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এ আমলের হিন্দু কবিরা তাঁদের রচনায় আরবি ও ফার্সি থেকে ধার করা শব্দ ব্যবহার করতে দ্বিধা করেন নি।[১১১] কিছু কিছু মুসলমান কবি ও পণ্ডিতের সংস্কৃত ভাষা ও হিন্দু পৌরাণিক কাহিনী সম্পর্কে পুরাদস্তুর জ্ঞান ছিল বলে মনে হয়। এখানে আমরা পঞ্চদশ বা ষোড়শ শতকের বাঙালি কবি সাবিরিদ খানের নামোল্লেখ করতে পারি যিনি বিদ্যা ও সুন্দরের প্রেমকাহিনী নিয়ে একটি কাব্য রচনা করেছিলেন। গোটা কাব্যেই সম্ভবত কবির নিজেরই রচিত সংস্কৃত পংক্তি ছড়িয়ে আছে।[১১২] কাব্যের ভাষা হচ্ছে সংস্কৃতের অনুরূপ বাংলা। আরবি বা ফার্সি শব্দের ব্যবহার এতে খুবই কম। হিন্দু পৌরাণিক কাহিনী সম্পর্কে সাবিরিদ খানের জ্ঞান সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত, কারণ কাব্যের প্রথমাংশে তিনি দিলীপ ও দশরথের মতো পৌরাণিক রাজাদের জীবনের সঙ্গে জড়িত কিছু ঘটনার উল্লেখ করতে ভুলেন নি।[১১৩] তার কাব্যে বর্ণিত কাহিনীর উৎস যে পার্বতীর পূজার সঙ্গে সম্পর্কিত সে কথা আমাদের জানাতে কবি দ্বিধা করে নি।[১১৪] ফলে সাবিরিদের রচনা থেকে হিন্দু সংস্কৃতির প্রতি কবির মনোভাবের কিছুটা ধারণা আমরা পাই। ইসলামি মরমিবাদ কিভাবে যোগ ও তান্ত্রিক ধারণা ও আচারাদি আত্মীভূত করেছিল পূর্ববর্তী এক পরিচ্ছেদে তা আমরা আলোচনা করেছি।

৪.

পর্তুগিজরা তখন পর্যন্ত বাংলায় একটি সামাজিক শ্রেণীতে পরিণত হয় নি। তারা ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য ও জলদস্যুতার সঙ্গে জড়িত এবং শাসকশ্রেণী ও আরব ও পারস্যদেশীয়

ব্যবসায়ীদের শত্রুতার কারণে এদেশে তাদের অবস্থানকাল ছিল সীমিত। সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেই শুধু তারা তাদের উপনিবেশগুলিতে রীতিসম্মত সামাজিক জীবন যাপন করতে শুরু করেছিল। তাদেরকে অবশ্য সাতগাঁও ও চট্টগ্রামের শুল্কভবনগুলি দেওয়া হয়েছিল এবং পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহের বাসিন্দাদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায়ের অনুমতি দান করা হয়েছিল। দুর্ভাগ্যবশত স্থানীয় জনগণের সঙ্গে এসব পর্তুগিজ ইজারাদারদের সম্পর্কের বিষয়ে কিছু জানা যায় না। মনে হয় এ সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল না, কারণ বাংলার সুলতান ও আরব বণিকদের প্রতি তাদের শত্রুতা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত।[১১৫] আলোচ্য সময়কালে তাদের কর্মকাণ্ডের ধর্মীয় ও বাণিজ্যিক দু'টো দিকই ছিল। আন্দালুসীয় উপদ্বীপ থেকে আরবদের বিতাড়নের পর যেখানে মুসলমানদের দেখা যেত সেখানেই তারা তাদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করেছিল বলে মনে হয়।[১১৬] কিন্তু এর অর্থনৈতিক দিকটি অবহেলা করা যায় না। পর্তুগিজরা প্রাচ্যে এসেছিল ধনসম্পদের সন্ধানে। বাংলার সামুদ্রিক বাণিজ্যের ক্ষেত্র আরবদের দখলে দেখে তারা আরবদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হয়ে পড়ে।

'বাঙ্গেলা' নগরীতে ভার্থেমা কয়েকজন নেস্টরপন্থী খ্রিস্টানকে দেখতে পেয়েছিলেন। তারা রেশমি বস্ত্র, ঘৃতকুমারী-কাঠ, দেব-ধূপ, এবং কস্তুরীর ব্যবসা করত। তারা এসেছিল সর্নৌ শহর থেকে এবং তারা ছিল ক্যাথের 'বিখ্যাত খানের' শাসনাধীন। তারা লাল টুপি এবং ভাঁজ করা জ্যাকেট পরত যার হাতাগুলি ছিল ভিতরে তুলা দিয়ে দুই পাট কাপড়কে কাঁথার মতো সেলাই করা। তারা জুতা ব্যবহার না করলেও "নাবিকদের পরিহিত চোগার মতো রেশমি চোগা পরত এবং এগুলি ছিল রত্নখচিত।" তারা টেবিলে বসে আহার করত এবং 'সবরকম মাংস' খেত। আর্মেনীয়দের রীতি অনুসরণ করে তারা ডান দিক থেকে বাম দিকে লিখত।[১১৭] তাদের ধর্মীয় আচার ও বিশ্বাস সম্পর্কে ভার্থেমা বলেছেন যে তারা ত্রিত্ব, যিশুর বারজন শিষ্য এবং চারজন সুসমাচার লেখককে বিশ্বাস করত। জল দিয়ে তাদের দীক্ষা হতো। রক্ষণশীল খ্রিস্টান হিসেবে তারা "যিশুর জন্মদিন এবং ক্রুশে বিদ্ধ যিশুর যন্ত্রণাভোগ ও মৃত্যুদিন উদ্‌যাপন করত এবং প্রতি বছর আমাদের মতো যিশুর উপবাস স্মরণে ঈস্টারের পূর্বে চল্লিশ দিন উপবাস ও অন্যান্য নিশিপালন উদ্‌যাপন করত।"[১১৮] মনে হয় এসব খ্রিস্টান মাঝে মাঝে আসত, তারা এদেশের স্থায়ী বাসিন্দা ছিল না।

৫.

পূর্ববাংলা ও পশ্চিম বাংলার সামাজিক আচার ও স্থানিক ভাষার পার্থক্য সহজেই নজরে পড়ে। পূর্ববাংলার স্থানিক ভাষা ও যারা এ ভাষায় কথা বলে তাদের প্রতি দেশের পশ্চিমাঞ্চলের অধিবাসীদের এক তীব্র বিরাগ ছিল। তাদেরকে এরা বর্তমানের মতো তখনও বাঙ্গাল রূপে গণ্য করত।[১১৯] নবদ্বীপবাসী বঙ্গদেশীয়দের সম্পর্কে চৈতন্য বিদ্রূপ করে কথা বলতেন। অন্যদিকে কবিকঙ্কণ এবং কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ এ অদ্ভুত স্থানিক ভাষার প্রতি অবজ্ঞা দেখিয়েছেন। তারা তাদের বিখ্যাত গ্রন্থগুলিতে ঠাট্টার ছলে এ ভাষার অনুকরণ করেছেন।[১২০] কিন্তু এসব বৈসাদৃশ্য দেশের দুই অংশের মধ্যে সাংস্কৃতিক

সম্পর্ক গড়ে ওঠার ব্যাপারে বাধা হয়ে দাঁড়ায় নি। প্রথম জীবনে চৈতন্যের পূর্ব বাংলা সফরের যে কিছু সাংস্কৃতিক ও শিক্ষামূলক গুরুত্ব ছিল সেটা সন্দেহাতীত।[১২১] পরবর্তীকালে সিলেট ও চট্টগ্রামে বৈষ্ণবধর্ম বেশকিছু অনুসারীও পেয়েছিল।[১২২] উপরন্তু, নবদ্বীপ ও শান্তিপুরের শিক্ষাকেন্দ্রগুলি এ অঞ্চলের শিক্ষার্থীদের আকর্ষণ করত।

বহু আচার ও নিয়মে ভরা বাংলার জীবনযাত্রা ছিল বিচিত্র। রাঢ়, বরেন্দ্র এবং বঙ্গের মতো প্রাচীন আঞ্চলিক বিভাগগুলি তখনও অন্তর্হিত হয় নি। কিন্তু সেগুলিকে বৃহত্তর এক ভৌগোলিক অঞ্চলের অধীনে সুগ্রথিত করা হয়েছিল যার আঞ্চলিক আয়তন ছিল মোটামুটিভাবে বর্তমান বাংলার মতো। বাঙ্গালা বা বাংলা নামের উদ্ভব ইতোমধ্যে হয়েছে এবং চট্টগ্রাম থেকে মন্দারণ এবং বঙ্গোপসাগর থেকে আসামের পাহাড়শ্রেণী পর্যন্ত বিস্তৃত গোটা ভূখণ্ডের জন্য এ নাম ব্যবহার করা হচ্ছিল।[১২৩] এরচেয়ে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ছিল এই যে, এ সময়ের মধ্যে বাংলায় তার নিজস্ব একটি ভাষার বিকাশ ঘটেছিল যা সে আমলের কবিরা সমরূপে গ্রহণ করতে পারতেন।[১২৪] কাজেই বাঙালিদের জীবনযাত্রায় বেশকিছু সর্বজনীন উপাদান ছিল। এগুলি ছিল বসবাসের জন্য একটি সন্নিহিত এলাকা, সাহিত্যের এক সর্বজনীন ভাষা এবং তাদেরকে শাসনের জন্য এক সর্বজনীন রাজনৈতিক শক্তি। এগুলি ঐক্যের শক্তিশালী বন্ধন রূপে কাজ করেছিল এবং তাদের প্রকৃতিকে পূর্ণতা দান করেছিল। এটা কোনো সাধারণ কৃতিত্ব নয় এবং এতে নিশ্চিতরূপে শাসকবর্গের প্রত্যক্ষ অবদান ছিল। হোসেন শাহী আমল বাঙালি জাতির জন্মের একটি সুস্পষ্ট পর্যায়ের সূচনা করেছিল বলে মনে হয়। আফগানদের বিজয়-তরঙ্গমালা ও পরবর্তীতে মোগল সাম্রাজ্যবাদ একে নিরুৎসাহিত করেছিল বলেও মনে হয়। শাসকগোষ্ঠীকে চারদিক থেকে বেশকিছু শত্রুভাবাপন্ন দেশ ঘিরে রেখেছিল। এদেরকে প্রতিরোধ করার অবিরাম চেষ্টা সে করে যাচ্ছিল। এটা করতে গিয়ে তাকে অভ্যন্তরীণ শান্তি ও দেশের অখণ্ডতা নিয়ে ভাবতে হয়েছিল। স্থানীয় সংস্কৃতির উন্নতি বিধান এবং জনগণের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখলে এটা অর্জন করা সম্ভব ছিল। ফলে জনগণকে শাসকশ্রেণীর আরও কাছে টানা হয়েছিল এবং শাসকশ্রেণীর প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার তাদের অকৃত্রিম কারণ ছিল। কাজেই অভিন্ন শাসকগোষ্ঠীর প্রতি সহানুভূতি জনগণের মধ্যে এক সর্বজনীন ঐক্য-বোধের সঞ্চার করেছিল বলে মনে হয়।

টীকা

১. পারস্যদেশীয় ও ভারতীয় শাসকদের ঐশ্বরিক অধিকার দাবি ইত্যাদির জন্য দেখুন কে, এম. আশরাফ ঃ পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১২৮-২৯।

২. পূর্বোল্লিখিত, ২য় পৃ. ৪৮২।

৩. বিপ্রদাস ঃ পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১৪৩; বার্বোসা ঃ পূর্বোল্লিখিত, ২য়, পৃ. ১৩৮-৩৯।

৪. পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১৩৩।

৫. বিপ্রদাস ঃ পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১৪৩।

৬. মজুমদাব, রায় চৌধুরী ও দত্ত ঃ দি অ্যাডভান্সড হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া, পৃ. ২৯৭ ও ৩০০।

৭. পূর্বোল্লিখিত, ১ম, পৃ. ২৬০।

৮. পূর্বোল্লিখিত, ২য়, পৃ. ৭৪-৭৬।

৯. ভট্টশালী ঃ তৈফুর সংগ্রহ, ৭-১৫; উপরে পৃ. ১২৬-২৭।

১০. পূর্বোল্লিখিত, ২য়, পৃ. ১৪৭।

১১. বিশ্বভাবতী অ্যানালস, পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১২১ ও ১২৪।

১২. বার্বোসা ঃ পূর্বোল্লিখিত, ২য়, পৃ. ১৪৭।

১৩. বিশ্বভারতী অ্যানালস, পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১১৯ ও ১৩১।

১৪. বার্বোসা ঃ পূর্বোল্লিখিত, ২য়, পৃ. ১৪৮।

১৫. জে. আর. এ. এস, ১৮৯৫, পৃ. ৫৩১; বিশ্বভাবতী অ্যানালস, পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১১৯।

১৬. জে. আর. এ. এস. ১৮৯৫, পৃ. ৫৩২; আরও দেখুন, সি ইয়াং চাওকুং টিয়েন লু, পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১২৪-২৫।

১৭. ওয়াকিয়াৎ-ই-মুশতাকী, কে. এম. আশরাফ কর্তৃক উদ্ধৃত, পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৩৩৪-৩৫।

১৮. বার্বোসা ঃ পূর্বোল্লিখিত, ২য়, পৃ. ১৪৭-৪৮।

১৯. জে. এ. এস. বি. ১৮৭৩, ১ম অংশ, পৃ. ২৯৮ তে প্রদত্ত দ্য এশিয়া থেকে উদ্ধৃতাংশ।

২০. পূর্বোল্লিখিত, ২য়, পৃ. ১৪৭-৪৮।

২১. উপরে, পৃ. ২২৬-২৭।

২২. কৃষ্ণদাস কবিরাজ ঃ পূর্বোল্লিখিত, আদি, সপ্তদশ, পৃ. ৬৭।

২৩. কবিকঙ্কণ চণ্ডী : ১ম, পৃ. ২৬০-৬১।

২৪. বার্বোসা : পূর্বোল্লিখিত, ২য়, পৃ. ১৪৮।

২৫. বিপ্রদাস : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৬৭-৬৮; বিজয়গুপ্ত : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৫৫-৫৬; মাহুয়ানের বিবরণ, পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৫৩০; কবিকঙ্কণ চণ্ডী, ১ম, পৃ. ২৫৯।

২৬. বিজয়গুপ্ত : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৬০।

২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০।

২৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০।

২৯. জে. এ. এস. বি. ১৮৭৪, পৃ. ৩০৩; দানী : বিব্লিওগ্রাফি, পৃ. ৪৯; এস. আহমদ : ইনস্ক্রিপশন্স, পৃ. ১৫৯।

৩০. জে. এ. এস. বি. ১৮৭২, পৃ. ৩৩৭-৩৮; কানিংহাম : পূর্বোল্লিখিত, পঞ্চদশ খণ্ড, পৃ. ১৪৪; দানী : বিব্লিওগ্রাফি, পৃ. ৬৭; এস. আহমদ : ইনস্ক্রিপশন্স, পৃ. ২০৯।

৩১. পূর্বোল্লিখিত, ১ম, পৃ. ২৬৩।

৩২. পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৪।

৩৩. উপরে, পৃ. ১৪২-৪৩।

৩৪. হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৮৪।

৩৫. শুদ্ধিতত্ত্ব, জে. এ. এস. বি. উনবিংশ খণ্ড, পৃ. ১৭০; বি. টি. ভট্টাচার্য কর্তৃক উদ্ধৃত।

৩৬. বৃন্দাবন দাস : পূর্বোল্লিখিত, মধ্য, ১ম, পৃ. ১২০, ত্রয়োবিংশ, পৃ. ২৬৪ এবং ২৭৮; বিজয়গুপ্ত : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৪, ৭১-৭৬ এবং ১৫২-৫৬; চণ্ডীমঙ্গল, ১ম, পৃ. ২৬৬-৭৩।

৩৭. হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৬৮-৭০ এবং ৫৭৩-৭৪।

৩৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬৮ ও পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহ; নীহাররঞ্জন রায় : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৩০০ ও পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহ।

৩৯. পূর্বোল্লিখিত, ১ম, পৃ. ২৬৫।

৪০. বৃন্দাবনদাস : পূর্বোল্লিখিত, আদি, চতুর্দশ, পৃ. ১০৭।

৪১. প্রাগুক্ত, আদি, ২য়, পৃ. ১৬, ১৮; ৩য়, পৃ. ১৯; ৫ম, পৃ. ৩১; বিজয়গুপ্ত : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১৫০-৫১।

৪২. সংস্কারতত্ত্ব অ্যান্ড মলমাস, জে. এ. এস. বিতে উদ্ধৃত, পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১৭১; এস. সি. বন্দ্যোপাধ্যায় : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৭৬-৮২।

৪৩. পূর্বোল্লিখিত, আদি, ২য় পৃ. ১১।

৪৪. প্রাগুক্ত, আদি, নবম, পৃ. ৬০।

৪৫. মধ্যযুগীয় স্মৃতিগুলি থেকে দেখা যায় যে বিয়ের অনুষ্ঠান নান্দী-মুখ দিয়ে শুরু হতো এবং পত্যভিবাদন বা কনের প্রতি বরের আনুষ্ঠানিক প্রীতিসম্ভাষণ দিয়ে শেষ হতো। অন্যান্য অনুষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে মুখচন্দ্রিকা যাতে বর-কনে পরস্পরের মুখের দিকে তাকায়, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয় জল ও মধুপর্কের মতো জিনিস দিয়ে কনে-বরণ এবং বরকে আনুষ্ঠানিকভাবে কনে-সম্প্রদান। এরপর রয়েছে পাণিগ্রহণ (কনে কর্তৃক বরের হাত ধরা), অশ্বারোহণ (কনের একখণ্ড পাথরের ওপর ওঠা), লাজ-হোম (কনে কর্তৃক ভাজা খাদ্যশস্য আগুনে নিক্ষেপ), সপ্তপদী-গমন (বরের সাহায্য নিয়ে কনের সাত পা অগ্রসর হওয়া), মূর্ধাভিষেক (বর-কনের মাথায় পবিত্র জল ছিটানো), মহাব্যাহৃতিহোম, ধ্রুবারুন্ধতী-দর্শন (বর কর্তৃক কনেকে ধ্রুব বা ধ্রুবতারা ও অরুন্ধতী প্রদর্শন) এবং পত্যভিবাদন। বিভিন্ন স্মার্ত বৈবাহিক আচারের বর্ণনার জন্য দেখুন, এস. সি. বন্দ্যোপাধ্যায় : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৪৭-৭৪ এবং ৮২-৮৫। প্রাচীন বাংলায় অনুরূপ অনুষ্ঠানের জন্য তুলনীয়, হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, ১ম, পৃ. ৬০১ ও পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহ।

৪৬. বৃন্দাবন দাস : পূর্বোল্লিখিত, আদি, ৯ম, পৃ. ৫৯-৬০; কবিকঙ্কণ চণ্ডী : ১ম, পৃ. ১৩৪-৩৫ এবং ২য়, পৃ. ৩৬৬-৬৮ ও ৩৮২-৮৪; বিজয়গুপ্ত : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১৬৫-৬৭।

৪৭. বৃন্দাবন দাস : পূর্বোল্লিখিত, আদি, ৯ম, পৃ. ৬০ ও ত্রয়োদশ, পৃ. ৯২-৯৩; বিজয়গুপ্ত : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ২৪-২৫ ও ১৬৯-৭০; কবিকঙ্কণ চণ্ডী : ১ম, পৃ. ১৩৬-৩৯ ও ২য়, ৩৮৫-৮৯।

৪৮. বৃন্দাবন দাস : পূর্বোল্লিখিত, আদি, ত্রয়োদশ, পৃ. ৯৪-৯৫; বিজয়গুপ্ত : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১৭১-৭২ ও ১৭৯।

৪৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮২-৮৩।

৫০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬, ২৭, ১৮৩-৮৪, ১৮৭, ১৯৪ ও ১৯৫; বৃন্দাবনদাস : পূর্বোল্লিখিত, আদি, ত্রয়োদশ, পৃ. ৯৫-৯৬।

৫১. পূর্বোল্লিখিত, আদি, ৭ম, পৃ. ৪০ ও ৪২।

৫২. বিজয়গুপ্ত : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১৬৪।

৫৩. এস. সি. বন্দ্যোপাধ্যায় : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১৯৭।

৫৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮১-৮২ এবং ১৯০-৯১; হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, ১ম, পৃ. ৬১০।

৫৫. এস. সি. বন্দ্যোপাধ্যায় : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৬৫।

৫৬. বিজয়গুপ্ত : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ২৬ ও ১৮৭।

৫৭. বিজয়গুপ্ত : ডি. সি. সেন কর্তৃক উদ্ধৃত : বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, পৃ. ১০৮।

৫৮. মালাধর বসু : শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়, পৃ. ২৯৪; 'তরণস্মরি' নগরীতে পালিত এ প্রথার এক বিস্তারিত বিবরণ ভার্থেমা দিয়েছেন; পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ২০৬-০৮।

৫৯. অ্যাডভান্সড হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া, পৃ. ৩৭৬, ৪০০, ৪৯৬ এবং ৫৬৮; ভিনসেন্ট এ. স্মিথ : আকবর দি গ্রেট মোগল, পৃ. ২২৬ ও ৩৮২; ১৬৬৭ সালের দিকে বার্নিয়ার (জে. এ. দাসগুপ্ত কর্তৃক উদ্ধৃত, বেঙ্গল ইন দি সিক্সটিনথ্ সেঞ্চুরি এ. ডি., পৃ. ৪৪-৪৫, টীকা) লিখেছেন যে "বিদ্রোহের ভয়ে" মুসলমান শাসকরা 'সতী' বন্ধ করতে অনিচ্ছুক ছিলেন এবং তাঁরা "এটাতে যথাসম্ভব বিঘ্ন ঘটাতেন।"

৬০. শুদ্ধিতত্ত্ব, ভবতোষ ভট্টাচার্য কর্তৃক উদ্ধৃত, জে. এ. এস. বি. ১৯৫৩, সংখ্যা ২, পৃ. ১৬০-৬১।

৬১. স্মৃতিতত্ত্ব, এস. সি. বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক উদ্ধৃত; পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৭১ ও ২১২।

৬২. তুলনীয়, উদাহরণস্বরূপ চৈতন্য ও নিত্যানন্দ যে সব পরিবারে জন্মেছিলেন; চূড়ামণিদাস : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৭-৮, ১৭-১৮, ২৪, ৩৩, ৬০ ইত্যাদি।

৬৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮।

৬৪. তুলনীয়, নিত্যানন্দের গৃহে আখণ্ডল আচার্যের ক্রোধের বিস্ফোরণ; প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯-৮০।

৬৫. নিত্যানন্দের মাতা-পিতা বিশেষভাবে কেমন করে মাধবেন্দ্র পুরীকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন সে বর্ণনার জন্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭-৮; আরও দেখুন কে. এম. আশরাফ : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৩২৫।

৬৬. আইন, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৪।

৬৭. বিশ্বভারতী অ্যানালস, পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১২১, ১২৪, ১৩০-৩১।

৬৮. আইন, ২য়, পৃ. ১৩৪।

৬৯. চূড়ামণি দাস : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৭, ১৯, ৩৩-৩৪, ৪৭ ইত্যাদি।

৭০. বিপ্রদাস : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১৪৩ এবং শেখ ফয়জুল্লাহ : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৩৪।

৭১. পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৬ ও ৪৪।

৭২. বৃন্দাবনদাস : পূর্বোল্লিখিত, মধ্য, ৭ম, পৃ. ১৬৪-৬৫; কবিকঙ্কণ চণ্ডী; ২য়, পৃ. ৫২০।

৭৩. বৃন্দাবনদাস : পূর্বোল্লিখিত, মধ্য, ৬ষ্ঠ, পৃ. ১৫৮, ৮ম, পৃ. ১৭৮ এবং ৯ম, পৃ. ১৮২; কবিকঙ্কণ চণ্ডী, ২য়, পৃ. ৫১০-১৩ ও ৫১৫-১৬; বিজয়গুপ্ত : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৯৬-৯৭।

৭৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬; আরও দেখুন কবিকঙ্কণ চণ্ডী, ২য় পৃ. ৫১৪-১৫।

৭৫. বৃন্দাবন দাস : পূর্বোল্লিখিত, আদি, ২য় পৃ. ১১; মধ্য, ৮ম, পৃ. ১৭১; ত্রয়োদশ, পৃ. ২১০; ত্রয়োবিংশ, পৃ. ২৬৬।

৭৬. কৃষ্ণদাস কবিরাজ : পূর্বোল্লিখিত, মধ্য, পঞ্চদশ, পৃ. ১৬৭ এবং অন্ত্য, ৫ম, পৃ. ২৮৮; বৃন্দাবন দাস : পূর্বোল্লিখিত, মধ্য, অষ্টাদশ।

৭৭. প্রাগুক্ত, আদি, ২য়, পৃ. ১১, ১২, ১৩; ৩য় পৃ. ১৯; ৪র্থ, পৃ. ২১, ৭ম, পৃ. ৪৮; মধ্য, ৫ম, পৃ. ১৫৬; ৬ষ্ঠ, পৃ. ১৬০ ইত্যাদি; বিজয়গুপ্ত : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১৩৭ ও ১৬২।

৭৮. এস. বন্দ্যোপাধ্যায় : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ২০৭-০৯।

৭৯. বিপ্রদাস : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৬৩, ৭০ ইত্যাদি; বিজয়গুপ্ত : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৪।

৮০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২; বিপ্রদাস : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৬২।

৮১. বার্বোসা : পূর্বোল্লিখিত, ২য়, পৃ. ১৩৪; ডি. ব্যারোস থেকে এম. এল. ডেমস কর্তৃক প্রদত্ত উদ্ধৃতি : দি বুক অফ ডুয়ার্টে বার্বোসা, ২য়, পরিশিষ্ট-১, পৃ. ২৪৫; তীর্থতত্ত্ব ও প্রায়শ্চিত্ত তত্ত্ব, জে. এ. এস. বি. ১৯৫৩-তে উদ্ধৃত, পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১৬৩ ও ১৬৪।

৮২. বৃন্দাবনদাস : পূর্বোল্লিখিত, আদি, চতুর্দশ, পৃ. ১০৫ এবং মধ্য, অষ্টম, পৃ. ১৭৬।

৮৩. বিজয়গুপ্ত : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৯৮, ১০০, ১২২, ১৬২ এবং ১৮০।

৮৪. পূর্বোল্লিখিত, আদি, ২য়, পৃ. ২০-২৫।

৮৫. এস. সি. বন্দ্যোপাধ্যায় : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ২০৬।

৮৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪-৫৫।

৮৭. রঘুনন্দন দিব্যতত্ত্বে এসব সাক্ষ্য আলোচনা করেছেন; বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৫ ও পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহ।

৮৮. বিজয়গুপ্ত : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৫১ ও ৯৫; বৃন্দাবন দাস : পূর্বোল্লিখিত, আদি, চতুর্দশ, পৃ. ১০৭।

৮৯. প্রাগুক্ত, আদি, পঞ্চম, পৃ. ৩১।

৯০. প্রাগুক্ত, আদি, সপ্তম, পৃ. ৪৩-৪৫, ৪৯; দশম, পৃ. ৬৬-৬৭ এবং একাদশ, পৃ. ৭৮-৭৯।

৯১. প্রাগুক্ত, আদি, একাদশ, পৃ. ৮০।

৯২. প্রাগুক্ত, আদি, দ্বিতীয়, পৃ. ১১; সপ্তম, পৃ. ৪৩ ও ৪৪; একাদশ, পৃ. ৭৬।

৯৩. প্রাগুক্ত, অন্ত্য, চতুর্থ, পৃ. ৩৪৮; সুকুমার সেন : মধ্যযুগের বাঙ্গালা ও বাঙ্গালী, পৃ. ২৩।

৯৪. পূর্বোল্লিখিত, মধ্য, ত্রয়োদশ, পৃ. ২০৫।

৯৫. চৈতন্য-মঙ্গল, পৃ. ২৬, মধ্য।

৯৬. পূর্বোল্লিখিত, মধ্য, অষ্টম, পৃ. ১৭২ ও ১৭৬।

৯৭. বিজয়গুপ্ত : পৃ. ৭২, ৮০-৮১ এবং ১৫৩; চণ্ডীমঙ্গল, ১ম, পৃ. ২৭৩।

৯৮. প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব, আহ্নিকতত্ত্ব, মলমাসতত্ত্ব এবং তিথিতত্ত্ব, জে. এ. এ. বি. ১৯৫৩-তে উদ্ধৃত, পৃ. ১৬০, ১৬৫ ও ১৭০।

৯৯. একাদশীতত্ত্ব, জে. এ. এস. বি -১৯৫৩ তে উদ্ধৃত, পৃ. ১৯২-৯৩।

১০০. এস. সি. বন্দ্যোপাধ্যায় : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ২০৭-০৮; জীমূতবাহন নির্দেশিত অনুরূপ অনুষ্ঠানাদির জন্য দেখুন হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, ১ম, পৃ. ৬০৭-০৮।

১০১. মলমাসতত্ত্ব : জে. এ. এস. বি -১৯৫৩ তে উদ্ধৃত, পৃ. ১৬৪।

১০২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৫। এ সব ধারণা সম্পর্কে রঘুনন্দন মনে হয় ভাগবত দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। সেটা থেকে তিনি প্রায়ই উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

১০৩. হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, ১ম, পৃ. ৬০৬।

১০৪. বিজয়গুপ্ত : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৫৪-৬১।

১০৫. পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৬৩-৬৬ভ

১০৬. সাহিত্য পত্রিকা, ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ, ১ম, পৃ. ১১৫-১৭-তে বিদ্যাসুন্দরের মূলপাঠ দেখুন।

১০৭. এ আমলের দু'টি লিপিতে জনৈক বিবি মালতীর নামোল্লেখ রয়েছে। তিনি তৃতীয় মাহমুদ শাহের রাজত্বকালে একটি মসজিদ এবং নসরত শাহের রাজত্বকালে জলপানের জন্য একটি ছাউনি নির্মাণ করেছিলেন; দেখুন ৯৩৮/১৫৩১ সালের পুরাতন মালদহ লিপি; জে. এ. এস. বি. ১৮৭৪, পৃ. ৩০৮ ও ৯৪১/১৫৩৫ সালের গৌড় লিপি; জে. এ. এস. বি. ১৮৭২, পৃ. ৩৩৯। এ মহিলা সম্ভবত মুসলমান ছিলেন। তাঁর মসজিদ নির্মাণ থেকেই এর সাক্ষ্য পাওয়া যায়। তিনি হিন্দু মহিলা হতে পারেন না কারণ একজন হিন্দুর পক্ষে মসজিদ নির্মাণ মোটেই স্বাভাবিক নয়। মালতী নামটা স্পষ্টত স্থানীয় শব্দ যা থেকে মুসলমান সমাজের ওপর হিন্দু প্রভাবের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বিজয় গুপ্তের গ্রন্থে প্রদত্ত মুসলমান তাঁতির নাম ছিল শুভোদন; পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৫৯। এটা হিন্দু নাম।

১০৮. কৃষ্ণদাস কবিরাজ : পূর্বোল্লিখিত, আদি, সপ্তদশ, পৃ. ৬৫।

১০৯. বিজয়গুপ্ত : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১৭৯।

১১০. বৃন্দাবন দাস : পূর্বোল্লিখিত, আদি, সপ্তদশ, পৃ. ৬৭।

১১১. বিপ্রদাস কলিমা, নিকাহ্, রোজা, দরবিশ, কিতাব, কুরাণ, সালাম, গোলাম এবং মসজিদের মতো শব্দ ব্যবহার করেছেন। বিপ্রদাস : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৬৩-৭০। আগেই দেখা গেছে যে ফার্সি শব্দ সর-ই-খৈল ছিল সরকারি উপাধি। এটা লক্ষ্য করা কৌতূহলোদ্দীপক যে কিছুসংখ্যক রক্ষণশীল হিন্দু পরিবারে এটা সাংসারিক বিষয়াদির ব্যবস্থাপকের সমার্থক হয়ে পড়েছিল; তুলনীয়, চূড়ামণিদাস : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ২৪।

১১২. সাহিত্য পত্রিকা, ১ম সংখ্যা, পৃ. ৯৬-১১৪; সংস্কৃত শ্লোকের জন্য দেখুন, পৃ. ৯৬, ১০৪, ১০৮, ১১০, ১১১, ১১২ ও ১১৩।

১১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭।

১১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭-৯৮।

১১৫. ক্যাম্পোস : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ২৭-৩৬; হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, ২য়, পৃ. ৩৫১ ও পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহ; উপরে পৃ. ২১-২২ ও ৭০-৭১।

১১৬. পর্তুগিজ পরিব্রাজক বার্বোসা মালাবার ভ্রমণকালে 'মুরদের' 'ঘৃণ্য মফমেদের অনুসারী' রূপে বর্ণনা করেছেন, পূর্বোল্লিখিত, ২য়, পৃ. ৩।

১১৭. ভার্থেমা : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ২১২-১৪।

১১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৩।

১১৯. বৃন্দাবন দাস : পূর্বোল্লিখিত, আদি, দ্বাদশ, পৃ. ৮৮।

১২০. কবিকঙ্কণ চণ্ডী, ২য়, পৃ. ৬৫৫; কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসা-মঙ্গল, ১ম, পৃ. ২১১। এ দু'টি গ্রন্থে মধ্যযুগের পূর্ববঙ্গীয় স্থানিক ভাষার বিকৃত রূপের নমুনা রক্ষিত রয়েছে কারণ এ কবিদের এ সম্পর্কে কোনো প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছিল না।

১২১. বৃন্দাবন দাস : পূর্বোল্লিখিত, আদি, দ্বাদশ, পৃ. ৮৫-৮৮।

১২২. প্রাগুক্ত, আদি, ২য় পৃ. ১০ ও নবম, পৃ. ৬২। আরও দেখুন, শ্রীচৈতন্য-পরিষদ-জন্মস্থান-নিরূপণ, এস. পি. পি. ১৩১৭ বঙ্গাব্দ, ৪র্থ সংখ্যা, পৃ. ২২৩।

১২৩. বার্বোসা হোসেন শাহী রাজ্যকে বাংলা বা বাঙ্গালা রাজ্য রূপে অভিহিত করেছেন, পূর্বোল্লিখিত, ১ম, পৃ. ১৩৫; বাবুরও তাই করেছেন, পূর্বোল্লিখিত, ২য়, পৃ. ৪৮২। ডি ব্যারোসও এ নামেই অভিহিত করেছেন।

১২৪. পূর্ববাংলায় রচিত পরাগলী মহাভারত এবং অশ্বমেধপর্বের ভাষা পর্যালোচনাধীন আমলের পশ্চিম বাংলার কবি বিপ্রদাসের ভাষা থেকে খুব ভিন্নতর নয়।

দশম পরিচ্ছেদ

উপসংহার

রাজ্যের ভূখণ্ডের প্রসারণ, প্রশাসনের সুস্থিতিকরণ এবং ধর্ম, সাহিত্য, শিল্প ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে কিছু গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন হোসেন শাহী শাসনামলকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে। এই আমলের প্রথম দু'জন শাসকের সামরিক সাফল্য অনেকাংশে তাঁদের কূটনৈতিক দক্ষতার ফলে এবং লোদী, শর্কি এবং সেনদের অবনতির কারণে সম্ভব হয়েছিল। এরফলে পশ্চিমে গোগরা ও গঙ্গার সঙ্গমস্থল, পূর্বে চট্টগ্রাম এবং উত্তরে কামরূপ পর্যন্ত এলাকা বাংলার রাজনৈতিক সীমার অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। এসব এলাকার উপর আধিপত্য দিয়ে হোসেন শাহ ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার উপরাংশে তাঁর পরাজয়ের ক্ষতি মোটামুটি পুষিয়ে নিয়েছিলেন বলে মনে হয়। এ এলাকাগুলির হয় সামরিক না হয় বাণিজ্যিক গুরুত্ব ছিল। ভাগলপুর অঞ্চল ছাড়িয়ে বাংলার সীমান্তের সম্প্রসারণ ও হোসেন শাহের খলিফাতুল্লাহ উপাধি ধারণের মধ্য দিয়ে দিল্লি সুলতানাত ও বাংলা রাজ্যের মধ্যে যে বিরোধ চলছিল তার সমাপ্তি ঘটে। এ উপাধি গ্রহণ ছিল একটি কূটনৈতিক চাল যা আমাদের শার্লামেনের ঐতিহাসিক অবস্থানের ধারার কথা মনে করিয়ে দেয়। তিনি রোমান সম্রাট ও অগাস্টাস উপাধি গ্রহণ করে নিজেকে কনস্ট্যান্টিনোপলের সম্রাটের প্রতিপক্ষরূপে দাঁড় করিয়েছিলেন।[১] এটা প্রকৃতপ্রস্তাবে সত্যি না হলেও খলিফাতুল্লাহ্ উপাধি সুন্নি মুসলমানদের ব্যাপক শ্রদ্ধা অর্জন করবে বলে আশা করা হয়েছিল। তাদের আবেগকে বাংলার সুলতান তাঁর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির কাজে লাগিয়ে ছিলেন বলে মনে হয়। রাজ্যহারাবার পর পরই মুদ্রা জারির অধিকারসহ শেষ শর্কি সুলতানকে ভাগলপুরে এক ধরনের শরণার্থী সরকার প্রতিষ্ঠার অনুমতি দিয়ে তিনি তার প্রতি যে সহানুভূতি দেখিয়েছিলেন সেটা বোধহয় বাংলাকে উত্তর ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদ থেকে বিচ্ছিন্ন করার উদ্দেশ্যপ্রণোদিত নীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত ছিল। ভাগলপুরে দীর্ঘকাল স্থায়ী শর্কি রাজতন্ত্রের ছায়া নিশ্চয়ই লোদী শাসকদের জন্য এক হুমকিস্বরূপ ছিল, কারণ দিল্লির শাসকদের ভূতপূর্ব প্রতিদ্বন্দ্বী নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়লেও, তখন পর্যন্ত জৌনপুরের সার্বভৌম ক্ষমতার দাবি ত্যাগ করেন নি।

আলোচ্য সময়কালের শাসকদের দিল্লির শাসকদের বিরুদ্ধে গৃহীত বিস্তৃত রাজ্য বিজয় ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার পরিকল্পনায় প্রশাসনে ধর্মনিরপেক্ষ নীতিমালা প্রবর্তনের প্রয়োজন ছিল। লিপিগত সাক্ষ্যপ্রমাণে যাদের নাম ও উপাধি প্রচুর দেখতে পাওয়া যায় সে সব বিদেশী উৎসোদ্ভূত সামরিক গভর্নররা যে প্রশাসনের নৈত্যনৈমিত্তিক কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তাঁরা ছিলেন প্রশাসনবৃত্তের বহির্ভাগ। ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ জাতের স্থানীয় হিন্দুরা ছিলেন সমাজের গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং শাসক ও জনগোষ্ঠীর

নিম্নশ্রেণীর মধ্যে যোগসূত্র। তাদেরকে যথাযথ স্বীকৃতি দিতে হয়েছিল। বাংলার ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে এ ধরনের ধর্মনিরপেক্ষ নীতি ছিল স্বাভাবিক। দেশের ভৌগোলিক আকার এবং জনগণের অনুভূতি তাঁদের জানা ছিল বলে স্থানীয় প্রশাসকদের রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে গুরুত্বপূর্ণ পদে রাখা হয়েছিল[৭]। ফলে মুসলমান শাসকবৃন্দের রাজনৈতিক সংহতির উদ্দেশ্য সাধনে তারা তাঁদের যথেষ্ট সাহায্য করতে সক্ষম হয়েছিল।

উত্তর ভারত থেকে বিচ্ছিন্নতা তখন চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হওয়ায় বাংলা তার সাংস্কৃতিক স্বরূপ আবিষ্কার করতে এবং নিজেই নিজেকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিল। সাহিত্যিক নবজাগরণ যা আলোচ্য সময়কালকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছিল সেটা ছিল স্থানীয় সৃজনীশক্তির পূর্ণতাপ্রাপ্তি। এ প্রতিভাকে বাংলার ইতিহাসের পূর্বতন সময়ে অবদমিত করে রাখা হয়েছিল। এটা ছিল জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা থেকে সৃষ্ট তাদের স্বাভাবিক প্রবণতা অনুসারে নিজেদের ধারণা প্রকাশের এক স্বতঃস্ফূর্ত গতিময়তা। যে সব উপাদান এর উদ্ভবে সাহায্য করেছে সেগুলি ছিল মহাকাব্য ও পৌরাণিক কাহিনীতে জনগণের আগ্রহ, স্থানীয় বিশ্বাসের উদ্ভব এবং শাসকদের বাংলা ভাষাকে স্বীকৃতিদান। সংস্কৃত সাহিত্যকে বিবেচনা করলে ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনর্জাগরণ ও চৈতন্যবাদের উদ্ভবও একে সাহায্য করেছিল। আরবি বা ফার্সির মতো বিদেশী ভাষাগুলিতে এ কর্মচাঞ্চল্যের চেতনার কোনো স্থান ছিল না। ফলে স্থানীয় ভাষাগুলি, বিশেষত বাংলা, স্বাভাবিকভাবেই ভাবপ্রকাশের মাধ্যম হয়ে উঠে। গোড়ার দিকে সংস্কৃত ভাষায় লেখা চৈতন্যের জীবনী গ্রন্থগুলি সংস্কৃত থেকে দেশীয় সংস্কৃতিতে উত্তরণ প্রক্রিয়াকে সহজতর করেছিল বলে মনে হয়। কারণ সেগুলি ছিল ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে প্রকাশিত বৈষ্ণব নেতার বাংলা জীবনী গ্রন্থগুলির ভিত্তি।

রোমান্টিকতার বিকাশ ছিল সমগ্র কাব্যরচনার এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান যা সাহিত্যের ক্ষেত্রে মানবতাবাদের সূচনাপর্ব নির্দেশ করেছিল। অন্যথায় এ সাহিত্যকে বিষয়বস্তুর দিক থেকে প্রধানত ধর্মীয় বলে আখ্যায়িত করা যেত। সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক উদ্দীপনার এ উচ্ছ্বাস সম্ভবত বাংলার সাহিত্যের ইতিহাসের পরবর্তী পর্যায়ের উপর প্রভাব ফেলেছিল। আলাওল এবং দৌলতকাজী কাব্যের ঐতিহ্য উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছিলেন।

ব্রাহ্মণ্য উপাদানে গঠিত সংস্কৃত কৃষ্টির রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতার অভাব ঘটলেও তা দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলায় সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। রঘুনাথ শিরোমণি, রঘুনন্দন এবং চৈতন্য-এ তিনজন বিখ্যাত ব্যক্তি এ দেশের ইতিহাসের পাতায় স্থায়ী ছাপ রেখে গেছেন। নবদ্বীপে নব্যন্যায় চিন্তাধারার প্রতিষ্ঠা এর মৈথিলী প্রতিরূপকে ম্লান করে দিয়েছিল। রঘুনাথের পরবর্তী নৈয়ায়িকরা ছিলেন এ বিখ্যাত নৈয়ায়িকের নির্বাচিত ক্ষেত্রে ফসল-কুড়ানি মাত্র। অনুরূপভাবে রঘুনন্দনের সামাজিক-ধর্মীয় সংহিতা ছিল রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের এক স্থায়ীসম্পদ। চৈতন্য শুধু ভক্তি মতবাদকে নতুন জীবনই দান করেন নি, তিনি এক মহান সাহিত্যিক কর্মচাঞ্চল্যের মূলাধারের সৃষ্টি করেছিলেন যা বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনকে লক্ষণীয়ভাবে সমৃদ্ধ করেছিল।

আলোচ্য সময়কালে বাংলায় কোনো নতুন ধরনের শিল্পকলার আবির্ভাব ঘটে নি।

যথেষ্ট পরিমাণে অলঙ্করণ হচ্ছে চারুশিল্প ও স্থাপত্যশিল্পের বিদ্যমান নিদর্শনগুলির বৈশিষ্ট্য। এ থেকে দেশের সভ্যতার প্রাগ্রসর পর্যায়ের ইঙ্গিত লাভ ছাড়াও এ আমলের সমৃদ্ধির প্রতিফলন পাওয়া যায় বলে মনে হয়। সাধারণভাবে বলা যায় যে, হোসেন শাহীদের আমলের শৈল্পিক ঐতিহ্য ছিল পূর্ববর্তী আমলে প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যের অনুসরণ মাত্র। শিল্পের কোনো শাখাতেই কোনো গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হয় নি। পাথরের ওপর পোড়ামাটির অলঙ্করণের প্রচেষ্টা ছিল তখন পর্যন্ত এক অজ্ঞাত পরীক্ষা-নিরীক্ষা। শৈল্পিক গভীরতা ও রূপায়ণের দিক থেকে এটা সফল হয়েছিল বলে মনে হয় না। এটা সত্যি যে তীর-ধনুক রীতিতে বহুল অলঙ্কৃত তুঘরা লেখার রীতি শিল্পের ইতিহাসের এক উল্লেখযোগ্য উপাদান। কিন্তু এর শুরু হয়েছিল পরবর্তী ইলিয়াস শাহী আমলে যদিও এটা শীর্ষবিন্দু ও সর্বোৎকৃষ্ট অবস্থায় পৌঁছেছিল হোসেন শাহী আমলে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক নবজাগরণ ঘটেছিল। কিন্তু এ আমলের মৌলিক শিল্প বা স্থাপত্যের ইতিহাসে এ ধরনের কোনো পুনর্জাগরণ লক্ষ্য করা যায় না।

সাহিত্যিক সাক্ষ্য থেকে যা ইঙ্গিত পাওয়া যায় তা থেকে এ অনুমান রোধ করা কঠিন যে শাসকবৃন্দ তাদের বিদেশী উৎসের বহিঃআবরণ ত্যাগ করে স্থানীয় আশা আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে একাত্ম হওয়ার চেষ্টা করেছিলেন এবং মুসলমান মানসের বিকাশ ছিল কমবেশি দেশীয় সংস্কৃতির ধারায়। লোককাহিনীমূলক ধারণা ও তান্ত্রিক আচার সম্ভবত একইভাবে হিন্দু ও মুসলমানদের কোনো কোনো শ্রেণীর সাধারণ উত্তরাধিকারে পরিণত হয়েছিল।

বাংলার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল এমন সব গুরুত্বপূর্ণ শক্তির সূচনা এ যুগেই লক্ষ্য করা গিয়েছিল। পরবর্তী শতাব্দীগুলিতে এদেশের জীবনযাত্রার রূপদানকারী নির্ধারিত ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াগুলির সময়কাল ইউরোপীয়দের প্রথম আগমন ও মোগল শাসনের সূচনার অন্তর্বর্তী সময়কালে নির্দিষ্টরূপে স্থির করা যেতে পারে। একথা সত্য যে, মোগল শাসন শুধু বাংলার রাজনীতির বহিঃপ্রান্ত স্পর্শ করেছিল এবং ইউরোপীয় ব্যবসা-বাণিজ্যের তখনও যথোচিত সূত্রপাত ঘটে নি। কিন্তু ঐ সব শক্তির ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে যে নতুন বাংলার আবির্ভাব ঘটতে যাচ্ছিল আলোচ্য সময়কাল তার সম্ভাবনা নির্দেশ করেছিল। কাজেই হোসেন শাহী শাসনামল হচ্ছে বাংলার ইতিহাসের গঠনমূলক পর্ব।

টীকা

১. হেনরি পিরেন : মেডিয়াভাল সিটিজ, পৃ. ১৮।

পরিশিষ্ট-ক

কালানুক্রম

হোসেন শাহী সুলতানদের কালানুক্রম নিম্নরূপ : ১

হোসেন শাহ = ৮৯৯ হিজরি = ১৪৯৪-১৫১৯ সাল।

নসরত শাহ = ৯২৫-৯৩৮ হিজরি = ১৫১৯-১৫৩২ সাল।

ফিরুজ শাহ = ৯৩৮-৯৩৯ হিজরি = ১৫৩২-১৫৩৩ সাল।

মাহমুদ শাহ = ৯৩৯-৯৪৪ হিজরি = ১৫৩৩-১৫৩৮ সাল।

এ প্রসঙ্গে হোসেন শাহী মুদ্রার কিছু অস্পষ্ট দিক আলোচনা করা যেতে পারে। আগেই যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, নসরত খলিফতাবাদ ও হোসেনাবাদ টাকশাল থেকে ৯২২/১৫১৬ এবং ৯২৩/১৫১৭ সালে তাঁর নিজের নামে মুদ্রা জারি করেছিলেন।[২] এ দু'টি তারিখ থেকেই দেখা যায় যে তিনি তাঁর পিতা হোসেন শাহের জীবদ্দশায় মুদ্রা জারির অধিকার ব্যবহার করেছিলেন। মাহমুদও ৯৩৩/১৫২৭, ৯৩৪/১৫২৮, ৯৩৫/১৫২৯ এবং ৯৩৮/১৫৩২ সালে নসরতাবাদ, মোহাম্মদাবাদ, ফতহাবাদ এবং হোসেনাবাদ থেকে মুদ্রা জারি করেছিলেন।[৩] নসরত ৯২৩/১৫১৯ থেকে ৯৩৮/১৫৩২ সাল পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। কাজেই এটা মোটামুটি নিশ্চিত যে মাহমুদ তাঁর পূর্বসূরি নসরত শাহের জীবদ্দশাতেই এ মুদ্রাগুলি জারি করেছিলেন।

ব্লখম্যানই প্রথম পণ্ডিত যিনি নসরতের নিয়মবহির্ভূত মুদ্রা জারির বিষয়টি লক্ষ্য করেছিলেন। তিনি বলেছেন, "এগুলি হয় ক্ষমতা অর্পণের এক অসাধারণ ইঙ্গিত অথবা সফল এক বিদ্রোহের নিদর্শন।"[৪] মাহমুদের নিয়মবহির্ভূত মুদ্রার ভিত্তিতে একজন আধুনিক পণ্ডিত মত প্রকাশ করেছেন যে "তিনি নসরত শাহের রাজত্বকালেই গৌড় রাজ্যের এক নির্দিষ্ট স্বতন্ত্র অংশে এক স্বাধীন শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন" এবং "বিদ্রোহী মাহমুদ তাঁর পূর্ব-অধিকৃত অঞ্চলে ফিরুজের সঙ্গে একই সময়ে তাঁর শাসন অব্যাহত রেখেছিলেন।"[৫] এসব পণ্ডিত নিচের সারণিতে ব্যাখ্যাত যুগপৎ শাসনের তত্ত্ব উপস্থাপনের পক্ষপাতী :

শাসকদের নাম	যুগপৎ শাসনের সময়কাল
হোসেন শাহ নসরত শাহ	৯২২/১৫১৬ থেকে ৯২৩/১৫১৭ পর্যন্ত
নসরত শাহ মাহমুদ শাহ	৯২৩/১৫১৭ থেকে ৯৩৫/১৫২৯ পর্যন্ত এবং ৯৩৮/১৫৩২ সালে
মাহমুদ শাহ ফিরুজ শাহ	৯৩৮/১৫৩২ থেকে ৯৩৯/১৫৩৩ পর্যন্ত।

এর অর্থ এই যে, আলোচ্য সময়কালে প্রত্যেক সুলতানের রাজত্বকালে বিদ্রোহ হয়েছিল। এটি একটি অযৌক্তিক উক্তি এবং আমাদের প্রাপ্ত উৎসগুলিতে এর কোনো সমর্থন পাওয়া যায় না। আলাউদ্দীন হোসেন শাহ অত্যন্ত শক্তিশালী শাসক ছিলেন এবং তিনি নিশ্চয়ই তাঁর রাজ্যে কোনো বিদ্রোহীকে শক্তিশালী হতে দিতেন না। নসরতের জীবদ্দশায় মাহমুদ যে চারটি টাকশাল শহর থেকে মুদ্রা জারি করেছিলেন তা নিশ্চিতভাবেই এক বিস্তৃত এলাকা জুড়ে ছিল। তিনি এ বিস্তৃত অঞ্চলে শাসন করেছিলেন অথচ তাঁর অধিকতর শক্তিশালী ভ্রাতা নসরত তাঁর বিরোধিতা করেন নি এটা সম্ভাব্য নয়। কিন্তু দু'ভাইয়ের মধ্যে সংঘটিত গৃহযুদ্ধের কোনো বিবরণ ইতিহাসে নেই। এ আমলে বারংবার বিদ্রোহ হয়ে থাকলে বাংলার সামরিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনে পরিলক্ষিত অগ্রগতি অসম্ভব হয়ে পড়ত। কোনো একজন শাসকের মুদ্রা নিঃসন্দেহে তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতাপ্রয়োগের ইঙ্গিতবহ। কিন্তু প্রাক-মোগল আমলে বাংলায়, মনে হয়, এক অদ্ভুত রীতি প্রয়োগকারী রাজকুমারগণ রাজ্যের উত্তরাধিকারী হতে যাচ্ছেন এটা দেখানোর জন্য কোনো কোনো সুলতান যুবরাজদের তাঁদের নিজের নামে মুদ্রা জারি করার অনুমতি দিয়েছিলেন। আলাউদ্দীন হোসেন শাহের ১৮ জন সন্তানের মধ্যে জ্যেষ্ঠ[৬] ও সম্ভবত যোগ্যতম নসরত যে তাঁর পিতার স্থলাভিষিক্ত হবেন এটা প্রায় নিশ্চিত ছিল। পিতার জীবদ্দশায় নসরতের মুদ্রা জারিকে প্রকৃতপক্ষে উত্তরাধিকারের জন্য পিতা কর্তৃক তাঁর মনোনয়নের ইঙ্গিত রূপে বিবেচনা করা যেতে পারে। আলাউদ্দীন হোসেন শাহের দ্বিতীয় পুত্র মাহমুদকে নসরত মনে হয় উত্তরাধিকারী রূপে মনোনীত করেছিলেন এবং মুদ্রা জারি করার যে বিশেষাধিকার তিনি ভোগ করেছিলেন সেটা এ মনোনয়নের বাস্তব স্বীকৃতি ছিল বলে মনে হয়। মনোনয়নের ব্যাপারে নসরত ফিরুজের চেয়ে মাহমুদকে কেন অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন তা স্পষ্টভাবে জানা যায় না। সম্ভবত শাসনকার্য পরিচালনার জন্য তিনি ফিরুজকে অত্যন্ত অনভিজ্ঞ মনে করেছিলেন।

টীকা

১. এ সারণি তৈরির জন্য যে ক্যাটালগ ব্যবহার করা হয়েছে হোসেন, নসরত এবং ফিরুজের রাজত্বকাল আলোচনাকালে ইতোমধ্যে তার উল্লেখ করা হয়েছে। এসব তথ্য নির্দেশের জন্য প্রাসঙ্গিক টীকাসহ উপরে পৃ. ৭৩-৭৪, ৮২, ৮৬ ইত্যাদি দেখা যেতে পারে। ৯৪৪ হিজরিতে উৎকীর্ণ মাহমুদের মুদ্রাগুলির জন্য দেখুন, এস. আহমদ : সাপ্লিমেন্ট, পৃ. ৭১ এবং এ. ডব্লিউ. বোথাম : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১৭৪-৭৫। প্রায়ই এটা মনে করা হয় যে হোসেন ১৪৯৩ সাল, মোতাবেক ৮৯৯ হিজরিতে গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করেছিলেন; হিস্ট্রি অব বেঙ্গল, ২য় পৃ. ১৪২ এবং ১৪৩; আবিদ আলী : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১৯০। কিন্তু এ মতের কিছুটা সংশোধন করা যেতে পারে। হোসেনের পূর্বসূরি মোজাফফর শাহ ১৪৯১ সালের প্রথম দিকে সিংহাসনে বসেছিলেন বলে মনে হয় কারণ মোজাফফরের পূর্বসূরি নাসিরউদ্দীন মাহমুদের উৎকীর্ণ সর্বশেষ লিপির তারিখ হচ্ছে ২রা মহররম, ৮৯৬ হিঃ/১৫ই নভেম্বর, ১৪৯০ সাল। স্পষ্টত তাঁর সিংহাসনারোহণকে লক্ষণীয় করে তোলার উদ্দেশ্যে স্মারক রূপে জারি করা মোজাফফরের

স্বর্ণমুদ্রার তারিখ স্পষ্টভাবে ৮৯৬ হিঃ। আবার, হযরত পাণ্ডুয়া লিপির সাক্ষ্যানুসারে মোজাফফরের সর্বশেষ উল্লিখিত তারিখ হচ্ছে ১৭ই রমজান, ৮৯৮ হিঃ/২রা জুলাই, ১৪৯৩, (জে. এ. এস. বি. ১৮৭৩, পৃ. ২৯০-৯১; আবিদ আলী : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১১৪-১৫; কানিংহাম : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৮৪; র‍্যাভেনশ : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৭৭)। এটা ১০ই রবিউল আউয়াল, ৮৯৮ হিঃ/ ৩১শে ডিসেম্বর, ১৪৯২ সাল নয়, যা হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, ২য় খণ্ডের ১৪১ পৃষ্ঠায় শেষোক্ত তারিখ সংবলিত মালদহ লিপির ভিত্তিতে মনে করা হয়েছে; দেখুন ই. আই. এম, ১৯২৯-৩০, পৃ. ১৩, প্লেট ৮ (ক); পি. এ. এস. বি. ১৮৯০, পৃ. ২৪২ এবং এ. এইচ. দানী : বিব্লিওগ্রাফি, পৃ. ৪৩। ফলে মুদ্রা ও লিপির সাক্ষ্যানুযায়ী মোজাফফরের শাসনকাল হিসেবে প্রায় আড়াই বছর সময়কালকে গ্রহণ করা যায়। কিন্তু নিজামউদ্দীন : পূর্বোল্লিখিত, ৩য়, পৃ. ২৭০ এবং সেলিম : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১২৯, মনে করেন যে এ সুলতান তিন বছর পাঁচ মাস রাজত্ব করেছিলেন। কাজেই তিনি যে শুধু ১৪৯৩ সালের শেষভাগে জীবিত ছিলেন তাই নয়, ১৪৯৪ সালের প্রথম ভাগেও তিনি বেঁচে ছিলেন। হোসেনের সর্বপ্রথম লিপিবদ্ধ তারিখ হচ্ছে ১০ই জিলকাদা, ৮৯৯ হিঃ/১৩ই আগস্ট, ১৪৯৪। দেখুন হোসেনের মালদহ লিপি, র‍্যাভেনশ : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৭৮, প্লেট ৫০, নং ১০; জে. এ. এস. বি. ১৮৭৪, পৃ. ৩০২ এবং আবিদ আলী : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১৫২-৫৩। তাঁর কিছু মুদ্রার তারিখও ৮৯৯ হিজরি। সুতরাং ১৪৯৪ সাল হচ্ছে সম্ভবত হোসেন শাহের রাজত্বের প্রথম বছর। ৮৯৮ হিজরি ১৪৯৩ সালের শেষ চতুর্থাংশ ৮৯৯ হিজরির মধ্যে পড়ে। কিন্তু হোসেন যে ১৪৯৩ সালের শেষদিকে সিংহাসন দখল করেছিলেন তা প্রমাণ করার মতো কিছু নেই। অন্যদিকে, উপরে উদ্ধৃত লিপিগত ও সাহিত্যিক সাক্ষ্যাদি মনে হয় এ ইঙ্গিত দেয় যে ১৪৯৪ সালে তাঁর রাজত্বকাল শুরু হয়েছিল।

২. উপরে পৃ. ৫৭।

৩. এইচ. এন. রাইট : ক্যাটালগ, ২য়, পৃ. ১৭৯; লেন-পুল : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৫৪-৫৫, প্লেট ৭, নং ১৪৭ ও ১৪৯। এস. আহমদ : সাপ্লিমেন্ট, পৃ. ৭০-৭১। সাদুল্লাহ্পুর লিপি থেকে দেখা যায় যে ৯৩৩ হিঃ/১৫২৭ সালে তিনি রাজকীয় মর্যাদার পরিচয়সূচক চিহ্নগুলি ব্যবহার করেছিলেন; জে. এ. এস. বি. ১৮৯৫, পৃ. ২১৪-১৫।

৪. জে. এ. এস. বি. ১৮৭৩, পৃ. ২৯৭; আরও দেখুন, একই সাময়িকীর পৃ. ২৭৭ যেখানে ব্লখম্যান বলেছেন যে নসরত তাঁর পিতার বিরুদ্ধাচারণ করে মুদ্রা জারি করেছিলেন।

৫. ভি. আর এস. মনোগ্রাফ নং ৬, পৃ. ১৮।

৬. সেলিম : পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১৩৬।

পরিশিষ্ট খ

হোসেনের প্রাথমিক জীবন

আমাদের আমলের পণ্ডিতদের মধ্যে হোসেনের প্রাথমিক জীবন সম্পর্কে অন্তহীন বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজের বিবরণ অনুসারে সৈয়দ হোসেন খান শুবুদ্ধি রায় নামে গৌড়ের এক রাজস্ব কর্মকর্তার অধীনে চাকুরি করতেন। দিঘি খননকালে তাঁর নিজের এক ভুলের জন্য শুবুদ্ধি রায় হোসেনকে কঠোরভাবে বেত্রাঘাত করেছিলেন। গৌড়ের সুলতান হয়ে তিনি তাঁর ভূতপূর্ব মনিবের প্রতি অনুগ্রহ দেখাতে ব্যর্থ হন নি। কিন্তু সুলতানের বেগম তাঁর শরীরে বেত্রাঘাতের স্পষ্ট দাগ দেখে তাঁকে রায়কে মৃত্যুদণ্ড দানের অনুরোধ জানান। এ দুষ্ট পরামর্শ না শুনলেও সুলতান শুবুদ্ধি রায়ের জাত নষ্ট করেন এবং তিনি বেনারস চলে যান।[১] এ কাহিনীতে আদৌ কোনো ঐতিহাসিক সত্যতা আছে কিনা তা নিরূপণ করা কঠিন। কবি নিজেই স্বীকার করেছেন যে, তাঁর গ্রন্থের অন্যান্য বিবরণের জন্য তিনি পূর্ববর্তী লেখক মুরারীগুপ্ত, দামোদর স্বরূপ এবং বৃন্দাবনদাসকে অনুসরণ করেছেন। কিন্তু এ কাহিনীর উৎস সম্পর্কে তিনি নীরব। উৎস যাই হোক না কেন, হোসেনের এই প্রাথমিক জীবন বৃত্তান্তের সঙ্গে এর অন্যান্য জ্ঞাত ভাষ্যের মূলবিষয়ে সাদৃশ্য দেখা যায়।

জোয়াও ডি ব্যারোস মনে করেন যে, এডেনের একজন সম্ভ্রান্ত বংশীয় আরব বণিক চট্টগ্রামে আগমন করেন। তাঁর সঙ্গে বহু সৈন্য ছিল এবং তাদের সাহায্যে গৌড়ের সুলতান উড়িষ্যা জয় করেন। শেষপর্যন্ত বণিক সুলতানকে হত্যা করে গৌড়ের সিংহাসন দখল করেন।[২] এ উক্তির উপর নির্ভর করে ব্লখম্যান অনুমান করেছেন যে, ডি ব্যারোস বর্ণিত এই আরব বণিক হচ্ছেন সৈয়দ হোসেন শরীফ মক্কী।[৩] বুকানন-হ্যামিল্টনের মতানুসারে হোসেন ছিলেন রংপুর জেলার স্থানীয় অধিবাসী। বুকানন-হ্যামিল্টন ব্যবহৃত পাণ্ডুয়া পাণ্ডুলিপিতে নিম্নলিখিত তথ্য পাওয়া যায় "...হোসেনের পিতামহ, সুলতান ইব্রাহিম, জালালউদ্দীন নাম গ্রহণকারী হিন্দুধর্ম থেকে ধর্মান্তরিত এক ব্যক্তির হাতে তাঁর জীবন ও সিংহাসন হারান। হিন্দু ব্যক্তি ও তার উত্তরাধিকারীদের কর্তৃত্বকে দুর্বল করে ফেলা দ্রুত ও পরপর সংঘটিত হত্যা ও বিদ্রোহের পর হোসেন শাসন ক্ষমতা আবার অধিকার করেন। দীর্ঘ ৭৬ চান্দ্র বছর সময়কাল ধরে ইব্রাহিমের পুত্র ও তাঁর পরিবার মনে হয় কমটেশ্বরীর রাজ্যে আশ্রয় পেয়েছিলেন। পরবর্তীকালে হোসেন তাঁর শাসনের অবসান ঘটান।"[৪] হোসেন এবং তাঁর তথাকথিত পিতামহের মাঝখানে ৭৬ বছরের ব্যবধান ছিল এ কথা ধরে নিলেও শেষোক্তকে আমরা পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে স্থাপন করতে পারি। কিন্তু এ নামের কোনো শাসক বাংলায় শাসন করেছিলেন বলে জানা যায় না।[৫] তাহলে এই সুলতান ইব্রাহিম কে ছিলেন? জালালউদ্দীন মোহাম্মদের সমসাময়িক

জৌনপুরের ইব্রাহিম শাহ শর্কির সঙ্গে গৌড়ের আলাউদ্দীন হোসেন শাহের কোনো সম্পর্ক ছিল না। ইব্রাহিমের পৌত্র ছিলেন আলাউদ্দীন হোসেন শাহ এবং তিনি জৌনপুরে রাজত্ব করেছিলেন। মনে হয় যে পাণ্ডুয়া পাণ্ডুলিপিতে এই হোসেন শাহকে তার একই নামে অভিহিত গৌড়ীয় ব্যক্তির সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা হয়েছে। কাজেই এ উৎস প্রদত্ত আলাউদ্দীন হোসেন শাহের প্রাথমিক জীবন বৃত্তান্তের কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই।

গৌড়ের সুলতান হওয়ার আগে তিনি একজন হিন্দু কর্মকর্তার অধীনে চাকুরি করেছিলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজের এ বর্ণনার সঙ্গে হোসেন শাহের প্রাথমিক জীবন সম্পর্কিত উপরোক্ত অভিমতগুলির কোনো সম্পর্ক নেই। মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রচলিত একটি জনপ্রিয় কাহিনী অনুসারে বাল্যকালে হোসেন মুর্শিদাবাদের চন্দ্রপাড়া নামক এক গ্রামের এক ব্রাহ্মণের গৃহে গো-পালক ছিলেন। গৌড়ের সুলতান হয়ে তিনি তাঁকে মাত্র এক আনা খাজনার বিনিময়ে চন্দ্রপাড়া গ্রাম দান করে তাঁর প্রতি অনেক কৃতজ্ঞতা দেখিয়ে ছিলেন। এরফলে এ ব্রাহ্মণের জমিদারি এক আনি চন্দ্রপাড়া হিসেবে পরিচিত হয়। কথিত আছে যে হোসেন শাহের মহিষী তাঁর জাত নষ্ট করার জন্য বদ্ধপরিকর হয়ে এ ব্রাহ্মণকে গো-মাংস খেতে বাধ্য করেছিলেন যার ফলে তাঁকে বৈষ্ণব ধর্মে ধর্মান্তরিত হতে হয়েছিল।[৬] এ কাহিনী কৃষ্ণদাস কবিরাজের বর্ণিত কাহিনীর প্রায় অনুরূপ। এখানে অনুমান করা যেতে পারে যে ষোড়শ শতাব্দীর শেষদিকে চৈতন্য-চরিতামৃত রচনাকালে কবি সম্ভবত রাঢ়ে এ কাহিনীর ব্যাপক প্রচলন দেখতে পেয়েছিলেন এবং সেখান থেকেই তিনি হয়তো এ কাহিনীর উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন। অন্যান্য জ্ঞাত তথ্য দ্বারা সমর্থিত না হলে কোনো ঐতিহাসিকই নিশ্চিতভাবে এ ধরনের কাহিনীর উপর নির্ভর করতে পারেন না। অবশ্য, ষোড়শ শতাব্দীর শেষদিকে রাঢ়ে প্রচলিত এ কাহিনীর সঙ্গে দেশের ঐ অঞ্চলে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষদিকের ঘটনাবলির কিছু সম্পর্ক হয়তো ছিল। সেলিম[৭] বলেছেন যে মক্কার শরীফ এবং তিরমিজের (তুর্কিস্থানের একটি শহর) অধিবাসী জনৈক আশরাফ হোসেনীর পুত্র হোসেন দৈবক্রমে বাংলায় আগমন করেন। তিনি রাঢ়ের চান্দপাড়া গ্রামের এক কাজীর বাড়িতে অবস্থান করেন। কাজী তাঁকে শিক্ষা দান করেন এবং তাঁর সম্ভ্রান্ত বংশ দেখে তার মেয়েকেও তাঁর সঙ্গে বিয়ে দেন। শেষপর্যন্ত হোসেন মোজাফফর শাহের ওয়াজীর হন। সেলিম তাঁর তথ্যের জন্য আংশিকভাবে ফিরিশতার বিবরণের উপর নির্ভর করেছিলেন বলে মনে হয়। ফিরিশতাও হোসেনকে মক্কার অধিবাসীরূপে অভিহিত করেছেন।[৮] ব্লখম্যান চান্দপাড়াকে যশোরের একই নামের একটি গ্রাম রূপে শনাক্ত করার পক্ষপাতী।[৯] কিন্তু হোসেনের ঘটনাস্থলের এ শনাক্তকরণ সন্তোষজনক বলে মনে হয় না। সেলিম যখন স্পষ্টভাবে বলছেন যে, উল্লিখিত চান্দপাড়া ছিল রাঢ় বা পশ্চিমবঙ্গে তখন যশোরে এটার অবস্থান নির্দেশ করার কোনো কারণ আমাদের নেই। যশোর তখন রাঢ়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। উপরন্তু এই চান্দপাড়ায় হোসেনের প্রাথমিক জীবন সংক্রান্ত কাহিনীর প্রাচুর্য দেখা যায় না, যা পাওয়া যায় মুর্শিদাবাদের চান্দপাড়ায়।[১০] যশোরের চান্দপাড়া গ্রামে আজ পর্যন্ত হোসেন শাহের একটিও লিপি আবিষ্কৃত হয় নি। মনে হয় সেলিম এক আনি চান্দপাড়া নামেও পরিচিত (সম্ভবত ইতোমধ্যে উল্লিখিত কারণে) বর্তমানে মুর্শিদাবাদের

এক গ্রাম চান্দপাড়াকে নির্দেশ করেছেন। সেলিমের উপর্যুক্ত বিবরণ কৃষ্ণদাস কবিরাজের কাহিনীকে সমর্থন না করলেও মুর্শিদাবাদের ঐ অঞ্চলের সঙ্গে হোসেন শাহের প্রাথমিক জীবনের সম্পৃক্ততা নির্দেশ করে। চান্দপাড়ার চারপাশের গ্রামগুলিতে হোসেন শাহের রাজত্বকালের প্রথম দিকের বহু লিপির আবিষ্কার এ তথ্যকে স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে।[১১] সুলতানের প্রথম জীবনে মুর্শিদাবাদের সঙ্গে যোগাযোগ এত সুপ্রতিষ্ঠিত বলে মনে হলে সুলতান হওয়ার পূর্বে ঐ স্থানের একজন হিন্দু রাজস্ব কর্মকর্তার অধীনে তাঁর চাকরি করাও অত্যন্ত সম্ভাব্য। ফিরিশতা ও সেলিম দু'জনই তাঁকে সৈয়দ বলে অভিহিত করে[১২] হোসেনকে জন্মসূত্রে আরবদেশীয় বলে নির্দেশ করেছেন। তাঁর আরবীয় বংশানুক্রম মুদ্রা ও লিপি দ্বারা প্রমাণিত। "সৈয়দ আশরাফুল হোসেনীর পুত্র সুলতান হোসেন শাহ"—এই শব্দগুচ্ছ প্রায়ই তাঁর মুদ্রায় দেখা যায়।[১৩] কাজেই হোসেন ছিলেন সৈয়দ আশরাফুল হোসেনীর পুত্র যিনি আদিতে মক্কার বাসিন্দা ছিলেন এবং শেষে তিরমিজে বসবাস করেছিলেন– সেলিমের এ বর্ণনায় কিছুটা সত্যতা থাকতে পারে। হোসেনের পিতা ছিলেন মক্কার শরীফ। সমাজে শরীফরা যথেষ্ট সম্মান পেতেন। নকীবুল আশরাফ বা রসুলের বংশধরদের তালিকারক্ষক সম্ভবত ছিলেন তাঁর অধীনস্থ শহরের এক প্রশাসক। তাদেরকে মাঝে মাঝে হোসেনী বংশের সদস্যদের মধ্য থেকে নিযুক্ত করা হতো। ইবনে বতুতা আমাদের কাছে একজন শরীফের কাহিনী বর্ণনা করেছেন যিনি গিয়াসউদ্দীন তুঘলকের রাজত্বকালে ভারতবর্ষে এসেছিলেন এবং উপযুক্ত রাজস্বপূর্ণ সম্পত্তি ভোগ করে মৃত্যুবরণ করেছিলেন।[১৪] পরবর্তী উৎসগুলি অবশ্য এ ইঙ্গিত দেয় যে, শরীফ ছিলেন কাবার তত্ত্বাবধায়ক যার সাম্প্রতিক দৃষ্টান্ত হচ্ছে মক্কার শরীফ হোসেন। হোসেনী পরিবারের সদস্য হিসেবে শরীফদের শিয়াপন্থী প্রবণতা ছিল।

টীকা

১. কৃষ্ণদাস কবিরাজ : পূর্বোল্লিখিত, মধ্য, পঞ্চবিংশতিতম, পৃ. ২৫৫-৫৬।

২. পরবর্তী একজন লেখক ফারিয়া ওয়াই সুজা প্রধানত ডি ব্যারোসকে অনুসরণ করেছেন বলে মনে হয়। তিনি বলেছেন "পর্তুগিজদের ভারতবর্ষ আবিষ্কারের প্রায় ৫০ বছর আগে একজন আরব মুসলমানের গৌড়ে আগমন ঘটে। তিনি ধীরে ধীরে ধনী ও শক্তিশালী হয়ে উঠেন। তিনি বাংলার তৎকালীন সুলতানের পক্ষে উড়িষ্যার রাজার বিরুদ্ধে জয়লাভ করেন। তাঁকে অন্যান্য পুরস্কার দেওয়া ছাড়াও সুলতান তাঁকে তাঁর প্রহরীদের সেনানায়ক পদে নিযুক্ত করেন। তিনি অকৃতজ্ঞ হয়ে সুলতানকে হত্যা করে রাজ্য জোর দখল করেন এবং তাঁর উত্তরাধিকারী মুসলমানদের জন্য এ রাজ্য রেখে যান।" পূর্বোল্লিখিত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪১৭। ষোড়শ শতকের প্রথম দিকের বাংলার রাজনৈতিক অবস্থা ও ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে ফারিয়া ওয়াই সুজা যা বলেছেন তা সতর্কতার সঙ্গে বিশ্লেষণ করলে (পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৯৬-৯৭, ১০৮, ২২০, ২৭৩, ৩১৪-১৫ এবং ৪১৫-২২) মনে হয় যে তিনি ডি ব্যারোস ও অন্যান্য পর্তুগিজ লেখকদের ওপর নির্ভর করেছিলেন।

৩. জে. এ. এস. বি. ১৮৭৩, পৃ. ২৮৭।

৪. মার্টিন : পূর্বোল্লিখিত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৪৮; আরও তুলনীয়, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬১৮-১৯।

৫. প্রথম ইলিয়াস শাহী বংশের শেষ সুলতান ছিলেন আলাউদ্দীন ফিরুজ। তাঁর মুদ্রার তারিখ হচ্ছে ৮১৭হিঃ/১৪১৪ সাল; দেখুন ভট্টশালী : কয়েন্স অ্যান্ড ক্রনোলজি, পৃ. ১০৭-০৮, প্লেট ৭, নং ১ ক এবং ১ খ; এস. আহমদ : সাপ্লিমেন্ট, পৃ. ৫৮-৫৯, প্লেট ৩, নং ১৩৩। তাঁর পরবর্তী শাসক ছিলেন রাজা গণেশের ধর্মান্তরিত পুত্র জালালউদ্দীন মোহাম্মদ শাহ। রাজা গণেশের বংশ ১৪৩২ সাল পর্যন্ত বাংলার ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন বলে মনে হয়। এরপর নাসিরউদ্দীন মাহমুদ ইলিয়াস শাহী বংশ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। বাংলার ইতিহাস সযত্নে পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, রাজা গণেশের বা ইলিয়াস শাহী বংশের কোনো শাসকেরই নাম ইব্রাহিম ছিল না।

৬. আর. ডি. ব্যানার্জি : বাঙ্গালার ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪৩।

৭. পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১৩১-৩২।

৮. ফিরিশতা : পূর্বোল্লিখিত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩০১।

৯. জে. এ. এস. বি. ১৮৭৩, পৃ. ২২৮।

১০. এ সব কাহিনীর জন্য দেখুন জে. এ. এস. বি. ১৯১৭, পৃ. ১৪৩-৪৭।

১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮-৫৯।

১২. ফিরিশতা : পূর্বোল্লিখিত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩০১।

১৩. এইচ. এন. রাইট : ক্যাটালগ, ২য় খণ্ড, ২য় অংশ, প্লেট ৫, নং ১৬৭, ১৬৮ এবং ১৭৫; লেন-পুল : পূর্বোল্লিখিত, প্লেট ৫ ও ৬, নং ১০৮, ১২২ এবং ১২৮; জে. এ. এস. বি. ১৮৭৩, পৃ. ২৯২।

১৪. ট্র্যাভেলস অফ ইবনে বতুতা, গিব, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫৮ ও পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহ।

পরিশিষ্ট-গ

ইসমাইল গাজী

ইসমাইল গাজী সম্পর্কে এখানে কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন। পণ্ডিততরা তাঁকে হোসেন শাহের রাজত্বকালের সঙ্গে জড়িত করতে চান। ইসমাইল গাজীর নাম ঘিরে সত্য তথ্য ও কল্পকাহিনী এমন অবিচ্ছেদ্যভাবে মিশে গেছে যে প্রায় সব লেখকই বিনা প্রশ্নে তাঁর সম্পর্কে প্রচলিত কাহিনী মেনে নিয়েছেন। ব্লখম্যান নিম্নলিখিত ভাষায় যথাযথভাবে ইসমাইল গাজী সম্পর্কে আমাদের বর্তমান জ্ঞানের সারসংক্ষেপ করেছেন :[১]

"মস্তকবিহীন অশ্বারোহীর কাহিনী থেকে অলৌকিক ঘটনাবলি বাদ দিলে আমরা ইসমাইলের সুবোধ্য কাহিনী পাই। হোসেন শাহের একজন সেনাপতি, গঞ্জ-ই-লস্কর ষোড়শ শতকের প্রথম ভাগে বাংলা থেকে উড়িষ্যা আক্রমণ করেন। কটকে উড়িষ্যা আক্রমণ করেন। কটকে উড়িষ্যাবাসীদের বিরুদ্ধে লক্ষণীয় বিজয় অর্জন করে তিনি মন্দারণে ফিরে আসেন। সেখানে তিনি একটি দুর্গ নির্মাণ করেন এবং সে দুর্গের প্রাচীরের ভিতরেই তিনি সমাধিস্থ রয়েছেন। লোককাহিনীর ঐতিহাসিক মূল্য সম্পর্কে সাধারণত যতই মতভেদ থাকুক না কেন মদারণ লোককাহিনী যে একান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে উড়িয়া বিবরণকে যে সমর্থন ও পূর্ণতাদান করে তা আমাকে বিস্মিত করেছে। এ উড়িয়া বিবরণ থেকেই স্টার্লিং মুসলমানদের উড়িষ্যা অভিযানের উল্লিখিত বিবরণ সংগ্রহ করেছেন"। এ কাহিনীর অনুপুঙ্খ বিবরণ দিতে গিয়ে রজনীকান্ত চক্রবর্তী[২] বলেছেন যে, ১৫১০ সালে উড়িষ্যা আক্রমণকারী ইসমাইল গাজীকে হোসেন শাহ মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলেন কারণ মন্দারণ সীমান্তে দুর্গ নির্মাণের পর ইসমাইল সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার চেষ্টা করেছিলেন বলে সুলতান সন্দেহ করেছিলেন। মস্তকবিহীন ইসমাইলের দেহ ঘোড়ায় চড়ে গৌড় থেকে মন্দারণ অভিমুখে যাত্রা করে। ছিন্ন মস্তক বহু উচ্চে বাতাসে ভেসে তাকে অনুসরণ করে। মন্দারণ দুর্গের তোরণে পৌঁছে ইসমাইল সেখানে অপেক্ষমাণ প্রহরীদের কাছে কয়েকটি পান চান। মৃত ব্যক্তির অনুরোধ রাখতে তারা অস্বীকৃতি জানালে ধড়বিহীন মস্তক গৌড়ে ফিরে যায় এবং দেহটাকে মন্দারণে সমাধিস্থ করা হয়। রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়ও একই কাহিনীর পুনরাবৃত্তি করেছেন। তিনি বলেছেন যে বাংলার নবাবের (হোসেন শাহ) একজন সেনাপতি ইসমাইল গাজী পুরী নগরী ধ্বংস করেন।[৩] বুকানন হ্যামিল্টন ইসমাইলকে হোসেনের কামরূপ অভিযানের সঙ্গে জড়িত করেছেন এবং তিনি মনে করেন যে, এ দরবেশ নসরতের রাজত্বকালে জীবিত ছিলেন।[৪]

সুতরাং মনে হয় যে ইসমাইল গাজীকে হোসেন শাহের সমসাময়িক ও তাঁর কর্মকর্তারূপে বিবেচনা করার মূল ভিত্তি হচ্ছে মাদলাপঞ্জিতে প্রাপ্ত বলে কথিত কাহিনী।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও স্টার্লিং এর উল্লেখ করেছেন এবং শেষোক্ত ব্যক্তি হচ্ছেন ব্লখম্যানের তথ্যের উৎস। এ সব ঐতিহাসিক দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলায় এখনও বহুল প্রচলিত ইসমাইল গাজীর লৌকিক উপাখ্যান দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। রজনীকান্ত চক্রবর্তী ও ব্লখম্যান বর্ণিত লৌকিক উপাখ্যান হচ্ছে ঐতিহাসিক তথ্য ও লোকপ্রিয় কল্পনার এক বিচিত্র সংমিশ্রণ।

প্রারম্ভিকভাবে অবশ্য মাদলাপঞ্জির উল্লেখ মনে হয় ভুল। এর সহজবোধ্য কারণ এই যে পঞ্জি ১৫০৯ সালে সুরস্থান কর্তৃক উড়িষ্যা আক্রমণের কথা বলেছে।[৫] সুরস্থান শব্দটিকে আরবি শব্দ সুলতানের অপভ্রংশ বলে মনে হয়। পঞ্জি কখনই ইসমাইল গাজীর নামোল্লেখ করে নি। পঞ্জিতে সুরস্থান শব্দটি থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, তাঁর কর্মকর্তাদের সাহায্যে সুলতান নিজেই উড়িষ্যা অভিযানে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। উড়িষ্যার বিরুদ্ধে কোনো কোনো অভিযানে যে সুলতান নিজেই ব্যক্তিগতভাবে অংশ নিয়েছিলেন তার প্রমাণ হোসেন শাহের ১৫১২ সালের সিলেট লিপিতে[৬] পাওয়া যায়। বাংলা ও উড়িয়া উৎসগুলিতেও এর প্রমাণ রয়েছে।[৭] সুরস্থান শব্দটিকে সহজেই এভাবে ব্যাখ্যা করা চলে। সুতরাং এটা দিয়ে ইসমাইল গাজীকে বুঝানো হয়েছিল বলে মনে করা উচিৎ নয়।

সুতরাং হোসেন শাহের অভিযানের সঙ্গে ইসমাইলের সংশ্লিষ্টতা পরীক্ষায় টিকে না। এটা সত্য যে, জনৈক ইসমাইল গাজী একসময় বাংলা থেকে উড়িষ্যা আক্রমণ করেছিলেন। এটাও সত্য যে তাঁর সুলতানের আদেশে ইসমাইলকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। হোসেন শাহ যে উড়িষ্যা আক্রমণ করেছিলেন তাতে যেমন কোনো সন্দেহ নেই, তেমনি ইসমাইলকে যে তাঁর নামের সঙ্গে জড়িত মন্দারণ দুর্গে সমাধিস্থ করা হয়েছিল তাতেও কোনো সন্দেহ নেই। যে ইসমাইল গাজী প্রকৃতপক্ষে উড়িষ্যা আক্রমণ করেছিলেন, তিনি তা করেছিলেন পূর্ববর্তী এক শাসনামলে, অর্থাৎ সুলতান বারবক শাহের রাজত্বকালে। এ সুলতানের আদেশেই ৮৭৮হিঃ/১৪৭৪ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেছিলেন।[৮] সুলতানের আদেশে ইসমাইলের মুণ্ডচ্ছেদের মতো দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাসহ বারবক শাহের উড়িষ্যা আক্রমণ হোসেন শাহের রাজত্বকালের একই ধরনের ঘটনার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলার কারণে ইসমাইলের নামে গড়ে ওঠা লোককাহিনীতে মিশে যায়। দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার হিন্দু ও মুসলমান উভয়ই একজন বড় দরবেশ হিসেবে ইসমাইলকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে।[৯] এ বিভ্রান্তি দূর করতে রিসালাত-উশ শুহাদা আমাদের সাহায্য করে। এটা লেখা হয়েছিল ১০৪২হিঃ/১৬৩৩ সালে।[১০] ইসমাইলের ঐতিহাসিক ব্যক্তিগত অবস্থা সম্পর্কে নিম্নলিখিত পংক্তিগুলি হচ্ছে রিসালার বক্তব্যের সারাংশ :[১১] ঘোড়াঘাটের অধ্যক্ষ ভণ্ডসীরায় সীমান্ত অঞ্চলে একটি দুর্গ নির্মাণের অনুমতির জন্য ইসমাইলকে অনুরোধ করেন এবং তিনি তাঁর অনুরোধ মেনে নেন। কিন্তু কামরূপের রাজার সঙ্গে ইসমাইল এক মৈত্রী চুক্তি করেছেন একথা বলে রায় ইসমাইলের বিরুদ্ধে সুলতানের মনকে বিষিয়ে তুলেন। ইসমাইলকে ধ্বংস করতে বদ্ধপরিকর হয়ে সুলতান তাঁর বিরুদ্ধে সৈন্যদল পাঠালে ইসমাইল সফলতার সঙ্গে তাদের প্রতিহত করেন। অবিলম্বে দরবারে হাজির হওয়ার জন্য তিনি ইসমাইলকে এক চিঠি লেখেন। সুলতানের আহ্বানে সাড়া

দিয়ে ইসমাইল তাঁর ভাগ্যের রায় মেনে নেন। শুক্রবার, ১৪ই শাবান, ৮৪৫ হিজরি (৪ঠা জানুয়ারি, ১৪৭৪সাল) সুলতানের আদেশে তাঁকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়। রাজকীয় ক্ষমতাবলে তাঁর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। সুলতান যখন রায়ের ভূমিকা জানতে পারলেন তখন তিনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। বিদেহী আত্মার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে তিনি রানীকে সঙ্গে নিয়ে মন্দারণ ও কান্তাদুয়ার যান।[১২]

মন্দারণে ইসমাইলের সমাধিতে স্থাপিত ৯০০ হিঃ/১৪৯৪-৯৫ সালের একটি লিপিতে[১৩] ইসমাইলের সময়কাল ১৪৯৪-৯৫ সালের আগে স্থাপনের ব্যাপারে রিসালার সাক্ষ্যের আংশিক সমর্থন পাওয়া যায়। ১৫০৯ সালে যখন হোসেন শাহ উড়িষ্যা আক্রমণ করেছিলেন তখন ইসমাইলের জীবিত থাকা সম্ভব ছিল না।

দু'জন ইসমাইল ছিলেন এ অনুমান না করলে রিসালাত-উশ-শুহাদা এবং মন্দারণ লিপির সাক্ষ্য সম্ভবত ইসমাইল সম্পর্কে এতদিন ধরে প্রচলিত বিভ্রান্তির অবসান ঘটায়। একজন ইসমাইল ১৪৭৪ সালে নিহত হন এবং অপরজন ১৫০৯ সালে উড়িষ্যা অভিযানে নেতৃত্ব দান করেছিলেন। দু'জনই মন্দারণে সমাধিস্থ হন এবং হিন্দু ও মুসলমান, উভয়ের নিকটই দু'জনই সমান শ্রদ্ধার পাত্র। এ অনুমান হবে অত্যন্ত কষ্টসাধ্য।

ইসমাইল গাজী পূর্ববর্তী সময়কালে, অর্থাৎ বারবক শাহের রাজত্বকালে বেঁচে ছিলেন। হোসেন শাহের উড়িষ্যা আক্রমণের সঙ্গে ইসমাইল গাজীর কোনো সম্পর্ক ছিল না।[১৪]

টীকা

১. পি. এ. এস. বি. ১৮৭০, পৃ. ১২০।

২. পূর্বোল্লিখিত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২০-২১; মন্দারণের এ মুণ্ডবিহীন অশ্বারোহীর ইতিবৃত্ত ব্লখম্যানও বর্ণনা করেছেন, পি. এ. এস. বি. ১৮৭০, পৃ. ২১৭-২০।

৩. বাঙ্গালার ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪৫-৪৬।

৪. মার্টিন : পূর্বোল্লিখিত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪১১ ও ৪১২; আরও দেখুন, কে. এল. বড়ুয়া : দি আর্লি হিস্ট্রি অফ কামরূপ, পৃ. ২৪০-৪১।

৫. জে. এ. এস. বি. ১৯০০, সংখ্যা, পৃ. ১৮৬।

৬. জে. এ. এস. বি. ১৯২২, পৃ. ৪১৩।

৭. উপরে, পৃ. ৪৫।

৮. রিসালাত-উশ-শুহাদা, জে. এ. এস. বি. ১৮৭৪, পৃ. ২৩৬।

৯. তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে গিয়ে বাংলার সপ্তদশ শতকের একজন কবি সীতারামদাস বলেছেন : "আমি গড় মন্দারণে পীর ইসমাইলকে পূজা করি। (এটা তাঁর আধ্যাত্মিক প্রভাব যে) বাঘ ও মহিষ জঙ্গলে একসঙ্গে বাস করে। ইসমাইলের নির্মিত বেড়িবাঁধ গড় মন্দারণে টিকে রয়েছে। মন্দারণের পরিখাপ্রাচীরের ভিতরে তিনি বাহান্তরটি দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন।

মাটিতে মাথা নত করে আমি তাঁর পদ-উপাসনা করি।" সুকুমার সেন কর্তৃক মূলপাঠ উদ্ধৃত, মধ্যযুগের বাংলা বা বাঙালি, পৃ. ৪১।

১০. রিসালা, জে. এ. এস. বি. ১৮৭৪, পৃ. ২২২।

১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৫-৩৮।

১২. রিসালাত-উ-শ শুহাদা থেকেও আমরা জানি যে পূর্বাঞ্চলে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে দরবেশ বাংলায় এসেছিলেন। একজন সামরিক কর্মকর্তারূপে নিযুক্ত করে এবং কামরূপ ও উড়িষ্যার অমুসলমান শাসকদের আক্রমণের দায়িত্ব তাঁর উপর অর্পণ করে বারবক শাহ তাঁকে সাহায্য করেছিলেন। এসব শাসকদের দমন করতে ইসমাইল গাজী সফল হয়েছিলেন বলে মনে হয়। (জে. এ. এস. বি. ১৮৭৪, পৃ. ২২৬-৩৫ এ রিসালা, এবং হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৩-৩৪ দেখুন।) তাঁর জন্য যে ভয়াবহ পরিণতি অপেক্ষা করছিল তা আগেই বর্ণনা করা হয়েছে। ইসমাইলের জীবনের সঙ্গে জড়িত ঘটনাবলি বর্ণনাকারী গ্রন্থসমূহের মধ্যে রিসালা মনে হয় সর্বপ্রথম। রিসালাতে সামান্য পরিমাণে পাওয়া জীবনবৃত্তান্তের সত্যতা যাচাই করার মতো উপাদানের দুঃখজনক স্বল্পতা থাকলেও এখানে এটা অনুমান করা যেতে পারে যে, এ গ্রন্থ ঐতিহাসিক সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। কামরূপ ও উড়িষ্যার সঙ্গে বাংলার রাজনৈতিক সম্পর্ক যে বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল না সেটা একটি যথেষ্ট প্রমাণিত তথ্য।

১৩. জে. এ. এস. বি. ১৯১৭, পৃ. ১৩৩-৩৪।

১৪. বাংলায় আমার প্রবন্ধ দেখুন : ইসমাইল গাজী ও সমসাময়িক বাংলা, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ, ৩য় সংখ্যা, পৃ. ৪৫-৫৪।

পরিশিষ্ট-ঘ

হাউজ-উল হায়াতের মূলপাঠ

ফার্সি অনুচ্ছেদগুলি ও তার অনুবাদ নিম্নে দেওয়া হলো। এগুলিতে গর্ভাসন (বা মাতৃগর্ভে শিশুর অবস্থান) ও সভাসন (বা সভায় যেমন দেখা যায় সে ভঙ্গি) বর্ণনা করা হয়েছে।

چون طالبی خواهد که باین شغل مشغولی نماید باید که
جلسه گربه آسن پیش گیرد، گربه آسن آنرا گویند که چنانچه بچه
در شکم مادر می باشد، در باید پای چپ بر پائی راست
نهاده دو سرین بر دو پائی داشته و سر میان دو زانو برداشته
و دو آرنج بردو تهی‌گاه نهاده و دو دست بردو گوش کرده
ناف را به پشت رساند از ناف رمقی که پیداست آنرا ارنجن
میگویند عبارت از . . . است دم را حبس کند ـ

কেউ এ বিশেষ ধরনের অনুশীলন করতে চাইলে তার গর্ভাসন অবলম্বন করা উচিত। এটাকে গর্ভাসন বলা হয় কারণ এটার অবয়ব হচ্ছে মাতৃগর্ভে শিশুর মতো। তার বাঁ পা ডান পায়ের উপর রাখা উচিৎ, দু'পায়ের উপর রাখতে হবে নিতম্ব, দু'হাঁটু উঁচু করে তার মাঝখানে মাথা রাখতে হবে। তার দু'কনুই থাকবে তলপেটের উপর এবং দু'হাতের তালু থাকবে দু'কানের উপর। নাভিটাকে পিছন দিকে চাপ দিতে হবে। নাভি থেকে যে অবস্থানের সৃষ্টি হয় তাকে বলা হয় নিরঞ্জন যার অর্থ... যতটা সম্ভব নিশ্বাস বন্ধ রাখতে হবে।

خواهد که ذکر کنبهک کند بادی که بر اعضا شده است
از پورک تدریجاً بام الدماغ برو قوت لکند و اگرله اعضا
شکسته شولد، چون بام الدماغ رسد چشم را واز دارد زبانرا
بکام جفشاند نفس از راه بینی آهسته آهسته بدر آمدن دهد
باز عمل پورک از سر آغاز کند چون درون کشند پورک
گویند چون بیرون بر آرد کنبهک نامند چون بگذارد ریچک
خوانند ذکر سبهاآسن برای قوت بینی و رگهائے گردن و پشت و
هضم طعام و خشک شدن لهان که بندهائی تن است این
جلسه نگاهدارد که پائے راست باساق بران چپ نهد و پائی
چپ باساق بران راست نهد نرمی و آهستگی تا آنکه عادت
پذیر گردد، در آغاز مشکل است'

কেউ কুম্ভক (এর জিকির) করতে চাইলে পূরকের কারণে মস্তিষ্কের মূল পর্যন্ত তার অঙ্গের ক্রমান্বয়ে (কষ্ট) স্বীকার করা সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে। অন্যথায় তার অঙ্গ ভেঙ্গে যেতে পারে। মস্তিষ্কের কেন্দ্র পর্যন্ত পৌঁছে গেলে তার চোখ ও জিহ্বা মদ দিয়ে ভিজিয়ে নেওয়া উচিৎ এবং নাসিকা দিয়ে ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস ত্যাগ করা উচিৎ। তারপর তার উচিৎ পূরকের অনুশীলন দ্বারা শুরু করা। সে যখন শ্বাস নেয় তাকে বলে পূরক, যখন সে নিশ্বাস ত্যাগ করে একে বলে কুম্ভক এবং যখন সে (বায়ু) ত্যাগ করে তাকে বলে রেচক। নাক এবং ঘাড় ও পিঠের শিরাকে জোরদার করা, খাদ্য হজম এবং শরীরের দাস, ভিতরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলিকে শুষ্ক করা হচ্ছে সভাসনের বর্ণনার উদ্দেশ্য। অভ্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত ধীরে ধীরে পদতল সহ ডান পা রাখতে হবে বাম উরুর উপর এবং পদতল সহ বাম পা রাখতে হবে ডান উরুর উপর। শুরুতে এটা কঠিন।

পরিশিষ্ট-ঙ

আদ্য-পরিচয় ও জ্ঞান সাগরের মূল পাঠ

১.

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের ২য় অংশে অনূদিত বা শব্দান্তরিত শেখ জাহিদের আদ্য-পরিচয়ের মূল পাঠ। বিভিন্ন স্থানে উল্লিখিত পৃষ্ঠাসংখ্যা হচ্ছে বর্তমান গ্রন্থের যাতে সংশ্লিষ্ট মূলপাঠের অনুবাদ বা শব্দান্তর রয়েছে।

না ছিল খিতিজল ই মহীমণ্ডল
শূন্য মধ্যে না ছিল প্রকাশ,
স্বর্গ মর্ত পাতাল সব ছিল অন্ধকার
আউর না ছিল আকাশ।
চন্দ্র সুজ্জ তারা না ছিল অভিপরা
না ছিল নবীন জলধর,
বায়ু বরুণ আনল পৃথিবী রসাতল
না ছিল পর্বত শিখর।
নদনদী শূন্যকার না ছিল ঝড় ঝঙ্কার
না ছিল সাগর তীর্থস্থান,
সংসারে না ছিল কিছু সব হইল তার পিছু
সবেমাত্র ছিল ভগবান।
একা ছিল নিজরূপ কিছু না পাইল সুখ
ভাবিলা প্রভু আপন শরীরে,
শূন্যকার ঘুচাই দৃষ্ট রচিলাত নানা সৃষ্ট
এক খেলা খেলাব সংসারে।
আপনার দিয়া রতি নিজ লয়ে এক মূর্ত্তি
রাখিলা গোসাঞি অলংঘ্য সাগরে,
মিও সঙ্গে আলাপনে কৌতুক বাড়িল মনে
নির্মাইল একহি হুঙ্কারে।
সৃজন করিয়া মিও হরিষ বাড়িল চিত্ত
জলের উৎপত্তি হইল সংসারে,
শীঘ্র কহিতে বচন তাহাতে জন্মিল পবন
আনল জন্মিল ক্রোধ হইতে।

মিত্তেরা অঙ্গের মলি নিজ করে তাহা তুলি
যোগাইল জলের উপরে
মিত্তিকা বাড়য়ে জলে সমুদ্রের উথালে
দিনে দিনে হয় প্রসারে।
জন্মিল চারিরত্ন পাইয়া মহাযত্ন
শ্রধায়ে সৃজিল গোসাঞিও,
সংসারেতে জন্মে সব হয় ক্রেমে ক্রেমে
ওহা বহি অন্য কিছু নাঞিও।
যতছিল ভয়ঙ্কর সব হইল প্রচার
হুঙ্কারে করিল নির্ম্মান,
রচিল তিন জীব তাহাতে দিয়া শিব
সৈন্য মুখ্য কইল স্থানে স্থানে।
জন্মিল দেব অসুর বলে হইল প্রচুর
বাহুবলে না চিনে অন্যথা,
নিরবধি করে রণ না জানে মরণ
কাহো সনে নাহিক মমতা।
ঘোড়া হস্তি প্রখর রাক্ষস ভয়ঙ্কর
রাজত্ব করে চিরকাল,
ভুঞ্জিল আপন মনে বিবিধ বিধানে না চিনে
কেবা সৃজিল সযাল।
প্রভু করিল মনে আমা কেহ নাহি চিনে
কি কি কারণে করিলুন প্রকাশ
ক্রোধ হইয়া দেও সব করিবা খেও
যে কে কে কইল বংশনাশ।
নির্মূল করিয়া দেও সংসারেত নাঞি কেও
এমন গেল কথো দিবস,
পুনর্বার করিল মনে মনুষ্য সৃজন ভুবনে
তাহা হইতে পাইমু হরিষ।
(উপরে পৃ. ১৮৫-৮৬)

... ...

তাহক করিমু রাজা জীবেরে করিমু প্রজা
পৃথিবী সাজিয়া দিব মহীতলে,
করিমু প্রবীণ পূজে যেন রাত্রিদিন
তেয়াগিয়া সকল জঞ্জালে।

আর কথা সৃজিল কাহাত সুখ না পাইল
মনুষ্য করিমু সৃজন,
আপনার অঙ্গ ছিল আর কথা নির্মাইল
কেমনে হয় মনুষ্য আকার।
(উপরে পৃ. ১৮৮)

বাত, বরুণ আনল বইসে যেই যেই খানে,
স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল কহিমু স্থানে স্থানে।
চন্দ্র সুজ্জ আকাশে যত তারা সাজে,
তুলনা দিমু সব শরীরের মাঝে।
নদনদী আর গঙ্গা ভাগীরথি,
শরীরের মাঝে ঢেউ বহিছে দিবারাতি।

... ...

সত্য তৃতিয় দ্বাপর কলি মহাপ্রখর

... ...

এই শরীর-মাঝে চারি বেদ আছে

... ...

এই শরীর মাঝে চারি কিতাব বিরাজে

... ...

এই ত শরীর ভিতর যাচ্ছে পর্বত শিখর
তাহে যাচ্ছে ঝোর ঝঙ্কার
(উপরে পৃ. ১৮৮)

বৃক্ষের শিকড় লড়ে কহিল ব্রহ্ম
মনুষ্যের শিকড় বিপরিত কর্ম
(উপরে পৃ. ১৮৯)

২.

নিম্নে সৈয়দ সুলতানের জ্ঞান-প্রদীপ থেকে মূলপাঠ দেওয়া হলো। এ গ্রন্থের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের দ্বিতীয় অংশে এর অনুবাদ ও শব্দান্তর করা হয়েছে। মূলপাঠের নিচে আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাণ্ডুলিপির ফোলিও সংখ্যা এবং এ গ্রন্থের যে সব পৃষ্ঠায় মূলপাঠের অনুবাদ বা শব্দান্তর রয়েছে সে পৃষ্ঠাসংখ্যা উল্লেখ করেছি। সাহিত্যবিশারদের ক্যাটালগের উদ্ধৃতি এবং এনামুল হকের মুসলিম বাঙ্গালা সাহিত্যের সাহায্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাণ্ডুলিপি সামান্য সম্পাদনা করা হয়েছে। বানান বা স্নায়ুর নামের শুদ্ধির ক্ষেত্রে যোগ সাহিত্য ব্যবহার করা হয়েছে।

ব্রহ্মাণ্ডে যে গুণ বইসে সে গুণ শরীরে।
(ফোলিও ৯ খ, উপরে পৃ. ১৮৯)

... ...

মেরুদণ্ডে ইঙ্গিলা পিঙ্গিলা দুই নাড়ী,
যেন বৃক্ষ দুই পাশে লতা আছে বেড়ি।
দক্ষিণে পিঙ্গিলা নাড়ী যেন দিবাকর,
বামপাশে ইঙ্গিলা নাড়ী যেন শশধর।
ইঙ্গিলাত বইসে গঙ্গা পিঙ্গিলা যমুনা,
সুরাসুর মধ্যে বইসে নামেত সুষুম্না।
তিন নাড়ী এক হয়ে আছে ভুরুবাট,
জ্ঞানী সবে বলে এই ত্রিপিনীর ঘাট।
(ফোলিও ১০ক; উপরে পৃ. ১৯০)

ইঙ্গিলা পিঙ্গিলা নাড়ী দুই যে প্রধান,
গান্ধারী কুহূ হস্তিজিহ্বা পূষা যশস্বিনী,
পয়স্বিনী অলম্বুষা ত্রিগুণ শঙ্খিনী।
(ফোলিও ৯খ-১০ক; উপরে পৃ. ১৯০)

মধ্যেত সুষুম্না নাড়ী সর্ব্বমধ্যে সার,
আদ্য শক্তি সাধিবার সেই যে দুয়ার।

... ...

পূরকে পুরিয়া বায়ু করিবে ভক্ষণ,
সূচি মুখে সুতা যেন করে প্রবেশন।

... ...

সন্ধি পাই সেই বায়ু করিবে প্রবেশ,
উঠিতে উঠিতে ধ্বনি করিবে বিশেষ।
শুনিতে শুনিতে ধ্বনি স্থির হবে মন,

... ...

সেই ধ্বনি মধ্যে জ্যোতি চিনিয়া লইব।
তবে এই জ্যোতি মধ্যে মন নিয়োজিব।
তবে সেই জ্যোতিতে মনের হবে লয়,
সেই সে প্রভুর পন্থ জানিও নিশ্চয়।
(ফোলিও ১০ক; উপরে পৃ. ১৯০-৯১)

... ...

জ্ঞানী সবে বলে এই ত্রিপিণীর ঘাট।
এই ঘাটে সেই জল সিনান যে করে,
কোটি কোটি জন্মের পাপে তারে কি করিতে পারে।
(ফোলিও ১০ক; উপরে পৃ. ১৯২)

তুম্মি সৃষ্টি তুম্মি কর্ত্ত তুম্মি যে স্বরূপ,
(ফোলিও ৬খ; উপরে পৃ. ১৯৪)

ত্রিগুণ নাড়ীর কথা তিন থাঞি বেঙ্কা,
তাহাকে জানিলে নরে মৃত্যু নাহি শঙ্কা।
(ফোলিও ৩ ক; উপরে পৃ. ১৯৫)

দেখিতে না পারি যারে তারে বলি শূন্য,
যাহারে চিন্তিলে দেখি পুরুষের ধন্য।
(ফোলিও ৪খ; উপরে পৃ. ১৯৯)

পরিশিষ্ট-চ

ক. গ্রন্থপঞ্জি সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ

আলোচ্য সময়কালের ইতিহাস পর্যালোচনা করতে গিয়ে বহু উৎস থেকে উপাদান ব্যবহার করা হয়েছে। এর সবগুলির সার্বিক পর্যালোচনা করা কঠিন বিধায় বর্তমান লেখক শুধুমাত্র গুরুত্বপূর্ণগুলিই বর্তমান উদ্দেশ্যে নির্বাচন করেছেন।

ফার্সি উৎসগুলি থেকে পাওয়া কোনো কোনো সাক্ষ্যের সমালোচনামূলক ব্যবহার পর্যালোচনাধীন আমলের রাজনৈতিক ইতিহাস পুনর্গঠনে আমাদের সাহায্য করতে পারে। তবকাৎ-ই-আকবরী, তারিখ-ই-ফিরিশতা, রিয়াজ-উস-সালাতীনের মতো ফার্সি ঘটনাপঞ্জি এবং বুকানন-হ্যামিল্টনের পাণ্ডুয়া পাণ্ডুলিপির ইংরেজি সংস্করণ হোসেন শাহী বংশের কোনো কোনো সুলতান সম্পর্কে অসম্পূর্ণ ধারণা দিয়ে থাকে। এগুলি দেশের সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে কোনো আলোকপাত করে না। নিজামউদ্দীন ও ফিরিশতা হোসেন ও নসরতের রাজত্বকালের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিলেও তাঁরা ফিরুজের রাজত্বকাল সম্পর্কে নীরব। শেরশাহের বাংলা আক্রমণের প্রসঙ্গেই তাঁরা বিশেষভাবে মাহমুদের উল্লেখ করেছেন যা পাঠকের মনে এই ধারণার সৃষ্টি করে যে, মাহমুদ যে হোসেন শাহী বংশভুক্ত ছিলেন সেটাও তাঁরা জানতেন না। গোলাম হোসেন সেলিমের রিয়াজ-উস-সালাতীন এ অর্থে অপর্যাপ্ত যে গ্রন্থকার অস্পষ্টভাবে হোসেনের উড়িষ্যা ও কামরূপ বিজয়ের উল্লেখ করেছেন। তিনি তাঁর ত্রিপুরা অভিযানগুলি ও চট্টগ্রাম দখলের উল্লেখই করেন নি। এ সব লেখক যে তারিখ ও ঘটনাক্রম দিয়েছেন সেগুলি শুধু বিভ্রান্তিকরই নয়, এগুলি ভুল ধারণাও দান করে। এ সব ফার্সি উৎস, মুদ্রা, লিপি ও স্থানীয় সাহিত্যিক উৎস দ্বারা সমর্থিত ও সম্পূরিত হলে অবশ্য আলোচ্য আমলের রাজনৈতিক ইতিহাসের নিছক রূপরেখা দিতে পারে। আলমগীর নামা এবং ফত-ইয়াই-ই-ইব্রিয়াতে হোসেন শাহের আসাম অভিযানের বিবরণ রয়েছে। মনে হয়, রিয়াজ-উস-সালাতীনের লেখক সেটা অবিকল নকল করেছেন। আইন-ই-আকবরীতে প্রাপ্ত টোডর মলের রাজস্ব-তালিকা ইতিহাসের ছাত্রকে বাংলায়, বিশেষত, ষোড়শ শতকের শেষদিকে প্রচলিত আঞ্চলিক বিভাগ ও প্রশাসনিক এককগুলি বুঝতে সাহায্য করে। বাদাউনীর মুন্তাখাব-উৎ-তওয়ারিখে হোসেন শাহের সঙ্গে সিকান্দর লোদী ও জৌনপুরের হোসেন শর্কির সম্পর্ক বুঝতে সাহায্যকারী তথ্য আছে বিধায় এটা প্রয়োজনীয়। বাবুরের আত্মচরিত মোগলদের সঙ্গে বাংলার সম্পর্কের উপর যথেষ্ট আলোকপাত করে। আহমদ ইয়াদগারের তারিখ-ই-সালাতীন-ই-আফগানা এবং আব্বাস সরওয়ানীর তারিখ-ই-শের শাহীর মতো আফগান উৎসগুলি ১৫৩৮ সালে শেরশাহের গৌড় অধিকারের ঘটনাবলির ধারাবাহিক বিবরণ দান করে। তারিখ-ই-ফিরুজ শাহী, তারিখ-ই-মোবারক শাহী, তবকাৎ-ই-নাসিরী, হুমায়ুননামা

এবং তাজকিরাত-উল-ওয়াকিয়াৎ এর মতো উৎসগুলি এ গ্রন্থে প্রয়োজনবোধে উল্লেখ করা হলেও বর্তমান প্রসঙ্গে এগুলির যথেষ্ট ইতিবাচক মূল্য নেই। ইসমাইল গাজীর সময়কাল শুদ্ধিকরণে এবং বারবক শাহের সঙ্গে তাঁর রাজনৈতিক সম্পর্ক সুনিশ্চিতকরণের জন্য রিসালত-উশ-শুহাদা একটি প্রয়োজনীয় উৎস।

বাংলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস পর্যেষণার জন্য সমসাময়িক বাংলা কাব্যগুলি এক অপরিহার্য উৎস। বিজয়গুপ্তের মনসা-মঙ্গল এবং বিপ্রদাসের মনসা-বিজয়ের মতো গ্রন্থগুলি থেকে শুধু যে মনসা পূজার বিকাশ দেখতে পাওয়া যায় তাই নয়, এগুলি বাঙালি জীবনচর্যার প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন দিক সম্পর্কেও যথেষ্ট আলোকপাত করে। বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য-ভাগবৎ, কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য-চরিতামৃত, লোচনদাসের চৈতন্য-মঙ্গল এবং জয়ানন্দের চৈতন্য-মঙ্গল ও চৈতন্যের অন্যান্য বাংলা জীবন চরিতগুলি তথ্যের আকর। এগুলি চৈতন্যবাদের, বিশেষত নবদ্বীপ ধারার ক্রমবিবর্তনের ইঙ্গিত দান করে। চৈতন্যবাদের প্রাথমিক পর্যায়ের ইতিহাস রচনার জন্য কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য-চরিতামৃত ব্যবহারে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা উচিৎ কারণ এটা রচিত হয়েছিল বৃন্দাবন-গোস্বামীদের রচনাবলি ও তাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য ও প্রেরণার ভিত্তিতে। বৈষ্ণববাদের নবদ্বীপ ধারার সঙ্গে তাদের কোনো যোগাযোগই ছিল না। সৈয়দ সুলতানের শব-ই-মিরাজ এবং জ্ঞান-প্রদীপসহ আলী রিজার যোগ কালন্দর ও জ্ঞান-সাগরের মতো পরবর্তী রচনাবলি থেকে ঐ আমলে মুসলমান সংস্কৃতির রূপান্তরের চলমান প্রক্রিয়া সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা আমরা লাভ করি। শব-ই-মিরাজকে বাদ দিলে, এসব গ্রন্থে যোগ আচারাদি ও ইসলামি মরমিবাদের এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ প্রকাশ পায়। সংস্কৃত ভাষায় রচিত অমৃত-কুণ্ডের আরবি ও ফার্সি অনুবাদ বা অভিযোজন এ প্রক্রিয়ার প্রকৃতি নির্ধারণে আমাদের বহুলাংশে সাহায্য করে। বিদ্যা ও সুন্দরের প্রণয়কাহিনী সম্পর্কে শ্রীধর ও সাবিরিদ রচিত কাব্যগুলি হচ্ছে বাংলা সাহিত্যে রোমান্টিক রীতির প্রথম নিদর্শন। কুতবনের মৃগাবতী ও জয়সির পদ্মাবতের দ্বারা সৃষ্ট এর হিন্দি-অবধী পটভূমির কথা মনে রাখলে এটা যথাযথভাবে উপলব্ধি করা যায়। পরাগলী মহাভারত ও অশ্বমেধপর্ব সংস্কৃত উপাখ্যানমূলক রচনাবলির বাংলা অনুবাদের প্রক্রিয়া নির্দেশ করা ছাড়াও হোসেনের চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরা বিজয় সম্পর্কে কিছু বিক্ষিপ্ত তথ্য দিয়ে থাকে, পরবর্তীকালের বাংলা ঘটনাপঞ্জি রাজমালায় যার সমর্থন পাওয়া যায়। লোককাহিনীতে ভরপুর হলেও আসাম বুরুঞ্জীর বিভিন্ন সংস্করণে হোসেন শাহী শাসকদের আহোম রাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযানগুলির বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। শূন্য-পুরাণ, ধর্ম-পূজা-বিধান, গোরক্ষ-বিজয় এবং কবিকঙ্কণের চণ্ডী-মঙ্গল ধর্ম, নাথ এবং চণ্ডীপূজার ইতিহাস ও জীবনচর্যার আরও বহুদিক সম্পর্কে কিছু অমূল্য তথ্য সরবরাহ করে।

উল্লিখিত বাংলা ভাষায় রচিত চৈতন্যের জীবনচরিতগুলির অনুরূপ সংস্কৃত ভাষায় রচিত চৈতন্যের জীবন চরিতগুলি বৈষ্ণববাদের নবদ্বীপ ধারার সহজ ও আদি রূপের উপর আলোকপাত করে। এগুলির মধ্যে রয়েছে মুরারীগুপ্তের চৈতন্য-চরিতামৃত, কবিকর্ণপুরের চৈতন্য-চরিতামৃত ও চৈতন্য-চন্দ্রোদয়। এ গ্রন্থের সপ্তম পরিচ্ছেদে এ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত

আলোচনা রয়েছে। রঘুনন্দনের স্মৃতিতত্ত্ব যা হিন্দুদের জীবনচর্যার প্রতি ব্রাহ্মণ্য মনোভাব প্রকাশ করে এবং বিভিন্ন নাটক ও চম্পু থেকে সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া যায় যা দীর্ঘদিন ধরে দেশকে প্রভাবিত করেছিল।

বিদেশী পরিব্রাজকদের বিবরণের গুরুত্বের অতিমূল্যায়ন করা সম্ভব নয়। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাংলায় আগত ভার্থেমা ও বার্বোসা এ দেশের বাণিজ্য, শিল্প ও জনগণ সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য দিয়েছেন। বিশেষত পর্যালোচনাধীন আমলে বাংলার রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক অবস্থা সম্পর্কে জোয়াও দ্য ব্যারোসের বিবরণ গুরুত্বপূর্ণ। সপ্তদশ শতাব্দীর একজন লেখক, ফারিয়া ওয়াই সুজার দি পর্তুগিজ এশিয়াতে বাংলার বিবরণ রয়েছে যা বহুলাংশে দ্য ব্যারোসের গ্রন্থে প্রদত্ত বিবরণের অনুরূপ। পঞ্চদশ শতাব্দীতে রচিত চৈনিক বর্ষপঞ্জি এবং পূর্বতন আমলের ইবনে বতুতার রেহলা থেকেও সাহায্য নেওয়া হয়েছে কারণ আমাদের আলোচ্যকালের ইতিহাস রচনার জন্য সহায়ক কিছু উপাদান সেগুলিতে রয়েছে।

হোসেন শাহী আমলের বাংলার ইতিহাসে আলোকপাতকারী মুদ্রা ও লিপিগুলি সম্ভবত কার্যকরভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। এগুলি বর্তমান লেখককে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তারিখ নির্ধারণে বা সংশোধনে সাহায্য করেছে। সার্বভৌমত্বের প্রকৃতি ও প্রাদেশিক গভর্নর ও অন্যান্য কর্মকর্তার দায়িত্বের প্রকৃতির মতো বাংলার সামাজিক-রাজনৈতিক জীবনের অন্যান্য অনেক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে টুকরো খবর সংগ্রহ করতেও এগুলি সাহায্য করেছে।

পরিশিষ্ট-চ

খ. গ্রন্থপঞ্জি

১. মৌলিক উৎসসমূহ

ঘটনাপঞ্জি

আবুল ফজল ঃ আইন-ই-আকবরী, ১ম খণ্ড, এইচ. ব্লখম্যান কর্তৃক অনূদিত, ২য় সংস্করণ, ডি. সি. ফিলট কর্তৃক সংশোধিত, বিব্লিওথেকা ইন্ডিকা, কোলকাতা, ১৯৩৯; ২য় ও ৩য় খণ্ড,. এইচ. এস. জ্যারেট কর্তৃক অনূদিত, যথাক্রমে ১৯৪৯ ও ১৯৪৮ সালে স্যার যদুনাথ সরকার কর্তৃক সংশোধিত ও টীকা সংযোজিত, বিব্লিওথেকা ইন্ডিকা, মূল পাঠ এইচ. ব্লখম্যান কর্তৃক সম্পাদিত ও বিব্লিওথেকা ইন্ডিকা সিরিজে প্রকাশিত (১৮৬৭-৭৭)।

আব্বাস সরওয়ানী ঃ তারিখ-ই-শেরশাহী, অনুবাদ, ইলিয়ট অ্যান্ড ডাওসন, হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া অ্যাজ টোল্ড বাই ইটস ঔন হিস্টোরিয়ান্স, ৪র্থ খণ্ড, লন্ডন, ১৮৭২; এস. এম. ইমাম উদ্দীন কর্তৃক মূলপাঠ সম্পাদিত ও অনূদিত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, যথাক্রমে ১৯৬৪ ও ১৯৬৫ সাল।

আব্দুল হামিদ লাহোরী ঃ বাদশাহ্‌নামা, ১ম খণ্ড, ১ম অংশ, কবির উদ্দীন আহমদ ও আব্দুর রহিম কর্তৃক মূলপাঠ সম্পাদিত, বিব্লিওথেকা ইন্ডিকা, কোলকাতা, ১৮৬৭। ইলিয়ট অ্যান্ড ডাওসন, ৭ম খণ্ডে সংক্ষিপ্ত অনুবাদ, লন্ডন, ১৮৭৭।

আব্দুল কাদির বদাউনী ঃ মুন্তাখাব-উত-তাওয়ারিখ, ১ম খণ্ড, মৌলবি আহমদ আলী কর্তৃক মূলপাঠ সম্পাদিত, বিব্লিওথেকা ইন্ডিকা, ১৮৬৮। জর্জ এস. এ. র‍্যাংকিং কর্তৃক ইংরেজি অনুবাদ, বিব্লিওথেকা ইন্ডিকা, ১৮৯৮।

আহমদ ইয়াদগার ঃ তারিখ-ই-শাহী বা তারিখ-ই-সালাতীন-ই-আফগানা, এম. হেদায়েত হোসেন কর্তৃক মূলপাঠ সম্পাদিত, বিব্লিওথেকা ইন্ডিকা, কোলকাতা, ১৯৩৯। ইংরেজি অনুবাদ, ইলিয়ট অ্যান্ড ডাওসন, ৫ম খণ্ড, লন্ডন, ১৮৭৩।

ইয়াহিয়া বিন আহমদ বিন : তারিখ-ই-মোবারকশাহী, এম. হেদায়েত

আব্দুল্লাহ্ সরহিন্দি ঃ হোসেন কর্তৃক মূলপাঠ সম্পাদিত, বিব্লিওথেকা ইন্ডিকা, কোলকাতা, ১৯৩১;ইংরেজি অনুবাদ, কে. কে. বসু, বরোদা, ১৯৩২।

কালী প্রসন্ন সেন (সম্পাদক) : রাজমালা, ১ম ও ২য় খণ্ড, আগরতলা, ১৩৩৬-৩৭ ত্রিপুরাব্দ।

খাজা নিয়ামতউল্লাহ্ : তারিখ-ই-খান জাহান লোদী, ইংরেজি অনুবাদ, ইলিয়ট অ্যান্ড ডাওসন, ৫ম খণ্ড; মূলপাঠ, ১ম খণ্ড, এস. এম. ইমামউদ্দীন কর্তৃক সম্পাদিত, এশিয়াটিক সোসাইটি অফ পাকিস্তান, ঢাকা, ১৯৬০।

গুণাভীরাম বড়ুয়া (সম্পাদক) : আসাম বুরঞ্জী, নওগাং, ১৮৭৫।

গুলবদন বেগম : হুমায়ুননামা, এ. এস. বেভারিজ কর্তৃক সম্পাদিত ও অনূদিত, ওরিয়েন্টাল ট্র্যানস্লেশন ফান্ড, নিউ সিরিজ, ১, লন্ডন, ১৯০২।

গোপাল চন্দ্র বড়ুয়া (সম্পাদক) : আসাম বুরঞ্জী, কোলকাতা, ১৯৩০।

গোলাম হোসেন সেলিম : রিয়াজ-উস-সালাতীন, মৌলবি আব্দুল হক আবিদ কর্তৃক মূলপাঠ সম্পাদিত, বিব্লিওথেকা ইন্ডিকা, কোলকাতা, ১৮৯০-৯১; ইংরেজি অনুবাদ, আব্দুস সালাম, বিব্লিওথেকা ইন্ডিকা, কোলকাতা, ১৯১০।

জওহর : তাজকিরাত-উল-ওয়াকিয়াত, স্টুয়ার্ট কর্তৃক ইংরেজি অনুবাদ, ওরিয়েন্টাল ট্র্যানস্লেশন ফান্ড, লন্ডন, ১৮৩২।

জিয়াউদ্দীন বারানী : তারিখ-ই-ফিরূজশাহী, মৌলবি সৈয়দ আহমদ খান সাহেব কর্তৃক সম্পাদিত, বিব্লিওথেকা ইন্ডিকা, কোলকাতা, ১৮৬২।

নিজামউদ্দীন আহমদ : তবকাত-ই-আকবরী, ৩য় খণ্ড, বি. দে. কর্তৃক মূলপাঠ সম্পাদিত, বিব্লিওথেকা ইন্ডিকা, ১৯২৭, ১৯৩১ ও ১৯৩৫ সালে প্রকাশিত; বি. দে কর্তৃক এ তিনখণ্ডের ইংরেজি অনুবাদ ১৯২৭, ১৯৩৬ ও ১৯৩৯ সালে বিব্লিওথেকা ইন্ডিকায় প্রকাশিত, (৩য় খণ্ড, বেণীপ্রসাদ কর্তৃক সংশোধিত)।

ফিরিশতা : তারিখ-ই-ফিরিশতা, মূলপাঠ, নেওয়াল কিশোর সংস্করণ, লক্ষ্ণৌ। জন ব্রিগস কর্তৃক অনূদিত, ১ম, ২য় ও ৪র্থ খণ্ড, কোলকাতা, ১৯০৮-৯ ও ১৯১০।

বাবুর : মেময়েরস অফ, ২য় খণ্ড, এ. এস. বেভারিজ কর্তৃক ইংরেজি অনুবাদ (মূল তুর্কি থেকে), লন্ডন, ১৯২১।

বুকানন হ্যামিল্টন : ফ্রান্সিস (কর্তৃক আবিষ্কৃত) : অ্যানোনিমাস ম্যানাস্ক্রিপ্ট হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, মার্টিনের ইস্টার্ন ইন্ডিয়া, ২য় খণ্ডে সারসংকলন, লন্ডন, ১৮৩৮।

মিনহাজ-ই-সিরাজ : তবকাত-ই-নাসিরী, ডব্লিউ. নাসাউলীজ, খাদিম হোসেন এবং আব্দুল হাই কর্তৃক মূলপাঠ সম্পাদিত, বিব্লিওথেকা ইন্ডিকা, কোলকাতা, ১৮৬৪; এইচ. জি. র‍্যাভার্টি কর্তৃক ইংরেজি অনুবাদ, বিব্লিওথেকা ইন্ডিকা, ১৮৮১।

মোহাম্মদ কাজিম : আলমগীরনামা, খাদিম হোসেন ও আব্দুল হাই কর্তৃক মূলপাঠ সম্পাদিত, বিব্লিওথেকা ইন্ডিকা, কোলকাতা, ১৮৬৮।

মির্জা নাথান : বাহারিস্তান-ই-গায়েবী, ২য় খণ্ড, এম. আই. বোরা কর্তৃক ইংরেজি অনুবাদ, গৌহাটি, ১৯৩৬।

শিহাবউদ্দীন আহমদ তালিশ : ফত্‌ইয়া-ই-ইব্রিয়া, বডলেন লাইব্রেরি পাণ্ডুলিপি, অর ৫৮৯; এশিয়াটিক সোসাইটি অফ পাকিস্তানের ফটোকপি; এইচ. ব্লখম্যান কর্তৃক ইংরেজি অনুবাদ, জে. এ. এস. বি. ১৮৭২।

সূর্যকুমার ভূঁঞা (সম্পাদক) : আসাম বুরঞ্জী, গৌহাটি, ১৯৩০।

দেওধাই আসাম বুরঞ্জী, গৌহাটি, ১৯৩২।

হামিদউল্লাহ্ খান : আহাদীস-উল-খাওয়ানীন, কোলকাতা, ১৮৭১।

২. সাহিত্য : কাব্য, ধর্মীয় রচনাবলি ইত্যাদি

আবু নসর-উস-সরাজ : কিতাব-উল-লুমা ফি'ত তসাওয়ুফ, আর. এ. নিকলসন কর্তৃক সম্পাদিত, লন্ডন, ১৯১৪।

আলাওল : পদ্মাবতী, ১ম খণ্ড, মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ্ কর্তৃক সম্পাদিত, ঢাকা, ১৯৫০।

আলী রিজা : জ্ঞান-সাগর, আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ কর্তৃক সম্পাদিত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, গ্রন্থ নং ৫৯, কোলকাতা, ১৩২৪ বঙ্গাব্দ।

আলী বিন উসমান-উল-জুল্লাবিল হুজউইরী : কাশফ্-উল-মহজুব, আর. এ. নিকলসন কর্তৃক সম্পাদিত, গিব মেমোরিয়াল সিরিজ, লন্ডন, ১৯১১।

ইউসুফ হোসেন (সম্পাদক) : হাউজ-উল-হায়াত, সংক্ষিপ্ত ফরাসি অনুবাদ সংবলিত, জার্নাল এশিয়াটিক, প্যারিস, ১৯২৮। ২১৩, পৃ. ২৯১-৩৪৪।

ঈশান নাগর : অদ্বৈত-প্রকাশ, মৃণাল কান্তি ঘোষ কর্তৃক সম্পাদিত, ৩য় সংস্করণ, কোলকাতা, ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ।

কবি কর্ণপুর (পরমানন্দ সেন) : চৈতন্য-চরিতামৃত, রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন কর্তৃক সম্পাদিত, রাধারমণ প্রেস, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, ১২৯১ বঙ্গাব্দ।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ : চৈতন্য-চরিতামৃত, অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী কর্তৃক সম্পাদিত, ৩য় সংস্করণ, কোলকাতা, ১৩২৫ বঙ্গাব্দ।

কৃত্তিবাস : রামায়ণ, দীনেশ চন্দ্র সেন কর্তৃক সম্পাদিত, কোলকাতা, ১৯১৬।

কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দ : মনসা-মঙ্গল, ১ম খণ্ড, দীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য কর্তৃক সম্পাদিত, কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪৩।

কুতবন : মৃগাবতী, অধ্যাপক হাসান আসকারী কর্তৃক উদ্ধৃতাংশ : কুতবন্স মৃগাবত– এ ইউনিক ম্যানাস্ক্রিপ্ট ইন পার্সিয়ান স্ক্রিপ্ট, জার্নাল অফ বিহার রিসার্চ সোসাইটি, খণ্ড ৪১, ৪র্থ অংশ, ১৯৫৫, ডিসেম্বর, পৃ. ৪৫২-৮৭।

গোবিন্দ দাস : কড়চা, দীনেশ চন্দ্র সেন কর্তৃক সম্পাদিত, কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯২৬।

চণ্ডীদাস : শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন, বসন্ত রঞ্জন রায় কর্তৃক সম্পাদিত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কোলকাতা, ১৩২৩ বঙ্গাব্দ, ১৩৪২ বঙ্গাব্দ ইত্যাদি। চণ্ডীদাসের পদাবলী, নীলরতন মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩২১ বঙ্গাব্দ।

চূড়ামণিদাস : গৌরাঙ্গ-বিজয়, সুকুমার সেন কর্তৃক সম্পাদিত, বিব্লিওথেকা ইন্ডিকা, কোলকাতা, ১৯৫৭।

জয়দেব : গীত-গোবিন্দ, স্যার উইলিয়াম জোন্স কর্তৃক ইংরেজি অনুবাদ, কালেক্টেড ওয়ার্কস, লন্ডন, ১৮০৭।

জয়ানন্দ : চৈতন্য-মঙ্গল, অতুল কৃষ্ণ গোস্বামী কর্তৃক সম্পাদিত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩০৭ বঙ্গাব্দ।

দৌলত কাজী : সতী ময়না ও লোর-চন্দ্রাণী, সাহিত্য পত্রিকা ১ম খণ্ডে সত্যেন্দ্র নাথ ঘোষাল কর্তৃক সম্পাদিত, বিদ্যাভবন, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন, ১৩৬২ বঙ্গাব্দ।

দৌলত উজির বাহরাম খান : লায়লী মজনু, আহমদ শরীফ কর্তৃক সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৫৭।

নিজামী : হফ্‌ত পয়কর, ১ম খণ্ড, সি. ই. উইলসন কর্তৃক ইংরেজি অনুবাদ, লন্ডন, ১৯২৪।

প্রসন্নকুমার কবিরত্ন (সম্পাদক) : গোরক্ষ-সংহিতা, কোলকাতা, ১৮১৩ শকাব্দ।

পীর মোহাম্মদ শাত্তারী : রিসালাত-উস-শুহাদা, জি. এইচ. দমন্ত কর্তৃক মূলপাঠ ও সংক্ষিপ্ত ইংরেজি অনুবাদ, জে. এ. এস. বি. ১৮৭৪।

বিপ্রদাস : মনসা-বিজয়, সুকুমার সেন কর্তৃক সম্পাদিত, বিব্লিওথেকা ইন্ডিকা, কোলকাতা, ১৯৫৩।

বিজয় গুপ্ত : মনসা-মঙ্গল, বসন্ত কুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক সম্পাদিত, ৩য় সংস্করণ, বাণীনিকেতন, বরিশাল (প্রকাশনার তারিখ নেই)।

বৃন্দাবন দাস : শ্রীচৈতন্য-ভাগবত, ৪র্থ সংস্করণ, মৃণাল কান্তি ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত, কোলকাতা, ৪৪০ গৌরাঙ্গাব্দ।

ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর : ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলির ২য় খণ্ডে বিদ্যা-সুন্দর, ব্রজেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস কর্তৃক সম্পাদিত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কোলকাতা, ১৩৫০ বঙ্গাব্দ।

মালাধর বসু : শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়, খগেন্দ্রনাথ মিত্র কর্তৃক সম্পাদিত, কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪৪।

মালিক মোহাম্মদ জয়সী : পদ্মাবতী, গ্রিয়ারসন ও সুধাকর ত্রিবেদী, বিব্লিওথেকা ইন্ডিকা, কোলকাতা, ১৯১১। শিরেফ কর্তৃক ইংরেজি অনুবাদ, বিব্লিওথেকা ইন্ডিকা, ১৯৪৪।

মাওলানা দাউদ : চন্দাইন, অধ্যাপক হাসান আসকারী কর্তৃক উদ্ধৃতাংশ : "রেয়ার ফ্র্যাগমেন্টস অব চন্দাইন অ্যান্ড মৃগবতী", কারেন্ট স্টাডিজ, পৃ. ৬-২৩, পাটনা কলেজ, ১৯৫৫।

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী : চণ্ডীমঙ্গল বা কবিকঙ্কণ-চণ্ডী, ১ম ও ২য় খণ্ড, ডি. সি. সেন ও অন্যান্য কর্তৃক সম্পাদিত, কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯২৪ ও ১৯২৬।

মোহাম্মদ গাওসী : গুলজার-ই-আবরার, পাণ্ডুলিপি নং ২৫৯, এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল, কোলকাতা; এশিয়াটিক সোসাইটি অফ পাকিস্তান, ঢাকা, ফটোস্ট্যাট কপি।

মোহসীন ফনি : দবিস্তান-উল-মজাহিব, বোম্বে সংস্করণ, (তারিখ নেই)।

রামাই পণ্ডিত : শূন্য-পুরাণ, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত, কোলকাতা, ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ।

: ধর্মপূজা-বিধান, ননী গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত, কোলকাতা, ১৩২৩ বঙ্গাব্দ।

রামেশ্বর ভট্টাচার্য : শিবায়ন, ঈশান চন্দ্র বসু কর্তৃক সম্পাদিত, কোলকাতা, ১৩১০ বঙ্গাব্দ।

রূপরাম : ধর্ম-মঙ্গল, ১ম খণ্ড, সুকুমার সেন, পঞ্চানন মণ্ডল ও সুনন্দা সেন কর্তৃক সম্পাদিত, ২য় সংস্করণ, কোলকাতা, ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ।

শেখ ফয়জুল্লাহ : গোরক্ষ-বিজয়, পঞ্চানন মণ্ডল কর্তৃক সম্পাদিত, বিশ্বভারতী প্রকাশনা, কোলকাতা, ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ।

শেখ জাহিদ : আদ্য পরিচয়, এনামুল হকের সম্পাদিত ভি. আর. এস. পাণ্ডুলিপি।

শ্রীধর : বিদ্যা-সুন্দর, আহমদ শরীফ কর্তৃক সম্পাদিত, সাহিত্য পত্রিকা, ঢাকা, ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১৫-৩৪।

শ্রীকরনন্দী : অশ্বমেধ পর্ব, বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ ও দীনেশচন্দ্র সেন কর্তৃক সম্পাদিত, বঙ্গীয় সহিত্য পরিষৎ, কোলকাতা, ১৩১২ বঙ্গাব্দ।

শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার (সম্পাদক) : হথযোগ-প্রদীপিকা, বোম্বে থিওসফিকাল ফান্ড. ১৮৯৩।

লোচন দাস : চৈতন্য-মঙ্গল, মৃণাল কান্তি ঘোষ কর্তৃক সম্পাদিত, ২য় সংস্করণ, কোলকাতা ৪৪৪ গৌরাঙ্গাব্দ।

সাবিরিদ খান : বিদ্যা-সুন্দর, আহমদ শরীফ কর্তৃক সম্পাদিত, সাহিত্য পত্রিকা,

ঢাকা, ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৬-১১৪।

সাধন : ময়না-সত, মনের পাণ্ডুলিপি ও পণ্ডিত উদয়শঙ্কর চতুর্বেদীর অধ্যাপক হাসান আসকারী কর্তৃক আমাকে প্রদত্ত অন্য একটি পাণ্ডুলিপি থেকে তৈরি করা হয়েছে। একটি প্রবন্ধ রচনায় আমি এগুলি ব্যবহার করেছি। বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ঢাকা. ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৩ পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহ এবং ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৮ ও পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহ।

সৈয়দ মুর্তুজা (?) যোগকালন্দর, পাণ্ডুলিপি ৩৮৬ ও ৩৮৮ (আরবি হরফে)। সাহিত্য-বিশারদের সংগ্রহ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার। বিভিন্ন অংশ জোড়া দিয়ে এ গ্রন্থের একটি মূলপাঠ (এখনও অপ্রকাশিত) ড: এনামুল হক তৈরি করেছেন যা রাজশাহীর বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটির যাদুঘরে আছে। একই প্রতিষ্ঠানের অন্য একটি নম্বরবিহীন পাণ্ডুলিপি ও সেপাণ্ডুলিপি ব্যবহার করা হয়েছে।

সৈয়দ সুলতান : জ্ঞান-প্রদীপ, পাণ্ডুলিপি নং ১৫২, আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ সংগ্রহ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (সম্পাদক) : চর্যাচর্য-বিনিশ্চয়, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কোলকাতা, ১৯৫৮।

হরিহরানন্দ আরণ্য : ধর্মমেঘ আরণ্য ও রায় কপিলাশ্রমীয় পাতঞ্জল জে.সি. বাহাদুর (অনুবাদক ও সম্পাদক) : যোগদর্শন, ৪র্থ সংস্করণ, কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪৯।

৩. মুদ্রা

এ. করিম : কর্পাস অফ দি মুসলিম কয়েন্স অফ বেঙ্গল, এশিয়াটিক সোসাইটি অফ পাকিস্তান, ঢাকা, ১৯৬০।

এন. কে. ভট্টশালী : ক্যাটালগ অফ কয়েন্স, হাকিম হাবিবুর রহমান খান কর্তৃক সংগৃহীত, ঢাকা, ১৯৩৬।

এন. কে. ভট্টশালী : ক্যাটালগ অফ কয়েন্স ফ্রম তৈফুর কালেকশন্স, ঢাকা ১৯৩৬ : কয়েন্স অ্যান্ড ক্রনোলজি অফদি আর্লি ইন্ডিপেডেন্ট সুলতানস অফ বেঙ্গল, কেম্ব্রিজ, ১৯২২।

এস. আহমদ : এ সাপ্লিমেন্ট টু ভল্যুম টু অফ দি ক্যাটালগ অফ কয়েন্স ইন দি ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম, কোলকাতা, দিল্লি, ১৯৩৯।

টমাস. ই : দি ক্রনিকল্স অফ দি পাঠান কিংস অফ দিল্লি, লন্ডন, ১৮৭১।

বোথাম. এ. ডব্লিউ : ক্যাটালগ অফ দি প্রভিন্সিয়াল কয়েন ক্যাবিনেট অফ আসাম, ২য় সংস্করণ, এলাহাবাদ, ১৯৩০।

বোথাম. এ ডব্লিউ এবং ফ্রিয়েল : সাপ্লিমেন্ট টু দি ক্যাটালগ অফ দি প্রভিন্সিয়াল ক্যাবিনেট অফ কয়েন্স, আসাম, এলাহাবাদ, ১৯১৯।

রাইট. এইচ. নেলসন : ক্যাটালগ অফ দি কয়েন্স ইন দি ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম,ক্যালকাটা, ২য় খণ্ড, ২য় অংশ, অক্সফোর্ড, ১৯০৭।

: দিকয়েনেজ অ্যান্ড মেট্রোলজি অফ দি সুলতানস অফ দিল্লি, দিল্লি, ১৯৩৬।

লেন-পুল, স্ট্যানলি : দি কয়েন্স অফ দি মোহামেডান স্টেটস অফ ইন্ডিয়া ইন দি ব্রিটিশ মিউজিয়াম, লন্ডন, ১৮৮৫।

স্মিথ ভি. এ : ক্যাটালগ অফ দি কয়েন্স ইন দি ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম, ক্যালকাটা, ১ম খণ্ড, অক্সফোর্ড, ১৯০৬।

স্ট্যাপলটন. এইচ. ই : ক্যাটালগ অফ দি প্রভিন্সিয়াল ক্যাবিনেট অফ কয়েন্স, ইস্টার্ন বেঙ্গল অ্যান্ড আসাম, শিলং, ১৯১১।

৪. উৎকীর্ণ লিপিমালা

আবিদ আলী খান : মেময়েরস অফ গৌড় অ্যান্ড পাণ্ডুয়া, এইচ. ই. স্ট্যাপলটন কর্তৃক সম্পাদিত ও সংশোধিত, কোলকাতা, ১৯৩১।

এ. এইচ. দানী : বিব্লিওগ্রাফি অফ দি মুসলিম ইনস্ক্রিপশন্স অফ বেঙ্গল, (ডাউন টু ১৫৩৮), অ্যাপেনডিক্স টু দি জার্নাল অফ দি এশিয়াটিক সোসাইটি অফ পাকিস্তান, ২য় খণ্ড, ঢাকা, ১৯৫৭।

এস. আহমদ : ইনস্ক্রিপশন্স অফ বেঙ্গল, ৪র্থ খণ্ড, বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়াম, রাজশাহী, ১৯৬০।

কানিংহাম, আলেকজান্ডার : আর্কিওলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া রিপোর্ট, (সংক্ষেপে এ. এস. আই), পঞ্চদশ খণ্ড, কোলকাতা, ১৮৮২।

গ্রেজিয়ার, ই. জি. : এ রিপোর্ট অন দি ডিস্ট্রিক্ট অফ রংপুর, কোলকাতা, ১৮৭৩।

র‍্যাভেনশ. জে. এইচ : গৌড় : ইটস রুইন্স অ্যান্ড ইনস্ক্রিপশন্স, লণ্ডন, ১৮৭৮।

৫. বিদেশী পর্যটকদের বিবরণ

ইবনে বতুতা : দি রেহ্‌লা অফ ইবনে বতুতা, মাহদী হোসেনের ইংরেজি অনুবাদ, গায়কোয়াড়ের ওরিয়েন্টাল সিরিজ, ওরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউট, বরোদা, ১৯৫৩। ডিফ্রেসারি ও স্যানগুয়িনেট্টির ভয়েজেস দ্য ইবনে বতুতা তে মূলপাঠ ও ফরাসি অনুবাদ, প্যারিস, ১৯২২। এ সংস্করণের ৪র্থ খণ্ডে বাংলার বিবরণ রয়েছে। দি ট্রাভেলস অফ ইবনে বতুতা, এইচ. গিব কর্তৃক ইংরেজি অনুবাদ, হ্যাকলুইট সোসাইটি, কেম্ব্রিজ, ১৯৫৮।

পুরকাস, স্যামুয়েল : পুরকাস হিজ পিলগ্রিমস, ১০ম খণ্ড, গ্লাসগো, ১৯০৫ (সিজার ফ্রেডারিক ও রালফ্ ফিচ এর বিবরণের জন্য)।

বার্বোসা, ডুয়ার্টে : দি বুক অফ ডুয়ার্টে বার্বোসা, ২য় খণ্ড, এম. এল. ডেমস কর্তৃক ইংরেজি অনুবাদ, হ্যাকলুইট সোসাইটি, লণ্ডন, ১৯১৮ ও ১৯১৯।

ব্যারোস, জোয়াও দ্য : দ্যা এশিয়া, দি বুক অফ ডুয়ার্টে বার্বোসা, ২য় খণ্ডে উদ্ধৃতাংশ, পরিশিষ্ট ১, পৃ. ২৩৯-৪৮।

ভার্থেমা. লুডোভিকো ডি: দি ট্র্যাভেলস অফ ভার্থেমা, জন উইন্টার জোন্স কর্তৃক ইংরেজি অনুবাদ, জর্জ পার্সি ব্যাজার কর্তৃক সম্পাদিত, হ্যাকলুইট সোসাইটি, লন্ডন, ১৮৬৩।

মাহুয়ান : "কিংডম অফ বেঙ্গালা", জর্জ ফিলিপ কর্তৃক ইংরেজি অনুবাদ, জে. আর. এ. এস. ১৮৯৫। বিশ্বভারতী অ্যানালস, ১৯৪৫, ১ম খণ্ডে মুসলিম বাংলা সম্পর্কে অন্যান্য চৈনিক বিবরণসহ মাহুয়ানের বিবরণের প্রবোধচন্দ্র বাগচী কর্তৃক ইংরেজি অনুবাদ।

মার্কো পলো : দি বুক অফ সের মার্কো পলো, ২য় খণ্ড, ৩য় সংস্করণ, ইউল অ্যান্ড কোর্ডিয়ের, লন্ডন, ১৯০৩।

সুজা. ফরিয়া ওয়াই : দি পর্তুগিজ এশিয়া, ১ম খন্ড, স্টিভেন্স কর্তৃক ইংরেজি অনুবাদ, লন্ডন, ১৬৯৫।

খ. অপ্রধান উৎসসমূহ

১. রাজনৈতিক ইতিহাস, ইম্পেরিয়াল গেজেটিয়ার্স

ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার্স ও স্থান-বিবরণ সম্বন্ধীয় বিবরণ।

আই. এইচ. কোরেশী : দি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ দি সুলতানস অফ দিল্লি, লাহোর, ১৯৪৪।

আর. সি. মজুমদার : এইচ.সি. রায় চৌধুরী

ও কে দত্ত : অ্যান অ্যাডভান্সড হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া, লন্ডন, ১৯৫০।

আর. ডি. ব্যানার্জি : বাংলার ইতিহাস, ২য় খণ্ড, কোলকাতা, ১৩২৪ বঙ্গাব্দ। হিস্ট্রি অফ উড়িষ্যা, ১ম খণ্ড, কোলকাতা, ১৯৩০।

আর. কে. চক্রবর্তী : গৌড়ের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, মালদহ, ১৯০৩।

এ.বি. এম. হাবিবুল্লাহ : দি ফাউন্ডেশন অফ মুসলিম রুল ইন ইন্ডিয়া, ২য় সংস্করণ, এলাহাবাদ, ১৯৬১।

এস. এন. ভট্টাচার্য : এ হিস্ট্রি অফ মোগল নর্থ-ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার পলিসি, কোলকাতা, ১৯২৯।

ও'ম্যালী, এল. এস. এম : চিটাগাং গেজেটিয়ার, কোলকাতা, ১৯০৮।

ক্যাম্পোস. জে. জে. এ : এ হিস্ট্রি অফ দি পর্তুগিজ ইন বেঙ্গল, কোলকাতা, ১৯১৯।

কে. আর. কানুনগো : শেরশাহ, কোলকাতা, ১৯২১।

কে. এল. বড়ুয়া : দি আর্লি হিস্ট্রি অফ কামরূপ, শিলং, ১৯৩৩।

গেইট. ই. এ. : হিস্ট্রি অফ আসাম, কোলকাতা, ১৯০৬।

গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া : ইম্পেরিয়াল গেজেটিয়ার অফ ইন্ডিয়া, দশম ও চতুর্দশ খণ্ড, নতুন সংস্করণ, অক্সফোর্ড, ১৯০৮।

টড : অ্যানালস অ্যান্ড অ্যান্টিকুইটিজ অফ রাজস্থান, ১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড, ডব্লিউ ক্রুকের সংস্করণ, লন্ডন, ১৯২০।

ফ্যায়ার, আর্থার : হিস্ট্রি অফ বার্মা ইনক্লুডিং বার্মা প্রপার, পেগু, টৌঙ্গু টেনাসেরিম অ্যান্ড আরাকান, লন্ডন, ১৮৮৩।

মার্টিন, মন্টগোমারি : দি হিস্ট্রি, অ্যান্টিকুইটিজ, টোপোগ্রাফি অ্যান্ড স্ট্যাটিস্টিক্স অফ ইস্টার্ণ ইন্ডিয়া, ২য় ও ৩য় খণ্ড, লন্ডন, ১৮৩৮।

রেনেল, জে : এ বেঙ্গল অ্যাটলাস, কোলকাতা, ১৭৭১; মেময়েরস অফ এ ম্যাপ অফ হিন্দুস্তান, লন্ডন, ১৭৮৮। (লেখক মূল গ্রন্থপঞ্জিতে এ দু'টোর নামোল্লেখ করেন নি। পরে সূচিপত্রের শেষে টীকা সংযোজন করে লেখক এ দু'টোর উল্লেখ করেছিলেন।)

স্যার যদুনাথ সরকার : (সম্পাদক) : হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, ২য় খণ্ড, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত,ঢাকা, ১৯৪৮।

স্মিথ, ভি. এ : আকবর দি গ্রেট মোগল, সংশোধিত ২য় সংস্করণ, অক্সফোর্ড, ১৯২৬।

স্টুয়ার্ট, চার্লস : হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, কোলকাতা, ১৯০৩ সংস্করণ, বঙ্গবাসী প্রেস।

সুখময় মুখোপাধ্যায় : বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর : স্বাধীন সুলতানদের আমল, কোলকাতা, ১৯৬২।

হার্ভে, জি. ই. : হিস্ট্রি অফ বার্মা ফ্রম দি আর্লিয়েস্ট টাইমস টু টেনথ্ মার্চ, এইটিন টুয়েন্টিফোর, দি বিগিনিং অফ দি ইংলিশ কংকোয়েস্ট, লন্ডন, ১৯২৫

হান্টার, ডব্লিউ, ডব্লিউ : এ স্ট্যাটিস্টিকাল অ্যাকাউন্ট অফ বেঙ্গল, ভাগলপুর, চতুদর্শ খণ্ড, লন্ডন, ১৮৭৭।

২. অর্থনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাস

আর. সি. মজুমদার (সম্পাদক) : হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, ১ম খণ্ড, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪৩।

এ. করিম : সোসাল হিস্ট্রি অফ দি মুসলিমস ইন বেঙ্গল, এশিয়াটিক সোসাইটি অফ পাকিস্তান, ঢাকা, ১৯৫৯।

এ. রহিম : সোসাল অ্যান্ড কালচারাল হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, ১ম খণ্ড, করাচি, ১৯৬৩।

এন. এন. বসু : বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ১ম অংশ (ব্রাহ্মণ কান্ড) এবং ৩য় খণ্ড (পিরালী ব্রাহ্মণ বিবরণ), কোলকাতা, ১৩৩১ বঙ্গাব্দ।

এন. আর. রায় : বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, কোলকাতা, ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ।

কে. এম. আশরাফ : লাইফ অ্যান্ড কন্ডিশন্স অফ দি পিপ্‌ল অফ হিন্দুস্তান (১২০০-১৫০০ এ. ডি.), জে. এ. এস. বি. ১৯৩৫, ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা, প্রবন্ধ-৪।

জে. এন. দাশগুপ্ত : বেঙ্গল ইন দি সিক্সটিনথ্ সেঞ্চুরি এ. ডি, কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯১৪।

টি.সি. দাশগুপ্ত : অ্যাসপেক্টস অফ বেঙ্গলী সোসাইটি ফ্রম ওল্ড বেঙ্গলী লিটারেচার, কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩৫।

টি. কে. রায় চৌধুরী : বেঙ্গল আন্ডার আকবর অ্যান্ড জাহাঙ্গীর, কোলকাতা, ১৯৫৩।

ডি. সি. সেন : বৃহৎ বঙ্গ, ১ম ও ২য় খণ্ড, কোলকাতা, ১৩৪১-৪২ বঙ্গাব্দ।

পিরেন, এইচ : ইকনমিক অ্যান্ড সোসাল হিস্ট্রি অফ মিডাইভাল ইউরোপ, এ হার্ভেস্ট বুক, নিউইয়র্ক। মিডাইভাল সিটিজ, এ ডাবল ডে অ্যাঙ্কর বুক, নিউইয়র্ক।

সুকুমার সেন : প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী, বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ, কোলকাতা, ১৩৫৩ বঙ্গাব্দ।

মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী, বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ, ১৩৫২ বঙ্গাব্দ।

৩. সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস

আর্নল্ড, স্যারটি. ডব্লিউ : এ ক্যাটালগ অফ ইন্ডিয়ান মিনিয়েচার্স, ১ম ও ৩য় খণ্ড, জে. ভি. এস. উইলকিন্সন কর্তৃক সংশোধিত ও সম্পাদিত, এ চেস্টারবিটীর গ্রন্থাগার, লন্ডন, ১৯৩৬।

আইভানো ভ্লাদমির : কনসাইজ ডেস্ক্রিপ্টিভ ক্যাটালগ অফ দি পার্সিয়ান ম্যানাস্ক্রিপ্টস ইন দি কালেকশন অফ দি এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল, বিব্লিওথেকা ইন্ডিকা, কোলকাতা, ১৯২৯।

এ. হক : মুসলিম বাঙ্গালা সাহিত্য, ঢাকা, ১৯৫৭।

এ. করিম সাহিত্য-বিশারদ : বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ, ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কোলকাতা, ১৩২০ বঙ্গাব্দ।

এলউইন, ভেরিয়ের : ফোক সংস অফ ছত্তিশগড়, বোম্বে, ১৯৪৬।

এথে. এইচ : ক্যাটালগ অফ দি পার্সিয়ান ম্যানাস্ক্রিপ্টস ইন দি বডলেন লাইব্রেরি, অক্সফোর্ড, ১৮৮৯।

এম. জিয়াউদ্দীন : এ মনোগ্রাফ অন মুসলিম ক্যালিগ্রাফি, বিশ্বভারতী কোয়ার্টারলি থেকে পুণর্মুদ্রিত, কোলকাতা, ১৯৩৬।

এন. কে. ভট্টশালী : আইকনোগ্রাফি অফ বুড্ডিস্ট অ্যান্ড ব্রাহমিনিকাল স্কাল্পচারস ইন দি ঢাকা মিউজিয়াম, ঢাকা, ১৯২৯।

এস. সি. বিদ্যাভূষণ : হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়ান লজিক, কোলকাতা, ১৯২১।

এস. রাধাকৃষ্ণণ : ইন্ডিয়ান ফিলসফি, ২য় খণ্ড, লন্ডন, ১৯২৭।

এস. সি. বন্দ্যোপাধ্যায় : স্মৃতিশাস্ত্রে বাঙ্গালী, কোলকাতা, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ।

ক্রেটন. এইচ : রুইন্স অফ গৌড়, ডেসক্রাইব্ড অ্যান্ড রিপ্রেজেন্টেড ইন এইটিন ভিউজ, লন্ডন, ১৮১৭।

ক্রেসওয়েল. কে. এ. সি : এ শর্ট অ্যাকাউন্ট অফ আর্লি মুসলিম আর্কিটেকচার, পেঙ্গুইন সংস্করণ, লন্ডন, ১৯৫৮।

গ্যারেট. জি. টি (সম্পাদক) : লেগেসি অফ ইন্ডিয়া, অক্সফোর্ড, ১৯৩৮।

গ্রে. ব্যাসিল : রাজপুত পেইন্টিং, দি ফ্যাবার গ্যালারি অফ ওরিয়েন্টাল আর্ট, লন্ডন।

দি আর্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যান্ড পাকিস্তান, লন্ডন, ১৯৪৯।

ডি. সি. ভট্টাচার্য : বাঙ্গালার সারস্বত অবদান, ১ম খণ্ড, কোলকাতা, ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ।

ডি. সি. সেন : বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, কোলকাতা, ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ। হিস্ট্রি অফ বেঙ্গলী ল্যাংগুয়েজ অ্যান্ড লিটারেচার, কোলকাতা, ১৯১১।

তারাচাঁদ : ইনফ্লুয়েন্স অফ ইসলাম অন ইন্ডিয়ান কালচার, ২য় সংস্করণ, এলাহাবাদ, ১৯৬৩।

ফার্গুসন, জে : এ হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়ান অ্যান্ড ইস্টার্ন আর্কিটেকচার, ২য় খণ্ড, লন্ডন, ১৯১০।

ফক্সস্ট্র্যাংওয়েজ, এ. এইচ : দি মিউজিক অফ হিন্দোস্তান, অক্সফোর্ড, ১৯১৪।

ফণীভূষণ তর্কবাগিশ : ন্যায় পরিচয়, যাদবপুর, ১৩৪০ বঙ্গাব্দ।

ব্রাউন, পার্সি : ইন্ডিয়ান আর্কিটেকচার (ইসলামিক পিরিয়ড), ৩য় সংস্করণ, বোম্বে।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ : বাংলা সাহিত্যের কথা, ২য় খণ্ড, ঢাকা, ১৯৬৫।

সুকুমার সেন : বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, কোলকাতা, ১৯৪৮।

ইসলামি বাঙ্গালা সাহিত্য, বর্ধমান সাহিত্য সভা, ১৩৫৩ বঙ্গাব্দ।

হিট্টি, পি. কে : হিস্ট্রি অফ দি অ্যারাবস, ৪র্থ সংস্করণ, লন্ডন, ১৯৪৯।

হ্যাভেল, ই. বি : ইন্ডিয়ান আর্কিটেকচার, ইট্‌স সাইকলজি, স্ট্রাকচার অ্যান্ড হিস্ট্রি ফ্রম দি আর্লিয়েস্ট মোহামেডান ইনভেশন টু দি প্রেজেন্ট ডে, ২য় সংস্করণ, লন্ডন, ১৯৭।

৪. ধর্মীয় সম্প্রদায় ও আন্দোলন সম্পর্কিত গ্রন্থাবলি

আমীর আলী : দি স্পিরিট অফ ইসলাম, লন্ডন, ১৯৪৯।

ইউ. এন. ভট্টাচার্য : বাংলার বাউল ও বাউল গান, কোলকাতা, ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ।

এ. হক : বঙ্গে সুফী প্রভাব, কোলকাতা, ১৯৩৫।

পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম, ঢাকা, ১৯৪৮।

এ. সোবহান জন : সুফিজম, ইটস সেইন্টস অ্যান্ড শ্রাইন্স, লক্ষ্ণৌ, ১৯৩৮।

এম. এম. বোস : দি পোস্ট-চৈতন্য সহজিয়া কাল্ট অফ বেঙ্গল, কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩০।

এস. বি. দাশগুপ্ত : অবস্কিউর রেলিজিয়াস কাল্টস, কোলকাতা, ১৯৬২।

ভারতীয় সাধনার ঐক্য, বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ, ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ।

শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ : দর্শনে ও সাহিত্যে, কোলকাতা, ২য় সংস্করণ, ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ।

এস. ভট্টাচার্য : তন্ত্রপরিচয়, বিশ্বভারতী, ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ।

এস. কে. দে : আর্লি হিস্ট্রি অফ বৈষ্ণব ফেইথ অ্যান্ড মুভমেন্ট ইন বেঙ্গল, কোলকাতা, ১৯৪২।

কে. মল্লিক : নাথ সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন প্রণালী, কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫০।

কেনেডী. এম. টি : দি চৈতন্য মুভমেন্ট, ওয়াই. এম. সি. এ. কোলকাতা, ১৯২৫।

জে. এম. ভট্টাচার্য : বাঙ্গালার বৈষ্ণব-ভাবাপন্ন কবি, কোলকাতা, ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ।

ডি. সি. সেন : চৈতন্য অ্যান্ড হিজ এইজ, কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯২২।

নিকলসন, আর. এ : স্টাডিজ ইন ইসলামিক মিস্টিসিজম, কেম্ব্রিজ, ১৯২১।

দি মিস্টিকস্ অফ ইসলাম, লন্ডন, ১৯১৪।

'মিস্টিসিজম', লেগেসি অফ ইসলাম, টি. আর্নল্ড ও এগিলোস কর্তৃক সম্পাদিত, লন্ডন, ১৯৪৯।

বি. বি. মজুমদার : চৈতন্য-চরিতের উপাদান, কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩৯।
শিকদার ইকবাল আলী শাহ : ইসলামিক সুফিজম, লন্ডন, ১৯৩৩।

গ. সাময়িকী (প্রয়োজনীয় স্থানে সংক্ষেপকরণসহ)

অ্যানালস অফ দি ভান্ডারকার ওরিয়েন্টাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট, (এ. বি. ও. আর. আই)।
ইন্ডিয়ান এন্টিকোয়ারি, বোম্বে।
ইন্ডিয়ান হিস্টোরিকাল কোয়ার্টারলি, (আই. এইচ. কিউ), কোলকাতা।
এপ্রিগ্রাফিয়া ইন্ডিকা (ই. আই), ভারত সরকার।
এপিগ্রাফিয়া ইন্ডো-মোসলেমিকা (ই. আই. এম), ভারত সরকার।
কারেন্ট স্টাডিজ, পাটনা।
জার্নাল এশিয়াটিক, প্যারিস।
জার্নাল অফ দি এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল, (জে. এ. এস. বি), কোলকাতা।
জার্নাল অফ দি এশিয়াটিক সোসাইটি অফ পাকিস্তান (জে. এ. এস. পি), ঢাকা।
জার্নাল অফ বিহার রিসার্চ সোসাইটি (জে. বি. আর. এস), পাটনা।
জার্নাল অফ বিহার অ্যান্ড উড়িষ্যা রিসার্চ সোসাইটি (জে. বি. ও. আর. এস), পাটনা।
জার্নাল অফ দি ইন্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওরিয়েন্টাল আর্ট (জে. আই. এস. ও. এ), কোলকাতা।
জার্নাল অফ দি নিউসিসমেটিক সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া (জে. এন. এস. আই), বোম্বে ও বেনারস।
জার্নাল অফ দি রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি অফ গ্রেট ব্রিটেন অ্যান্ড আয়ারল্যান্ড (জে. আর. এ. এস), লন্ডন।
ঢাকা রিভিউ, ঢাকা।
প্রসিডিংস অফ দি এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল (পি. এ. এস. বি), কোলকাতা।
বেঙ্গলী একাডেমী পত্রিকা, ঢাকা।
বেঙ্গলী লিটারারি রিভিউ, করাচি।
বেঙ্গল পাস্ট অ্যান্ড প্রেজেন্ট (বি. পি. পি.), কোলকাতা।
বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটিজ মনোগ্রাফস (ভি. আর. এস মনোগ্রাফস), রাজশাহী।
বিশ্বভারতী অ্যানালস, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন।
মার্গ, বোম্বে।
মু'আসির, পাটনা।
ললিতকলা, নিউ দিল্লি।
সাহিত্য পত্রিকা, ঢাকা।
সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা (এস. পি. পি), কোলকাতা।